সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পসমগ্র

গল্পসমগ্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড
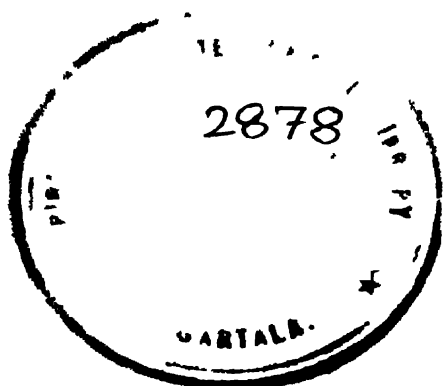
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

ব্রিগেডিয়ার ডা: পি. কে. রায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু—

এই লেখকের কিছু বই

গল্পসমগ্র
তালাচাবি
বাড়িবদল
অজ্ঞাতবাস
দীনজনে
অচেনা আকাশ
অ্যাকোরিয়াম
আকাশ পাতাল
আমার বড়মামা
আমার ভূত
ইতি তোমার মা
ইতিহাসের মেকসিকোয়
ইতি পলাশ
ইহকাল পরকাল
এক দুই
একস্
কলকাতার নিশাচর
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই
শ্বেতপাথরের টেবিল
অগ্নিসংকেত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্পসমগ্র
(২য় খণ্ড)

বারুদ

শব্দ শুনে সুধা এঁটো হাতেই ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে। মানস মেঝেতে দু'হাতে মাথা আড়াল করে বসে আছে, তার সামনে বেলো খোলা হারমোনিয়াম। আর শঙ্কর একটা কাঠের হ্যাঙার দিয়ে মানসকে আগাপাশতলা পিটিয়ে যাচ্ছে। একেবারে আন্তরিক পেটানো। কোনও দয়ামায়া নেই। সুধা অবাক, নিজের ছেলেকে কেউ ওভাবে মারতে পারে! সুধা ছুটে এসে স্বামীর হাত থেকে হ্যাঙারটা কেড়ে নিলেন, 'কি করেছে কি? তুমি ওকে অমন করে মারছ কেন? মরে যাবে যে?'

উত্তেজিত শঙ্কর বেরিয়ে এলেন দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। ঘেমে গেছেন। টুকটুকে ফর্সা সুন্দর চেহারা। যখন বয়েস আরও কম ছিল, সবাই বলত কন্দর্প, গন্ধর্ব। শঙ্করের টকটকে ফর্সা মুখ রাগে লাল। সারা শরীর কাঁপছে। গায়ে চাঁপা ফুল রঙের ফিনফিনে পাঞ্জাবি। কালো কাঁচিপাড় ধুতি। শঙ্কর বেগে ঘরে ঢুকে মানসকে আচমকা একটা লাথি মেরে বললেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।'

সুধা জামা তুলে ছেলের ক্ষতবিক্ষত পিঠ দেখছিলেন। পুলিসেও বোধহয় এমন করে মারে না। সুধা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার শরীরে কি কোনও মায়া দয়া নেই। কিভাবে মেরেছো একবার দেখ। কোনও বাপ তার ছেলেকে এইভাবে মারে?'

শঙ্কর বললেন, 'এই বংশে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ গানের লাইনে যাবে না, যাবে না, যাবে না। আমি এসে দেখি আমারই হারমোনিয়াম নিয়ে রাসকেলটা আমারই গান গাইছে। এর আগে আমি বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। তুই হারমোনিয়াম ছুঁবি না। না, তুই গলা দিয়ে সুর বের করবি না। লেখা-পড়া শিখে ডাক্তার হও, ব্যারিস্টার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, কিন্তু গাইয়ে তুমি হবে না।'

সুধা বললেন, 'এ আবার কি? আশ্চর্য কথা! যার অত সুন্দর গলা, এমন ভগবানদত্ত প্রতিভা, যে শুধু শুনে শুনে তোমার প্রায় সব গান অবিকল তোমার মত গাইতে পারে, সে গান গাইবে না? এ কি? তোমার তো উচিত ওকে তালিম দেওয়া। পশ্চিমের ওস্তাদরা তো তাই করেন। তোমার এই অদ্ভুত আদেশের কারণ তো আমার মাথায় আসে না!'

শঙ্কর উঁচু গলায় বললেন, 'তুমিও গেট আউট। আমার ত্রিসীমানায় তোমরা কেউ আসবে না।'

সুধা ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন দমাস করে। ছিটকিনি তোলার শব্দ হল ভেতর থেকে। সুধা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় বললেন, 'সবাই গেট আউট হয়ে গেলে কাকে নিয়ে থাকবে?'

ভেতর থেকে উত্তর এল, 'ভিকিরিরা যেমন গান নিয়ে থাকে, অন্ধ ভিকিরি।'

ভারি সুন্দর চেহারা। মায়াবী মুখ চোখ। একমাথা ফুরফুরে চুল। দীর্ঘ, সুঠাম। শঙ্কর যেমন উঁচুদরের গাইয়ে তেমনি উচ্চশিক্ষিত। স্কটিশের নামকরা ছাত্র। ভারতবর্ষের প্রথম তিনজন প্রথম সারির ওস্তাদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। খেয়াল, ঠুংরি, ভজন।

সাতবছর বয়সে জামাইবাবুর কোলে বসে গান গেয়েছেন, তবলার সঙ্গে, তালে, লয়ে, 'কোলে তুলে নে মা কালী'। সেই আসরে ছিলেন ভীষ্মদেব। তিনি শঙ্করকে বলেছিলেন, 'তোমার হবে। তবে এখনই আসর মারার চেষ্টা কোরো না। নষ্ট হয়ে যাবে।' শঙ্করের হয়েছে। সত্যিই হয়েছে। গানের ব্যাকরণে তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তালে, লয়ে যে কোন তবলিয়াকে তিনি ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। এফ শার্পে তিন সপ্তকে তাঁর গলা খেলা করে অক্লেশে। সবই হয়েছে। হয়নি অর্থ। সংগীতজগতের কুৎসিত দলাদলি অনবরতই তাঁর পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। প্রাপ্য সম্মান তিনি আজও পেলেন না। ভীষণ একরোখা, আর সৎ মানুষ, তেমনি রাগী, ফলে অক্ষম, অযোগ্য লোকের পায়ে তেল মাখাতে পারেন না। আর ওইটা না পারলে, এ বাজারে মানুষের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। শঙ্করের বৃদ্ধ পিতা সংসারের হালটি ধরে আছেন বলেই চলছে, তা না হলে সংসার টাল খেয়ে পড়ে যেত। বাঁধ দিয়ে যেমন জল আটকায়, শঙ্কর সেইরকম প্রতিশোধ দিয়ে গান আটকাতে চাইছেন। এই বংশে আর যেন কেউ গাইয়ে না হয়। গান বেচার জিনিস নয়। গান আরাধনার জিনিস। প্রকৃত শিল্পীর ভবিষ্যৎ হল, অনাহারে মৃত্যু। শঙ্কর জানেন, ছেলে তারই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়ে এসেছে। শ্রুতিধর। সংগীত তাকে টানবেই মায়বিনীর বাঁশির মতোই। তারপর ভবিষ্যৎটা ছারখার করে দেবে। তিনি এড়াতে পেরেছেন, ছেলে কি পারবে? সুরের পেছনে আসবে সুরা, তার পেছনে সাকী। নিজের গুরুভাইদের অবস্থা তো পড়েই রয়েছে চোখের সামনে। আবীরলাল চক্রবর্তী। হীরেন মজুমদার। গলায় সুর না থাকুক, তালকানা, লয়কানা হও ক্ষতি নেই, পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকলেই হল। যেটা এ-বংশের কারোর ছিল না কখনও, এখনও নেই। শরীরে বড় বেশি নীল রক্ত। বড় বেশি অহঙ্কার। ঈশ্বর আর সংগীত ছাড়া কারোর চরণে মাথা নত করবো না। তা বললে চলে। সেই কারণেই সব অচল হয়ে আসছে। মাথায় মাথায় দুই মেয়ে, এক ছেলে। এদিকে আমির-ওমরাহদের মতো মেজাজ। কেউ বিয়ের নিমন্ত্রণ করলে বেনারসী নিয়ে লৌকিকতা করতে ছোটেন। বেদীজীর কাছে যখন খেয়াল শিখছেন, তখন থেকেই মোগলাই খানায় অভ্যস্ত। রোগানজুস আর পরোটা না হলে রাতের খানা জমে না। দু'একজন সমঝদার বন্ধু না হলে খেতে বসে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এমনিতে ভীষণ রসিক মানুষ। মেজাজ ভালো থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রসিকতা করে আসর জমিয়ে রাখতে পারেন। সবাই হেসে কুটোপাটি খাবে। আবার গানে বসলে অন্য মূর্তি। একেবারে আত্মগত, তন্ময় শিল্পী। তবলিয়া 'সম' ধরতে না পারলে 'ফাঁক' চিনতে না পারলে, তবলা টেনে নিয়ে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দেবেন, বোলের ছন্দ। তারপরেও না পারলে আসর থেকে দূর করে দেবেন। তবলিয়া ডাঁট দেখালে গানের মধ্যে 'সম'টাকে এমন কায়দায় লুকিয়ে ফেলবেন যে বেচারা বিপাকে পড়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, 'ধরার চেষ্টা করুন।' এক একবার এক জায়গা থেকে তিনি ধরবেন, শঙ্কর অমনি মাথা দুলিয়ে বলবেন, 'হল না, হল না।' প্রকাশ্য আসরে এইরকম কতবার হয়েছে। আসরে কেউ কোনও রাগ গাইবার ফরমাশ করলে শঙ্কর অসম্ভব রেগে যান। একবার এক আসরে জনৈক নামজাদা ধনী খুব মেজাজে বললেন, 'একটা মালকোষ ছাড়ুন তো।' শঙ্করের পাতলা ধনুক-ভুরু আরও

ধনুকের মতো হয়ে গেল। শঙ্কর শঙ্করায় গানের মুখটা গেয়ে ভদ্রলোককে খুব বিনিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে নিবেদন ঠিক হচ্ছে তো?' ভদ্রলোক ব্যঙ্গটা ঠিক ধরতে পারলেন না, খুব মুরুব্বিয়ানার চালে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোফা হচ্ছে। মধ্যমটা আর একটু কড়া করে লাগান।'

'কড়া করে লাগাবো?'

শঙ্কর যোগ রাগে একটা গানের মুখ গেয়ে বললেন, 'এইবার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অ্যায়, এতক্ষণে ঠিক এল।'

'তাই না কি? মালকোষে কি কি পর্দা লাগে বলুন তো?'

'ওই যে, যা যা লাগাচ্ছেন।'

শঙ্কর অমনি কড়া গলায় বললেন, 'এটাকে বাইরে বের করে দিন তো।'

সঙ্গে সঙ্গে হই চই পড়ে গেল আসরে। যাঁর টাকায় আসর, তাঁকেই বাইরে বের করে দেবার আদেশ! শেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়াল—শিল্পী থাকেন, কি উদ্যোক্তা।

রেকর্ড কোম্পানিতে শঙ্করের সুরে ও কথায় গান রেকর্ড করবেন নামী এক শিল্পী। রিহার্সাল হচ্ছে। সাত আটবার দেখাবার পরও শিল্পীর গলায় গান আসছে না। শঙ্কর মালিকদের একজনকে ডেকে বললেন, কাকে ধরে এনেছেন মশাই। নি লিক করছে। কড়ি মধ্যম লাগছে কড়ি বরগার মতো।'

'কি বলছেন? এঁর রেকর্ড বাজারে পড়তে পায় না।'

'এঁকে দিয়ে হবে না মশাই। গলাকাটার গান হয় না। এঁকে দিয়ে ছড়া গাওয়ান।'

রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল চিরকালের মতো। শঙ্করের 'টেনর' গলা। শঙ্করের সুরে যে কোন গানের অন্তরা তারসপ্তকের মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ছুঁয়ে খেলা করে নেমে আসে। কে গাইবে সে গান! শঙ্কর ছাড়া।

রেডিওর স্টেশান ডিরেক্টারকে বললেন, 'আমাকে আর কতকাল বি-হাই-গ্রেডে ফেলে রাখবেন?'

ডিরেক্টর বললেন, 'যতদিন না আপনি গ্রেড বাড়াবার অডিশ্যানে বসছেন।'

'আমার পরীক্ষা কারা নেবেন?'

'কেন? আমাদের প্যানেল অফ জাজেস্।'

'তাঁরা গান জানেন? আমার পরীক্ষায় তাঁরা পাশ করতে পারবেন?'

বাস্, রেডিওর সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। এইভাবে শত্রু বাড়াতে বাড়াতে শঙ্কর আজ একেবারেই একঘরে। সবাই বলেন, 'ওই দুর্বাসাকে কে আসরে ডাকবে বাবা।'

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত আর সেই আঘাতে আহত শঙ্করের এখন তিনটি সম্পদ, সুর, ঈশ্বর আর অভিমান। শঙ্করের ইদানীং একটি বিখ্যাত গান, নিজের কথায় নিজের সুরে, 'গান শোনাবি তাকে যিনি দীন-দুনিয়ার কাণ্ডারী / তিনিই যে তোর সকল গানের, সকল সুরের ভাণ্ডারী॥' তিলক-কামোদে এই গান যখন করেন, তখন শ্রোতাদের চোখে জল এসে যাবে। গানে বসলেই শঙ্করের একটা রূপান্তর হয়। চোখ-মুখ-চেহারা। তখন সকলেরই মনে হতে থাকে, এই সেই গন্ধর্ব। দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন মর্ত্যলোকে। শঙ্কর গান দিয়ে আর মানুষকে ছুঁতে চান না। রেডিও অফিসের বড়কর্তা, রেকর্ড

কোম্পানির বড়বাবু, কি পেটমোটা গোলাপী ধনকুবের, কি টিকিট কাটা হুজুগে শ্রোতা। গানের ওপারে এখন দাঁড়িয়ে দেখেন তিনি, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥' গানের ভেতরে যত ডুবতে থাকেন গলা ততই চড়তে থাকে। একেবারে তার সপ্তকের ধৈবতে ধরেন—'ব্যথায় কারো গলে না প্রাণ/ব্যথায় বলো কি আছে দাম॥' শঙ্করের সমস্ত গানই এত কঠিন যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তোলা অসম্ভব। ফলে একমাসের বেশি কেউ টেঁকে না। সুধা বলেছিলেন, 'একটু সহজ হও না।' শঙ্কর রেগে বলেছিলেন, 'তার মানে? সারেগামা শেখাবো আর মাসে পাঁচ টাকা মাইনে নেবো।'

সুধা মানসকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। দুই বোন ছুটে এল। তারা এতক্ষণ মারের শব্দ শুনে কাঁদছিল কিছু তো করার নেই। বাবার ভয়ে সবাই তটস্থ। কোনও দিন হেসে কাছে ডাকলে তবেই এগোবার সাহস হয়। ভোলেভালে, গানপাগলা এই ভাইটাকে দু'জনেই ভীষণ ভালবাসে। লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। মন পড়ে আছে গানের দিকে। মাথার ভেতর সবসময় সুর চলছে। দরবারীর আলাপ। কাফি সিন্ধুর মোচড়। পিলুর কান্না। ভৈরোঁর প্রার্থনা। এঘরে পড়া নিয়ে বসেছে, ওঘরে বাবা গানে সুর বসাচ্ছেন। মানস একেবারে বিভোর। কাজকর্ম দিয়ে গানটাকে বাবা যত কঠিনই করুন, মানসের মনে গেঁথে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সামনে পড়ার বই, মানস গুনগুন করছে গান। নিজের মনেই বাবার তারিফ করছে। বাবাকে সে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে। গানের মতোই ভালবাসে। বাবা যদি তাকে কুপিয়ে খুন করেন মানস প্রতিবাদ করবে না, চিৎকার করবে না। পড়ে পড়ে মার খাবে। কেউ যদি বাবার নিন্দে করে, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক মানস তেড়ে যাবে।

সুধা পিঠের দিকে জামাটা তুলতে গেলেন। মানস হাসতে হাসতে বললে, 'আমার কিছু লাগেনি মা। বাবার গায়ে কি তেমন জোর আছে। আসলে কি জানো তো, হারমোনিয়ামটা খুব দামী তো, উল্টোপাল্টা বাজিয়ে আমি যদি খারাপ করে ফেলি।'

সবাই জানে মানস ভীষণ ভালো হারমোনিয়াম বাজায়। সে যখন বাজায় মনে হয় কোনও পাকা লোক অরগ্যান বাজাচ্ছে।

মেজো বোন বললে, 'ভাইদা, তুই তো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে বাজাবি। তাহলে এই মারটা খেতে হত না। বাবার ভারি অন্যায়।'

মানসের মুখটা কঠিন হল। বললে, 'বাবার নামে কিছু বলবি না। বেশ করেছে বাবা আমাকে মেরেছে।'

সুধা মেয়েদের বললেন, 'কি লাগাই বল তো?'

দুই মেয়ে ভাইয়ের পিঠের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠল, 'ইস কি অবস্থা।'

মানস বললো, 'চোপ। এমন কিছুই হয়নি। বাবা শুনতে পেলে দুঃখ পাবেন।'

সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ। শঙ্করের বাবা বাজার থেকে ফিরছেন। বৃদ্ধ, কিন্তু ভীষণ শক্তসমর্থ। ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বলশালী। দীর্ঘ, ঋজু শরীর। যৌবনে কুস্তি করতেন। আড়াই মণ ওজনের মুগুর ভাঁজতেন। একটা গোটা কাঁঠালের রস পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে ফুটিয়ে খেতেন। একবাটি অড়হর ডালে আধপোয়া খাঁটি খুরজা ঘি ঢেলে

খেয়ে হজম করার শক্তি ছিল। এই বয়সেও ছানি পড়েনি। চোখে দূরদৃষ্টি অথবা নিকট-দৃষ্টির চশমা লাগাতে হয়নি। প্রাচীন অভ্যাস, খড়ম পায়েই হাঁটাচলা করেন পাড়ার রাস্তায়। তাঁর হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গিমার দিকে লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রবীণরা ডেকে ডেকে যুবকদের দেখান—'দ্যাখ, সংযমী মানুষের চেহারা দ্যাখ। এই বয়সেও কেমন হাঁটছেন, 'খাপখোলা তলোয়ারের মতো।' চামড়া এখনও তেলা, টানটান, মসৃণ। চুল পেকেছে, কিন্তু টাক পড়েনি। সাংঘাতিক রজোগুণী মানুষ। সিংহের মতো স্বভাব। কারোকে পাত্তা দেন না। পরোয়া করেন না। জীবনে কারোর কাছে হাত পাতেননি। প্রায় মাথায় মাথায় একটি শিশু-পুত্র ও কন্যা রেখে স্ত্রী চলে যাবার পর আবার বিয়ের জন্যে আত্মীয়-স্বজনেরা যখন ভীষণ উৎপাত শুরু করলে, তখন দুম করে অনেক টাকা মাইনের রেল কোম্পানির ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আর তো কোনও সমস্যা নেই। নিজের ছানাদের মানুষ করবো। সংসারে কোনও সার আছে? ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে হিসেব করলে দেখা যাবে, ক্ষেপে ক্ষেপে তিনটে বছর গেছে ঝগড়ায়। দেড় বছর গেছে রোগের সেবায়। আর দেড়টা বছর একটু প্রেমালাপ। মার ঝাড়ুমার, ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর।

বৃদ্ধ ছেলে আর মেয়েটিকে কিন্তু ভীষণ ভালবাসতেন। মেয়ের মধ্যে দেখলেন জগদম্বাকে, ছেলের মধ্যে পেলেন শিবশঙ্করকে। ঢুকে পড়লেন সাধনার জগতে। শুরু হল তন্ত্রসাধনা। আরম্ভ হল ষোড়শোপচার-এ তারা মায়ের পূজা। কোথা থেকে এসে গেলেন এক তন্ত্রসিদ্ধ পূজারী। বৃদ্ধ এক সময়ে ধ্রুপদ শিখতেন। নিজেই আবার শুরু করে দিলেন সংগীতসাধনা। বিশাল তাঁর কণ্ঠ। জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার, বলে যখন তানপুরা বেঁধে গান ধরতেন, পাড়া-প্রতিবেশীকে তখন নিজেদের কথাবার্তা জোরে জোরে বলতে হত। কিছুই শোনা যেত না, মুকুজ্যেমশায়ের গানের ঠেলায়। বাড়িতে ঘনঘন সাধুসন্তর আগমন হতে লাগল। গৃহ হয়ে উঠল আশ্রম। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন ভাল ঘরে। আদর্শবাদ, ভয়ঙ্কর এক রাগী মানুষের সঙ্গে। ছেলেটিকে মেয়ে-জামাইয়ের হেপাজতে রেখে চলে যেতে লাগলেন হিমালয়ে। পরিব্রাজকের বেশ হল গেরুয়া। হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, কাঁধে কম্বল। পাহাড়, ঝরনা, বরফ, হিমবাহ হল জীবনের সঙ্গী। হরিদ্বারে মিলে গেল গুরু। রাজসিক ভোগী হয়ে গেলেন যোগী। চাঁদের আলোয় পাহাড়ী ঝরনার সঙ্গে গলামিলিয়ে গান শোনাতেন পরমেশ্বরকে।

সেই বৃদ্ধ খড়ম খটখটিয়ে আসছেন। হাতে একটা চটের থলে। নাতনীরা দাদার পিঠে সোঁটা সোঁটা খতের উপর ওষুধ লাগাচ্ছে। সুধা তটস্থ হয়ে এগিয়ে আসছেন বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত থেকে থলেটি নেবার জন্যে। এমন সময় বন্ধ ঘরে শঙ্কর চড়া পর্দায় গান ধরলেন, 'মা গো তুমি শুধু বেদনাই দিতে জানো।'

বৃদ্ধের গানের কান। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হল, দোর বন্ধ করেই ভরদুপুরে দরবারী ধরলেন, খুনোখুনি হয়েছে বুঝি?'

ছোট নাতনীর মুখ হালসা, সে আগেই বলে বসল, 'এই দেখ না বুড়োদা, ভাইদাকে কি রকম মেরেছে।'

'কে মারলে ওরকম করে! রাস্তায় বুঝি মারামারি করতে বেরিয়েছিল?'

সুধা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন, এখুনি পিতাপুত্রে বেধে যাবে হয়তো ; আর সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে সংসার চালানোর প্রসঙ্গ। মানুষটার অনশন শুরু হয়ে যাবে। ওই ঘরের একাসনে বসে শীর্ণ তাপসের মতো একের পর এক গান লিখে সুর করে গেয়ে যাবে, আর গেলাস গেলাস জল খাবে। দু'জনেরই কষ্ট। বৃদ্ধ তাঁর নিজের কুঠুরিতে ঢুকে যাবেন। বসে পড়বেন পুজোর আসনে। ওপরে আর ভুলেও উঠবেন না। দোকান বাজার বন্ধ। দিনকতক অরন্ধন। অনশনভঙ্গের অস্ত্র হল অনশন। ছেলেমেয়েদের চিঁড়ে খাইয়ে সুধা এক গেলাস জল খেয়ে বই কি বোনা নিয়ে বসবেন। মেয়েরা সাধ্য-সাধনা করবে। বাবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আজ তিনদিন হয়ে গেল, মা কিন্তু তোমার জন্যে শুধু জল খেয়ে আছে বাবা।'

সুধা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'এক দণ্ড বাড়ি থাকে না, কোথায় কি করে এল বলছেও না।'

মানস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে পালাচ্ছিল, বৃদ্ধ বললেন, কবে তুই একটু মানুষের মতো হবি রে ? মানস আবার রাস্তায়। বাড়িতে থাকলেই সে আবার গান গেয়ে ফেলবে। গান তার কাছে কাশির মতো। কিছুতেই চাপতে পারে না। অন্যমনস্ক হলে বেরিয়ে আসবেই, আর বেরোবে বাবার সুর ও কথা।

বাড়ীতে মানসের কোনও খাতির নেই ; কিন্তু বাইরে তার সাংঘাতিক খাতির। সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণের মতো এই ছেলেটির দিকে। যে যখন সুযোগ পায় সেই মানসকে ধরে নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে। যেখানেই মানস সেখানেই জমজমাট পরিবেশ। গানে, গল্পে, মজার মজার কথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সকলকে মজিয়ে রাখে। অফুরন্ত মানসের গানের ভাণ্ডার। প্রায় সমস্ত রাগারাগিণী তার আয়ত্তে। সবরকম তাল সে জানে। নিজে নিজেই তবলা শিখেছে। খেয়াল পুরো গাইতে পারে না, কিন্তু ঠুংরি, গীত, গজল, ভজন গেয়ে সে একটা সারা রাতের আসর অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারে। ভক্তিমূলক গান, প্রাচীন শ্যামাসংগীত, টপ্পা অঙ্গের গান অসাধারণ ভাল গায়। সবাই ভাবে, বাবার তালিমে এইসব হয়েছে।

রাস্তায় বেরোলেই মানস যেন নিজেকে খুঁজে পায়। আড্ডাবাজ, মিশুক ছেলে। কেউ তার কাকা। কেউ দাদা। কেউ জ্যাঠা। কেউ দিদি। কেউ বউদি। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সোজা যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সে চলে যেতে পারে। মানস হল তার অহঙ্কারী, বংশগর্বী বাবার নিরহঙ্কারী অপর পিঠ। মানস হল তার বাবার ব্যালেনস্। পাড়া-বেপাড়ার অজস্র শত্রু মানসের জন্যেই ঠাণ্ডা থাকে। এই বয়সের ছেলেরা মেয়ে-পাগল হয়। মেয়েদের সম্পর্কে মানসের আলাদা কোনও কৌতূহল নেই। সে বোঝে না, মেয়ে ব্যাপারটা কি ? এটা মনে হয় তার পিতামহের উত্তরাধিকার। মানসের এই সকল 'শিশু-মনের জন্যে যে-কোনও বয়সের মেয়ে মানস বলতে অজ্ঞান। মানস যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সোজা চলে যেতে পারে। একটু হাসির গান। আখর দিয়ে কীর্তনের ক্যারিকেচার। ছায়াছবির নায়কের অনুকরণ। নিজের জীবনের মজার মজার গল্প। বন্যার জলে ভেসে যাবার গল্প। পাগল অধ্যাপকের গল্প। মানস কথা বলে একটু থেমে থেমে। কথা মাঝে মাঝে আটকে যায়। সেটাও একটা বড় আকর্ষণ। আর সবচেয়ে

বড় আকর্ষণ তার অসাধারণ হাসি। তিন মিনিটে মানস পরকে আপন করে নিতে পারে। মানস চলে যাবার পর সকলেই একটা শূন্যতা বোধ করে। যেন মহানন্দের হাট ভেঙে গেল। যেন শ্রীচৈতন্য চলে গেলেন নবদ্বীপ ছেড়ে। কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়।

শংকরের সাংঘাতিক মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজনই কিছু আদায় করতে পেরেছিল, তার নাম সুখময়। লম্বা কঞ্চির মতো চেহারা। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। আড়ালে অনেকেই তাকে ঝুলঝাড়ু বলে। সামনে কেঁচো হয়ে থাকে। সুখময় যখন গান গায় তখন সুখময় ; যখন ছুরি চালায় তখন তার নাম বল্টু। মাসখানেক আগে এক আসরে সুখময় বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গেয়েছিল, কানন সায়েব গান শেষ হবার পর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 'বাগেশ্রী রাগটা ভেবেছিলুম আমিই ভালই গাই, এখন দেখছি তুমিও কম যাও না।'

মানস—কোথায় যাই, কোথায় যাই করতে করতে চলে এল বল্টুদার বাড়িতে। ছন্নছাড়া একটা মানুষ। একটা পোড়ো বাড়ির বাইরের ঘরে তার আস্তানা। এককোণে মা-কালীর বেশ বড় একটা মূর্তি। বিরাট, লকলকে জিভ ঝুলিয়ে আধো অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। বল্টু যখনই হোক রোজ ঘণ্টা তিনেক আসনে বসে। আজ বোধ হয় সকালেই বসেছিল। কপালে দগদগ করছে এক ধাবড়া তেল-সিঁদুর। বাড়িটা এত প্রাচীন আর এত ড্যাম্প যে মায়ের গায়েও নোনা ধরে গেছে।

বল্টু মেঝেতে একটা চটের ওপর বসে তানপুরা ছাড়ছে। গায়ে গা লাগিয়ে আয়েস করে শুয়ে আছে রাস্তার একটা কুকুর। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে ঝাঁঝালো ঝগড়ার শব্দ। বল্টুর বাবা চির রুগণ। এখন একেবারে ইনভ্যালিড। মাথায় মাথায় দুটি মেয়ে বেশ বড় হয়েছে। সুন্দরী, কিন্তু কেউই বিয়ের চেষ্টা করেনি বলে বিয়ে হয়নি। গোটাকতক বখাটে ছেলে জামাই হবার ইচ্ছে রাখে, বল্টুর ভয়ে এগোতে পারে না। দূর থেকে দেখে। মিটসেফের বাইরের বেড়ালের মতো। বল্টুর মা জীবনে একটা জিনিসই জানেন, ঝগড়া। ঝগড়ার সময় তিনি যেন চতুর্মুখ লেডি ব্রহ্মা। এখন সেই ঝগড়াই চলছে।

মানসকে দেখে বল্টু লাফিয়ে উঠল, এসো গুরু। এতদিনে মনে পড়ল ওস্তাদকে। নিশ্চয়ই বেদনার রাগিণী বেজেছে মনে। ভেতরে ঝন ঝন করে কি একটা পড়ল। মানস চমকে উঠেছিল। বল্টু হাত তুলে বললে, 'ঘাবড়ে যেও না গুরু, 'সম' পড়ল। ঝাঁপতালে ঝগড়া চলছে। মা মেয়েতে। ভাবছি, এ বছর কালী পূজোয় সবকটা পাঁঠাকে বলি দিয়ে দোবো। কাল রাত্তির থেকে শুরু হয়েছে।'

মানস চটের এক পাশে বসল। কুকুরটা অমনি পা দুটো টান টান করে মানসের কোলে তুলে দিল। বল্টু বলল, ব্যাটা যেন গভার্নরের বাচ্চা। নাও গুরু, মিঞা মল্লারে একটু গলা মেলাও। গান জমে গেল নিমেষে। এ ধরে ও ছাড়ে, ও ছাড়ে, তো এ ধরে। বিস্তারের রকম রকম খেল। দুজনেই তখন অন্য জগতে। একটু আগে মানসের ক্ষতবিক্ষত পিঠটা বড় জ্বালাচ্ছিল। সে সব এখন উধাও। সুর বোনা চলেছে নানা নকশায়।

হঠাৎ বল্টুর মা জ্বলন্ত একটা তোলা উনুন এনে ঘরের মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে

খ্যানখেনে গলায় বললেন, 'নাও, রাগ-রাগিণীর কালিয়া কোফতা বানাও। সকাল সাতটা থেকে জনে জনে বলছি, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই। সব কানে তুলো দিয়ে বসে আছে। নে সব চুলো খা চুলো।'

বল্টু মিঞামল্লারেই গানের লাইন বলে উত্তর দিল 'কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব তোর গয়না। ওরে ও কুতুর কুতুর ময়না।' বল্টুর মা রেগে বেরিয়ে যেতে যেতে মানসকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'তুমি এসেছো বাবা, ভেতরে এসো। ওর সঙ্গে বেশি মিশো না। পরকালটা ঝরঝরে করে দেবে।

বল্টু সঙ্গে সঙ্গে গান ঘুরিয়ে নিল, 'দনুজ, দলনে. অসুর নাশিতে মাতঙ্গী মেতেছে সমর রঙ্গে।'

বল্টুর মা বেরিয়ে গলেন। চেহারা দেখলেই মনে হয় ভদ্রমহিলার চালচলনে কোথাও একটু গোলমাল আছে। তা বয়েস কম হল না : কিন্তু এখনও পাতাপেড়ে চুল বাঁধা। পানের রসে ঠোঁট লাল। কপালে কাঁচ পোকার টিপ। শাড়ি পরার ধরন। ঠিক মা বলে মনে হয় না। ভদ্রমহিলার কাছে যেতে মানস ভয় পায়। একদিন দুপুরে। সেদিন কেউ ছিল না বাড়িতে। শোওয়ার ঘরে খাটে বসে মানস একটা ঠুংরির মুখ গাইছিল, মহিলা বললেন, 'এক সময় ভালো নাচতে পারতুম। তুমি গাও আমি নাচি।' বলেই শাড়িটা খুলে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে। ওই শরীরের দিকে মানসের তাকাতে ভয় করছিল। একবার তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তার সারা শরীর সিরসির করছিল। মনে একটা বিষণ্ণ অন্ধকার নেমে আসছিল। তবু সে বসেছিল। গানও গাইছিল। হঠাৎ মহিলা একটা পাক মেরে দুম করে খাটে এসে পড়লেন, মানসের ঘাড়ে। ঘামঘাম শরীরে মানসকে কষকষে করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার রাগকৃষ্ণ'। মুখে জর্দার গন্ধ। ভারি বুকের ওঠা নামা। আবার গান ধরলেন, 'ও সে হোক না কালো, আমার তাকে ভালো লেগেছে। টেরি কাটা কালো ছোঁড়া আমায় পাগল করেছে।' সেই দেহভারে মানস উল্টে পড়ে গেল। ঘণ্টাখানেক ধরে কি ঝড় যে বহে গেল। সেই থেকে এই মহিলাকে দেখলেই মানস ভয় পেয়ে যায়। বল্টুদার বাবা চিররুগ্ন। ব্রঙ্কাইটিসের রুগী। ইদানীং ভয়ংকর হাঁপানি। চোখ দুটো সব সময়ের জন্যে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আছে। লাল জবাফুলের মতো রঙ। কিন্তু মেয়ে দুটো কি সুন্দর। নিন্দুকে বলে মেয়ে দুটো এক জমিদারের। এমন এলোমেলো সংসার মানস আর দুটো দেখেনি। কোন গোছগাছ নেই সবকিছু ছড়ানো ছত্রাকার। বল্টুদার মা বসে কেবল হুকুম করে চলেছেন। এ বাড়ির অন্দরমহলে গেলে মানস বুঝতে পারে কোনটা পাপের সংসার, কোনটা পুণ্যের সংসার। সাধনা দিয়ে পুণ্যকে ধরে রাখতে হয়। তার বাবা, মা, বুড়ো দাদা, তার দুই বোন যেন হোমের আগুনে পুড়ছে সব। মানস এর পরেই জেনেছিল, এই ভদ্রমহিলা বল্টুদার সৎ মা।

উনুনটার দিকে তাকিয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ মেঘমল্লার গেয়ে তানসেন আগুন নেবাতেন। এসো আজ হয়ে যাক সেই পরীক্ষা। দেখি উনুনটাকে নেবানো যায় কি না!'

শুরু হল মেঘমল্লার। মানস হারমোনিয়ামটা টেনে নিল। শুরু হল আলাপ। বল্টুর

গলা অসাধারণ, একেবারে বড়ে গোলাম আলির মতো। সুর একবার ধরে গেলে বল্টু একেবারে অন্য মানুষ। গান গেয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। উনুনে ছাই পড়ে এল। তানপুরা শুইয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ, মায়ের চরণে পেন্নাম ঠোকো, দেখ উনুন নিবিয়ে দিয়েছি। আমরা দ্বিতীয় তানসেন।' মা কালিকে প্রণাম করে বল্টুদা বললে, 'মা এত লোক মরে, তুমি কেন মরো না মা। এখন তোমার ভোগের জন্যে আমাকে বেরোতে হবে। ওস্তাদ, টাকা কি করে রোজগার করতে হয় বলো তো ! । সব মুফতে গান শুনবে আর পিঠ চাপড়াবে। আর ডবকা মেয়েগুলোকে এগিয়ে দিয়ে বলবে, একটু সুর ধরিয়ে দাও। গুরুদক্ষিণা ? অমনি গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। পৃথিবীটা কি জায়গা মাইরি। ওস্তাদ, আজ একাদশী না ?'

'ঠিক জানি না বল্টুদা।'

'হ্যাঁ আজ একাদশী। সকালে ষষ্ঠী বুড়ি কোঁত পাড়ছিল।'

'ষষ্ঠী বুড়ি ?'

'ওই যে সামনের বাড়িতে থাকে রে। বাতের রুগী।'

বল্টুদা মা কালীর দিকে ফিরে বললে, 'মা আজ তোমার নির্জলা একাদশী। শিব কি আর তোমার ভারে জ্যান্ত আছে মা, কবেই হার্টফেল করেছে। আর কেন ? এইবার একাদশী[illegible] [illegible] কচি পাঁঠাগুলো একটু প্রাণে বাঁচুক।' বল্টু উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উঠে পড়ল ধড়মড় করে। বল্টু তার মাথায় তিনটে তেহাই মেরে বললে, 'কাল রাতে তোকে মাংস খিলিয়েছি ব্যাটা। আজ স্বাস্থ্যের কারণে নো মিল।'

মানস বললে, 'যাচ্ছেন কোথায় ?'

'পালিয়ে বাঁচি ওস্তাদ। একটু পরেই হোল ফ্যামিলির খিদে পাবে, তখন আর একবার কীর্তন শুরু হবে। তার আগেই পালাই। বল্টু যেন শালা সকলকে গেলাবার দাদন নিয়ে বসে আছে'।

ট্রাউজারের ওপর ঝলঝলে একটা শার্ট গলিয়ে নিল বল্টু। মানস জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবেন আজকে ?'

'আগে একটু হাওয়া খাই, তারপর দেখা যাবে। আরে জল-হাওয়ার মতো জিনিস আছে।'

'আমাদের বাড়িতে চলুন।'

'শোনো ওস্তাদ, খালি পেটে কোথায় যেতে নেই। নিজেকে ভিকিরি মনে হবে। আমরা হলুম রাজার জাত।'

ওস্তাদ আজ তোমার লাঞ্চের কি ব্যবস্থা। বাড়িতে আছো, না গলাধাক্কা খেয়েছো ?'

মানস উঠে পড়ল। বল্টু বলল, 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ দলাইমলাই হয়েছে।'

মানস বললে, 'আজ আমার রূপালিদের বাড়ি নেমন্তন্ন।'

'সেই কারখানাঅলার মেয়েটা ? তা ভালো। কেস কতদূর এগলো ?'

'কি কেস ?'

'আরে স্যুটকেস।'

বল্টু একলাফে রাস্তায়। কুকুরটাও লাফ মারলো।

মানস আর ভেতরে গেল না। উঠোনে রোদে বসে বল্টুদার দুই বোন কাপড়জামা কাচছে। গেলেই সব ছেঁকে ধরবে। মজার মজার গল্প শুনতে চাইবে। আজ মেজাজ ভাল নেই। পিঠটা টাটাচ্ছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। এই সময় কারোর বাড়িতেও যাওয়া উচিত নয়। সব বাড়িতেই এখন খাওয়ার সময়। গেলেই জোর করে খাইয়ে দেবে।

মানস একটা চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খেল। বাড়ির দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। জানে কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা আসে। বাবার হারমোনিয়ামের আওয়াজটা এত সুন্দর যে লোভ সামলানো যায় না। আর ও কোনও দিন হাত দেবে না। প্রতিজ্ঞা। আচ্ছা, বাবা কি তাকে হিংসে করেন ? তা কখনো হয়। কোনও বাবা কোনও ছেলেকে হিংসে করতে পারেন ? তাহলে ? বোনেদের ডেকে ডেকে গান শেখান, আর তাকে দূর দূর করেন। কই ছাত্রছাত্রীদেরও তো বিশেষ কিছু দেন না ! যক্ষের মতো নিজের সম্পদ, নিজের মধ্যেই আগলে রাখতে চান না কী ?

মানস বাস স্টপে এসে একটা বাসে উঠে পড়ল। মাথায় এসে গেছে, কোথায় সে যাবে। ভবানীপুরের গুরুদোয়ারায়। সেখানে তার খুব খাতির। অল্প অল্প পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারে, আর কয়েকশো ভজন সে তো জানেই। রাত ন'টা অব্দি তার আর কোনও ভাবনা নেই। তারপর দেখা যাবে। পরের কথা পরে। নিজের বাড়িতে ঢুকলেই একটা-না-একটা অশান্তি। তার জন্যে আজ বাড়িসুদ্ধ লোকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা মনে হয়। কেউ যদি তাকে একটু ভালোবাসতো। সবাই থেকেও তার যেন কেউ নেই ! বাবার ভয়ে বাড়ির কেউ তাকে ভালবাসতে সাহস পায় না। সে কি এতই খারাপ ছেলে !

বাস কিছুদূর এগোতেই মানস সব ভুলে গেল। অনেক লোক তার ভীষণ ভালো লাগে। কত রকমের মুখ ! কত কথা ! একা একটা ভাবটা বেশ কেটে যায় ! রাস্তা, ফুটপাত, দু'পাশে দোকান। পৃথিবীটা আনন্দে যেন টগবগ করে ফুটছে ! বেঁচে থাকতে ভীষণ ভাল লাগে ; কিন্তু কাল কি হবে, এই ভেবে আপনার লোকেরা ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। ওরে তোর কাল কি হবে। বাবা চোখ বোজালে তুই কি করবি রে ? বোনের বিয়ে, মায়ের ভরণপোষণ। পাওনাদার, ট্যাক্স। তারপর যদি নিজে সংসার করো তাহলে তো হয়েই গেল। মানস বুঝতে পারে না, মানুষ এত ভাবে কেন ? ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে ! চলতে চলতেই তো ভবিষ্যৎটা বর্তমান হয়ে জীবন ছেড়ে অতীতে চলে যায়। আজ খুব রোদ, কাল খুব ঝড়বৃষ্টি। দুটো দিনই মানুষকে পেরোতে হবে। মানুষ আর পেরোয় কই, দিনই চলে যায় মানুষকে পেরিয়ে। যারা সবসময় প্ল্যান বগলে নিয়ে বাড়ি তৈরির কনট্রাকটারের মতো চলে তারাই সারাটা জীবন হল না, হল না, আর গেলো গেলো করে। 'গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায় বিরহের বালুচরে।' মানস অন্যমনস্কভাবে একটু জোরেই গান গেয়ে উঠেছিল। বসে থাকা পাশের ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। মানস তার সেই অনিন্দ্য হাসি হেসে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, লিক করেছে।'

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, 'গলাটা তোমার খুব ভাল। সুর ভরাট। সাধনা করো।

জাতের গলা। আমার নাম যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। নামটা শুনেছ নিশ্চয় !'

মানস তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রণাম করল। পুরাতনী বাংলা গান আর টপ্পায় ভীষণ নাম। ফরসা ধবধবে চেহারা। ঋষির মতো মুখ। হলুদ দেয়ালের গায়ে রোদের আভার মতো এক ঝলক হাসি লেগে আছে। নিমেষে আলাপ জমে গেল। মানসের বাবার নাম শুনে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'খুব চিনি ! মেজাজটা যদি একটু সংযত করতে পারত, তাহলে ও তো আজ ভারতের শীর্ষস্থানে চলে যেতে পারত। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার সেখানে মানুষকে মানুষ ভাবতে হবে। কত রকমের মানুষ ! সব মানুষকে নিয়েই চলতে হবে। লোক না পোক ভাবলে সাধুর চলবে। শিল্পীর চলবে না। অত শিক্ষা নিয়ে তাই বেচারা আজ একঘরে। তুমি বাবা ওরকম হয়ো না।'

মানস বললে, 'জ্যাঠামশাই, একদিন আপনার বাড়িতে যাবো।'

'তোমার জন্যে আমার অবারিত দ্বার। শোনো বাবা, শুধু শ্রুতিতে হবে না, শাস্ত্রও চাই। সংগীত শাস্ত্র একটু পড়বে। বেস চাই, বেস। গুরুরও খুব প্রয়োজন। সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা।'

গুরুদোয়ারায় আজ একটা কিছু আছে। খুব ভিড়। শিখ মেয়েরা দামি দামি শালোয়ার কামিজ পরে জায়গাটাকে যেন আলো করে রেখেছে। পাঞ্জাবিদের মধ্যে হাঁড়ি চড়ে না, এমন সংসার নেই বললেই চলে। যেমন সব সাজ, তেমনি সব চেহারা। মানসও বেশ লম্বা ; তাই মানিয়ে যায়। পথে পথে ঘোরে, খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই ; কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক লালিত্য। মনে পাপ না ঢুকলে মানুষের মুখে একটা দেবভাব আসে।

গেলাসে গেলাসে সরবত বিলি হচ্ছে। মানসকে দেখেই কি আনন্দ সকলের, 'আইয়ে আইয়ে মানসজী, ওস্তাদজী।' ঢলঢলে সুন্দরী এক মহিলা, মানসের হাতে এক গেলাস সরবত তুলে দিলেন। ফরসা শরীরে গাঢ় নীল রঙের কামিজ। মানস না তাকিয়ে পারল না। তার মেজো বোন শোভনাটাকেও এই রকমই প্রায় দেখতে। তাকে যদি এইরকম একটা পোষাক পরানো যেতো।

মানস বুঝতেই পারলো, আজ এখানে আসরে বসতে হবে। খাওয়াটা হবে জবরদস্ত। ভেতরে ভজন চলছে। মানসের কানে সুর লেগে গেল। ভেতরে তার একটা সুরের মৌচাক আছে। খোঁচা লাগলেই গানের মাছি ভোঁ ভোঁ করে উড়তে থাকে।

মানস সোজা আসরে গিয়ে বসে পড়ল। পুরু, বাহারি কার্পেট পাতা। একজন মানসের গলায় একটা চাদর পরিয়ে দিলেন। খুব খাতির মানসের। এমন খাতির মানসকে নিজের লোকেরা করে না। মানসজী এইবার ভজন পরিবেশন করবেন।

প্রথমেই মানস কাফিতে ধরল, 'সাধো গবিন্দকে গুণ গাবো। মানব জনম আমোলক পায়ো, বিরথা কাহে গঁবাবো।' নানকের ভজন। শঙ্করও এই ভজনটা করেন। মানস তার সাধা গলায় একেবারে পশ্চিম ওস্তাদের ঢঙে গাইছে। পঙ্গত একেবারে ভরে গেছে। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরা সব ভেতরে চলে এসেছেন ; যেন পাণ্ডাল-সভা। গানে বসলেই মানস গানটাকে দেখতে পায়। সেই কতকাল আগের ভারত। কম আলো ; কম শব্দ, কম লোক। মোগল আমলের ঘর, বাড়ি, জাফরি। গালিব, সুরাদাস, গোবিন্দ সিংজী, নানক, মীরাবাঈ, কবীর। পঞ্চনদ। নানক সাহেব আপন মনে গাইছেন, 'পতিত পুনীত

দীনবান্ধব হরি, শরণ তাহি তুম আবো !' মানসের চোখে জল। গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। মানসের চোখ দুটো বংশের ধারা অনুসারে বিশাল বড় বড়। আর চোখের পাতাগুলো যেন ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখে। কুঞ্জছায়ে দুটি সরোবর। শ্রোতারা সব আসনে আটকে গেছেন। প্রবীণাদের চোখ ছলছল করছে। প্রবীণরা মালা জপছেন। কেউ 'অয়, অয়' বলছেন। মানস গাইছে, 'ত্যজ অভিমান মোহনায়া পুনী ভজন রাম চিতলবে।/নানক কহত মুক্তি পথ এহী,/গুরুমুখ হোয় তুম পাবো॥' ঢোল আর তবলা একসঙ্গে বাজছে কাহ্যবা তালে।

এর পরই মানস শুরু করল কবীরের ভজন। 'মেরী মেরী দুনিয়া' করতে মোহ্ মছর তন ধরতে।' শঙ্কর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, 'মানে বুঝে গান গাইবে, আর যে ভাষার গান, সেই ভাষার উচ্চারণ যেন শুদ্ধ হয়।' মানস সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলে। যদিও সেই উপদেশ তার জন্যে নয়। মানস গাইছে আর গানের অর্থ তার মনে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। যেমন জামা ঝোলাবার হ্যাঙারের মার তার পিঠে কেটে কেটে বসেছিল। 'দুনিয়া আমার আমার করে। মোহ-মাৎসর্যে জীবন কাটায় মানুষ। পূর্বে যাঁরা মুখ্য পীর হয়েছেন তাঁরাও এই করতে করতেই চলে গেছেন। 'কিসকী মর্মা চচা পুঁনি কিসকা, কিসকা পংগুড়া জোঈ।' কারো মামা, কারো বা কাকা, কারো পঙ্গু স্ত্রী। এই ত সংসার। এই সংসার একটা বাজার মণ্ডী। এ রহস্য জানতে পারে এমন ব্যক্তি দুর্লভ। আমি বিদেশী। কাকেই বা ডাকব। এখানে আমার কেউ নেই।

শ্রোতারা সব হায় হায় করতে লাগলেন। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। মানসের গলা একেবারে ঝনঝন করছে। এইসব ভজনে সে নিজেই সুর আর তাল বসিয়েছে। মানস গানের নোটেশান করাও শিখে গেছে। সবাই বলে, সে নাকি একটা প্রতিভা। এতে মানসের কোনও অহঙ্কার নেই। প্রতিভা আবার কাকে বলে।

রাত নটার সময় মানস যখন গুরুদোয়ারা থেকে বেরিয়ে এল তার পকেটে তখন তিনশো টাকা। শ্রোতাদের স্নেহের দান। পাঞ্জাবী খানায় পেট ভরপুর। আজ আর বাড়ি ফিরবে না মানস। বাড়ি আর তাকে টানে না। বাইরে কত ভালবাসা। বাড়ির অবস্থা সে দেখতে পাচ্ছে। নিচের ঘরে পঁচিশ পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। চটা ওঠা উঠোন। খোলা নর্দমার গন্ধ। মশা। বুড়োদাদা তাঁর বিশাল সিন্দুকটাকে বেদী করে, তার ওপর বসে আছেন ধ্যানে। ওপরের সবচেয়ে ভাল ঘরটায় কার্পেটের ওপর বসে আছেন বাবা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। হয় লিখছেন, না হয় গানে সুর করছেন। উপোসে মুখ শুকনো। কারোর সঙ্গে কোন কথা নেই। তার পাশের ঘরে মা আর দুই বোন। বোন দুটো পড়ছে। রান্নাঘরে শিকল তোলা। বাড়ি নিস্তব্ধ। উঠোন থেকে সোজা উঠে গেছে বেঁটে জাতের এক নারকেল গাছ। রাতের বাতাসে পাতার ঝালর হিল হিল করে দুলছে। যেন কিছু একটা খুঁজছে।

আকাশের পশ্চিম কোণে বিশাল একখণ্ড মেঘ উঠেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের দেঁতো হাসি। বাতাসে ঠাণ্ডার সিরসিরানি। অল্প দূরেই মামার বাড়ি। মানস যখন মামার বাড়ি পৌঁছলো তখন সাড়ে নটা, পৌনে দশটা। মামার বাড়ি এক মজার বাড়ি। সাবেক কালের বনেদী বংশ। দাদু ছিলেন সুপণ্ডিত প্রধান শিক্ষক। পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন দোতালার

ঘরে। দিদিমা কানে কিছুই শোনেন না। একমাত্র মামা, ভীষণ ভালো মানুষ, কিন্তু সাংঘাতিক ভুলো মন। আবার ঢেঁকুরের রুগী। যেই সূর্য ডুবলো, শুরু হল ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর তোলা। আর মামা অমনি, 'নাঃ, পেটে গ্যাস হয়ে গেছে, গ্যাস হয়ে গেছে', বলতে বলতে সারা বাড়ি ঘুরবেন আর ঢেঁকুর তুলবেন। ঠিক যেন বাছুর ডাকছে ! রাস্তার মোড় থেকে শোনা যাবে সেই শব্দ। বাড়ির বাইরে মার্বেল ফলকে লেখা আছে, 'নিকুঞ্জ নিবাস'। পাড়ার লোকে বলে উদগারালয়। একমাত্র মাসীমা। খুবই সুন্দরী, কিন্তু মাথার গোলমাল। সবসময় নয়। শুক্লপক্ষে বাড়ে। চাঁদ যত বড় হতে থাকে মাথা তত ঢিলে হতে থাকে। পূর্ণিমায় একেবারে পূর্ণ উন্মাদ। পাগলামির একটাই লক্ষণ, দু'চার কথা বলেই বলবেন, 'আচ্ছা, আমার চোখের নিচে কি কালি পড়েছে ?' যেই বলবে, না, কই কালি পড়েনি তো। অমনি বলবেন, 'তা হলে আয়নায় একবার দেখে আসি।' সেই যে আয়নার সামনে বসলেন, শুরু হল ঘষাঘষি। বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িও খুব ভাল। মাসী মেসোকেও পাগল করে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তিনি দু'চার কথার পরই প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা আমার কি ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে।' তারপর নিজেই বলবেন, 'একটু মনে হয় হচ্ছে। যাই বেল্ট বেঁধে আসি।' শ'খানেক বেল্ট কেনা হয়ে গেছে। কেউ বিদেশ গেলেই বলবেন, 'আমার জন্যে ভালো দেখে একটা বেল্ট এনো তো।'

মানস ঢুকেই মামার মুখোমুখি হল। তিনি তখন একটা ঢেঁকুর তোলার কসরত করছিলেন। মানসকে দেখেই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই জায়গাটার নাম কি রে ?'

'কোন জায়গাটা ?'

'ওই যে রে যেখানে বরফের একটা কি হয়।'

'আইসক্রিম ?'

'ধুর, আইসক্রিম তো খায়। এ হল পূজা করার জিনিস। শিবলিঙ্গ রে। বরফের বিশাল শিবলিঙ্গ। তীর্থস্থান।'

'ও, তুমি অমরনাথের কথা বলছো।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ অমরনাথ। উঃ, ভাগ্যিস তুই এলি। নামটা এমন আটকান আটকে গিয়েছিল মেমারিতে। ভাল করে ঢেঁকুর তুলতে পারছিলুম না। সেই সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র দশটা ঢেঁকুর কোনও মতে উঠেছে।'

'কটা ওঠার কথা ?'

'তা শ'খানেক তো বটেই।'

কথা শেষ করেই তিনি পরপর গোটা আষ্টেক ঢেঁকুর তুললেন। রাগমালার মতো ঢেঁকুরমালা।

মানস বললো, 'এই তো, চ্যানেল খুলে গেছে। আঠারটা হয়ে গেল।'

'ভাবতে পারিস কি হার্ড টাস্ক, রাত বারোটার মধ্যে আরো বিরাশিটা তুলতে হবে ! এ কি তোর ফুল তোলা, না চুল তোলা !'

দোতালার বারান্দা থেকে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এল রে এত রাতে ?'

মামা বললেন, 'মানস।'

দিদিমা শুনতে পেলেন না। বললেন, 'এখনও কিচ্ছু খালি করা হয়নি, বলে দে কাল সকালে আসতে।'

'মামা মানসকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে বল তো?'

'ও কিছু না।'

মামা দর্শনের অধ্যাপক। তিনি সহজে ছাড়বেন কেন? তিনি বললেন, 'কিছু না বলে কিছু নেই। কিছু আছে, তবেই না কিছু নেই? কিছুই না থাকলে কিছু না থাকার কথাটা আসে কি করে? অবশ্যই কিছু আছে। তা হলে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস আছে, যা সত্যিই নেই। হ্যাঁ আছে বলেই না—না। না শব্দটা আগে না হ্যাঁ শব্দটা আগে। আমি যখন আছি, তখন সব আছে। আমি যখন নেই তখন কিছুই নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে—মৃত্যুকেই নেই। তার মানে মৃত্যুও নেই। তাহলে প্রকৃত না থাকাটা কি? বলো কি?'

'মৃত্যু।'

'সে তো তোমার মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর পরেও তো অনেকে রয়ে গেল।'

'আমি নেই তো কেউ নেই।'

'আহা, মামার বাড়ি আর কি? তুই নেই তো কি হয়েছে? অন্যের স্মৃতিতে তো তুই আছিস। মানস ছিল বলেই না মানস নেই।'

'তাহলে কি হবে?'

'সেইটাই তো সমস্যা!' পৃথিবীটা যে কি সমস্যার জায়গা? কিছুই ভাল লাগে না। এ ভাবে বাঁচা যায়!'

'তুমি অত ভাবছ কেন?'

'কি আশ্চর্য! ভাববো না? না ভেবে মানুষ বাঁচতে পারে? আমি গরু না ছাগল।

মামা আবার পরপর ছ'সাতটা ঢেঁকুর তুললেন। আর ঠিক সেই সময় মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেজেগুজে। মানসকে দেখে বললেন, 'মালা এনেছিস। মালা?'

'মালা? কি হবে?'

'ওমা! তাও জানিস না বুঝি? আজ যে আমার বিবাহবার্ষিকী।'

মামা বলতে লাগলেন, 'স্যাড, ভেরি স্যাড, ভেরি ভেরি স্যাড।'

মাসিমা এরপরেই চলে এলেন তাঁর আসল জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার চোখের তলায় কালি আছে?'

মানস কিছু বলার আগেই, মামা বলে দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু যেন কালচে কালচে লাগছে।'

মাসিমা অমনি চিৎকার করে বললেন, 'চোপ। তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। তুমি রুগি। তুমি একটা আধপাগলা বুড়ো। মানস তুই বল তো?'

মানস বললে, 'একটু যেন কালোকালো লাগছে।'

'যাই বাবা, তাহলে ভাল করে আর একটু ঘষি।'

মাসিমা আবার তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মামা তখনও সমানে বলে চলেছেন, 'স্যাড। ভেরি স্যাড।'

মানস দোতালায় চলে গেল। বিশাল এক খাটে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ দাদু। শরীরটা পড়ে গেলেও, বোধবুদ্ধি, স্মৃতি সবই প্রখর। কথা বলেন, তবে একটু জড়িয়ে যায়। দিদিমা বললেন, 'ও মা তুই এসেছিস! ওপর থেকে আজকাল আর ঠিক ঠাওর করতে পারি না। চোখ দুটো একেবারে গেছে। সব কিছু যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখছি। তা বল, বস কে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

বৃদ্ধা কি বুঝলেন কে জানে? বেশ জোরে বললেন, 'সে কি রে?'

দাদু বিছানা থেকে বললেন, 'কে এলি মানস?'

মানস খাটের ধারে গিয়ে বসল। বৃদ্ধর অবস শরীর এলিয়ে আছে। ওষুধের গন্ধ। বেডসোর হয়ে যাবার ভয়ে শরীরে ওষুধ লাগানো হয়। বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ রে! লেখাপড়াটা একেবারে ছেড়ে দিলি? আমাদের বংশে যে ওইটাই ছিল রে!'

'আমার যে গান ভীষণ ভালো লাগে।'

'আহা! তোর বাবা তো গান আর লেখাপড়া দুটোই একসঙ্গে রেখেছিলেন।'

'আমিও তো পড়ছি।'

'হ্যাঁ, দাদু ওটা ছেড় না। শিক্ষা ছাড়া মানুষের পশুত্ব ঘোচে না।'

হঠাৎ মাসিমা এলেন ঘরে। খাটের কাছে এসে বাবাকে বললেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। যখনই দেখছি তখনই শুয়ে আছ। এত শুয়ে থাকলে যে বাতে ধরবে!'

পেছন পেছন মামা এলেন, ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। ঢুকেই বললেন, 'আমার পক্ষে আর ওই টিমকে সাপোর্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। মোহনবাগান আজও দু গোলে হেরেছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলতে গেলেই যে ওদের কি হয়! কাল আমি পাড়ায় মুখ দেখাবো কি করে?'

দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁ রে ওষুধ এনেছিস?'

মামা চমকে উঠে বললেন, 'ওষুধ? কার ওষুধ? কিসের ওষুধ?' তারপর দু'হাতে মাথা চাপড়ে বললেন, 'সর্বনাশ! প্রেসক্রিপসানটা তো ধোপার বাড়ি চলে গেল, জামা কাপড়ের সঙ্গে।' সারা ঘরে ঘুরতে শুরু করলেন. একটা করে ঢেঁকুর তোলেন, আর কপালের কাছে টুসকি মেরে বলেন, 'কি যেন নাম ছিল ওষুধটার! আহা! লার, লার, মনে আসছে মুখে আসছে না।'

দিদিমা বললেন, 'কি করছে বল তো, নামসংকীর্তন? এত ভক্তি এল কোথা থেকে?'

দাদু বললেন, 'কেমন বুঝছিস দাদু। এর নাম সংসার! বেঁধে মারছেন। বুঝতে পারি না, আমার পাপটা কি? সারাটা জীবন সাত্ত্বিক ভাবে কাটিয়ে, শেষটায় আমার এ কি হল? দাদুভাই একটা গান শোনা তো। এমন গান যেন একটু কাঁদতে পারি। ভাল করে কাঁদতে পারলে তাড়াতাড়ি মুক্তি হয়।'

মানস খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা টেনে বের করল। এই বাড়িটাও কি হয়ে গেল, কি সুন্দর ছিল।

দাদু বললেন, 'গোপাল, তুই যদি এইভাবে ঢেঁকুর তুলিস গান হবে কি করে?'

মামা বললেন, 'গান আরম্ভ হলেই থেমে যাবে।'

মাসিমা বললেন, 'ও গান হবে বুঝি ! তাহলে একটু সেন্ট মেখে আসি।'

মানসের মনে তখনো কবীর ঘুরছেন। দাদু বললেন, 'যদি হিন্দি ধরিস তাহলে আমাকে মানেটা একটু ধরিয়ে দিস।'

মানসের কানে হারমোনিয়মের সুর ঢুকলেই, সে আর কারোর নয়। পুরোপুরি একজন শিল্পী। তখন তার মুখচোখের চেহারাই আলাদা। মানস একপাল্টা দ্রুত হারমনিয়াম বাজিয়ে সুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'গানটার মানে আমি আগেই বলে দি—'চার দিন অপনী নৌবতি চলে বজাই।' তার মানে, চার দিন আপনার নহবত বাজিয়ে চলল। 'উতানেঁ খটিয়া গড়িলে মটিয়া সঙ্গি ন কুছ লৈ জাই॥' এমন খাটিয়া তৈরি করলে তাও ঢেকে দিলে মাটি দিয়ে, সঙ্গে তো কিছু নিয়ে যেতে পারলে না। 'দেহরী বৈঠী মেহরী রোবৈ দ্বারৈ লগি সগী মাঈ।' দেহলী মানে, দাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী যাবে কাঁদতে কাঁদতে, দরজা পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে যাবে নিজের মা। 'মরহট লোঁ সব লোগ কুটুম্ব মিলি হংস অকেলা জাই॥' সব কুটুম্ব সজ্জন মিলে শ্মশানে গেল ; কিন্তু হংস চলে গেল একলা।

মানস এইবার গানের শেষ দুটি লাইন ভৈরবীতে ধরে ফেলল আর ধৈর্য রাখতে পারল না ব্যাখ্যার—'বহি সুত, বহি বিত, বহি পুর পাটন বহুরি ন দেখৈ আই।/কহ কবীর ভজন বিন বন্দে জনম অকারণ যাই॥' এক ফাঁকে থেমে মানস বলে দিল—সেই পুত্র, সেই বিত্ত, সেই ঘরদোর কিছুই আর ফিরে এসে দেখে না। কবীর বলছেন, ওরে বান্দা, ভজন বিনা বৃথা জন্ম গেল।

জীবনের সেরা গান মানস সেদিন গাইল। পাগলী মাসি সেও কেঁদে ফেলল। মামার টেঁকুর বন্ধ। দিদিমা ভাল শুনতে না পেলেও কিছুটা তাঁর কানে গেল। দাদু একেবারে নির্বাক। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

গান শেষ হবার পর মানসকে কাছে ডেকে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার হাত দুটো অচল না হলে তোমাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতুম। গান তোমার ভেতরেই আছে। তুমি নিয়ে এসেছ। তুমি দিয়ে যাও। সাবধান ! একটু ধর্ম দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখো। সুরের দেবলোক আর অসুরের ভোগলোকের চৌকাঠটা বড় সরু।'

মাসিমা বললেন, এটা মনে হয় জন্মদিনের গান নয়, মৃত্যুদিনের গান। আমি যে কেঁদে ফেলেছি। হ্যাঁ রে, চোখের কোলের কালি কি আবার বেরিয়ে পড়েছে ?'

॥ ২ ॥

মানস যখন গুরদোয়ারায় শ্রোতাদের মাতাচ্ছিল, সেই সময় তার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ঝকঝকে নতুন একটা গাড়ি তাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। নেমে এলেন প্রায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ধপধপে সাদা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। দেখলেই মনে হয় কংগ্রেসের কোনও চাঁই। ভদ্রলোকের নাম সুরজিত দাস। রূপালির বাবা। শিল্পপতি। পায়ে মশমশে জুতো।

ঢুকেই তিনি খুব জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন।

উৎকট কড়া নাড়ার শব্দ শঙ্কর ভীষণ অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, কড়া নাড়া, জিনিসপত্র রাখা, হাঁটাচলা, হাতপা নাড়া, কুলকুচো করার ধরন দেখে মানুষ চেনা যায়।

সংস্কৃতিবান মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত সুললিত হয়। ভদ্রলোক যখন কড়া নাড়ছিলেন, শঙ্কর সেই সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ম্যানিপ্ল্যান্ট ঠিক করছিলেন।

মুখ ঝুলিয়ে এক দাবড়ানি দিলেন, 'ইডিয়েটটা কে?'

ভদ্রলোক একটু পেছিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'ইডিয়েটের নাম সুরজিত দাস।' এই তল্লাটের সবাই এই নামের সঙ্গে পরিচিত। খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলে যা জায়গাজমি ছিল, প্রায় সবই কিনে ফেলেছেন। জমিদারদের যুগ শেষ, শুরু হয়েছে শিল্পপতিদের খেলা। এক পা শিল্পে আর এক পা রাজনীতিতে। শিল্পের গাড়ির স্টিয়ারিং হল রাজনীতি। একেই বলে দেশটাকে কব্জা করা। মাখন খাওয়া। স্বাধীনতার আগে সব রোগাপটকা ছিল। এখন নধরকান্তি। মসৃণ ভাগলপুরী গরু। এই সুরজিত এক সময় ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। সংসারে হাঁড়ি চড়ত না। এখন এই পাড়ায় তার পাঁচতলা বাড়ির ছাদের মিনার সারারাত বাতিঘরের মতো জ্বলে থাকে। একতলায় উমেদারদের ভিড়। দোতলায় নেতাদের মজলিশ। তিনতলায় আমোদপ্রমোদ। চারতলায় বসবাস। পাঁচতলায় নির্জনবাস। এই সুরজিত দাস এখন প্রায় সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান। শিক্ষিত, পণ্ডিত, অধ্যাপকদেরও স্যার। থানার ওসি স্যালুট করেন। যে যাই করুক, শঙ্কর ভদ্রলোককে পাত্তা দেয় না। শঙ্করের বাবা বলেন, লোহাকাটা দাস। সুরজিত বিরক্ত হলেও, বলেন না কিছু ; কারণ শঙ্করের বাবা একসময় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রেল কোম্পানীতে একটা চাকরিও করে দিয়েছিলেন।

শঙ্কর বললেন, 'তুমি? হঠাৎ কি মনে করে? এসো ওপরে এস।'

সুরজিত মশমশ করে ওপরে এলো। জুতো পরেই ঢুকছিল। শঙ্কর বললেন, 'জুতো ছেড়ে এস।'

সুরজিত কার্পেটের ওপর বসল। শঙ্কর দেখছেন আর ভাবছেন—কি ছিল, আর কি হয়েছে। বিরাট শরীর। ভারিক্কি মুখ। নেতাদের মতো কাঁচাপাকা চুল। বিশ বছর আগের সুরজিত ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছে—অবস্থা পড়ে এসেছে। আর সে দিন নেই, সে দাপট নেই। থাকার মধ্যে মেজাজটাই আছে। বাঘের আর দাঁত নেই, ডাকটাই আছে। সরস্বতী আর কি দেবেন! দেনেঅলা তো লক্ষ্মী। আমার ফ্যাকটারি নাম তাই, লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিজ। ইঞ্জিনিয়ারদের আমি চাকরি দি। চাকরির সুপারিশ করে মন্ত্রীরা আমার কাছে তাদের আত্মীয়দের পাঠায়। আমি বোর্ডে বসে ইন্টারভিউ নিই। সুরজিতের মনে হল ; সে কারোর মৃত্যু-শয্যার পাশে এসে বসেছে। বনেদিয়ানার মৃত্যু। পথে যারা ছিল তারা ওপরে উঠেছে। ওপরে যারা ছিল, তারা পথে নামছে।

শঙ্কর যেন ধ্যানাসনে বসেছেন। বেশ বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'বলো কি বলবে?'

সুরজিত বললে, 'মেয়ের বিয়ে দোব।'

'দেবে, দেবে, তার আমি কি করবো?'

'তুমি অনুমতি দেবে।'

শঙ্কর একটু অবাক হলেন। ভেতরে ভেতরে একটু নরম হলেন। এত শ্রদ্ধা এত ভক্তি! একমাত্র মেয়ে। এক সময় গান শিখতে আসত শঙ্করের কাছে। দেখতে শুনতেও

ভাল। বেশ একটা সংস্কৃতির ছাপ আছে। লোহাকাটার মেয়ে বলে মনেই হয় না।

শঙ্কর বললেন, 'আমার অনুমতির জন্যে কাজ আটকে আছে?'

'অবশ্যই। বিয়ে তো হবে তোমার ছেলের সঙ্গে।'

শঙ্কর যেন স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে! মানসের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আর তো কোনও উপায় নেই। মেলামেশাটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে এর বাইরে আর কিছু ভাবা যায় না।'

'তার মানে?'

'মানে প্রেম। দু'জনে দু'জনের প্রেমে পড়েছে।'

'সে আবার কি?'

'লাভ। আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে ছাড়া আর কারোকে বিয়ে করবে না। আর তোমার ছেলেরও ওই একই ব্যাপার।'

'আচ্ছা! তাহলে কাল সকালেই আমার প্রথম কাজ ওই প্রেমিকাটির পেছনে কঁ্যাত করে একটা লাথি মেরে বিদায় করা; তারপর তুমি যা পার তাই কোরো। একটা জাতের বিচারও তো আছে।'

'এখনও জাতের বিচার? জাত বলে কিছু নেই। তুমি না প্রগতিবাদী?'

'জাত আছে। যাক সেটা বাদ দিলেও, বংশ থাকে।'

পুরুষে পুরুষে বংশ বদলায়। আমাদের এখন উঠতি, তোমাদের পড়তি। পূর্বপুরুষের তালপুকুরে এ-পুরুষের ঘটি ডোবে না।'

শঙ্করের ফর্সা মুখ লাল জবার মত হয়ে গেল। একবার মনে করলেন লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'এই পড়তি বংশের, বেকার অপদার্থ একটা ছেলের সঙ্গে তোমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?'

'সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীকে মেলাবো বলে। মায়ের কৃপায় আমার অর্থের অভাব নেই। একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, কয়েক লাখ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। ছেলেটার ভেতর অসাধারণ প্রতিভা। আমার মনে হয়, ও তোমার চেয়ে বড় হবে। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি কিছুই করতে পারলে না; আর ও কিছু করুক সেটাও তুমি চাইলে না।'

শঙ্কর এবার লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'গেট আউট। তুমি আমার ছেলে কিনতে এসেছ?'

'কিনতে না পারি, কুড়িয়ে নেবো। তোমরা তো ফেলেই দিয়েছ। পথে পথেই তো ঘোরে। তোমাকে শুধু জানিয়ে গেলুম।'

সুরজিত, মশমশ করে বেরিয়ে গেলেন। দামী গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ হল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে যেই চলে গেল শঙ্করের মনে হল শব্দটা তার ভেতরেই হল। এক ট্যাঙ্ক পেট্রলে আগুন ধরে গেছে। প্রথমেই এক টান মেরে বারান্দায় এতক্ষণ ধরে সাজানো সমস্ত মানিপ্ল্যান্ট পটগুলি টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেন। পাশেই একটা গোলাপফুলের টব ছিল। একটানে গাছটাকে উপড়ে দিলেন। তাতেও মন শান্ত হল না। ঘরে ঢুকে দেয়াল থেকে নিজের ছবিটা টেনে নামালেন। প্রয়াগসঙ্গীত সম্মেলনে গান গাইবার সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। সুন্দর ছবি। শঙ্কর তখন খ্যাতির তুঙ্গে। ভারতজুড়ে সমালোচকরা

তখন বাহবা বাহবা করছেন। সেই বাঁধানো ছবিটা শঙ্কর দোতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একতলায়। কাঁচ চুরমার হয়ে যাবার শব্দ হল।

সুধা ছুটে এলেন। মেয়ে দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিছু দূরে। বাবা যখন এরকম মূর্তি ধরেন, তখন তারা ভয় পায় কাছে আসতে। শঙ্করের সারা শরীর কাঁপছে। সুধা স্বামীকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে খুবই নরম গলায় বললেন, 'ছি ছি, এসব কি হচ্ছে?'

এই 'ছি ছি' শব্দে আগুনে যেন ঘি পড়ল। সুধার শরীরে শঙ্করের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা। প্রায় সমান লম্বা। শঙ্কর সেই তুলনায় ছিপছিপে। গত কয়েক বছরে শরীর অনেক ঝরে গেছে, কিন্তু রেগে গেলে শঙ্কর একেবারে বাঘের মতো হয়ে যায়। এক ঝটকায় শঙ্কর সুধাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। মেয়ে দুটো ভয়ে আরও দূরে সরে গেল। আর নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'ও বাবা, কি হবে।'

শঙ্কর সুধার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছি ছি'। আমি 'ছি ছি না তোমার ছেলে ছি ছি। তোমার আস্কারা, তোমার আদরে সে বাঁদরেরও বাঁদর। বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে বসেছে। প্রতিভা, প্রতিভা, বিরাট প্রতিভা, ক্ষণজন্মা। একশো বছরের মধ্যে এমন প্রতিভা আসেনি, আসবে না। গন্ধর্ব, গন্ধর্ব, গন্ধর্ব।' বারান্দায় কতকগুলো অর্কিডের টব ঝুলছিল পাশাপাশি। হাতের এক ঝটকায় সব কটা খুলে পড়ে গেল। একটা পড়ল শঙ্করের পায়ে। বেশ লেগেছে। ভাঙচুরের শব্দ শুনে ওপরে উঠে এসেছেন শঙ্করের বাবা। অনেক যত্নে একটি একটি করে ইট গেঁথে তৈরি এই বাড়ি। নিজে ছাতা মাথায় সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতেন। এখন কোথাও একটু পলেস্তারা খসে গেলে, সেই জায়গায় পানে খাবার চুন টিপে টিপে দেন। জানেন থাকবে না, তবু সৌন্দর্যটা যেন নষ্ট না হয়।

সুধা এইবার বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আশ্চর্য তো। এমন ভাঙচুরের অভ্যাস তো আগে ছিল না? কি তোমার হয়েছে বলবে তো। কিছু বলবেও না, গুমরে গুমরে থাকবে শুধু।'

শঙ্করের বাবা বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'একজন শিক্ষিত, শিল্পী মানুষ যদি এইরকম করে, তাহলে খুবই লজ্জার, খুবই লজ্জার। শান্ত হও, সংযত হও। তোমার ছেলে এমন একটা কিছু অমানুষ হয়ে যায়নি। আর সব ভেঙে ফেললেই সে রাতারাতি দিগ্গজ পণ্ডিত হয়ে যাবে?'

শঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের আদরে সে কি হয়েছে জানেন, চরিত্রহীন, লম্পট। সে ওই সুরজিত দাসের মেয়েটার পাল্লায় পড়েছে। লোকটার এত বড় অডাসিটি, বলে কি না, আপনারা তো রাস্তায় ফেলেই দিয়েছেন, আমি এইবার ঘরজামাই করে তুলেনি। লোকটা আমাকে তুমি তুমি করে কথা বলে গেল। বলে গেল রূপালির সঙ্গে মানস প্রেম করছে। ভাবতে পারেন কত বড় ব্যাভিচার। একটা ছাত্র সে লেখাপড়া ছেড়ে নারীসঙ্গ করছে। তার গুরু এখন বল্টু গুণ্ডা। সে আমাদের ঘরানার তালিম নিচ্ছে, চিপ ফিল্ম-মিউজিক ডিরেক্টারদের কাছে। আমাকে না জানিয়ে সে রেডিওয় অডেশান দিয়ে এসেছে। সে এমন এমন কাজ করে চলেছে যাতে আমার মুখ পোড়ে। এইবার আমাকে

ছেড়ে সে ওই অশিক্ষিত, আনকালচারড সুরজিত দাসটাকে বাবা বলবে, প্রণাম করবে ! তার ওই ঝি-টাইপের বউটাকে মা বলবে। হয় আমি মরবো, না হয় ও মরবে। হয় আমি থাকবো, না হয় ও থাকবে ! চেহারা দেখে মনে হয় মদ ধরে ফেলেছে। বল্টু যার স্যাঙাত, সে মদ না ধরে পারে।'

বৃদ্ধ বহুকাল বোধহয় এমন উদাত্ত হাসেননি। জীবনের শেষবেলায় সংসারটা ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে যায়। সব রষকষ শুষে নেয়। বৃদ্ধের সেই হাসিতে পরিবারের সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভয়ে। পাগল হয়ে গেলেন না তো ! সুধার মনে হল, কি অকারণ অশান্তি। মানুষে মানুষে কি এতটুকু সদ্ভাব থাকতে নেই। এ যেন একই তাঁবুর ভেতর বাঘে বাঘে লড়াই। ছেলেটা কি খেল, কোথায় গেল, সে নিয়ে কারোর চিন্তা নেই। বাঁচলো, কি মরলো।

বৃদ্ধ হাসি সংযত করে বললেন, 'এই বয়সে তুমি কি কি করেছিলে স্মরণে আছে কি ? না, বর্তমান তোমার অতীত ভুলিয়ে দিয়েছে। গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই কেন আমি তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে কি ? মনে পড়ে, তোমার নিজের আড্ডা আর কাপ্তানির কথা। তোমার চারপাশে এখনও অনেকে ঘোরে, যারা পাঁড় মাতাল। তোমার ওই ওপরের ঘরের মজলিশ, সময় সময় কতটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত খেয়াল করেছ কি ? শিল্পীদের এটাই না কি ধরন ! শঙ্কর তুমিই আমাকে বলেছিলে। তুমি জনান্তিকে আমাকে বলেছিলে ওল্ড ফুল। তোমার ছেলে তোমারই পথে চলেছে। ছেলের ধরন পাল্টায়নি, পাল্টাচ্ছে বাপের ধরন। আমিও বাবা তুমিও বাবা। আমি ছেলেকে ধরে ছিলুম, তুমি ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছ।'

বৃদ্ধের খড়মের আওয়াজ ধীরে ধীরে নেমে গেল নিচের দিকে। সেখানে চল্লিশ শক্তির একটা বাতি জ্বলছে মিটিমিটি। নোনাধরা দেয়ালে রহস্যময় সব দেবদেবীর চিত্রপট। কোণের দিকে খাড়া করা বিশাল এক ত্রিশূল। তার ছায়া দেয়ালে। গোটাগোটা রুদ্রাক্ষের বিশাল একটা মালা এক দেয়ালে ঝুলছে। কুলঙ্গিতে প্রাচীন কালের কিছু পুঁথি। কাঠের একটা চৌকির ওপর কম্বল পাতা বিছানা। পুটলির মতো একটা বালিশ। এই হল বৃদ্ধের সাধনপীঠ। মাঝে মাঝে বাগান থেকে ছুঁচো এসে ঢুকে পড়ে ঘরে। ব্যাং লাফায়। বর্ষাকালে জানালা দিয়ে সাপ দোল খায়। এই হল সংসার-জাহাজের কাপ্তেনের কেবিন।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। শঙ্কর ঢুকে গেলেন ঘরে। একটা মানুষের জীবন ঘাঁটলে কিছু না কিছু ময়লা বেরোবেই। একেবারে টলটলে ফটকিরি দেওয়া জলের মতো কাঁচ-স্বচ্ছ জীবন বোধহয় হয় না। কিছু ভুল, কিছু ঠিক এই দিয়েই মালা গাঁথা। উঠতি বয়সটা বড় সাংঘাতিক, কিন্তু ছেলেকে তিনি কাছে টানতে পারবেন না। একটা বাধা তৈরি হয়েছে মনে চিরকালের মতো। মানস এক প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক জায়গাতেই শুনেছেন, ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মানসের আবার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই। শঙ্করের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে তার আবার বেশি খাতির।

সুরজিৎ বাড়ি ফিরে মেয়েকে বললেন, 'তোমার কথা আমি রেখেছি। আধুনিক বাবার যেমন হওয়া উচিত। শঙ্করবাবু বললেন, ছেলেকে ক্যাঁত করে একটা লাথি মেরে দূর করে দেবেন। এরপর তো তোমার আর কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি আমার

পছন্দমতো তোমার বিয়ে দেবো।'

রূপালি বললে, 'আমি এখন বিয়ে করব না।'

'কি করবে ? বাউন্ডুলেটার পিছনে দৌড়োবে ?'

'দেখতেই পাবে।'

'তোকে ভূতে ধরেছে। তুই যে-ভাবে মানুষ হয়েছিস, তাতে বস্তিতে গিয়ে বাস করতে পারবি ?'

'মানুষ কি পারে আর কি পারে না, আগে থেকেই বলা যায় না বাবা।'

'প্রেম। প্রেমে কি আছে রে। ন্যাকামি। ফ্যাশান। রোগ। মনের অসুখ। মানসকে ভেবেছিলুম একটা ইনভেস্টমেন্ট। আমার টাকার সঙ্গে কালচারের বিয়ে। নাম ও করবেই। সেই নামটা আমি ভাঙাতুম। শিক্ষা আর সংস্কৃতি—এই দুটোতেই তো আমি শূন্য। তা ছাড়া ব্রাহ্মণদের ওপর আমার অনেক কালের রাগ। মুকুজ্যেমশাই আমাকে কখনো এক সারিতে বসে খেতে দেননি। ভেবেছিলুম তোকে দিয়ে গোঁড়াদের গোঁড়ামি ভাঙবো। দাস থেকে মুকুজ্যে। তা বাড়ি থেকে দূর করে দিলে সে আর কি করে হবে।'

সুরজিতের স্ত্রী পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ওটা একটা পাত্র হল ? তিন লাখ টাকায় অনেক ভাল ছেলে পাওয়া যায়।'

॥ ৩ ॥

মামার বাড়িতে বেশ একটু বেলাতেই মানসের ঘুম ভাঙল। তাও ভাঙত না, যদি না মাসি এসে চুল ধরে টানত। মানস চোখ মেলেই মাসির মুখ দেখতে পেল। মাথার গোলমাল হলে কি হবে, চেহারাটা ভারি সুন্দর। গোল মুখ। ছোট্ট কপাল। কপালের মাঝখানে গোল সিঁদুরের টিপ। একমাথা কালো কুচকুচে চুল।

মাসির ডান হাতে একটা চিরুনি। মানস তাকাতেই মাসি নাকে কেঁদে বললে, 'কি হবে বল তো, যেই না চুলে চিরুনি দিচ্ছি, অমনি না ভুসভুস করে চুল উঠে যাচ্ছে। তুই এখনও শুয়ে আছিস। আমার কথাটা একবারও ভাবিস না। আমাকে যে ওরা আর নেবে না রে।'

মানস উঠে বলল, 'কারা নেবে না ?'

'ওই যে রে আমার বরের বাবা আর মা।'

'তোমার চিরুনিতে তো মাত্র তিন চারটে চুল।'

'ওই তো, ওই করেই তো সব যায়। একটু একটু করেই তো যায়। দেখবি আমি একটা গান করবো—একটু একটু করেই হয়, আবার একটু একটু করেই সব যায়। হাহা, হোহো, হিহি।'

মাসির গলাটা কিন্তু খুব সুন্দর। ভোরের ফোটা ফুলের মতো ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে মানসের মনে হল তাদের দুটো পরিবারের ওপরেই একটা অভিশাপ খেলা করছে। ব্রহ্ম শাপ। ওই, একটু একটু করে জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে মাঝদরিয়ায়। অনেক দূর থেকে যেন বাবার গলার সেই গানটা ভেসে এল, বাবারই রচনা—'অনেক কিছু দিয়েছিলি/দিয়েও আবার কেড়ে নিলি/শুধু হার মানলি কাড়তে/আমার দু চোখ ভরা

জল ॥' মানসের গলা দিয়ে গানটা হঠাৎ বেরিয়ে এল ভোরের সুরে। মানসের মনে হয় কোনও ভাবে যদি ছেলেবেলার দিনগুলো ও আবার ফিরে পেত। বাবার ভালবাসা আর বন্ধুত্ব পেতে তার ভীষণ ইচ্ছে করে। বাবা তাকে ডাকছেন, মানস আয়। ভালবেসে কিছু একটা দিচ্ছেন। বেরিয়ে যা, না বলে, বলছেন কাছে আয় সে কি এমন করেছে।

আর একটু বেলা বাড়তেই মানসের মেজ বোন উৎপলা হন্তদন্ত হয়ে এল। বেচারা ঘেমে গেছে। চুল উড়ছে। মুখে না-খাওয়া, না-ঘুমোনোর কালি। মানসকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ভাইদা, তুই এখন ভুলেও বাড়ী যাবি না। গেলেই বাবা তোকে খুন করে ফেলবে।'

'কেন রে। আমি তো আর হারমোনিয়ামে হাত দিই নি। গানও গাইনি।'

'ধ্যুত, কাল সন্ধে'বেলা রূপালির বাবা এসে যা-তা বলে গেছে। রূপালিকে তুই ভালবাসিস?'

'আমি একমাত্র গান ভালবাসি, রূপালি আমার গান ভালবাসে। এ ভালবাসাটা সে ভালবাসা নয়।'

'তোদের ভালবাসাটা কি ভালবাসা, তোরাই জানিস, কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে। কি করে করবি? তোর তো চাকরি নেই, বাকরি নেই, বাবাও তো তাড়িয়ে দেবে, তুই কি করবি ভাইদা?'

'এখন কে বিয়ে করতে যাচ্ছে? বিয়ে করার তো একটা নিয়ম আছে।'

'বড়লোকের মেয়ে, বিয়ে করলে তুইও বড়লোক।'

'সিনেমা না কি? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।'

'তুই তাহলে পরিস্কার বলে দে। বাবা কিন্তু কাল থেকে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সব ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।'

'আমি কেন বলতে যাবো। আমাকে কেউ ভালবাসলে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'বুঝেছি। জানিস তো একেই বলে প্রেম। ভাইদা তুই কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছিস, আরও যাচ্ছিস।'

'গেছিই তো। আরও যাবো। তোরাই তো আমাকে দূরে ঠেলেছিস। তোরা বাবাকে একদিনও বলেছিস, বাবা তুমি অন্যায় করছ। বলেছিস। তোরা শুধু মজা করে দেখেছিস। কই তোরা তো আমার দিকে আসিসনি। বাবা যেবার জামা জুতো কেড়ে নিয়ে মাঝরাতে রাস্তায় বের করে দিলেন, সেদিন তোমরা কি করেছিলে?'

'বা-রে আমরা কত কেঁদেছিলুম সারা রাত।'

'আর আমি রাত কাটিয়েছিলুম মুদিখানার রকে নেড়িকুকুরের সঙ্গে। ভোরবেলা বাবা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন, একবারও ফিরে তাকালেন না। আমার মানসম্মান নেই! যত মানসম্মান তোমাদের! তখন আমি কোথায় গেলুম? ওই রূপালি তিন দিন আমাকে রেখেছিল।'

'বাবাকে আমরা ভীষণ ভয় পাই।'

'তাই পা। আমার কথা ভেবে আর কি হবে!'

'জানিস তো খুব অশান্তি হলে বাবার খুব লেখার মুড আসে। তখনই ভাল ভাল

গান লেখেন, ভাল সুর দেন।'

'তার মানে আমি বলির পাঁঠা। বাবা তোদের ডেকে গান শোনান, গান তোলান, তোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন। তোদের বেলায় যত আদর, আমার বেলায় যত ধোলাই! কেন রে!'

'আমরা যে মেয়ে, পরের বাড়ি চলে যাব। আর গান তো শিখতেই হবে। বিয়ে-পরীক্ষার একটা পেপারই তো গান।'

'একটু আগেই মনটা ভীষণ খারাপ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো। তোর কথায় মনটা ঘুরে গেল। আমি শিল্পী হয়ে বাবাকে দেখিয়ে দেবো শিল্পী হওয়া যায় কিনা! লোকে বাবার নাম ভুলে যাবে, আমার নাম মনে রাখবে। আমি অনেক কষ্ট করে বাবাকে ঘৃণা করতে শিখবো। আর সেই ঘৃণাই হবে আমার বারুদ। ঘৃণা করার মতো একটা-দুটো ঘটনা আমার কানে এসেছে। সেইগুলোকেই আমি নাড়াচাড়া করবো। মায়ের কাছে শুনে নিস, আমি মরতে মরতে বেঁচেছি, এইবার আমি বাঁচতে বাঁচতে মরবো। রাজার মতো বাঁচবো।'

'তুই কি জানিস, ক'ল সকালে আমরা সবাই টাটানগর চলে যাচ্ছি, তুই এখন কি করবি?'

'কেন তোরা আমাকে বলতে পারছিস না, ভাইদা, তুইও চল।'

'বা, রে। আমরা বলার কে?'

'মা কি মরে গেছে!'

'মা বাবার মন বুঝে চলতে চায়।'

'আচ্ছা! আমার জন্যে তোদের আর ভাবতে হবে না। আমার ভাবনা আমি ভেবে নেবো।'

'তুই আর পড়বি না?'

'টিয়াপাখির মতো একই কথা কপচাস না। আমি কি করব, আমি তা জানি।'

'জানিস তো বল্টুদাকে কাল অনেক রাতে পুলিস অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'সবাই বলছে খুনের মামলা।'

'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।'

মানসের মায়ের একটা একটা করে প্রায় সব গয়নাই চলে গেছে। গানের রোজগারে সংসার আর চলে না। মাঝে মধ্যে গয়না বেচতে হয়। কিছু আগে মাসিমা-র গাওয়া সেই গানের মতো একটু, একটু, একটু করেই যায়। সুধা মানসকে একদিন বলেছিলেন, 'হাত আর গলা একেবারেই খালি হয়ে গেল, হাতে কিছু জমেও না, যে, এক সেট নকল সোনার গয়না কিনবো।' মায়ের এই ক্ষোভ মানসের মনে খুব ধাক্কা মেরেছিল। মানসের পকেটে এখন কড়কড়ে তিনশো টাকা। মানস উৎপলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মায়ের জন্যে গয়না কিনবে।

বৌবাজারে দোকান ঘুরে ঘুরে মানস হার, চুড়ি আর একজোড়া দুল কিনল। বোনের হাতে দিয়ে বললে, 'মাকে বলিস, এখন নকল সোনাতেই কাজ চালাতে আর পাঁচটা

বছর পরেই আসল সোনা হবে।'

'কি করে হবে ?'

'হবে তুই দেখে নিস।'

'এই টাকা তুই কোথায় পেলি ?'

'চুরি করিনি। সৎ পথের রোজগার।'

উৎপলাকে বাসে তুলে দিল মানস। ওঠার আগে উৎপলা বললে, 'আবার কবে দেখা হবে ?'

'কোনও দিন হবে। কবে তা জানি না।'

'কোথায় থাকবি ?'

'জানি না রে, এত বড় দেশ, কোথাও একটা জায়গা হবেই।'

'সাবধানে থাকিস কিন্তু।'

বাস চলে গেল। মানস ভাবতে লাগল, পকেটে কয়েকটা মাত্র টাকা আছে, কাল তবু গুরুদোয়ারা ছিল আজ কি হবে। বল্টুদা হাজতে। যাবার অনেক জায়গা আছে ; কিন্তু রোজগার। একটা টিকিটের দাম তাকে তুলতে হবে। এক পিঠের ভাড়া তারপর দেখা যাবে।

ছানাপটির সামনে দাঁড়িয়ে মানস মনে-মনে একটা পরিকল্পনা ছকে নিল। টালিগঞ্জে বেশ একটা বড় মন্দির আছে। রোজই সেখানে একটা না একটা কিছু হয়। সেবায়েত পূর্ণবাবু মানসকে ভীষণ ভালবাসেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। একবার গিয়ে দেখলে হয়। মানস বারটার মধ্যেই পৌঁছে গেল। গিয়ে বুঝল, ঠিক দিনেই এসে পড়েছে। মানস আজকাল, বুড়োদার কথা সময় সময় ব্যবহার করে, যেমন, বেটি ঠিক দিনেই টেনে এনেছে। মন্দিরের আজ প্রতিষ্ঠাদিবস। ফুল, মালা, ধূপ, ধুনো, সংগীত, ভক্তসমাবেশ, যেন আর এক জগৎ। মানস একটু আগে ছিল কোথায়, আর এখন কোথায়।

পূর্ণ ভট্টাচার্য, মানসকে দেখেই বললেন, 'বিশ্বাস করবে কি না জানি না, মনে মনে আমি তোমাকেই ডাকছিলুম। আমার মানস কোথায় ? আমার মানস কোথায় ?'

'আর বৌবাজারের ছানাপটিতে দাঁড়িয়ে আমি সেই ডাক শুনতে পেলুম।'

'তাহলে জমিয়ে দাও। তোমাকে আমি একটা ধুতি আর চাদর উপহার দোব। সেইটা পরেই বোসো। আগে চান করে নাও।'

মানসের এই শুদ্ধাচার ঠিক আসে না, তবু সাধুসজ্জনের আদেশ। মনটা তার একেবারে ফাঁকা। একলা হলেই কেমন যেন লাগছে। মন্দিরের পেছনে বাগান, কলাঝাড়, একটা বাঁশ ঝাড়। ম্যাটম্যাটে রোদ। পাঁচিলের ওপারে ধুধু মাঠ। টিন দিয়ে ঘেরা বাথরুমে দাঁড়িয়ে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে মানসের কত কথাই মনে পড়ছে। পিতা শঙ্করের রমরমা অবস্থা সে দেখেছে। অল্প কিছুদিন। তিনি উঠলেন, তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন। কেন পড়লেন, কিভাবে পড়লেন মানস ঠিক জানে না। লোকে বলে, মেজাজ ও দুর্ব্যবহার। গুণী বলে, তুমি যাই করো মানুষ তোমায় পূজো করবে, সে যুগ আর নেই। এখন এ ইট ছুঁড়লেই পাটকেল খেতে হবে। যত অভাব বাড়ছে ততই দুর্ভাব চড়ছে। মেজাজ সব সময় সপ্তমে। সব গানেই কান্না। মানুষ একটু আনন্দ চায়। নিজের দুঃখ

সকলের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে হয় ! শুধু নিরাশার কথা মানুষ শুনবে কেন। নিরাশার ওপর আশাকে দাঁড় করাতে হবে। দুঃখকেই করে তুলতে হবে আনন্দ ! তবে বাবার ওই বিদ্রোহের গানগুলো ভারি সুন্দর—'বহুদিন হতে মোরা উপবাসী/দেখ্ মা তবুও মুখে আছে হাসি/(তোর) অভয় বাণীতে আর ভুলিব না/তোরে ভাল করে চিনি না ॥' সংসারটা তাহলে একেবারেই ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গুক। কুছ পরোয়া নেই।

নাটমন্দিরে তখন গান চলছে। মানস এসে বসল, রাজবেশ করে। শুরু হয়ে গেল গান। 'একটি অসুর নিধন করে মা/কত না দর্প হয়েছে তোর/মহিষাসুরের মৃত্যুর পরে বহু বহু যুগ কেটেছে/এরই মাঝেতে লক্ষ অসুর/তোরই সৃষ্টি ভেঙ্গে করে চুর ॥' বেলা তিনটে অবধি মানস একটানা গান গেয়ে গেল। সকলেই ধন্য ধন্য করছেন।। ওইখানেই ছ' জায়গায় গান গাইবার বায়না হয়ে গেল। পূর্ণবাবু এসে মানসকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুই সিদ্ধিলাভ করেছিস মানস। তোর পিতামহ প্রায়ই আসেন এখানে, এসে মায়ের সামনে বসে কেবল তোদেরই মঙ্গলকামনা করেন। পেছনের ওই গোটা জমিটা মায়ের সেবার জন্যে দান করেছেন। আমাকে বলেছেন, পূর্ণ, আমার জন্যে একটা চালা তৈরি করে রেখো, আমি এই এলুম বলে। হ্যাঁ রে, ছেলের সঙ্গে বনছে না বুঝি ?'

মানস কথা ঘুরিয়ে নিল। সামনে বিশাল এক থালায় অনেক প্রণামী পড়েছে। পূর্ণবাবু বললেন, ওগুলো সব তোমার।'

অন্য সময় হলে, মানস সব দান করে দিত ; যতই হোক আর একটা শঙ্করই তো বসে আছে ভেতরে, নির্লোভ, বেহিসেবী, অভিমানী, কল্পনাবিলাসী এক রাজা। আজ আর সে পারল না। এক পিঠের রেলভাড়া মায়ের কৃপায় যোগাড় হয়ে গেছে। এ বেশ ভাল। তাদের সংসারে ধারাটা সত্যিই বেশ সুন্দর হয়েছে। বুড়োদা বলেন, পাখির সংসার। কোথাও কোন সঞ্চয় নেই। কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বাঁধন নেই। এ যেন, শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস, কখন কি ঘটে ভেবে হই মা সারা। মানস ভাবলে, আমাদের আজ আছে কাল নেই। কাল কি হবে আমাদের পরিবারের কেউই জানে না।

মানস বললে, 'আজ আমি এখানেই থাকবো।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'একদিন কেন ? তুমি এক মাস থাকো। তুমি থাকলে বেশ জমে যায়। গানে-গল্পে। রাতে তোমাকে আমি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি খাওয়াবো, সঙ্গে ছোলার ডাল।'

দুটোই আমার ভীষণ প্রিয়। পিতামহের উত্তরাধিকার। বৃদ্ধেরও এই দুটি জিনিস ভীষণ প্রিয়, সঙ্গে একটু মোহনভোগ থাকলে তো আর কথাই নেই, ষোল কলা পূর্ণ।

মানস একটা কাপড়কাচা সাবান কিনে নিয়ে এল। এখনও বেলা আছে। বসে গেল টিউবওয়েলের তলায়। ট্রাউজার, জামা, গেঞ্জি। এক মহিলা হাত ধুতে এসে বললেন, 'এ কি শিল্পী মানুষের একি অবস্থা। আমি কেচে দিচ্ছি। সাধারণ মানুষ এই শিল্পী শব্দটা কেমন সহজে ব্যবহার করে। মানসের হাসি পায়। কবি, শিল্পী, ওস্তাদ। বোকা বোকা শব্দ। মহিলা বললেন ; কিন্তু কিছু করলেন না। হাত ধুয়ে চলে গেলেন।

কোথা থেকে ফ্রক পরা একটা মেয়ে এসে মানসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধুপধাপ কাচতে বসে গেল।

মানস বললে, 'এ কি রে বাবা?'

মেয়েটা বললে, 'হ্যাঁ রে বাবা। তোমার জন্যে আমি মায়ের কাছে বকুনি খেলুম। সবেতেই পাকামো।'

'এক পেট খিচুড়ি খেয়ে অমনি কাচতে বসে গেলেন। দেখানো হচ্ছে, আমি শুধু ভাল গাইতেই পারি না, কাচতেও পারি।'

'তুমি কে গা?' মানসের সন্দেহ হচ্ছিল, মা একবার রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই মা আর একবার এলেন না তো লীলা করতে। বড় বড় চোখ। কালো কুচকুচে চুল। লালচে সাদা গায়ের রঙ। শাসন করে কবে কথা; যেন কতকালের চেনা।

মানস বললে, 'দেখাতে যাবো কেন? তোমাকে আমি চিনি না কি?'

মেয়েটা বললে, 'ও মা, সে কি গো। তোমাকে যে আমি এই একটু আগে পরিবেশন করে খাওয়ালুম গো। এরই মধ্যে ভুলে গেলে। আমি তো পূর্ণবাবুর ভাগনী।'

'ও মা, তাইতো। আমি একটা মাথা মোটা।'

'তা হতে পারে, জানো। গাইয়েরা ভীষণ বোকা হয়।'

'কেন বলো তো?'

'তা না হলে, তারা তো সব হেডমাস্টার হয়ে যেত।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'খুব ভালো জায়গায়। নাম শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। গোবরডাঙায় থাকি গো আমি, গোবরডাঙায়। তুমি আমাকে একটু গান শেখাও না গো। তোমার গানগুলো বেশ ভালো। খুব সুর। ওই যে ওই গানটা—'জীবন বীণার তারে বাজে শুধু বারে বারে, বিদায় বেলার শেষ রাগিণী/বিদায়ের আগে তাই শুধু তোরে বলে যাই/তোর মত কারেও আমি এত ভালবাসিনি/এত ভালোবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই॥' আঃ খুব সুন্দর গান।'

'কথাগুলো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে? আশ্চর্য।'

'কি জানো, কোন কিছু ভালো লাগলে আমার চিরকাল মনে থাকে। এই তো তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে তো, তোমাকে আমি কোনও দিন ভুলবো না। তোমার ওই গণ্ডারের মতো নাক, পাগলা পাগলা চোখ। তুমি জানতেও পারবে না, তোমাকে একজন মনে রেখেছে।'

'তার মানে আমাকে বিচ্ছিরি দেখতে।'

'ও মা, তাই বললুম বুঝি। তোমাকে বেশ একটা নায়ক নায়ক দেখতে। এই একটা গায়ে সিল্কের চাদর দিয়ে, চোখ দুটো উল্টে উল্টে যখন গাইছিলে, মনে হচ্ছিল নিতাই আমার। দেখো তো সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না?'

'তোমার নামটা একবার বলো না গা'।

'ও মা! আমার নাম তো মহুয়া। তুমি তো খেতে বসে আমাকে ডাকছিলে। আমার মা আমাকে কি বলছিল জানো তো, তোমাকে নাকি জামাই করবে।'

মহুয়া খিল খিল করে হেসে ওপর-হাত দিয়ে কপালের চুলগুলো সরালো। বাতাসে সাবানের ফেনা উড়ছে। চুলগুলো খুব বিরক্ত করছে। মহুয়া বললে, 'একটা কাজ তুমি পারবে! পেছনদিকে এসে আমার চুলগুলো টেনে একটা খোঁপা করে দিতে পারবে?'

'ওঃ, এই কাজ! এ তো খুব সহজ। টেনে ধরবো, ধরে একটা গোলমতো করে দোব।'

মানস মহুয়ার পেছন দিকে গেল। পিঠে ছড়িয়ে আছে এক রাশ কালো চুল। ফুলছাপ ফ্রকের ওপর। পিঠের হুক তিনটে টান হয়ে আছে। ভেতরের জামার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। মানসের মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। কত ছোট ছোট জিনিসে, কত ভালো লাগা থাকে। একটু ইতস্তত করে মানস সমস্ত ছড়ানো চুল এক জায়গায় করে যেই টেনেছে, উবু হয়ে বসে থাকা মহুয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ল মানসের পায়ে। পা দুটো ছড়িয়ে গেল সামনে সাবানের ফেনায়। গোল, নিটোল দুটি পা। ভরাট গোড়ালি। পায়ে আবার এক হারা দুটো নূপুর।

মহুয়া তো হেসেই খুন। 'একটা ছোট্ট কাজও যদি তোমাকে দিয়ে হয়! এমন টান মারলে উল্টে পড়ে গেলুম। ও মা, আমার জামাটামা সব ভিজে গেল।' দমকা বাতাসে ফ্রকটা পায়ের দিকে উল্টে গেল। মহুয়া বলল, ভীষণ অসভ্য।'

'কে অসভ্য!'

'ওই যে মুখপোড়া হাওয়া। দেখো না সব উড়িয়ে দিচ্ছে। আমার লজ্জাশরম নেই বুঝি। দাও, আমাকে আবার আগের মতো করে দাও। জামাটা গেছে তো!'

'একটু গেছে।'

'একটা কাজও যদি ভালভাবে শান্তিতে করা যায়!'

মানস মহুয়ার বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তুলে বসাতে গেল। মহুয়া যে একটা বাড়ন্ত মেয়ে সে খেয়াল নেই। মহুয়ার ভীষণ সুড়সুড়ি লেগেছে। সে কুঁকড়ে মুঁকড়ে এবার পাশে উল্টে পড়ল। মানস বললে, 'আশ্চর্য তো! তুমি তো কেটলি নও যে হাতল ধরে তুলবো! তোমাকে তুলতে হলে তো আমাকে ওই ভাবেই তুলতে হবে।'

মহুয়া বেদম হাসছে। একটা হাত ভাঁজ করে মুখ চাপা দিয়েছে। সমস্ত চুল ছড়িয়ে গেছে মাটিতে। হাসি আর থামে না। 'তুমি তো আমাকে কলসির মতো করে তুললেই পারতে!'

'এখন তাহলে বেডিং-এর মতো করে তুলি।'

মহুয়া আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে নিজেই উঠে বসল।

সন্ধেবেলা মহুয়া আলু ভাজার আলু কাটতে কাটতে মানসকে বললে, 'শোন তো, সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না। 'জীবন বীনার তারে বাজে শুধু বারে বারে বিদায় বেলার শেষ রাগিণী...।'

মানসকে অবাক করে দিয়ে মহুয়া গোটা গানটা ঠিক ঠিক গেয়ে গেল। পুরো গানটাই প্রায় তারসপ্তকে খেলা করছে। মহুয়ার গলা যেন সাধা বাঁশির মতো। কেউ সাংঘাতিক ভালো একটা কিছু করে ফেললে মানসের চোখে জল এসে যায়। মানস বলল, 'আলুফালু রাখো। হারমোনিয়মে বসবে চলো।'

মন্দিরে সমারোহে আরতি লেগেছে। ঘন্টা, কাঁসর বাজছে। বাইরের দাওয়ায় মানসের ট্রাউজার আর জামা দোল খাচ্ছে বাতাসে। রান্নাঘরে মহুয়ার মা ভোগ রাঁধছেন। মানস হারমোনিয়াম টিপে মহুয়াকে বললে, 'গলা মেলাও।'

মেলাবে কি। মিলেই আছে। যেন কতকালের সাধা! মানসের মনে হল তার সামনে আর এক মানস বসে আছে। পবিত্র। সাদা ধপধপে একটা মোমবাতির মতো। মানস বললে এসো, দুজনে মিলে গাই—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণী তরলতরঙ্গে। মানস সাদামাটা সুরে গাইল না। পটবর্ধন সায়েব যে-ভাবে গাইতেন, যে-সুরে, যে-কায়দায় ঠিক সেই ভাবে। মানসের মনে হল, মেয়েটা সুরের ফোয়ারা। একটু উস্কে দিলেই হল!

গান শেষ হতেই মহুয়া বললে, 'তুমি তাহলে আমার গুরু হলে! প্রণাম করি।'

মানস বললে, 'কে কার গুরু। আমার তো মনে হচ্ছে, তুমিই আমার গুরু হবে।'

মহুয়া মানসকে কটাস করে একটা চিমটি কেটে বললো, 'বেশি, বেশি।'

'গুরুকে চিমটি কাটা?'

'তুমি আবার দয়া করে মাকে বলে দিও না যেন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে মহুয়া?'

'কবির মতো। মাইরি বলছি।'

আধ হাত জিভ কাটলো মহুয়া।

'কি হলো?'

'মাইরি বলে ফেলেছি। আমার বাবা বলেন, তোর কি হবে মহুয়া, আমার মতো পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে তুই মাইরি মাইরি করিস? কি জানো তো, এটা আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। যাক গে, যা হবার তা হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না, আমাদের ওখানে। আমার তা হলে খুব গর্ব হবে।'

'গর্ব হবে কেন?'

'সে হবে।'

'তোমাদের ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

অনেক রাতে মানস উঠোনের চৌকিতে বসে আছে। গাছের পাতায় পাতায় তেলেভাজার শব্দ। দূরের অন্ধকার মন্দিরের চূড়া, তারা খুঁজছে। মানস বসে আছে। এমনিই তার ঘুম কম। আজ আবার মনে চিন্তার ছবি উতলাচ্ছে। বহু মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, কিন্তু কোনও মেয়ের কথা সে রাতে ভাবে না। কোন সময়েই ভাবে না। ওই যতক্ষণ দেখা, ততক্ষণই। মহুয়া কিন্তু মানসকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মেয়েটা তার মন থেকে বেরোতে চাইছে না।

অন্ধকারে কিন্‌কিন্‌ করে শব্দ হল। মানসের পিঠের ওপর একটা হাত পড়ল। 'কি গো কবি, তুমি আজ ঘুমোবে না।'

'আমার ঘুম আসতে বেশ রাত হয়।'

'কটা বেজেছে জানো? বারোটা।'

'তুমি শোবে না?'

'শোব। এই তো সবে সারা হল সব।'

মহুয়া মানসের মাথার চুল খাবলাখাবলি করে দিল। মাথা ঘষল মানসের পিঠে। কানের কাছে ভিজে ভিজে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললে, ফিসফিস করে, 'তোমাকে আমি কিন্তু

ভালবেসে ফেলেছি।' বলেই মহুয়া দুদ্দাড় দৌড়াল। অন্ধকারে একটা কুকুর শুয়েছিল, বার কয়েক ধমকে উঠল। জোরে একটা বাতাস বয়ে গেল যেন কোথাও তাদের ভীষণ কাজ আছে।

মানস খুব ভোরেই বেরিয়ে গেল। প্রথম বাস ধরেই চলে গেল হাওড়া স্টেশনে। প্ল্যাটফর্ম জমজমাট। ভোরের ট্রেন সব ছাড়বে। আসানসোল, ধানবাদ, টাটানগর। একটু পরেই সব ছাড়বে। মানস মাঝেমাঝে নিজেকে হারিয়ে দিচ্ছে ভিড়ে। টাটা ছাড়বে তিন নম্বর থেকে। মানস হুইলারের বই-এর গাড়ির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। ঢোকার গেটের দিকে তার চোখ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আসছেন সব। বোন দুটোকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে, পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো। বাবাকে দেখাচ্ছে সরল একটা বেতের মতো। কি সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। দুধের মতো ফর্সা। আর্য ঋষিদের মতো নাক। রিমলেশ চশমা। নিখুঁত পরিপাটি বেশবাশ। মাকে ভীষণ ভীতু ভীতু আর বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ভীষণ যেন দুর্বল। বাবার ধবধবে সাদা পায়ে কালো স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি। পা দুটোর কি সুন্দর গড়ন! পাতলা আমসত্ত্বের মতো। বড় বড় চোখ দুটো যেন ঝলসাচ্ছে। মানসের মনে হল, সংসারের বাইরে এলে বাবাকে যেন হাজার গুণ সুন্দর দেখায়। কি অভিজাত চেহারা। সংসার বাবার স্থান নয়। সংসারে বাবা নিজেকে নষ্ট করছেন। অকারণ রাগ, ঝগড়া, কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। মানস জানে, বাইরে যাঁকে এত কঠিন কঠোর মনে হচ্ছে, ভেতরটা তাঁর ভীষণ কোমল। ভেতরে শুধু জল—যা গান হয়ে সুর হয়ে বেরিয়ে আসে। বন্দী মানুষের আর্তনাদ। কুলিরা আগে আগে ছুটছে। একজনের মাথায় সেই বিখ্যাত হারমোনিয়ামের বাকসো। বাবা তাকে কেবলই সাবধান করছেন।

মানসের একবার মনে হল, হঠাৎ গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। ওই পা দুটো ধরে বলে, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। পারলো না। অহংকারীর বংশের ছেলে, অহংকারটাকে ফেলবে কোথায়! চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম খালি। যে কুলি দু'জন মাল বয়ে এনেছিল, তারা এখন আয়েস করে খইনি দলছে।

মানস একটা ফোন করল। শেষ মুদ্রাটা ফেলে বোতাম টিপতেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হিসেব মিলেছে। রূপালিই ধরেছে।

'আমি মানস।'

'ওমা। কোথা থেকে বলছ তুমি?'

'হাওড়া স্টেশান।'

'ওখানে কি করছ? এত সকালে?'

'শোনো, আমি বোম্বাই যাচ্ছি। তুমি পালাবে আমার সঙ্গে?'

'ওমা সে কি? পালাবো কেন। খারাপ ছেলেমেয়েরাই তো বোম্বাই পালায়। তারপর পুলিস তাদের ধরে। তুমি শুধু শুধু বোকার মতো বোম্বাই যাচ্ছ কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'না, পুরোপুরি সুস্থ। ওখানে আমি কিছু একটা করার ডাক পেয়েছি।'

'কি করার?'

'আমি যা পারি, গান। বিদেশেও যেতে পারি দলের সঙ্গে।'

'তুমি বড় হও মানস, খুব বড়, আরও বড়।'

'সে তো হবই, আমার ভেতর বারুদ আছে। তুমি চলে এসো, বোম্বাইতে বিয়ে হবে।'

'যাঃ তা হয় না কি? বাবা, মার অমতে আমার অত সাহস নেই। তুমি আগে দাঁড়াও তারপর সব হবে। আমি এখন ছাড়ছি। আমার ভয় করছে।'

মানস হেসে ফেলল। আর এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন, তিনি বললেন, 'হাসছেন?'

'এই সকাল আটটায় একজনের ভয় করছে। ভূতের ভয়।'

মানস বোম্বাইয়ের একটা টিকিট কাটল। রিজার্ভেশান নেই। একটা কুলি বললে, 'দশটা টাকা দেবেন, আমি ইয়ার্ড থেকে চেপে আসবো।'

ছ'টাকায় রফা হল। মানসের কোনও ব্যস্ততা নেই। সে জানে বসতে পাবেই। সবাই ওঠার পর সে যখন উঠলো, এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'আইয়ে মানসজী, আইয়ে।' মানসের মনে হল সারা ভারতবর্ষ তাকে ডাকছে, আইয়ে, আইয়ে মানসজী আইয়ে।

একটু আগে শংকর যে-পথে গেছেন, সেই পথেই মানস চলল। সে যাবে অনেকটা দূরে। আর ঠিক সেই সময় এক বৃদ্ধ দোতালার সার সার ঘরের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে আপন মনে বলছেন, থিয়েটারে এখন ড্রপসিন পড়ে গেল। এ পালা শেষ। পরের পালার দিনক্ষণ পরে জানান হবে। খড়ম খটখটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলেন, নারকেল গাছের বেল্লোর খাঁজে ঘুঘুর বাসা হয়েছে। মাথা নাড়লেন, 'তোফা, তোফা! ভিটেয় তাহলে ঘুঘু চরল!'

পাঁচদিন পরে সুধা একটা চিঠি পেলেন,

মা, আমি এখন অনেক দূরে, বোম্বাইতে। আমার জন্যে ভেবো না। বেশ আছি আমি। মা, বাবাকে ছেড়ে যতটা ভাল থাকা যায়। বাবাকে বোলো, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। মানস এমন কিছু করবে না, যাতে তাঁর সম্মানের হানি হয়। বাবা শুধু আমার জন্মদাতা নন, গুরু। নিজে না শেখালেও আমি শুনে শিখেছি। আমার রক্তে তাঁরই সুর। বাইরের জগৎ বাবাকে অসম্মান করেছে, প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি, আঘাত করেছে, আহত করেছে, আমরা যেন সেই আহত মানুষটিকে আরও আঘাত করে না বসি। আমরা যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। বড় গুণী মানুষ, বড় আদরের মানুষ, বুকে ধরে রাখার মানুষ। বাবাকে তোমরা ধরে থেকো। দেখো তাঁর গান যেন বন্ধ না হয়। খুব উৎসাহ দেবে, সঙ্গ দেবে, ভেঙ্গে পড়তে দেবে না। বাবাকে বোলো সুরজিত দাসের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তার মেয়ের সঙ্গেও নয়। লোকটা ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ। কাল সকালে আমি দুবাই যাচ্ছি। কিসে কি হয়, কার কি হয়, বলা যায় না মা। ঈশ্বর আছেন। বাবাকে বোলো, আর কয়েকটা বছর, সংসারের ভাবনা, মেয়ের বিয়ে, কিছুই আর তাঁকে ভাবতে হবে না। মানস আসছে। আমার বারুদ যেন সেঁতিয়ে না যায়! তোমরা প্রণাম নিও—মানস॥

নারকেল গাছের তলায় বসে বৃদ্ধ একটি ছোট চিঠি পড়ে হেসে উঠলেন—বুড়োদা,

তুমি হলে আমাদের বুড়ি। চুপ করে বসে থাকো, আমরা সব চোর চোর খেলতে বেরিয়েছি। দেখি, এবার কে আগে বুড়ি ছুঁতে পারে ! প্রণাম নিও।—তোমার খোকা॥

গোবরডাঙ্গার এক কিশোরী আমবাগানে বসে যে চিঠিটা পড়ল—মৌ, আমি এখন বোম্বাইতে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসিনি, কাছে থেকে যা বলা যায় না, দূর থেকে বলব—আমিও তোমাকে ভালবাসি। তবে কি জান তো বাবারা মেয়ের বিয়ে দেন কোনও ছেলের সঙ্গে নয়, জীবিকার সঙ্গে। গাড়ি, বাড়ি, চাকরি, টাকা। আমি সেই সব গয়নার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি, ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আদায় করব বলে। আমার মাথায় এখন দুটো চিন্তা—গান আর তুমি। জীবনে আর কারোকে দেখে এত দুর্বল হইনি। পারলে অপেক্ষা কোরো। বেশি না, মাত্র কয়েক বছর। আর কারোর কাছে গান শিখো না, ঘরানা উল্টে দেবে। আমিই তোমাকে শেখাব। কিছুদিনের জন্যে আমি একটা দলের সঙ্গে দুবাই যাচ্ছি। বোম্বাই আর দুবাই দুটো ঠিকানাই রইল। ইচ্ছে হলে লিখো। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম—মানস॥

শংকর মানসের চিঠিটা পড়লেন। অনেকদিন পরে তাঁর চোখে একটু জল এল। একটা লাইন—এত ভালবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই। সব ব্যথা কথা হয়ে প্রাণে গাঁথা থাক না।

বৃদ্ধ দোতালায় উঠে এলেন। টবের গাছগুলো মরে না যায়। একটু একটু করে জল ঢালতে লাগলেন। পরিচ্ছন্ন, নধর, একটি ঘুঘু নারকেল গাছের পাতায় বসে ঘুরঘুর করছে। বৃদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'শ্মশানের শান্তি ভালবাসি নে পাখি সব শ্মশান করে দিয়েছি।' শংকরের ঘরের তালা খুললেন, ষাটটা বছর যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমবাগানে একটি মেয়ে ছুটছে। হলুদ ছাপ ফ্রক। গোল গোল পায়ে পাঁয়জোরের চিনচিনি। হাতে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র।

অভয়ারণ্য

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা। থমকানো পরিবেশ। জল মেশানো দুধের মতো আলো। এখানে জীবন আর মৃত্যুর লড়াই চলে অহরহ। ঝকঝকে লাল মেঝে। নিষ্প্রাণ একসার বসার আসন। বাতাসে ওষুধের গন্ধ। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ট্রলি প্রায় নিঃশব্দে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। সাদা পোশাক পরা নার্স। মাথায় বিচিত্র টুপি। ব্লাউজের দু' কাঁধে দুটো কলার। কেউ ফর্সা। কেউ কালো। কোঁদা চেহারা। পাথরের মতো মুখ। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। শুধু নির্দেশ আছে।

করিডরের একেবারে শেষ মাথায় ঘরের দরজার মাথায় আলোর অক্ষরে লেখা অপারেশন থিয়েটার। সাদা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এক মানুষ।

বুকের দিকটা অ্যাপ্রনে ঢাকা। চোখে রিমলেস চশমা। আলো পড়ে সোনার ডাঁটি ঝিকমিক করছে। একমাথা এলোমেলো চুল। এই শহরের সেরা-গাইনি। হাতের আঙুলগুলো অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা।

ধীর পায়ে তিনি এসে ঢুকলেন ভিজিটার্স রুমে।

দেয়ালের ঘড়িতে রাত দশটা। ঘরে চারজন পুরুষ তিনজন মহিলা। পুরুষদের দু'জন প্রৌঢ়। দু'জনেরই চোখে চশমা। দু'জন মহিলাও প্রৌঢ়। তৃতীয় জন তরুণী। ছিপছিপে শরীর। ধারালো মুখ। ভীষণ ফর্সা। চোখে পাতলা সোনালি চশমা। পুরুষদের বাকি দু'জন তরুণ। সুসংস্কৃত চেহারা। একজনের পরনে জিনস। কারোর মুখেই কোনও কথা নেই। উদ্বেগ থমক আছে।

ডাক্তারবাবু ঘরে ঢোকা মাত্রই সাতজন উঠে দাঁড়ালেন। ঘরটা যেন ছোট হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'বসুন বসুন।' তিনি নিজে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এলোমেলো চুলে একবার হাত বোলালেন। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে সাদা একটা গ্লাভস উঁকি মারছে। ডাক্তারবাবু ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজে ট্রাউজারের পকেট থেকে লাইটার বের করে হাতে নিলেন। সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও ধরালেন না। সাতজোড়া চোখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালেন। একটাই প্রশ্ন বাতাসে দুলছে বিশাল এক ঘন্টার মতো, 'কি হল ডাক্তারবাবু ?' তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে প্রশ্ন ভাষা হারিয়েছে।

ডাক্তারবাবু ঠোঁট থেকে সিগারেটটা বার করে নিলেন, না ধরিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনাদের একটা ডিসিশান নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। বেশি সময় দিতে পারব না।' সাতটা 'কি' প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হল।

'কি ডিসিশান ডাক্তারবাবু ?'

'হয় বাচ্চা না হয় মা যে কোনও একজনকে মারতে হবে। বাচ্চা চাইলে মাকে পাবেন না, মাকে চাইলে বাচ্চা। দু'জনকে একসঙ্গে বাঁচানো যাবে না, আই অ্যাম সরি। আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে আমাকে জানান, উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার। আমি আমার ঘরে আছি।'

সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে লাইটার জ্বালালেন। দীর্ঘ শিখা নেচে উঠল নাকের সামনে। লাইটারের আগুনে আলোকিত মুখটা মনে হল নির্দয় কোনও মুখোস। এক ভলক ধোঁয়া ছেড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাতজনের একজন, যিনি একটু সাহসী, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

ডাক্তারবাবু ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মেজাজী মানুষ। মুখে অসন্তোষের ছাপ। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সার্জেন ?'

প্রশ্ন করেছিলেন মেয়ের মা। মেয়ে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা অপারেশন থিয়েটারের ধাতব টেবিলে। একটু আগেই সে ছটফট করছিল যন্ত্রণায়। নতুন একটি প্রাণ নেমে আসতে চাইছে। মেয়েটির এই প্রথম বাচ্চা হবে। ডাক্তাররা যাকে বলেন, ফার্স্ট ডেলিভারি।

মেয়ের মা ভয়ে চুপ করে রইলেন।

ডাক্তারবাবু নিজেকে সংযত করে বললেন, 'বাচ্চা যে পোজিশানে আছে, অ্যাকিউট পোজিশান। একসরে প্লেট দেখালে আপনারা বুঝতে পারেন না। আমার সামনে একটা

পথই খোলা, যে কোনও একজন। এনি ওয়ান অফ দি টু।' তিনি ধীর পায়ে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে গেলেন। আত্মবিশ্বাসী মানুষের চলার ধরন যেমন হয় আর কি! শহরের সেরা গাইনির যেমন হওয়া উচিত।

মেয়েটির নাম সুমিতা। তার স্বামীর নাম ধীমান। ধীমানের বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালাজ, সকালেই এসেছেন। সুমিতা একমাত্র মেয়ে। গুণী মেয়ে। ধীমান খুবই ভাল ছেলে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। দুটি পরিবারই সম্পন্ন। উচ্চবিত্ত। মধ্যবিত্তের ঠুনকো নোংরামি থেকে মুক্ত। ছোট পাপ নেই। বড় পাপ কিছু থাকতে পারে। আবার বড় মানুষের পাপ, পাপই নয়। সেটা তাঁদের পুণ্য। যেমন পণ্ডিতেরা শব্দপ্রয়োগে ভুল করলে বলা হয় আর্ষ-প্রয়োগ। এই সুবিশাল নার্সিংহোমের বাইরে দুটি গাড়ি অপেক্ষা করছে। জানলা আঁটা অন্ধকার যেন অপেক্ষা করে আছে ঘটনার পরিণতি জানার জন্যে।

ধীমান ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। ধীমান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একটু জোর গলাতেই বলে ফেলল, 'বোগাস! আমি অন্য স্পেস্যালিষ্টের পরামর্শ নেবো। প্রয়োজন হলে মেডিকেল বোর্ড বসাবো।'

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই বেমানান লাগলো। সুন্দর এক স্তব্ধতাকে এভাবে চমকে দেওয়া ঠিক হয়নি। উত্তেজনায় সে অসভ্যতা করে ফেলেছে। না, ব্যাপারটা শুধু একজনের জীবনমৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ধীমান নিজের মান সম্মানকেও জড়িয়ে ফেলেছে এর সঙ্গে। ধীমান তার প্রযুক্তির ধারায় ভাবছে। সন্তানের জন্ম একটি দুর্ঘটনা বা ভাগ্য নয়। একটা টেকনোলজি। সেই টেকনোলজিতে সে কি এমন ভুল করে ফেলল, যার ফলে সুমিতার গর্ভে তারই সন্তান চলে গেল—দুরূহ কোণে! সে কি এক আনাড়ি ইঞ্জিনিয়ার! ইলেকট্রনিকসে তার এত সুনাম এই বয়সেই!

ধীমানের পিতাও এক নামী মানুষ। সেরা কলেজের সুখ্যাত প্রিনসিপ্যাল। তিনি ছেলেকে একটু তিরস্কারের গলাতেই বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি। চিৎকার করে মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ডক্টর মল্লিক ইন্টারন্যাশন্যাল স্পেশালিস্ট। তাঁকে অবিশ্বাস করা মানে তাঁকে অসভ্যের মতো ইনসাল্ট করা। তাছাড়া টাইম ইজ এ ফ্যাকটার। এটা আমেরিকা নয়, আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নই যে আধঘন্টায় বোর্ড বসিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা যাবে! বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় ধীমান। আপনি কি বলেন মিষ্টার ব্যানার্জি!'

ব্যানার্জি হলেন ধীমানের শ্বশুর। আই. এ. এস. অফিসার ছিলেন। এখন অবসর পেয়ে গেছেন। এক বেসরকারী সংস্থায় অ্যাডভাইসার হয়ে আছেন। ছেলে ব্যবসা করে বড়লোক। খানতিনেক গাড়ির মালিক। অর্থে, প্রতিপত্তিতে ধীমানদের চেয়ে অনেকটা উঁচুতে। সরকারী বড় চাকরি ও অর্থ, ক্ষমতার অহঙ্কারে তাঁর কথাবার্তা বহুকালই একটু বেঁকে গেছে। বাংলা বলেন ইংরেজে উচ্চারণে, আর ইংরেজি বলেন বাঙালির উচ্চারণে।

ব্যানার্জি বললেন, 'আঃ সিওর। এখানে মাথা হল একটা গ্রেট ফ্যাকটার।'

ধীমানের শ্যালক, অরিন্দম যে তিরিশ বছর বয়সেই মিলিয়নিয়ার, সে বললে, 'অলরেডি দশ মিনিট চলে গেছে। সেকেণ্ড ওপিনিয়ান যখন নেবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই, তখন ডিসিশান একটাই, কিল দি বেবি, অ্যাণ্ড সেভ দি মাদার।'

ঘরের বাতাস যেন আলকাতরার মতো থকথকে হয়ে গেল হঠাৎ। সিলিং ফ্যান ফিন্‌ফিন্‌ করে ধারালো ব্লেডের মতো বাতাস ছড়াচ্ছে। আজ শহরে বেশ একটু বৃষ্টি হওয়ায় উত্তাপ পাঁচ-সাত ডিগ্রি নেমে গেছে। সকালেরই একটু শীত শীত ভাব।

ধীমান বললে, 'তা কেন? হত্যার অধিকার কে দিয়েছে আমাদের! সন্তান হল ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ আমরা মেরে ফেলবো?'

অরিন্দম বললে, 'আমি ঠিক এই সন্দেহটাই করেছিলুম। তুমি এই কথাটাই বলবে। তুমি তোমার অফিসের এক মারাঠী মহিলার সঙ্গে ইনভলভড, সে খবর আমাদের কাছে এসেছে। তোমার সামনে এই এক সুযোগ। সুমিতাকে সরাতে পারলে তোমার পথ পরিষ্কার।'

ধীমান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অরিন্দমের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'নার্সিংহোম না হলে আমি এই নোংরা কথার জবাব এখুনি তোমাকে অন্যভাবে দিতুম।'

ধীমানের শ্বশুর ব্যানার্জি বললেন, 'সে আবার কি? শুনিনি তো! সাথমিং ফিসি'।'

অরিন্দম বললে, 'আজকাল এইটাই ফ্যাশান হয়েছে বাবা। বাঙালির পুরোনো স্বভাব আবার ফিরে এসেছে। ঘরে এক বাইরে এক। ওসব তুমি বুঝবে না।'

ধীমানের বাবা বললেন, 'আলোচনাটা অবনক্সাস দিকে চলে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে ওই আলোচনা চলে না। এবাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির ফাটলটা ক্রমশই বাড়ছে। ধীমানের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগের কোনও বেস নেই। বেসলেস অ্যালিগেশান! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ধীমান কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় বউ-কাতর। সময় সময় আমরাই তাকে স্ত্রৈণ বলি। ও বেচারা দু'তরফেরই মার খাচ্ছে।'

ধীমানের মা বললেন, 'ইদানীং ওঁদের বেশ টাকার অহঙ্কার হয়েছে। আর টাকা থাকলে যা হয়, যাকে যা খুশী তাই বলা যায়।'

সুমিতার মা ছিলেন নামকরা এক স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। এখনও তাঁর চেহারাটি জাঁদরেল। গম্ভীর মুখ। গোটা পৃথিবীটাকেই তিনি মনে করেন, নিজের স্কুল। সেই মন নিয়েই বলেন, 'আমরা কেউ রামকৃষ্ণ নই। টাকা আছে তাই টাকার অহঙ্কারও আছে। আপনারা তো মেয়েটাকে একটা থার্ডক্লাস নার্সিংহোমে ফেলে রেখেছিলেন। কৃপণরা যা করে থাকে। আমরাই এখানে এনেছি। প্রশ্ন হল, আমার মেয়ের এই অবস্থার জন্যে কে দায়ী। কারা দায়ী! আপনারা! নেগলেক্ট করেছেন। প্রপার চেক-আপ হয়নি। কৃমিন্যাল নেগলিজেন্‌স। মেয়েকে আপনারা সবাই মিলে যে টর্চার করেননি তাই বা কে বলতে পারে! আমার মেয়ের যদি কিছু হয়; তাহলে আমি সোজা থানায় যাবো। আপনাদের সব কটাকে আমি জেল খাটাবো।'

ধীমানের মা হঠাৎ বলে ফেললেন, আ মোলো। বসে বসে তিলকে তাল করছে দেখো।

ধীমানের মা তেমন আধুনিকা নন। জেলা শহরের মেয়ে। সহজ, সরল, আন্তরিক। মনে তেমন প্যাঁচও নেই। আধুনিক জগতের খবরও তেমন রাখেন না। সোজাসুজি কথা বলার সময় গ্রাম্য শব্দ বেরিয়ে আসে।

সুমিতার মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই তো ও-বাড়ির কালচার! বস্তির ভাষায় সব কথা বলে।'

সুমিতার বাবা বললেন, 'এঁদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। মেয়েটাকে আমার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি।'

ধীমান একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছে সব। সত্য কি ভাবে বিকৃত হয়! সুমিতার সঙ্গে, তার কি সম্পর্ক, তার মা, বাবার কি সম্পর্ক, তা একমাত্র সুমিতাই জানে। সে কিন্তু এই মুহূর্তে উঠে এসে প্রতিবাদ করতে পারবে না, কারণ সে অসহায়! ধীমান ভেবে পেল না, কেন সে হঠাৎ অমন একটা কথা বলে ফেলল! সত্যিই কি সে চায় না সুমিতা বাঁচুক! অবশ্যই চায়। আবার এটাও ভাবতে পারছে না, নিষ্পাপ একটা প্রাণকে সার্জেনের শিক্ষিত চিমটে হত্যা করে ফেলেছে! কে বলতে পারে কালে সেই প্রাণটি এক মহাপ্রাণ হয়ে উঠত না! চৈতন্য, বুদ্ধ, কি যীশু কি আইনষ্টাইন! আবার প্রবাদেই আছে, এক স্ত্রী মারা গেলে, আর এক স্ত্রী পেতে কতক্ষণ? স্ত্রী পুরনো হয়ে আকর্ষণ হারায়। জীবন্ত ফার্নিচারের মতো জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সন্তান এক অসীম সম্ভাবনা। চারা গাছের মতো। ভবিষ্যতের মতো। যত বড় হতে থাকে, ততই কৌতূহল, কি হয়, কি হয়। সেই আশাতেই তো মানুষ বাবা হয়।

অরিন্দম বললে, 'মেয়ে আমাদের, সিদ্ধান্তও আমাদের। কিল দি বেবি সেভ দি মাদার।'

ধীমানের বাবা বললেন, 'সে আবার কি? মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর সব মেয়েই শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি। তার টাইটেল পর্যন্ত পালটে যায়। এইটাই তো হিন্দু আইন আপনাদের সিদ্ধান্ত নেবার তো কোনও অধিকার নেই। সিদ্ধান্ত নেবে স্বামী। নেবে ধীমান।'

মিস্টার ব্যানার্জি, সারাটা চাকরিজীবন যিনি কানের কাছে শুনে এসেছেন, ব্যানার্জি সায়েব আর স্যার স্যার সম্বোধন, তিনি ফুঁসে উঠলেন, 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টটা তাহলে আমাকে একবার দেখতে হচ্ছে। মেয়ে শ্বশুরের সম্পত্তি না, বাপের সম্পত্তি। মেয়ে কি ছাগল? আমরা খাইয়ে দাইয়ে শিক্ষিতা করে কষাই শ্বশুরের হাতে তুলে দেবো!'

ধীমানের বাবা বললেন, 'আপনার সরকারী চাল ছাড়ুন। আমি মনুসংহিতা খুলে দেখিয়ে দেবো মেয়ে কার! আর আমাকে কষাই বললেন তো? আপনি কী! সারা জীবন পরের পয়সায় মদ গিললেন, ঘুষের টাকায় বাড়ি হাঁকালেন। আপনারা ক'দিন এসে মেয়ের খবর নিয়েছেন?'

ব্যানার্জি বললেন, 'আ গেলো! লোকটা বড় অসভ্য তো? আনসিভিলাইজড ব্রুট।'

অরিন্দম বললে, 'এর জবাব আমরা দেবো। একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিলেই ঠাণ্ডা।'

ধীমানের মা বললেন, 'আমি, আ মোলো বলেছিলুম. আপনারা কিন্তু আ গেলো বললেন!'

সুমিতার মা বললেন, 'আ মোলোর চেয়ে আ গেলো অনেক বেটার।'

ছিপছিপে, বুদ্ধিমতী মেয়েটি হল অরিন্দমের স্ত্রী। সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললে, 'আপনাদের সকলেরই দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুমিতার মা, মেয়েটির শাশুড়ি অমনি বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তার মানে ? যত বড় মুখ না তত বড় কথা ! মুখ সামলে বউমা।'

অরিন্দম লাফিয়ে উঠল, 'কেন মুখ সামলে কেন ? ওর কি নিজস্ব কোনও ওপিনিয়ান থাকতে নেই। তুমি কি ভাবো ও তোমার বাড়ির ঝি-চাকর !'

সুমিতার মা অমনি স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে আমি কি বলেছিলুম, বউয়ের ভেড়া হয়ে গেছে। বড়লোক শ্বশুর হলে এইরকম হয়। বাপ মা পর হয়ে যায়। তখন বিশ্বাস করো নি। আজ এতগুলো লোকের সামনে এই অপমান সহ্য করো। আমরা নাকি পাগল ! মেয়ের বয়সী মেয়ের ঔদ্ধত্যটা একবার দেখো। এরা হল কুকুরের জাত। লাই দিলেই মাথায় চড়ে।'

ব্যানার্জি বললেন, 'আমার বাবা, মা-ও তোমার সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলতেন।'

সুমিতার মা বললেন, 'ও তাই না কি ? তাই আজ ছেলের বউকে দিয়ে সকলের সামনে অপমান করাচ্ছ। দেখবো, দেখবো, তোমার ছেলের বউ শেষ পর্যন্ত তোমাকে কেমন আদর করে !'

অরিন্দমের স্ত্রী বললে, 'আপনি তো আজকাল মা খুব কথামৃত পড়েন। সেখানে পড়েছেন নিশ্চয়, রজ্জুতে সর্পভ্রম। আসলে আমি একটা নিরীহ দড়ি। আপনি ভুল করে আমাকে বিষধর সাপ ভাবছেন !'

ব্যানার্জি বললেন, 'পড়লে কি হবে ! মনের কোনও উন্নতি নেই। সেও ওই ঠাকুররেই কথা—পাঁজিতে বিশ আড়া জলের কথা লেখা আছে, নিঙড়োলে এক ফোঁটাও বেরোবে না।

ধীমান বললে, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে।'

তরুণী বললে, 'সিদ্ধান্ত তো হয়েই গেছে। গাছ আগে না ফল আগে ! গাছ বাঁচলে ফলের কি অভাব ! তা ছাড়া একালের হিসেবীরা তো পরিবার ছোট রাখবার জন্যে হামেসাই অ্যাবরশান করায় হাসতে হাসতে। বিবেকের কোনও প্রশ্নই শোনে না। স্বার্থের অপর নাম মানুষ। আপনি অত ভাবছেন কেন ? এ তো অকারণে নয়, মহৎ এক কারণে ! একটু সখে থাকার জন্যেই যখন আকচার হচ্ছে, কারণে হতে আপত্তি কি ? আপনি কি দিদিকে ভালবাসেন না ?'

ধীমান স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ভালবাসা এমন এক শব্দ যে ভালবাসি বললেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, রজনীগন্ধার পোকার মত। ধীমান বুঝতে পারছে, কিছু বলতে গেলেই গলাটা ধরা ধরা শোনাবে। এইসব অবিশ্বাসী কুচুটে লোকগুলোর সামনে সে তার আবেগ প্রকাশ করতে চায় না।

তরুণী বললে, 'যান, গিয়ে বলে আসুন।'

ধীমান সেই দরজাটার দিকে এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। বাইরে থকথকে রাত। সামান্য বাতাসও নেই। প্রকৃতি যেন এক মহাযোগীর মতো কুম্ভক করে বসে আছে। দরজার মাথায় লাল আলোর সঙ্কেত। ধীমানের অনেকটা পেছনে ছটি চরিত্র। একটু ছাড়া ছাড়া। সকলেই অল্পবিস্তর আহত। তাঁরা হাঁটছেন থমকে, পায়ে পায়ে। ধীমান পৌঁছবার আগেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। একটি শিশুর তীব্র চীৎকারের

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সাদা সার্জেন। এক ঝলক ঠাণ্ডা ধীমানের মুখে এসে লাগল।

পেছন থেকে ছুটে এল নারীকণ্ঠ, 'যাঃ, মেয়েটাকে মেরে ফেললে।'

কান্নার শব্দে ধীমানের ভেতরটা নেচে উঠেছিল। পরমুহূর্তেই ভয়ে তার চলা বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে। ঈশ্বরের মুখ না কোনও জল্লাদের। দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, দীর্ঘদেহী সার্জেন। সাদা অ্যাপ্রন নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। বুকের কাছে পড়ে আছে চেনঝোলা চশমা। মাথার ওপর লাল আলো। হঠাৎ কোথা থেকে একচুমুক বাতাস এসে তাঁর চুলে দোল খেয়ে গেল। থমকে গেছে ধীমান। ধীমানের পেছনে ছটি চরিত্র।

ডাক্তারবাবু ডান হাত তুলে বললেন, 'ভয় নেই। দু'জনেই সেফ। অসাধ্য সাধন করা গেছে। তবে!' তিনি থেমে গেলেন। ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

সাতটি কণ্ঠের এক সঙ্গে একই প্রশ্ন—'তবে?'

ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে সামনে লাইটার ধরালেন। বাঁ হাতের আড়ালে শিখা জ্বলে উঠল। এক ভলক ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার বললেন, 'তবে আর কোনও বাচ্চা হবে না। ওই একটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

পেছন থেকে প্রশ্ন, 'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে।'

'কত পাউণ্ড?'

'সিক্‌স।'

'সুন্দর?'

'সুন্দর।'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে আসছে একটি ট্রলি। সাদা চাদরে ঢাকা। সবাই একপাশে সরে গেলেন। সুমিতা তার বেডে ফিরে চলেছে অ্যানেসথেসিয়া এখনও জড়িয়ে আছে! ধীমানের মনে হল সুমিতার ঠোঁটের কোণে লেগে আছে একঝিলিক হাসি। পেছন পেছন চলেছেন সিস্টার। তাঁর দু হাতে সাদা তোয়ালে জড়ানো এতটুকু একটা মানুষ। লাল টকটকে। ছোট্ট এতটুকু একটা বাতাবি লেবুর মতো মুখ। মিছিলটা করিডরের ও প্রান্তে হারিয়ে গেল। যেন কোনও চার্চের শোভাযাত্রা। ফাদার বয়ে নিয়ে চলেছেন পবিত্র ক্রশ।

ডাক্তারবাবু পাশের দাঁড়ানো অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কাল সকালে।'

সাতটি চরিত্র এক হয়ে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ ব্যানার্জি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা এরকম করলুম কেন?'

ধীমানের বাবা বললেন, 'স্নেহে।'

ধীমান বললে, 'ভোলা যাবে!'

অরিন্দম বললেন, 'অবশ্যই যাবে। সবাই জানে জঙ্গল খুবই সুন্দর, কিন্তু বাঘ, ভাল্লুকও কিছু থাকে। মানুষ হল সেই অভয়ারণ্য। আমাদের কথাই হল, ধারালো নখ

আর দাঁত।'

দুই বেয়ানে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। দুধসাদা আলো।

সবাই যে যার গাড়িতে উঠে বসার আগে বললেন, 'মিষ্টিমুখ পাওনা রইল।'

দুটো গাড়ি চলে গেল দু'দিকে বাঁক নিয়ে। দু'সার গাছের মাঝে পড়ে রইল নির্জন পথ।

ফল্গু

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় আড় হয়ে কি একটা বই নাড়াচাড়া করছি। আজকাল এইরকমই হয়েছে। কি খাচ্ছি, কি পড়ছি, কিছুই আর তেমন খেয়াল থাকে না। খেয়াল করিও না। কিছুটা অভ্যাস, কিছুটা সংস্কার এই ভাবেই জীবন চলছে। অভ্যাসে বাজার যাই। অফিসে ছুটি। সংস্কারে বই টেনে নি। পাতা ওল্টাই। বয়েস বেড়ে গেছে। চোখের তেজ কমেছে। তেমন দেখতে পাচ্ছি না। উঠে গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসবো, সে শক্তিও যেন নেই। রোজই ওইরকম হয়। দু'চার পাতা নাড়াচাড়া করতে না করতেই শরীর খ্যাস করে নেতিয়ে পড়ে। রোজই এই সময়টায় আমার এক সমস্যা হয়—কে মশারি খাটাবে! আমি না আমার বউ। এদিকে সাংঘাতিক মশার উপদ্রব। মশারি ছাড়া এক মুহূর্ত শোবার-উপায় নাই। আর রোজ রাতেই এই মশারিপলিটিক্স হয়। বউ বলবে—'চারটে কোণ খাটিয়ে তুমি শুয়ে পড় আমার সৃষ্টি কাজ পড়ে আছে, আমার অপেক্ষায় থেকো না, গতরটা একটু নাড়াতে শেখো।' এই গতর শব্দটা শুনলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। মেয়েদের জগতের বিশ্রী একটা শব্দ। অশ্লীল তো বটেই। আজ আমি অপেক্ষায় আছি। কাল, পরশু, তার আগের দিন, পর পর তিনদিন আমি মশারি খাটিয়েছি। আজ আর আমি নেই। মরে গেলেও নেই। বইটার পাতা ওল্টাছি আর মনে মনে বলছি—এ লড়াই জিততে হবে। আজ আর আমি নেই। আর ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে চিৎকার 'এলিয়ে না থেকে মশারিটা ফেলে চারপাশ ভাল করে গোঁজো। জীবনে একটা কাজ অন্তত ভালো করে করতে শেখ।'

'পরপর তিন দিন আমি মশারি ফেলেছি, আজ আমি মরে গেলেও ফেলবো না?'

'তাহলে মরো, মশার কামড় খেয়েই মরো। যখন ম্যালেরিয়া হবে তখন বুঝবে ঠেলা।'

'হলে তোমার আমার একসঙ্গেই হবে, এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হয় না!'

'ওই আনন্দেই থাকো, মেয়েদের ম্যালেরিয়া হয় না। হলে অম্বল হয়, বাত হয়, পিত্তপাথুরী হয়। স্বামীদের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়।'

'আচ্ছা।' আমি সুর টানলুম।

হাওয়া বইছে এলোমেলো। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার সময় আমি আর ফাটা কাঁসি নিয়ে তরজা শুরু করতে চাই না। এ-পাড়ায় আমার একটা সম্মান আছে। অনেকেই প্রণামট্রণাম করে। বাড়ির লোক ঝ্যাঁটা মারলে কি হবে, বাইরে আমার অল্প বিস্তর

খাতির। একসময় ভালো ফুটবল খেলতুম, ফরোয়ার্ড লাইনে। সেকালে ফুটবলের তেমন কদর ছিল না, একালের ছেলেরা তো বল পাগল। সেই কারণেই অতীতের গোলোন্দাজ হিসেবে একালে আমার খাতির। আমার পায়ে বল মানেই গোল। এই তো গত দুর্গা পুজায় পাড়ার ক্লাব আমাকে সম্বর্ধনা জানালে। একটি টিনের ট্রে, তার উপর ছোট সাইজের একটা নারকোল, ছোট বাক্সে চারটে সন্দেশ। সে যাই হোক, শ্রদ্ধা ভালবাসার কোনও মূল্য হয় না। গলায় একটা রজনীগন্ধার শুকনো, শুকনো মালা পরিয়ে দিল ছোট টুলটুলে একটা মেয়ে। মালাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম। একেই বলে মহানুভবতা। লোককে দেখানো, আমি কতটা নির্লোভ, নিরহঙ্কারী। সবার আগে একটি বড় মেয়ে প্রদীপ দিয়ে আমাকে বরণ করেছিল। মেয়েটি মনে হয় আমার ব্যক্তিত্বে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তা না হলে আমার গোঁফে ছ্যাঁকা দিয়ে দেবে কেন? আমার এক গোছা ঝোলা ঝোলা গোঁফ পড়পড় করে পুড়ে গেল। সে যাক, দোষটা আমারই। একালে কেউ অত বড় গোঁফ রাখে না। সেই যে আমি গোঁফ কামালুম, এখন আমার ঠোঁট সাফ। বয়সটাও যেন অনেক কমে গেছে। আগে অচেনা লোক মাত্রই কিছু জিজ্ঞেস করার হলে কথা শুরু করতো হিন্দীতে এখন বাংলাতেই করে। সভার সভাপতি মহাশয় গলায় একটা পাটকরা মাদ্রাজী চাদর পরিয়ে দিলেন। আমাকে আবার দু'চার কথা বলতে হল। আমি বলেছিলুম—ফুটবলই আমাদের জীবন। দুটো পা যেন স্বামী-স্ত্রী জুটি ; আর বল হল গোল, মানে বিশ্ব। এই বিশ্ব হল স্বামী-স্ত্রীর খেলা। ঠিক বোঝাবুঝি, মেলামেশা হল তো, খেলা হয়ে গেল কবিতা। দুটো পায়ের আণ্ডারস্ট্যাডিংই হয় খেলোয়াড়ের সাফল্যের মূল কথা। উঃ সে কি হাততালি। তিন মিনিটে হিরো। অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে শখানেক তরুণ তেড়ে এল। যার খাতা নেই সে এগিয়ে ধরল, ঠোঙা। মনে হয় বাদামটাদাম খাচ্ছিল। সই করতে করতে আমার জান কয়লা। ফড়াক ফড়াক ছবি তুললেন ফটোগ্রাফার। এক নেতা এসে বললেন—নেকস্ট ইলেকশানে আমরা আপনাকে পার্টির টিকিট দোবো। যদি জিততে পারেন, যদি আমরা মিনিস্ট্রি ফর্ম করতে পারি, জেনে রাখুন আপনি হবেন ক্রীড়া-মন্ত্রী। আমি সেই গ্যাস খেয়ে বাড়িতে এসে একটা উলটো-পালটা করে ফেললুম। মন্ত্রীদের মতো মেজাজ দেখাতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়। আমার একমাত্র স্ত্রীর সঙ্গে একমাস বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। টিনের ট্রেটা দেখে বলেছিল, আজকাল এক প্যাকেট বড় সার্ফ কিনলে ওই রকম ট্রে ফিরি পাওয়া যায়। চাদরটা দেখে বলেছিল, ব্যান্ডেজ হিসেবে ভালই। নারকেলটা হাতে নিয়ে বলেছিল, একটা মোচা নিয়ে এলে ছোলা দিয়ে ঘন্ট করা যাবে। সম্বর্ধনার নারকেলে কি ঘন্ট করা উচিত। এই সংশয় আমার ছিল। এতো ভাবের নারকোল। ভালবাসার উপহার। ভালবাসার ঘন্ট হবে ! মোচার দাম কম নয়। এরপর সম্বর্ধনায় যাঁরা নারকোল দেবেন, তাঁরা যদি একটা করে মোচাও দেন তো বেশ হয়। আমার বউ আবার হিসেব করে ছেলেকে বুঝিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে তার বাপের কী রকম ভীমরতি ধরেছে, একশো একটাকা চাঁদা কানমলে নিয়ে গিয়ে কুড়ি টাকার মাল ঠেকিয়েছে, পরের বছরের জন্যে গলায় পরিয়ে দিয়েছে ব্যান্ডেজ। গামছার সিম্বল। ওরে আমার বড় পেলোয়াররে ! সারা রাত বাতের যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করে। তিন পা হেঁটে সাতবার হাপরের মতো হাঁপায়।

যাক, যারা আমার গৌরবোজ্জ্বল অতীত দেখতে পায় না, দেখলেও দেখতে চায় না, তাদের আমার কিছু বলার নেই। বাঙালি ইতিহাস বিমুখ জাতি, আমরা সবাই জানি। এরা হৃতিহাস বলতে বোঝে আকবর বাদশার ইতিহাস। সিনেমার 'ফ্লাশব্যাক' দেখবে, একটা জ্যান্ত মানুষের ফ্লাশব্যাক শুনবেও না, বিশ্বাসও করবে না। আমাদের যেন অতীত থাকতে নেই। আমরা সব বর্তমানের সরীসৃপ। আবার বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম। এবার মলাটে চোখ পড়ল। র‍্যাক থেকে ভাল বইই টেনেছি—গীতা মাহাত্ম্য। এই বয়েসে যে বইয়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার, সব ছিরি তো দেখছি। কতদিন ভাবি সন্ন্যাসী হয়ে কেটে পড়ব, পারি না। অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু মাত্র বাথরুমের ভয়ে। গৃহত্যাগের সময় নিজের বাথরুমটাকে তো আর নিয়ে যেতে পারবো না। যত্রতত্র আমার পোষায় না। ঘেন্না করে।

দরজার কাছ থেকে আমার রাখবালের একটু চড়া গলা শোনা গেল—'কি হল মশারির চারটে কোণ আর দয়া করে খাটাতে পারছ না, গতরটা একটু নাড়াও। না পরের গতরে যতটা হয়ে যায়!'

আবার সেই অশ্লীল শব্দটা। উঠে বসলুম। গতর বললেই, লুঙ্গি পরা, বিশাল ভুঁড়ি আর পাছাঅলা একটা নির্বোধ ভোগীর চেহারা ভেসে ওঠে। বিছানায় শুয়ে যারা মিঠি মিঠি গলায় গুন গুন করে ডাকে, 'কই গো, কই গো, তোমার হল।' বউ তোলানো পার্টি। আমি সর্ব অর্থে তার বিপরীত। জীবনে বউকে হ্যাঁ গা, কই গা, শুনছো বলিনি। সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্ট্রেটকাট কথা। পায়ে বল নাও, ছ'বার ড্রিবল করে ঢুকিয়ে দাও নেটে। আর তাকাতাকি নেই, ফিরে এসো মাঝ মাঠে। আমার গুরু আমাকে জপের মন্ত্র দিয়েছিলেন, 'অ্যাটাক, অ্যাটাক'। আমি ঝাঁজেই বললুম :

'দ্যাখো গতর বলবে না। গতর হয় মেয়েদের। আমার মতো খেলোয়াড়দের হয় ফিগার। আমার একেবারে কণ্ডির মতো শরীর। মশারি আজ আমি খাটাবো না, খাটাবো না, খাটাবো না। দিস ইজ নট মাই জব।'

'খাটিয়ো না, খাটিয়ো না।'

গলা নয় তো গোলা। একেবারে সংলগ্ন বাড়ির প্রতিবেশী মশারি ফেলা অন্ধকার ঘর থেকে দাবড়ে উঠলেন, 'আয় চোপ।' ভদ্রলোক সূর্য ডোবার পর থেকেই চড়াতে থাকেন। এখন তিনি পুরো চড়ে আছেন। আমি কিছু মনে করলুম না। জানি সকালেই তিনি বিনীত গলায় বলবেন—'কি দাদা, বাজারে চললেন' আমরা জানি, মাতালে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

আমার ছেলে। ওই একটি মাত্রই ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—'আশ্চর্য, দিন দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে।' বলেই সরে পড়ল। সবে প্রেম করে বিয়ে করেছে। মৌতাতে আছে। নতুন বউমা বিয়ের পর দিন-সাতেক মশারি খাটিয়ে পরিপাটি বিছানা করে শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা করেছিল। তারপর শোনা গেল স্পন্ডিলোসিস হয়েছে। হাতের খিল জ্যাম হয়ে গেছে। ওপর দিকে আর উঠছে না। যা পারছে তলার দিক থেকে সব হাতড়ে নিচ্ছে। মানুষের কপাল মন্দ হলে যা হয়। কে কাকে সেবা করে! এখন বধূ আর পুত্রবধূ দুজনের সেবা করে প্রারব্ধ ক্ষয় করি। ছেলে তো বিয়ে করেই

দায় সেরেছে। একালের ছেলেদের তো কোনও কর্তব্যবোধ নেই। প্রেম করার সময় খিদমত খাটতো তা আমি জানি। তখন মাছ খেলছিল, এখন মাছ জালে। আর তো কোনও ভয় নেই। এখন খাওদাও আর বগল বাজাও। নিধিকেষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াও।

পাখার স্পিড বাড়িয়ে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। প্রথমত রেগে আছি, অভিমানে একেবারে টসটসে। দ্বিতীয়ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের হুল সে সহ্য করতে পারে, মশা তার কি করবে। সেই আছে না, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়! নিদ্রাতেই মানুষের সব দুঃখের অবসান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত কত তা জানি না। ঘরে গুমোট গরম। পাখা বন্ধ। কানের কাছে ঝাঁক ঝাঁক মশার কালোয়াতি। রাস্তার আলো শোওয়ার আগে জ্বলছে দেখেই শুয়েছি। এখন চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মানে লোডশেডিং। মেঝেতে আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা একটা লাশ পড়ে আছে। আমার পঁচিশ বছরের প্রাচীন অভিমানী বউ। যত বয়েস বাড়ছে, তত মেদ বাড়ছে, তত বাড়ছে রাগ আর অভিমান। এইটুকু বুঝলুম ইলেকট্রিক সাপ্লাই চলে বউদের নির্দেশে। তা না হলে ঠিক এইসময়ে লোডশেডিং হবে কেন? আমাকে অন্যায় রণে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। যেমন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা বসে গেল।

যাই হোক সামান্য একটু যা ঘুমিয়েছি তাইতেই আমার রাগ জল হয়ে গেছে। আমি খাটে, বউটা আমার মেঝেতে। মনটা গুমরে উঠল। আহা পরের মেয়ে! বাপ নেই, মা নেই। মেরেছো কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না। খাট থেকে অন্ধকারে ঠাহর করে করে নামলুম। তারপর খুঁজে খুঁজে গোলগোল হাত দুটো ধরে তোলার চেষ্টা করলুম। ও বাবা, এ যেন এক পেল্লায় বোয়াল মাছ, পিছলে যায়। একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ। আবার আমার রাগ চড়ছে। কি উঠবে না। মার টান। হেঁইয়ো, মারি হেঁইয়ো, আউর থোড়া হেঁইয়ো, বয়লট ফাটে হেঁইয়ো ঘাস বিচুলি হেঁইয়ো। হাতখানেক তুলি তো, খ্যাস করে শুয়ে পড়ে। আমার বউ যে এত ভারি জানা ছিল না। যেন জগদ্দল পাথর। বোম্বে ছবির নায়িকা হলে হিরোর ভাত মারা যেত, কারণ একটা দুটো সিন এইরকম থাকতোই যেখানে নায়ক নায়িকাকে দু'হাতে পাঁজা কোলা করে তুলে বনের ধারে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে আর গাইছে—মেরা পেয়ার ঝুলতা রহে, ঝুমঝুম। বোম্বে ছবির নায়করা তো সব প্রেমে আধপাগলা মতো হয়ে যায়। তা এই নায়িকাকে কে তুলবে। এক গব্বর সিং পারতে পারে। যাই হোক আমার রোক চেপে গেল—কি? স্বামী হয়ে স্ত্রীকে খাটে তুলতে পারবো না। কত ছোবড়ার ওজনদার গদি আমি তুলেছি একা। অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান ওয়েট লিফটারদের স্মরণ করে, মারলুম আর এক টান। চাগাবার চেষ্টা করলুম। আর তখনই বুকের ডানপাশে যেন ওয়ার্লর্ড হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানের এক ঘুসি পড়ল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে এল শরীর। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা যেভাবে স্লো-মোশানে রিং-এর মধ্যে পড়ে যায় আমিও সেই ভাবে পড়ে যেতে যেতে বললুম—'যাঃ সুধা, তুমি বিধবা হলে। হার্ট-অ্যাটাক।' আর কোনো বড় কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই। উঃ হৃদয় আটকে গেলে, মানুষের কি যে হয়। কোথায় লাগে রেল রোকো, বাংলা বন্ধ। হৃদয় বন্ধের মতো কিছু নেই।

চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছি। শরীর অবশ। দম পড়ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। একটু

বাতাসের জন্য মানুষের কি ছটফটানি। আমার বউ এতক্ষণ জেগে জেগে মশকরা করছিল। বিধবা শব্দটায় চাঁদমারি হল। আচ্ছন্ন চেতনা নিয়েই বুঝতে পারছি, অন্ধকারে উঠে বসেছে। প্রথম প্রথম বিধবা হতে সকলেরই ভয় লাগে। ওই অবস্থাতেই নিজেকে হিরো মনে হচ্ছে। ফেলেছি তুরুপের তাস। খেলো, নন্দিনী, খেলো। আমি রামায়ণের রাম। আবার এ-ও মনে হচ্ছে—চলে যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে। আবার একটা গানের লাইনও মনে পড়ছে—সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী। মরে যাবার সময় মানুষের কত কি মনে পড়ে। মনটাও ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। ভীষণ ভালবাসা পায় মনে।

আমার বউ আমার বুকে ভর রেখে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। যেন বারান্দার রেলিং-এ হাতের ভর রেখে রাস্তার লোক দেখছে। বেশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলে—'কোথায় রেখে 'ছা ?'

এই সময় এই প্রশ্নের একটাই অর্থ, পাশবই, চেকবই, সেভিংস এইসব রেখেছো কোথায় ? তুমি তো চললে। সেখানে গিয়ে তো আর ভুড়ুম ঠুকতে পারবো না। তখনও আমার একেবারে বাক্যরোধ হয়ে যায় নি। অস্পষ্ট হলেও স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। আমি কোনও রকমে বললুম 'ভেবো না—তুমিই নমিনি, কাগজ পত্র, চেকবই, পাসবই সবই আলমারির লকারে আছে। চাবিটা আছে মাটির যে গোপাল মূর্তি তার ভেতরে। রুমালে জড়ানো।' এরপর আর আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরুলো না, গোঁ করে উঠলাম—আমার বউ বললে—'যাও তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলবো না, মানুষকে কেবল তোমার কামড়ানো স্বভাব।' আমি মনে মনে বললুম—হায় রে। এখনও তুমি বুঝলে না আর হয় তো পনেরো মিনিট পরেই তোমাকে প্রথামতো ডুকরে কেঁদে উঠতে হবে। তুমি ভাবছো আমি বোধ হয় অভিনয় করছি, তা কিন্তু নয়, একেই বলে হার্ট অ্যাটাক ! অব্যর্থ পরোয়ানা।' ভাবলুম, কিন্তু বলতে পারলুম না কিছু। কোঁক, কোঁক শব্দ হল কয়েকবার। তখন আমার বউ সরে এসে বললে, 'তোমার সেই অম্বলের ওষুধটা কোথায়। অফিসে আজ কি গিলে মরেছিলে। হার্ট অ্যাটাক না হাতি ? একে বলে গ্যাস।

আমি বলতে চাইলুম—'পাগলি, সবাই গ্যাসই ভাবে। মরলে তবেই বোঝা যায় গ্যাস না করোনারি।' প্যাঁক করে একটা শব্দ বেরলো মাত্র। আমার বউ তখন উঠে আলো জ্বালালো। আমার দিকে তাকিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখছি সব। ছেলেকে ডাকছে। ভদ্রমহিলার হইহই করা স্বভাব। এমন ভাবে ডাকছে বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে। আমার ছেলের ঘুম সহজে ভাঙে ! তার ওপর সবে বিয়ে করেছে। এক সময় ছেলের গলা পাওয়া গেল। ঘুম জড়ানো, বিরক্তি মেশানো গলায় বলছে—'এত রাতে ডাক্তার, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—নার্সিংহোম ? গাড়ি পাবে কোথায় ? কোনওরকমে ভোর পর্যন্ত ম্যানেজ করো, তারপর যা হয় করা যাবে। বাবাকে তো চেনো ! তিলকে তাল করা স্বভাব। এর আগেও তো দেখেছো !'

মনে মনে বললুম, 'তাই না কি সোনা ! বাবারা বুঝি তোমাদের সেবার জন্যে অমর হবে। খালি ফুয়েল ঢেলে যাবে সোনা, আর তোমরা শুধু কপচে যাবে ! পাখি সব করে রব।'

তিন জোড়া পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চারপাশে বাবুরা এসে গেছেন। আমার ছেলে আবার জাত আমেরিকান। জিনস পরেই ঘুমোয়। উবু হয়ে বসতে পারছে না। এখুনি পেছন ফেঁড়ে যাবে। পুত্রবধূ আমার বুকের উপর হাত রেখে বারে বারে ডেকেই যাচ্ছে, 'বাবা, বাবা, ও বাবা!' যেন হার্ট অ্যাটাকের এইটাই চিকিৎসা, বাবা, বাবা করলেই হৃদয় খুলে যাবে।

আমার বউ বলছে, নিশ্চয় আজ ঘুগনি খেয়েছে। ঘুগনি দেখলে তো আর লোভ সামলাতে পারে না। আজ তো সোমবার। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। আজ ওদের অফিস ক্যান্টিনে ঘুগনির ডেট।

আমি সব শুনছি, আর মনে মনে হাসছি। অ্যাতো যন্ত্রণাতেও হাসি। কেন হাসবো না। ছেলেবেলায় কত আবৃত্তি করেছি—জীবন-মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য।

ছেলে বলছে—'এই অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে?'

'তা প্রায় আধঘন্টা।'

ছেলে আমার হেসে উঠল। 'আধঘন্টা। তাহলে জেনে রাখো ব্যাপারটা হার্টের নয়, পেটের। হার্ট হলে কি হত জানো, পাকা আমটির মতো, টুপ করে খসে যেত। এ তোমার ঘুগনি কেস। তলপেটে নারকেল তেল, সাবান আর জল মিশিয়ে ডলতে থাকো। পায়ের তলায় নখ দিয়ে কুড়ু কুড়ু করে দ্যাখো তো।'

আমার বউ বললে, 'মাগো, সাতজন্ম পায়ে সাবান দেয় না, ওই পায়ের তলায় আমি মরে গেলেও হাত দোবো না।'

মনে মনে বললুম—'পিটপিটে বামনী, এখুনি মরলে ওই পায়েই তো আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলবে।'

ছেলে বললে, 'তোমার আবার বেশি বেশি। আমি যে প্যান্টের জন্যে নিচু হতে পারছি না।'

বউমা বললে, 'আমি দেখছি।'

আঙ্গুলের বড় বড় নখ। সেই নখ নিয়ে আঁচড়াতে লাগল। আমি ঝড়ক করে পা টেনে নিলুম।

ছেলে বলল, 'বুঝেছি, এ তোমার মাকে টাইট দেবার চেষ্টা। থম্বোসিস হলে পায়ে কোনও সাড়া থাকতো না। চলে এস সুমিতা। ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, নিজেরাই ফয়সালা করে নিক!'

মনে মনে বললুম, 'ও হে ছোকরা, তোমার বউয়ের আঙ্গুলে যে ফ্যাশানের নখ, অ্যালসেসিয়ানকেও হার মানায়। ওই আঁচড়ে মরা মানুষও ঠ্যাং সরাবে বাপ। পায়ে সাড় থাকলে কি হবে, শ্বাস যে এদিকে বন্ধ হয়ে এলো। পালসটা দ্যাখো, বিট মিস করছে কি না!'

আমি তিনবার ব্যাঙের মতো কোঁক কোঁক করলুম। ল্যাভেণ্ডার পাউডারের গন্ধ উড়িয়ে নব দম্পতি বিদায় নিল। পড়ে রইলুম, আমি আর আমার বোকা বউ। পঁচিশ বছরের পোড় খাওয়া একটি জীব। কোথা থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে তলপেটে চেপে ধরল। ফ্যাঁস ফোঁস করে একটু কাঁদল। বউটার ধৈর্য-একটু কম। কোনও কাজ

একটানা বেশিক্ষণ করতে পারে না। এমনি মানুষটা বেশ ভালো, তবে অবুঝ। বয়েস হলে কি হবে, বালিকার স্বভাব! আমি চলে গেলে বুড়িটার কি হবে! ছেলের সংসারে আয়াগিরি করতে হবে। ভাবতে ভাবতে আমার চোখেই জল এসে গেল। আমার বউ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তুমি চলে গেলে আমি আত্মহত্যা করবো, মাইরি বলছি, আমি আত্মহত্যা করবো, আমার কে আছে বলো!'

তিন চার ফোঁটা চোখের জল টপাটপ আমার গালে কপালে পড়ল। আমি আমার অবশ হাত দুটো তোলার চেষ্টা করলুম। প্রথমে পারছিলাম না। পরে পারলুম। পারলুম মনের আবেগে। মন তো আর হৃদয়ে থাকে না। মেয়েটাকে আস্তে আস্তে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরলুম। রাতের ধরিত্রীর মতো ঠাণ্ডা শীতল একটি শরীর। ধীরে ধীরে আমার হাতের চাপ বাড়ছে কাছে টানছি, কাছে, আরো কাছে। আমার অর্ধ অঙ্গকে। অদ্ভুত এক অনুভূতি, যেন হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করছি। হাপুস কাঁদছে আমার বউ। আমি কথা বলার চেষ্টা করলুম। পারলুম। আমার বাক্য ফিরে এসেছে। বললুম, 'মাইরি বলছি, আমার একটা মাইলড্ স্ট্রোকই হয়ে গেল। আমি আজ ঘুগনি খাইনি, কিছুই খাইনি। স্রেফ তোমার জন্যেই আমার হৃদয়ের বাধা খুলে গেল।'

আমার বুকের ওপর বউয়ের মাথা। চুলের আর সে শোভা নেই। দেহে আর সে উত্তাপ নেই, কিন্তু চোখে অনেক জল এসেছে। ভেতরে একটা সমুদ্র তৈরী হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

আমাকে আঁকড়ে ধরে আমার চির বালিকা বউ ধরা ধরা গলায় বললে, 'বুঝতে পারো না বোকা!' আমার চোখের সামনে খেলে গেল অতীতের দৃশ্য, একটা গাছ, এক টুকরো জমি, সবুজ ঘাস, এক তরুণ আর তরুণী, কাঁধে মাথা হাতে হাত। অদৃশ্য এক স্টার্টার বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, শুরু হল চলা। আজও চলছি। কোথায় সেই লাল ফিতে। কত দূরে। মনে মনে আমার ছেলেকে বললুম—'কি প্রেম করিস তোরা? দেখে যা প্রেম কাকে বলে? চোখের জল ছাড়া প্রেম হয়!' একটা হৃদয় হলে আজ যবনিকা পড়ে যেত। দুটো হৃদয় মিলেছিল বলেই রয়ে গেলুম। থাকিনা আর কিছুকাল।

ফাটল

আর একটু পরেই সেসানস কোর্টের রায় বেরোবে। জজসায়েব কিছুক্ষণের জন্যে এজলাস ছেড়ে উঠে গেছেন। পাশে কোথাও কোনও ঘরে গিয়ে বসেছেন জুরিদের সঙ্গে পরামর্শে। কোর্টের নিয়মকানুন, আদব কায়দা, আমি বিশেষ কিছু বুঝি না, বুঝতে চাইও না। যেদিন মামলা ওঠে সেদিন পুলিশের কয়েদী গাড়িতে তুলে আমাকে আদালতে নিয়ে আসে। নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় কাঠগড়ায়। কাঠগড়ায় ঢোকার সময় খুলে দেয় হ্যাণ্ডকাফ। খটাস্ করে শব্দ হয় একটা! মুক্তির শব্দ! এই শব্দটা বেশ ভালো লাগে আমার। হাত দুটো

ভারমুক্ত হয়ে হালকা লাগে পাখির ডানার মতো। আমি বসে থাকি চুপচাপ। শুনতে থাকি দু'পক্ষের উকিল আমার জীবন নিয়ে কথার খেলা খেলছেন। আমার হাসি পায়, ঘুম পায়, ক্লান্তি লাগে, বিরক্তি ধরে যায়। আমি তো প্রথম দিনেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করে নিয়েছি, আইনের চোখে অবশ্যই আমি অপরাধী, নিজের বিবেকের চোখে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি খুন করেছি ? খুন করবো বলেই করেছি। যাকে খুন করেছি, তাকে মানুষের মতো দেখতে হলেও সে পশু ছিল। নর-পশু। আইনের চোখ যেহেতু মানুষের ভিতরটা দেখে না, সেইহেতু আমি দোষী, আমি খুনী। আইন মোতাবেক যে সোজা আমার প্রাপ্য, সেই সাজা আপনি আমাকে দিন ধর্মাবতার। অকারণ সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি আপনার কাজ সারুন, এই আমার প্রার্থনা।

জানুয়ারীর কত তারিখ ছিল সে দিন। পনের কি ষোল হবে। শহরের সব কাগজেই খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। কোনও কাগজে ছোট করে, কোনও কাগজে ফলাও করে। তারিখটা আমি ভুলে গেছি। ঘটনাটাও প্রায় ভুলে এসেছি। এখন যেন মনে হয় স্বপ্ন। আমি অন্ধকারে বিশাল বড় একটা পাথর তুলে দু'হাতের শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে ছুঁড়েছি। তিনটে শয়তানের একটা পড়ে গেল, আর দুটো অন্ধকারে নিমেষে মিলিয়ে গেল। আমি পড়ে থাকা শয়তানটাকে কষে একটা লাথি মারলুম। মারার সময় মনে হল পশুটা মরে গেছে। জামা কাপড়ের কি বাহার ! চেক চেক হাওয়াই শার্ট। ডোরা কাটা ট্রাউজার। কেয়ারি করা চুল। মাথাটা অবশ্য থেঁতো হয়ে গিয়েছিল। আমি ঘৃণায় থু থু করে তিনবার থুথু ছিটিয়ে দিলুম। বড় তৃপ্তি পেয়েছিলুম সে রাতে। মানুষ মারার আনন্দে বিভোর। অন্ধকারে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আমার মেয়ে রূপাকে পথের ধূলো থেকে টেনে তুলে দাঁড় করালুম। শয়তান তিনটে তার শাড়িটা প্রায় খুলে ফেলেছিল। ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। রূপা তখনও কাঁপছে। ডানপাশের গালে লম্বালম্বি একটা ক্ষত চিহ্ন। কথা বলার শক্তি নেই। আমি কোনও রকমে তার গায়ে শাড়িটা জড়িয়ে দিলুম। তখন বেশ রাত। বারোটা তো হবেই।

থানায় পুলিশ আমাকে ধমকেছিল। কেন আপনি মেয়েকে নিয়ে অত রাতে ওই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোষ তো মশাই আপনার। আমি অবশ্য পুলিসের কথায় কিছু মনে করিনি ; আর সেই আমার পুলিসের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি। জানাই ছিল পুলিস এইরকম বোকা বোকা কথা বলাতেই অভ্যস্থ। আমি বলেছিলুম, 'ব্যাপারটা এখন তিরস্কারের বাইরে চলে গেছে। ঘটনা ঘটেই গেছে যখন, তখন আপনাদের কাজ হবে অ্যাকসান নেওয়া।' ওসি অনিচ্ছার গলায় বলেছিলেন, 'ডায়েরি একটা করে যেতে পারেন, তবে না করাই ভাল। ধরা কেউ পড়বে না। আর যদি ধরাও পড়ে, সাক্ষী মিলবে না। আর যদি সাক্ষী মেলে আপনার মেয়েকে কোর্টে যেতে হবে। কেসটা কাগজে উঠবে। লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তখন লজ্জার এক শেষ। রাস্তায় বেরোলেই লোক পিছু নেবে। সুযোগ নেবে। কি দরকার মশাই। শাড়ি দিচ্ছি, বাড়ি চলে যান।'

রূপা আমার গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল। তার কথা ফিরে এসেছে। শরীরের কাঁপুনিও কমে গেছে। রূপা আমার কানে কানে বললে, 'বাবা, চলো আমরা বাড়ি যাই।' মুহূর্তের জন্যে মন দুর্বল হল আমার। কোনও অপরাধ করেছি কি না জানি না, ছেলেটা মরেছে

কি না জানি না তাও, ভেবেছিলুম অকপটে বলে যাবো আমি কি করেছি, বলা আর হলো না, পুলিসের জিপে চড়ে বাড়ি ফিরে এলুম। সারা রাত ঘুমোতে পারলুম না। ধরা দিতে গিয়েছিলুম পুলিসকে। তখন সাহস ছিল, পরে ভয় এসেছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমি এক হত্যাকারী। একবারও মনে এল না, যাকে মেরেছি সে দল বেঁধে এসেছিল আমার মেয়ের ওপর যৌন-অপরাধ করতে। আমার খুবই অবাক লেগেছিল, বাড়ির কেউই আমার কাজের প্রশ্রংসা করল না। বরং বলেছিল আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। সবাই আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতেই তাকাচ্ছিল, লোকে যে ভাবে একজন খুনীর দিকে তাকায়। সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। গোটা পরিবার অপরাধীর মতো বসে রইল আত্মগোপন করে। সকলেই কথা বলছিল ফিসফিস করে। প্রয়োজনের কথা ছাড়া কেউই একটাও বাড়তি কথা বলছিল না। আমাকে ঘিরে সবাই বসেছিল খাটে। বাইরে গাড়ির শব্দ হলেই সকলে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। খুন করার অভ্যাস না থাকলে মানুষের এই রকমই হয়। আমাদের পাড়ায় এমন তিন চারজন ছিল যারা একাধিক খুন করে বুক ফুলিয়ে বেড়াত। আমার পাঞ্জাবি আর পাজামার রক্তের দাগ লেগেছিল, দাগ লেগেছিল চটিতে। যত বলি রূপার রক্ত, কেউই বিশ্বাস করে না। আমার ছেলে কলেজে পড়ত। আমার চেয়েও বোঝে বেশি। সে মাঝরাতে পাঞ্জাবি পাজামা সব একটা বালতিতে ভরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে। তার জ্ঞান ছিল না, চারপাশ বন্ধ ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে কাপড় জামা আগুন ধরালে কি হতে পারে। ধোঁয়ায় সব অন্ধকার। কেরোসিনের তীব্র গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে আগুন নেবার আগেই পাশের ফ্ল্যাটের সবাই ছুটে এল 'বিমান বাবু।' আমরা ভয়ে তালগোল পাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা। শেষে আমার স্ত্রীকে দরজা খুলতেই হল। বেরবার পথ না পেয়ে ঘরের মধ্যে সমস্ত ধোঁয়া ঘুরপাক খাচ্ছিল। দরজা খোলা মাত্রই গলগল করে ছুটে গেল বাইরের দিকে। খোলা দরজার সামনে সাত আটজন হতবাক প্রতিবেশী। তাঁরা একই সঙ্গে ঢুকে পড়লেন ঘরে। সকলেরই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, কোথায় আগুন, কোথায় আগুন।'

মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস না থাকলে মানুষ কি রকম বোকা বনে যায় সেইদিন বুঝেছিলুম। প্রশ্নটিকেই আমরা উত্তর হিসেবে চালাতে লাগলুম—'আগুন ! কোথায় আগুন !' উপকারী মানুষ কত আন্তরিক হয় ! সাত আটজন ছড়িয়ে পড়ল ভেতরে ! একজন এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। বালতি তখনও ধোঁয়া ছাড়ছে। সে চিৎকার করে উঠল—'একি ! কি পোড়াচ্ছিলেন বালতিতে ! জামা কাপড় !'

রাত তখন প্রায় তিনটে। সাত আট জোড়া অপরাধ অনুসন্ধানকারী, সন্দিগ্ধ চোখের সামনে আমরা। কে একজন একালের ভাষায় বললে—'ডালমে কুছ্ কালা। সঙ্গে সঙ্গে যারা প্রতিবেশীর উপকারে ছুটে এসেছিল, তারা হয়ে গেল পুলিসের লোক। একজন কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'বলুন কি সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করছিলেন ?' আমরা চারটে প্রাণী মাথা খাটিয়েও বিশ্বাসযোগ্য কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। নীরবে মাথা নিচু করে রইলুম। আর একজন বললেন, 'ইনফর্ম পুলিস।' আমার স্ত্রী তখন মাথা খাটিয়ে একটা উত্তর বের করেছে। 'জামাকাপড়ে এমন একটা নোংরা লেগেছিল, পোড়ানো ছাড়া

আর কোনও উপায় ছিল না।' সকলে হেসে উঠল—'তা এই মাঝরাতে ! কি এমন নোংরা মশাই !'

মানুষ মানুষের সর্বনাশের জন্যে কত কষ্ট করতে পারে। একদল রয়ে গেল আমাদের পাহারায়, যাতে আমরা বালতিটাকে লোপাট করে দিতে না পারি, আর আর এক দল চলে গেল পুলিসে খবর দিতে। বাকি রাতটা আমরা বসে রইলুম ঘেরাও হয়ে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল আমাদের দিকে। এক সময় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম—'আপনারা তো পুলিস ডাকছেনই যা বলার পুলিসকেই বলবো।'

সবাই একটু আশ্বস্ত হলেন, 'যাক বলার তাহলে আছে কিছু।'

এরপর সবই সরলরেখায় ঘটে গিয়েছিল। পুলিস এলো। তার আগে শেষ রাতে পথের ধার থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। যুবকটি এই শহরেরই বড় এক ব্যবসায়ীর সন্তান। থানায় খবর চালাচালি হয়ে গেল। অধাপোড়া পাজামা, পাঞ্জাবি সহ বালতি চলে গেল পুলিস হেফাজতে। আমার দুপাটি চপ্পল। থানায় আমার স্বীকারোক্তি। রূপার ডাক্তারি পরীক্ষা। আমি পড়ে গেলুম ইঁদুর কলে। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে সাক্ষী সাবুদের অভাব হল না ; কারণ আমি ছিলুম এক নিরীহ মানুষ। আমার কোনও দল নেই। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের আশ্রিত নয়। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে কারোর কোনও বিপদ নেই। আমার পক্ষে কোনও সাক্ষী পাওয়া গেল না। প্রমাণই করা গেল না, অন্ধকারে তিনটে ছেলে রূপাকে রেপ করতে এসেছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় রূপার শরীরে বলপ্রয়োগের কোনও চিহ্নই পাইয়া গেল না। গালের ক্ষত যে কোনও কারণেই হতে পারে। ছেঁড়া ব্লাউজ। নিজেই নিজের ব্লাউজ ছেঁড়া যায়।

অসহায় আমি কাঠগড়ায় বসে বসে কত কি শুনে গেলুম। যে ছেলেটিকে আমি মেরেছিলুম সে ছিল এক ব্যবসায়ীর সন্তান। অঢেল টাকার মালিক। রাস্তায় শিকার ধরা ছিল তার হবি। তার পিতাটি অর্থের জোরে ভোগ, আর রোগ দুটোরই মালিক। তিনি আমার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আমার হয়ে লড়ছিলেন নড়বড়ে এক অ্যাডভোকেট। বয়সে নবীন। তিনি আমাকে খালাস করিয়ে আনার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। ছেলেটি আদর্শবাদী। আমার মুখে সব শুনে বলেছিলেন, আপনি ঠিক করেছিলেন। নরখাদক বাঘ মারলে মানুষকে যদি পুরস্কার দেওয়া হয়, আপনাকেও পুরস্কার দেওয়া উচিত। সাজা নয়, কিন্তু কি করা যাবে, আইন হল আইন।

আদালতে বসে আমার মেয়ের সম্পর্কে কত কি শুনলুম। নিজের সম্পর্কেও। আমার মেয়ের চরিত্র। সে না-কি ছেলে ধরা। সত্যি সত্যিই সাক্ষীর কাঠগড়ায় পুলিস তিনটে লপেটা মার্কা ছেলেকে একের পর এক তুলে দিল। প্রত্যেকেই তাদের কাছে লেখা আমার মেয়ের দু-দশটা প্রেমপত্র আদালতে দাখিল করে গেল। সেই সব চিঠি আদালতে পড়া হল জোরে জোরে। আমাকে শুনতে হল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার মেয়েকে স্বীকার করতে হল, চিঠিগুলো তারই লেখা।

সরকার পক্ষের আইনজ্ঞ প্রমাণ করতে চাইলেন, যদি আমার মেয়েকে দিয়ে দেহব্যবসা চালাতুম, তা নাহলে কেমন করে আমার জীবনযাত্রার মান আমার উপার্জনের চেয়ে বেশি হয় ! কি করে আমি সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনি। কেনার পরেও

কি করে আমার অত টাকা ব্যাঙ্ক-ব্যালেনস থাকে। আদালতে বসেই আমি জানলুম, আমার স্ত্রী থিয়েটারে অভিনয় করত। তার অনেক প্রেমিক ছিল ! এমন কি এও প্রমাণ করার চেষ্টা হল রূপা আমার মেয়েই নয়। তার পিতা আমার কর্মস্থলের এক প্রাক্তন বড় কর্তা। স্ত্রীকে ভেট হিসেবে ব্যবহার না করলে একটা লোকের তিন বছরে চারটে প্রোমশান হয় কি করে।

কিছুতেই প্রমাণ করা সম্ভব হল না, ঘটনার দিন রাতে আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ভোজ খেতে গিয়েছিলুম ; কারণ আমার সেই বন্ধু ভোরের বিমানে সপরিবারে আমেরিকা চলে গেল। তার বৃদ্ধা মা সরাসরি আমাকে চিনতে অস্বীকার করলেন। আমার বন্ধু আমেরিকা থেকে আমার উকিলের একটা চিঠিরও জবাব দিলেন না। সরকার পক্ষের উকিল নাটকীয় কায়দায় হাত-পা নেড়ে প্রমাণ করে দিলেন, আমি অসৎ উদ্দেশ্যে ওই সময় ওই অঞ্চলে আমার মেয়েকে নিয়ে ঘুরছিলুম। ছেলেটি ছিল আমার মেয়ের প্রেমিক। সে সেদিন আমাকে ধরবে বলে দাঁড়িয়েছিল। পরপর তিনজন সাক্ষী দিয়ে গেল, ছেলেটি সত্যিই আমার মেয়ের প্রেমিক। ওরা দু'জনে সিনেমায় যেত। রেস্তোরাঁয় মিলিত হত। এক রেস্তোরাঁর মালিক এসে আমার মেয়েকে সনাক্ত করে হলফনামা দিয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল, আমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে আমি খুন করিনি বরং প্রেমিকাকে বাঁচাতে এসে আমার হাতে খুন হল ছেলেটি।

আমার উকিল শেষে প্রমাণ করলেন, খুনের যে হাতিয়ার ওই পাথর, ওই পাথর আমার মতো চেহারার এক প্রবীণ মানুষের পক্ষে কোনও রকমে তোলা সম্ভব হলেও, ছোঁড়া সম্ভব কি না ? তা ছাড়া ঘটনাস্থলে যেসব সঙ্গী-সাথী উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করছেন, তারা ইচ্ছে করলেই প্রবীণ মানুষটিকে একযোগে জাপটে ধরে মেরে ফেলতে পারত। অতএব পুলিসের যুক্তি ধোপে টেঁকে না। দ্বিতীয় পয়েন্ট ঘটনা যে থানায় ঘটেছে সেই থানায় অপরাধী না কি গিয়েছিলেন স্বীকারোক্তি করতে। এটা একজন নিরীহ মানুষকে জড়িয়ে দেবার জন্যে সর্বৈব মিথ্যা কথা, বানানো কথা। কোথায় সেই ডায়েরি ! অপরাধী পরে যে স্বীকারোক্তি করেছেন, পুলিস তা আদায় করেছে জোর করে। মারধোর করে।

কমিশন বসল। সেই কমিশনের সামনে আমাকে বলা হল পাথরটি তুলতে। আমি তুলতে পারলুম না। বিশাল এক সুদেহী এলেন, তিনি যদিও বা তুললেন, ছুঁড়তে পারলেন না। পাথরটাকে ওজন করা হল। শেষে সিদ্ধান্ত হল ওই পাথর আমার মতো ক্ষমতার একজন মানুষের পক্ষে তোলা অসম্ভব। এরপর আমার উকিল প্রশ্ন তুললেন, পাথরটা এল কোথা থেকে। ওই অঞ্চলে ওইরকম পাথর আর দ্বিতীয় নেই। একটি মাত্র পাথর অপরাধীর জন্যে রাখা ছিল। আর সে দৈত্যের শক্তি ধার করে পাথরটা ছুঁড়বে গল্পেও এমন অবাস্তব ভাবা যায় না।

জজসায়েব ফিরে এসেছেন এজলাসে। আদালত কক্ষ নিস্তব্ধ। তিনি সকলের দিকে একবার তাকালেন। আমার দিকেও মনে হয় তাকালেন একবার। তারপর পড়তে শুরু করলেন তাঁর দীর্ঘ রায়। কিছুটা পড়ে একেবারে চলে গেলেন শেষে। পুলিসের কাজের নিন্দা করে বললেন, অপরাধীর অপরাধ প্রমাণে ব্যর্থ পুলিস। যাকে অপরাধী বলা হচ্ছে,

সে নির্দোষ। সে নিরীহ। যুবকটি খুন হয়েছে অবশ্যই, তবে খুনী অন্য কেউ। আবার এমনও হতে পারে, এটি নিছক একটি পথ দুর্ঘটনা। অতএব আসামী বেকসুর খালাস।
ছাড়া আমি পেলুম ঠিকই, কিন্তু আমি এখন অন্য মানুষ। আমার পরিবারে ফাটল ধরে গেছে। রূপার একটা গোপন জীবন, আমার স্ত্রীর একটা গোপন জীবন, আর আমি। আইন প্রমাণ করতে না পারলেও, মেয়েকে লাঞ্ছিত হতে দেখে আমার শরীরে সত্যিই সেদিন দৈত্য ভর করেছিল।

যার যেমন

আমি একটা মানষ। আমার কোনও ইয়ে আছে? এই 'ইয়ে' শব্দটার কোনও তুলনা নেই। "ইয়ে" টা যে "কিয়ে" তা ব্যাখ্যা করা যায় না। ভেতরে অনেক, না বলা বাণী ঢুকে আছে। আমার কোনও 'ইয়ে' নেই। আমাতে আর মৃগাঙ্কতে অনেক তফাৎ। আমাতে আর অভিজিতে অনেক তফাৎ। মৃগাঙ্ক, অভিজিত, গজেন আলাদা আলাদা নাম হলেও একই ধরণের মানুষকে বোঝাচ্ছে। সফল মানুষ। জীবনে সফল। জীবিকায় সফল। ফুচকার মতো ভোগের জলে টইটুম্বুর হয়ে ভাসছে।
রোজ সন্ধেবেলা আমিও বাড়ি ফিরি। মৃগাঙ্ক কি গজেনও বাড়ি ফেরে। কত পার্থক্য। আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মৃগাঙ্কর গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিলভার গ্রে-রঙের দোতলা বাড়ি। চারপাশে বাগান। বারান্দায় আইভি-লতা, যুঁই। গেটের মাথায় লোহার অর্ধ-চন্দ্র। তার ওপর বোগেনভ্যালিয়ার আসর। যেন সানাই বাজাতে বসেছে, আলি আহমেদ খান। সামনের বাগানে নানা রঙের গোলাপ, হাসনুহানা। যত রাত বাড়ে, থাকে, ততই গন্ধ বাড়তে থাকে। মৃগাঙ্কের লিপস্টিক-লাল গাড়ি বাড়ির থামা মাত্রই, চারজন ছুটে আসে, মৃগাঙ্কের মা, মৃগাঙ্কের বউ, মৃগাঙ্কের চামড়া, চাকর, মৃগাঙ্কর ধেড়ে 'এলসেশিয়ান'। ড্রাইভার দরজা খোলা মাত্রই পা বেরিয়ে আসবে, ঝকঝকে জুতো, কুচকুচে কালো মোজা, ধবধবে সাদা ডান পা-কে অনুসরণ করবে বাঁ পা, মৃগাঙ্ক নামক বিশেষ্যটি স্প্রিং-এর মতো নেমে আসবে। বেলুন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে যে রকম হাল্কা নাচে, মৃগাঙ্ক ঠিক সেইরকম অল্প একটু নেচে নেবে। পরিধানে বুলটানা স্যুট। বুকের ওপর টাই। চোখে বিলিতি ফ্রেমের-চশমার অভিমানী কাঁচ। পোলারাইজাড গ্লাসের বাংলা অনুবাদ। কাঁচে রোদ লাগলে অভিমানে কালো হয়ে ওঠে।
মৃগাঙ্ক যখন স্প্রিং-এর মতো নাচছে তখন ড্রাইভার আর ছোকরা দু-জন মিলে গাড়ির পেছন হাতড়ে মালমশলা নামাতে ব্যস্ত। প্রচুর প্রচুর মশলা নামে। রোজই নামে। প্রথমে নামবে একটা বাস্কেট। বেতের তৈরি সুদৃশ্য একটি ব্যাপার। মনে হয় ত্রিপুরা থেকে

স্পেশ্যাল-আমদানি। সাধারণ মানুষের হাতে অমন বস্তু সহসা দেখা যায় না। লণ্ডন থেকেও আসতে পারে। কারণ মৃগাঙ্কর সবই ফরেন। দিশি মালে অসম্ভব ঘৃণা। পারলে দিশি দেহটাকেও বিলতি করে ফেলত। উপায় নেই। সে করতে হলে মরতে হবে। মরে টেমসের ধারে পিটার বা রবিনসনের ঘরে জন্মাতে হবে। আবার নব ধারাপাত, প্রথম ভাগ দিয়ে জীবন শুরু করতে হয়। বাস্কেটে কী থাকে আমি জানি। থাকে লাঞ্চ বক্স, এক বোতল বিশুদ্ধ জল গরম করে, ঢাল ওপর করে হাওয়া খাইয়ে ক্লোরিন দিয়ে বোতল ভরা। এ দেশে জল নিয়ে না কি ইয়ার্কি চলে না। জল এ-দেশে জীবন নয়, মরণ। পাট করা একটা নরম তোয়ালে থাকে। থাকে সিজন্যাল ফ্রুটস, দু-একটা ওষুধ। কথায় বলে, প্রিভেনশান, ইজ বেটার দ্যান কিওর। দামী শরীর। কত কিছুর আক্রমণ থেকে সামলে রাখতে হয়! একজিকিউটিভ ব্যামো কী একটা! হার্টে জমাট রক্ত ধাক্কা মারতে পারে। লিভারে কি লাংসে ক্যানসার ঢুকতে পারে। মৃগাঙ্ক আসে যখন এতটা দামি ছিল না, তখন একের এর একটা খুব সিগারেট খেত। এখন ভীষণ টেনসানের সময় একটা দুটো তাও দামী বিলিতি।

বাস্কেটের পর নামবে ব্রিফকেস। নামবে একটা সুদৃশ্য ফ্লাস্ক। সারা দিনের মত কয়েক গ্যালন দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া, কালো কফি থাকে। আর নামে পার্ক স্ট্রিটের দামী দোকানের কেক আর প্যাস্ট্রির বাক্স। এ এক এলাহি ব্যাপার। রোজ সকালে লোডিং, রোজ বিকেলে আনলোডিং। শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে একটা লেভেলে এনে মৃগাঙ্ক প্রথমেই যা করবে তা হল ওই বাঘের মত কুকুরটার সঙ্গে একটু আদিখ্যেতা। কুকুরের সায়েবি নাম রেখেছে, রাখুক আমার কিছু বলার নেই। এলসেশিয়ান। তার নাম ভোলা, কি গজা রাখলে মানাত না। মৃগাঙ্ক কুকুরের মাথা চাপড়াবে আর বলবে, ডিক, আমার ডিক, তোমার সব ঠিক?

ডিক, আধ হাত জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করবে।

মৃগাঙ্ক আদুরে গলায় বলবে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বদ্দো গলম, গলম"। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলবে, "ওঃ, হোয়াট এ সালট্রি ওয়েদার। অফুল।"

কুকুর ছেড়ে মৃগাঙ্ক সামনে এগোতে থাকবে আর তার বুকের কাছে টাইয়ের নট খুলতে খুলতে পেছতে থাকবে মৃগাঙ্কর মেয়ে। মৃগাঙ্কর সময় খুব কম। বাড়িতে ঢুকে টাইয়ের ফাঁস খোলার সময়টুকুও সে দিতে চায় না। বাপির যে সময়ের অভাব মৃগাঙ্কর মেয়ে তা জানে। মেয়ে কেন বাড়ির সবাই জানে। মৃগাঙ্ক কথায় কথায় বলে "সিসটেম", "ইউটিলাইজেশান"।

বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মৃগাঙ্কর বউ একটা হ্যাঙ্গার-হাতে পাশে এসে দাঁড়াবে। মৃগাঙ্ক হাত দুটো পেছনে ছেতরে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার ছোকরা চাকর কোটটা সুরুৎ করে খুলে নিয়ে মেম সায়েবের হাতে দিয়ে দেবে। মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসবে। নিমেষে খুলে ফেলবে জুতো, মোজা।

মৃগাঙ্কর মেয়ে বিলিতি স্টীরিও সিসটেমে সেতার চড়াবে। মৃগাঙ্ক বলে, মিউজিকের একটা সুদিং এফেক্ট আছে। সেতার শুনতে শুনতে জামা আর ট্রাউজার খোলা হয়ে যাবে। হাতে এসে যাবে নরম তোয়ালে। মৃগাঙ্ক ধীর পায়ে এগিয়ে যাবে বাথরুমের দিকে। ফাইভস্টার বাথরুম। এই সময় লোডশেডিং হতে পারে। হলেও ক্ষতি নেই। নিজস্ব

জেনারেটার আছে। ফ্যাট্ ফ্যাট্ চলবে। ফটাফট আলো জ্বলে উঠবে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্কর মুখ আয়নায় ভেসে উঠবে। ছোট্ট করে মুখ ভ্যাংচাবে নিজেকে। মৃগাঙ্ক পড়েছে, মনটাকে শিশুর মত করে রাখতে পারলে শরীর ফিট থাকে। যৌবন আটকে থাকে। স্মৃতি ভোঁতা হয় না। মৃগাঙ্ক কোমর দুলিয়ে খানিক নেচে নেয়। নিজের সঙ্গে আবোল তাবোল কথা বলে। শিশুর মতো বলতে থাকে, বিশ্বকর্মা পুজোয় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো। ঘুড়ি কিনব, একতে, আদ্দে। কাল সকালে পড়া হয়ে গেলে গুলি খেলব। খোকন আমার সঙ্গে পারবে?

খোকন ছিল মৃগাঙ্কের বাল্য-বন্ধু। এখন কোথায় আছে, কে জানে!

মৃগাঙ্ক বলবে, বড়দি, দুটো টাকা দিলে, দু-টাকারই লেবু লজেন্স কিনবো। যত সব ছেলেবেলার পরিকল্পনার কথা বলতে থাকে একে একে। বলতে বলতে একেবারে শিশুর মতো হয়ে যাবে। ঘুরে ঘুরে বারকতক নাচবে। তারপর বাথটবের কলদুটো খুলে দেবে। তখন সে গণিতজ্ঞ। গরম জলের ট্যাপ দুপ্যাঁচ মেরে, ঠাণ্ডা জলেরটায় মারবে ছ-প্যাঁচ, তবেই সে "টেপিড ওয়ার্ম" জল পাবে। বাথটা ভরে গেলে জলে এক খাবলা নুন ফেলে দেবে। এই নুন তাঁকে গেঁটে বাত থেকে বাঁচাবে।

নুনটা গলতে মৃগাঙ্ক জোরে জোরে দম নিতে নিতে চেষ্ট এক্সপানসান করবে। তারপর দেহটাকে সমর্পণ করবে বাথটবের জলে। ডান হাতের নাগালের মধ্যে দেওয়ালনদানিতে বিলিতি সাবানের দুধ সাদা কেক। মৃগাঙ্ক জল নিয়ে ভুঁড়িতে থ্যামাক থ্যামাক করবে। ছোট ছেলের মতো নানা রকম শব্দ করতে থাকবে মুখে তখন সে আর শিশু নয়। একেবারে সদ্যোজাত। ওঁয়া ওঁয়া করলেই হয়।

এই সময়টাকে মৃগাঙ্ক বলে, "মোমেন্টস অফ পিস্ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস"।

এইবার আমার কথায় আসি। আমি আর মৃগাঙ্ক সমবয়সী। কপাল গুনে মৃগাঙ্ক গোপাল, আর আমি কপালদোষে গরু। আমার গাড়ি নেই। আমার বাহন মিনি। আমি মিনিতে ধারের আসনে আধখোলা হয়ে বসব। দেখতে দেখতে ক্ষুদে যানের কুঁচকি, কণ্ঠা ঠেসে যাবে যাত্রীতে। আমাকে ভুঁড়ি দিয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে। ব্রহ্ম-তালুতে কনুই মারবে। মেয়েরা মাথার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ রাখবে। মাঝে মাঝে আঁচলে মুখে ঢেকে যাবে। একবার এক ভদ্রলোক আমার মাথায় নস্যির ডিবে রেখে নস্যি নিয়েছিলেন।

আমি ওই রকম আড়কাত হয়ে ঘন্টাখানেক থাকবো ; জ্যাম থাকলে দেড়, দুঘন্টা। তারপর ধুপুস করে স্টপেজে নামব। কণ্ডাকটার মাথায় চাঁটি মেরে টিকিট দেখতে চাইবে। আমার আকৃতিটাই এই রকম যে যেই দেখে সেই ভাবে, ব্যাটা একটা ছিঁচকে চোর। মেরে পালানোর পার্টি। চেহারায় কোনও আভিজাত্য নেই। বড় দোকান থেকে জিনিস কিনে বেরোবার সময় দরজার ধারে টুলে বসে থাকা দারোয়ান বিশ্রী গলায় বলবেই, "ক্যাসমেমো"। এহেন প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমি কোনও দিন ভুলবো না। একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলা দিয়ে লিণ্ডসের দিকে হেঁটে চলেছি। আমার সামনে হাঁটছেন, লম্বা চওড়া স্যুটেড-বুটেড এক ভদ্রলোক। তাঁর ঠোঁটে বাঁকা করে ধরা একটি পাইপ। পাইপ থেকে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি চলেছেন, আমি চলেছি। তিনি গ্যাট ম্যাট করে, আমি খুড়ুস খুড়ুস, যেন ঘোড়ার পেছনে গাধা। লিণ্ডসেতে পড়ে তিনি বাঁয়ে বেঁকলেন,

আমিও। তারপর আবিষ্কার করলাম দুজনেরই গন্তব্যস্থল এক। একই দোকানে। দোকানের কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষক টুল থেকে তড়াক করে উঠল, সেলাম বাজাল, দরজা টেনে ধরল, পাইপ ঢুকে গেলেন, আর আমি যেই ঢুকতে গেলুম, দরজাটা সে ছেড়েদিল, খাঁই করে আমার নাকের ওপরে। আমার শরীরের একমাত্র শোভা আমার পিচবোর্ডকাটা নাকটি। আমার লম্বাটে মুখের ওপর খাড়া হয়ে আছে। যেন ওটা আমার নাক নয় প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতে গীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত। ও নাক এ মুখের নয়। অন্য কোন মুখের। অনেকটা নাকু মামার মতো। আমার স্ত্রী যখন আমাকে ন্যাকা বলে, তখন মনে হয় এই নাক দেখেই বলে। আমারও কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু আছেন, সবাই আমার শত্রু নয়। সেইরকম এক বন্ধু বলেছিলেন, "তোমার গাল দুটো দেবে যাওয়ায় নাকের স্ট্রাকচারটা অত ঠেলে উঠেছে। গালদুটো সামহাউ একটু ভরাট করার চেষ্টা কর, তাহলে তোমার ওইমুখ যা দাঁড়াবে না। জেম অফ এ পীস। ফরাসী প্রিসিডেন্ট দ্য গলের মত হয়ে যাবে।

তারপরে আবিষ্কার করলাম, গাল ভরাট করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। অনেকটা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মতো। পুকুর ভরাট করা যায়, চোয়াড়ে গাল ভরাট করা যায় না। ধার করে, দেনা করে ফ্যাট খাও, প্রোটিন খাও, ভুঁড়িটাই বেড়ে গেল, খাবলা গাল, খাবলা গালই থেকে গেল।

দোকানের দরজাটা ধাঁই করে নাকে লাগতেই সর্দি হয়ে গেল। আমি তো আর মুষ্টি যোদ্ধা নই। নাকে ঘুষি হজম করার শক্তি কোথায়? দ্বারপালকের ওপর রাগ হল। তার বয়েই গেল। আমার মতো ফেকলুকে সে পাত্তা দেবে? ঠাণ্ডা, সুন্দর দোকানের ভেতর সেই সবাদৃত পাইপ। ঘুরে ঘুরে শাড়ি দেখছেন, কার্পেট দেখাচ্ছেন, বিছানার চাদর দেখেছেন। কী আগ্রহ নিয়ে দোকানবালিকারা তাঁকে দেখছেন। তিনি মাঝে মাঝে পাইপচ্যুত হয়ে অল্প-স্বল্প মন্তব্য করছেন। আমাকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। বলছি, চাদর, বলছে ওই তো চাদর দেখুন না। বলছি শাড়ি, বলছে এখানে শাড়ির অনেক দাম। পাইপ সারা দোকানে ওলটপালট করে দিয়ে, শুধু হাতে প্রস্থান করলেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে বলতে শুনলুম, দ্যাট মাই চয়েস্, দ্যাটস নট ফাইন, বেটার সামথিং। ভেবেছিলুম বড় খদ্দের যাবার পর ছোটটার দিকে নজর পড়বে। কোথায় কী। সুন্দরীরা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁদের সামনে কাউন্টারের উল্টোদিকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয় শুনতে লাগলুম। মোটা সুন্দরী, ছিপছিপে সুন্দরী, রোগা সুন্দরী, ভুরুওলা সুন্দরী, ভুরু আঁকা সুন্দরী, খোঁপা সুন্দরী, এলো সুন্দরী। কত কী যে তাঁদের বলার আছে। মাধুরীদি। স্বপ্নাকে কী বলেছে? স্যান্যালদাটা ভীষণ অসভ্য। ওরই মধ্যে একজন বলে ফেললে,.....লাগে, একদিন ঝাড় খাবে। আমার রুচিশীল কান বললে, পালাও। পালাব মানে! সোজা ম্যানেজার। তিনি ছুটে এলেন, "তোমরা ভদ্রলোককে শাড়ি দেখাচ্ছ না কেন?" স্লিম সুন্দরী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললে, "আহা, বোবা না কি? না বললে দেখাব কি?"

আমার প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ভবা পাগলার নাম শুনেছ, আমি এক প্রেম পাগলা, এই করেই আমার বউয়ের প্রেমে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেছি। মৃগাঙ্ক

হতে হতেও হওয়া হল না। সংসারের ঝাঁও সামলাতে সামলাতেই ঘাটে যাবার সময় হয়ে গেল। প্রবীণা এক মহিলা বললেন, 'সীমা, ভদ্রলোককে ওই ওপরের থাকের শাড়িগুলো দেখাও।' চালাকিটা পরে বুঝলুম। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে সবচেয়ে দামী শাড়ি একের পর এক নেমে এল। সাড়ে চারশো, সাতশো, সাড়ে নশো।

আমি বললুম, 'আর একটু কম দাম ?' 'এ দোকনে কম দামের শাড়ি রাখা হয় না। আমি সেই ক্ষয়া চাঁদের চোখের বাণে কাবু হলে কী হবে, তিনি আমার খাড়া নাকের অভিজাত্যকে মোটেই সমীহ করলেন না। আমি প্রায় মরিয়া হয়েই, সাড়ে চারশো দামের একটা শাড়ি কিনে ফেললুম। তখনও আর একজনের ওপর বদলা নেওয়া বাকি ছিল। ওই সেই দ্বারপাল। শাড়ির প্যাকেট বগলে নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আগেই দেখে রেখেছিলুম, সে পাইপকে উঠে দাঁড়িয়ে, দরজা খুলে সেলাম করেছিল।

বললুম, 'গেটআপ।'

লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ধমকের সুরে বললুম, 'গেট আপ।'

তখন আমার সংহার মূর্তি। উর্দি উঠে দাঁড়াল।

'দরওয়াজা খোল।'

দরজা খুলে ধরল। তখনও তার আর একটা কাজ বাকি।

'স্যালুট। সেলাম বাজাও।'

সেলাম করল। আমি সেই পাইপ দাদার মতো গ্যাটম্যাট করে বেরিয়ে এলুম। লোকটা মহা শয়তান। আমার শরীরটা পুরো বেরোবার আগে, দরজাটা ছেড়ে দিল। কড়া স্প্রিং দুম করে দরজাটা আমার পায়ের গোড়ালিতে ধাক্কা মারল। মারুক। আমি আমার পাওনা আদায় করে নিয়েছি।

এই এত বড় একটা ভনিতার কারণ, আমার দুঃখ। লোকটাকে কেউ সামান্যতম পাত্তা দেয় না। বাড়ির লোক, না বাইরের লোক। কেন ? কারণটা কী ? এক জ্যোতিষীকে বলেছিলুম, 'একবার দেখুন তো মশাই, হরোসকোপটা। কোথায় কোন গ্রহ এঁকে বেঁকে আছে।'

অনেক অঙ্কটঙ্ক কষে তিনি বললেন, "আপনার রবিটা খুব ড্যামেজ হয়ে আছে, যে কারণে চামচিকিতেও আপনাকে লাথি মারবে। মটরদানার মতো একটা হীরে পরুন।" হীরে পরব আমি। আমি কি মৃগাঙ্ক ? দশ, বারো, চৌদ্দ, কত হাজার পড়বে কে জানে, মারুক চামচিকিতে লাথি। যাক, যে কথা বলছিলুম, মিনি থেকে নেমে আমাকে এ-দোকান, সে দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে হবে। কেরোসিন কুকারের পলতে, চিঁড়ে, ছোলা, বাতাসা, বাদাম, মাথাধরার ওষুধ, সেজের চিমনি, মুরগীর ডিম, পূজার ফুল। কেনাকাটার কোনও মাথামুণ্ড নেই। নিতান্তই মধ্যবিত্তের জিনিস। মৃগাঙ্কর প্যাটিস-প্যাসট্রি নয়। আর সবই বিপরীতধর্মী জিনিস ফুলের সঙ্গে ডিম ঠেকবে না। বাতাসায় চাপ পড়বে না। চিমনি চাপ সইবে না। এ সবই আমার প্রেমের বউয়ের কারসাজি। রোজই এমন সব জিনিস আনতে বলবে, মানুষের দু-হাতে ম্যানেজ করা অসম্ভব। দশটা হাত, দশটা মুণ্ডু হলে যদি কিছু করা যায়। এ সংসারে রাম হলে কপালে বনবাস। রাবণ হতে হবে। রাজ্যপাট, লোভনীয় পরস্ত্রী, সবই তখন সম্ভব। রাম হলে ভোগান্তি।

রাবণ হলে ভোগের চূড়ান্ত। দু হাতে বুকের কাছে সব পাকড়ে ধরে বাড়ি মুখো হাঁটতে হাঁটতে বলি, "আই অ্যাম এ ডিগনিফায়েড ডাঙ্ক।" ফাইনাল খেলা সুরু হয় বাড়ির সামনে এসে। রবি নীচস্থ হলেও মঙ্গল আজ মনে হয় তুঙ্গী। বরাতে বাড়ি মোটামুটি ভালই জুটেছে। সামনে একটু বাগান মতো আছে। গেট। গেট থেকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা সোজা সদরে। আমার বউয়ের এদিক নেই ওদিক আছে। নিজে পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে। লোমঅলা ফুটফুটে কুকুর কিনে এনেছে। তিনি যেন গৃহ-দেবতা। তাঁর সেবার শেষ নেই। তিনি সকালে চুকচুক করে আধবাটি দুধ খাবেন। নিজে খাই, না খাই, ডেলি একশো গ্রাম ক্রিম ক্র্যাকার—বাঁধা। ঝড় হোক, জল হোক, রাষ্ট্রবিপ্লব হোক, এমনকি অ্যাটম বোমা পড়লেও ডেলি দুশোগ্রাম কিমা। মাসে ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধ বিষুধের পেছনে অ্যাভারেজ—পঞ্চাশ টাকা। নিজে অসুস্থ হলে পড়ে থাকা যায়। কেউ গ্রাহ্যই করবে না। তুমি ব্যাটা মরে ভূত হয়ে যাও, কিছু যায় আসে না। ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে, পাস বই নিয়ে ব্যাঙ্কে ছুটবে। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করবার জন্যে। তুমি তো আমার লোমআলা বিলিতি কুকুর নও। হিন্দি ছায়াছবিতে যেমন গেষ্ট আর্টিষ্ট থাকে আমাদের সেইরকম গেষ্ট কুকুর আছে, সে আবার আর এক ইতিহাস। কে বলে ইতিহাসে ইতিহাসে কেবল রাজারাজড়া? সাধারণ মানুষের জীবনে কম ইতিহাস? বছর দশেক আগে এক বর্ষার রাতে রাস্তার লালু এসেছিল বারান্দায় আশ্রয় নিতে। সেই লালু হয়ে গেল গেষ্ট। লালুর চারটে বাচ্চা হল। কান্নু আর গুগলু বড় হল। তাদের হল চারটে চারটে আটটা। তিনটে গেল রইল পাঁচটা। সে এক জটিল হিসেব। তবে এখন যা অবস্থা পিলপিল করছে কুকুরে। রাতে কানে তুলো গুঁজে, দরজা জানলা বন্ধ করে শুতে হয়। মিনিটে মিনিটে ডাক। প্রথমে একটা ডাক, তারপর আর কটা কোরাসে। শুরু হলে আর থামতে চায় না, সভাপতির ভাষণের মতো। আমার বউ বলবে, "কি আশ্চর্য। কুকুর ডাকবে না। ডাকবে বলেই তো দেড় কেজি চালের ভাত খাওয়াই।'

'বাঙালীর বাত, কুকুরের ডাক।' বেশ বাবা? তাই হোক। তা কিন্তু হল না। মালকিন নিজেই এবার কুকুরের ওপর খাপ্পা। কুকুরের খেলা পায়। খেলার আনন্দে তারে ঝোলা শাড়ি ছিঁড়ে ফালা ফালা করেছে। দরজার পাপোশ আঁচড়েন্স-মেটেরিয়াল করে দিয়েছে। এই সব অপকর্ম যদিও বা সহ্য হল, হল না সেই মারাত্মক অপরাধ। গেষ্ট আর্টিষ্টরা একদিন বাড়ির লোমঅলা হিরোকে বাগে পেয়ে খাবলে দিল। এখন নিয়ম হয়েছে, যে-ই আসুক আর যে-ই যাক গেট বন্ধ করতে হবে। সেও আবার এক ইতিহাস। লোয়েষ্ট কোটেসানের লোহার গেট। লোহা নামে সরু কতকগুলো সিক সরু পটির ফ্রেমে ঢালাই করা। বাতাসে ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপে।✓

ফুঁ দিলে খুলে যায়। ফলে ব্যবস্থা যা হয়েছে, তা অভিনব। অষ্টগণ্ডা গাঁটঅলা, একটা দড়ি দিয়ে গেটটা বাঁধা হয়। বাঁধা সহজ। যে বাঁধে, সে বাঁধে। শ্যামল মিত্রের সেই গান, 'ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার মালা, যে জানে সে জানে, ভ্রমরা যাস নে সেখানে। খুলতে পিতার নাম ভুলিয়ে দেয়। গেঁটে বাতের মতো।

মৃগাঙ্ক যখন ফেরে তাকে রিসিভ করার জন্যে একটা ব্যাটেলিয়ান খাড়া থাকে গার্ড অফ অর দেবার জন্যে। আমি তো আর মৃগাঙ্ক নই।

ছেলেবেলায় একটা ছবি দেখেছিলুম কোনও এক বইয়ে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বুকের কাছে দু হাত দিয়ে দলা পাকানো কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আর রাজার পোশাক-পরা গুঁপো একটা গুণ্ডা, হয় দুঃশাসন না হয় দুর্যোধন আঁচল ধরে টানছে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আমারও সেই অবস্থা। বুকের কাছে দু হাতে জাপটে ধরে প্যাকেট-ম্যাকেট। কাঁধে সাইড ব্যাগ, সামনে গেঁটে বাত। গেটে দড়ি বাঁধা ম্যালেরিয়া গেট। আবার একটা গানের কলি, 'কেউ দেওনি তো উলু, কেউ বাজায়নি শাঁক। দু হাতে যে বাঁধন খোলা যায় না, সেই বাঁধন খুলবে। এক হাতে? আলিবাবা, চিচিংফাঁক মন্ত্র দাও। বলেনা, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কে বলে বাঙালির ফেলো ফিলিংস নেই। খুব আছে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ না কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে? আমি ভাবি কত ভাবেই না মানুষ রোজগার করতে পারে। আমার ফেরার সময় খোকন জেগে গেছে। সেও এক ইতিহাস। খোকন খাঁড়ার বাবার ছিল সাবেক কালের বিশাল গোলদারী দোকান। প্রভূত পয়সার মালিক। পয়সা হল ভূত। ভূতে ধরলে মানুষের মতিভ্রম হয়। বড় খাঁড়া পর পর তিনটে বিয়ে করে ফেললেন। লোকে একটা বউয়ের হ্যাপা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। সব হ্যাপিনেস, গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। বড় খাঁড়ার চুল উঠে গেল। মুখ ফুলে গেল। ভুঁড়ি বেড়ে গেল। আমরা ভাবতুম সুখে বড় খাঁড়া মোটা হচ্ছে। তা নয় খাঁড়ার ৬দুরি হয়ে গেল। খাঁড়া মরে গেল। লোকে মরলে একটা বউ বিধবা হয়। খাঁড়া তিন তিনটেকে বিধবা করে পগার পার। তারপর যা হয়, বিষয় বিষ। মামলা, মকদ্দমা, মারদাঙ্গা। গোলদারী ভুস। বড়পক্ষের ছেলে খোকন খাঁড়া। খাঁড়া হলে কী হবে ধার নেই। পথে পড়ে গেল। কল্কে ধরলে। অন্যের কল্কে ধরলে লোকের আখের ফেরে। নিজে কল্কে ধরলে সর্বনাশ হয়। খোকন এখন আধপাগলা। শুধু ধান্দা, কীভাবে গাঁজার পয়সা জোগাড় করা যায়। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

সে আবার কী কথা। বলি সে কথা। ভগবান আমার জন্ম দিলেন। বয়েসকালে বাবরি চুল রেখে প্রেম করলুম। হ্যা হ্যা করে বিয়ে করলুম। ধারদেনা করে বাড়ি করলুম। পয়সার অভাবে লগবগে গেট করলুম। বিজ্ঞান হাতে তুলে দিল টি ভি। প্রবাদ, যত হাসি, তত কান্না বলে গেছে রাম শর্মা। যত প্রেম তত ঘৃণা। আমার বউ টি ভি দেখবে। আমি গরু খেটে ফিরব। দু হাতে ফলটা মূলোটা। খোকন খাঁড়া সামনের বাড়ির রকে। সে নেমে আসবে মেশোমশাইকে সাহায্য করতে। বিনিময়ে পঁচিশ পয়সা। এক পুরিয়া গঞ্জিকার দাম।

একেই বলে কুকুর। আমার বউ আমার এই বেড়া টপকানোর খবর কিছুই জানতে পারবে না। পারবে লোমওলা কুকুর। সে ঘেউ ঘেউ করবে। তাতেও আমার বউ উঠবে না। ভাগ্যিস ছেলেবেলায় ব্যাকে ফুটবল খেলেছিলুম। ডানপায়ে সদর দরজায় দমাদ্দম লাথি। তখন দরজা খুলে যাবে। কুকুর ছুটে আসবে। দু-হাত তুলে নাচবে। চাটার চেষ্টা করবে। আর আমার বউ হাসিমুখে অভ্যর্থনার বদলে, কি জিনিসপত্তর ধরে আমাকে খালাস করার বদলে একটি কথাই রুক্ষ গলায় বলবে, 'গেটে দড়ি বেঁধেছ? যাও বেঁধে এস।'

মালপত্তর কোনওরকমে নামিয়ে, আমি গান গাইব। মনে মনে। বাঁধ না তরীখানি

আমার এই নদীকূলে। একা দাঁড়িয়ে আছি লহ না কোলে তুলে। তারপর ছুটবো তলতা গেটে দড়ি বাঁধতে। ওই কাজটি করার কালে আমি দার্শনিক হয়ে যাব। মাথার ওপর মবুর আকাশ। মিটিমিটি তারা। আমার বাগানের কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতা। অসংখ্য গাঁটওলা একটা দড়ি, যেন হাতে ধরা জপের মালা। এক একটা গাঁট এক একটা রুদ্রাক্ষ। আমি তখন সত্যি সত্যিই তিন গাঁটে ওঁকার জপ করব। পা বাড়ালেই পথ। আমি তখন গাইব প্রশ্নের মতো করে, "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?" আমি কোনও উত্তর খুঁজে পাব না। মাথা-নিচু করে ফিরে আসব। আমার কুকুর গাল চাটবে। মৃগাঙ্কর বিলিতি আফটার শেভ লোশান-আছে। সেটা থাকে শিশিতে আমারও রয়েছে একটু অন্যভাবে। বিলিতি কুকুরের জিভে। ভাবা মাত্রই আমার মন মসৃণ। মধ্যবিত্ত মলিন বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়ব, আর ছাড়ব আমার গলা হারে রে রে রে তোরা দেরে আমায় ছেড়ে।

সেই লোকটা

আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আমার চেহারা সুন্দর। আমি লেখা পড়া নেহাত কম জানি না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। ভালো চাকরি করতুম। বিয়েও করেছি। আমার সব আছে ; কিন্তু আমাকে কেউ ভালবাসে না। আমার একটা গর্ব ছিল, চেহারা যখন সুন্দর, রোজগার যখন ভালো, তখন আমাকে আমার বউ ভালবাসবে, অন্য মেয়েরা আমার প্রেমে পড়বে। কর্মস্থলে বছর বছর আমার প্রোমশান হবে। জুনিয়ার থেকে সিনিয়ার। সিনিয়ার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবো। আমার বাড়ি হবে, আমার গাড়ি হবে। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বছর বছর বাড়বে। জীবনটা আমার সুখে ভরে যাবে। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক।

আমার সঙ্গে আমার বউয়ের বয়সের পার্থক্য একটু বেশি। এমনটা হওয়া উচিত ছিল না, তবু হয়েছে। আমি ভালোবাসা করে বিয়ে করিনি। দেখাশোনার পর যেমন হয়েছে, সেইটাই আমি মেনে নিয়েছি। এই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন আমার দিদি আর জামাইবাবু। বড় ঘরের মেয়ে। তাকে মিষ্টি দেখতে। শ্যামলা। হাসিটি ভারি সুন্দর। চিরকালই আমি একটু বড়সড় দেখতে। আমার বাবা জেলা আদালতে ওকালতি করতেন। জায়গাজমিও ছিল। প্রাচুর্যে মানুষ হবার ফলে দেহটা বেশি বেড়ে গেছে। বউয়ের সামনে আমার লজ্জা করত। আয়নায় পাশাপাশি দু'জনের প্রতিফলন দেখলে মনে হত, আমি স্বামী নই, বাবা। হিন্দুসমাজে এই রকমই নাকি হয় !

জোর দিয়ে বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয়, এই বিয়েতে মেয়েটার বোধ হয় মত ছিল না। হয়ত অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে আলাপ ছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে সব অধিকার খাটে, সেই সব অধিকার ফলাতে গিয়ে পদে পদে ধাক্কা খেয়েছি। জোর করে কাছে টানতে হয়। ছেড়ে দিলে এত দূরে সরে যায়, যেন বিপরীত

মেঝুতে বসবাস। এইরকম একটা সম্পর্কের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলনো। কেউ কোনও দিন শুনেছে অনুমতি নিয়ে বউয়ের গায়ে হাত দিতে হয়।

অনেক চেষ্টা করলুম, যদি সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়, হলো না। একদিন জোর করে একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলাম, খেঁকিয়ে উঠল। বলল, দামড়া। মনটা একেবারে বিগড়ে গেল। যেমন আমার বরাত ! কাকে ঠোকরানো ফল। বিয়ে না হলে ছিল একরকম। এখন আর কোথায় নৈবিদ্য সাজাবো ! কে আর আমাকে নেবে ? মনকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম এ আর কি এমন সমস্যা ? চাকরি বাকরি করছি। রোজগারপাতি ভালো, একটা মেয়ে দামড়া বললে কি এসে যায়।

এই রকম একটা সময়ে, হঠাৎ আমাকে বাইরে বদলি করে দিলে। পদোন্নতি হলো। ভালো কোয়ার্টার পেলাম। ফলের বাগান। চব্বিশ ঘন্টা দেখাশোনা করার একজন লোক, আবার একটা গাড়ি। ব্যাপারটা বেশ জমে গেল। জায়গাটাও বেশ সুন্দর। সুন্দর পরিবেশ। সহকর্মীরাও বেশ ভালো। শুধু ওই, একবালতি দুধ একটা মাছি। জীবন একঘেয়ে সুরে বাঁধা পড়ে গেল। ভোরবেলা বেরোই। দুপুরে খেতে আসি। আবার বেরোই। আবার আসি। বই পত্তর ওলটাই। রেডিও শুনি। স্পেয়ার চালাই। ঘুমিয়ে পড়ি। জীবনের এই রুটিন। কোনও নড়চড় নেই।

রক্তমাংসের মানুষ এ ভাবে কদিন চালাতে পারে। আমি তো রামকৃষ্ণ নই। আমার একটা গাড়ি আছে। দূরে একটা পাহাড় আছে। পাহাড়ের পাশে একটা জঙ্গল আছে। তার পাশের একটা নদী আছে। সব কিছুর পাশেই একটা না একটা কিছু আছে। আমার পাশে আছে শীতল একটা স্ত্রী। ছুটির দিন যদি বলি, চলো না, কোথাও বেড়িয়ে আসি। উত্তরে প্রথমে মুখ বাঁকায়। যেন পরপুরুষ কোনও কু-প্রস্তাব দিয়েছে ! বেশি জেদাজেদি করলে বলে, 'তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'তাহলে বিয়ে করলে কেন ?'

'আমিতো করিনি। তুমি করেছ।'

আমি গুণ্ডা নই, বদমাইশ নই, মাতাল নই, লম্পট নই, আমার একটা আত্মসম্মান আছে। আমি কোনও জোর খাটাতে পারি না। আমি জানি, আমার গায়ের জোরের কাছে ওকে হার মানতেই হবে। গায়ের জোরে তো সম্পর্ক তৈরি হয় না। সম্পর্ক মনের ব্যাপার। গায়ের জোরে দেহ পাওয়া যায়, মন পাওয়া যায় না। আমি মন পেতে চাই, দেহ নয়। বিয়ে করে আমি একটা দেহ পেয়েছি। যার মন পড়ে আছে অন্য জায়গায়। সেই জায়গাটা কোথায়। আমার বউ তো আর মীরাবাঈ নয় ! যে বলবে—'মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কই। জাকে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোই।' খাচ্ছে দাচ্ছে, চুল বাঁধছে, ভালো শাড়ি পরছে, গুনগুন গান গাইছে, ফুলের বাগানে প্রজাপতি হয়ে উড়ছে, অথচ আমার ব্যাপারেই অদ্ভুত একটা ঘৃণা, যার কোনও কারণ নেই।

কলকাতায় গিয়ে এক সাইকোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করলুম। বিরাট ব্যক্তি। বড়-ফি। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন আমি বোধ হয় রোগী। অনেকক্ষণ আমাকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখলেন। একটা টেবিল, এপাশে আমি, ওপাশে সাইকোলজিষ্ট। তিনি বসে আছেন

আরামদায়ক একটা চেয়ারে। যে চেয়ার গোল হয়ে ঘোরে। সামনে পেছনে দোলে।

হঠাৎ আদেশ করলেন, 'ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে উঁচু করে ধরে রাখুন, যে ভাবে অয়েল পেন্টাররা ছবি আঁকে।' আমি আমার ডান হাতটা সামনে উঁচু করলুম। সেই ভাবে ধরে রাখলুম কিছুক্ষণ। মাথার ওপর আলো ঝুলছে। হাতের ছায়া পড়েছে টেবিলের ওপর। ভদ্রলোক সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। মিনিট দুয়েক ওইভাবে রাখার পর বললেন, 'নামান।'

হাত নামালুম। তিনি চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়লেন। সেই আয়েসি অবস্থায় প্রশ্ন করলেন, 'রাতে ভালো ঘুম হয়?'

'কার কথা বলছেন?'

'আপনার। আপনার ভালো ঘুম হয়?'

সাইকোলজিস্টরা সাধারণত মিষ্টি গলায় কথা বলেন। কারণ মনোরোগের তো কোন ওষুধ নেই। শুধু কথা। কথা দিয়ে, কথা দিয়ে রোগীর ভেতরে যা জমে আছে সব বের করে আনেন। আমি বললুম, 'আমার ঘুম হওয়া, না হওয়ার ওপর, আমার স্ত্রীর ভালোমন্দ নির্ভর করে কি?'

'কেন করবে না। বিছানায় সারা রাত ছটফট করলে পাশে যে শুয়ে থাকে তার অসুবিধে হবে না। ভীষণ অসুবিধে হয় ভাই। আমি প্রথমে আপনাকে ঘুম পাড়াতে চাই।'

প্রেসক্রিপশান লেখার জন্যে ডাক্তারবাবু প্যাড টেনে নিলেন। আমি বললুম, 'আমার বেশ ভালোই ঘুম হয়। গভীর নিদ্রা। বিছানায় পড়ামাত্রই আমার নাক ডাকতে শুরু করে।'

প্যাড থেকে কলম তুলে ডাক্তারবাবু বললেন, 'নিজের নাক ডাকা শুনতে পান? তার মানে ঘুমে লিক আছে।'

'ঘুমে লিক মানে? ঘুম কি চৌবাচ্চা?'

'ঘুম হলো চাদর। মানুষ মারা গেলে চাদর চাপা দেয় জানেন তো? সেই চাদরকে বলে 'শ্রাউড'। ঘুম হলো সেই চাদর। সেই চাদরে ফাঁক-ফোঁকর থাকলেই মানুষ স্বপ্ন দেখবে, নাক ডাকার শব্দ শুনবে।'

'আমার নাক ডাকে না। আমি বললুম কথার কথা।'

'স্বপ্ন দেখেন?'

'দেখি।'

'কি জাতীয় স্বপ্ন?'

'মনে থাকে না।'

'তার মানে স্মৃতি কাজ করছে না। স্মৃতিটাকে মেরামত করতে হবে। তাহলে ওইদিকে থেকে শুরু করা যাক। একটা ওষুধ থাকছে সাত দিন খাবেন।'

আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'আমার স্মৃতি চাই না। জীবনের সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমি ভুলতে চাই।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, এই সব অসুখের পেছনে সবসময় একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থাকে। রোগী আপ্রাণ চেষ্টা করে ভোলার। ভুলতে পারে না। ছটফট করে, তখন সে

ভেতর থেকে ভেঙে দুখণ্ড হয়ে যায়। একে আমাদের ভাষায় বলে স্পিলট পারসোন্যালিটি। এর পর তো আপনি মশাই ক্রিমিন্যাল হয়ে যাবেন। কোন দিন মার্ডার করে ফেলবেন।'

'আপনি ধরেছেন ঠিক, সত্যিই আমি একদিন খুন করে ফেলব। একদিন ধরব আর গলায় চালিয়ে দোব।'

'অ্যায়, এই সন্দেহটাই করেছিলুম। প্রথম প্রথম এই রকম ইচ্ছেই হবে। পরের স্টেজে ইচ্ছে করবে আত্মহত্যা করতে।'

''আপনি কার কথা বলছেন ?'

'কেন আপনার কথা !'

'ধুর মশাই, আমি রোগী হতে যাব কেন ? রোগী আমার বউ।'

সাইকোলজিস্ট তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আপনার বউ যদি রোগী হয়, আপনি এসে মরেছেন কেন ? যান তাঁকে নিয়ে আসুন।'

'সে যদি আনতে পারতুম, তাহলে আপনার কাছে আসব কেন ?'

'পাগলামির চিকিৎসা বকলমে হয় না। রোগীকে যদি আনতে পারেন হবে, না হলে হবে না।'

বয়স্ক মানুষ। রেগে গেছেন। এই এতটা সময় আমার সঙ্গে বৃথা বকবক করলেন। এই বকবক করাকে এঁদের ভাষায় বলে সিটিং। আমি অসহায়ের মতো বসে আছি। তিনি আমার দিকে নয়, তাকিয়ে আছেন সিলিং-এর দিকে। হঠাৎ মনে হয় দয়া হলো, জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটা কি ?'

আমি যেন হালে পানি পেলুম! সেই কোথা থেকে কোথায় এসেছি কত আশা নিয়ে। বেশ গুছিয়ে বললুম, আমার কেসটা কি! বেশ মন দিয়ে শুনলেন. শুনে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর এইরকম ব্যবহারের কারণ অতীতের তিক্ত স্মৃতি।'

'অতীতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, এই তো সবে বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে আমাদের।'

'খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার মতো দেখতে আর একজন কেউ আছে।'

'তা কি করে হয়! আমার কোনও যমজ নেই। এই এক পিস আমিই পৃথিবীতে ঘুরছি।'

'পৃথিবী সম্পর্কে আপনার ধারণা এত কম! ভালো করে মন দিয়ে শুনুন, অনেকটা আপনার মতো দেখতে আর একজন লোক অতীতে কোনও একসময় আপনার স্ত্রীকে রেপ করেছিল।'

আমি চমকে উঠলুম, 'অ্যাঁ, সে কি! বলেন কি ? কোথায় সে, আমি তাকে খুন করব।'

'উত্তেজিত হবেন না! খুন করলে মানুষকে জেলে যেতে হয়। বিচারে ফাঁসি হয়। এতে আপনার লাভ কিছু হবে না, নিজের জীবনটাই নষ্ট হবে।'

''তা হলে! তাহলে কি হবে ?'

'কি আবার হবে! কিছুই হবে না। এই ভাবেই সারা জীবন চালাতে হবে। চেহারা

তো আর পাল্টাতে পারবেন না। ভগবানের ওয়ার্কশপ থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তার ওপর আর কারিকুরি চলবে না।'

'তার মানে অন্যের পাপের বোঝা সারা জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।'

'হবে। কি আর করবেন। আপনার স্ত্রীর দিকে আপনি যেই এগোচ্ছেন তাঁর চোখের সামনে নেমে আসছে কুয়াশার পর্দা। তাঁর অতীত। তিনি দেখছেন, এগিয়ে আসছেন আপনি নয়, সেই রেপিস্ট। দুটো হাত যেন দুটো থাবা। মুখটা হায়নার মতো, ভাল্লুকের মতো, গেরিলার মতো। তিনি ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। আপনি এগোচ্ছেন ধীরে ধীরে। আপনার প্রেম নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, আবেগ নিয়ে। আপনি কিছুই জানেন না। জানাব উপায়ও নেই। মনোজগতের ব্যাপার। সাব-কনসাস। আপনি আরও কাছে গিয়ে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখার জন্যে একটা হাত বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। চারপাশ থেকে সবাই ছুটে এল।'

'না, চিৎকার করে না। সরে যায়। কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব। যেন পচা মাছের গন্ধ থেকে পালাতে চাইছে।'

'হয়েছে কি। এরপর চিৎকার করবে। তারপর হাতের কাছে ধারালো কিছু পেলেই বসিয়ে দেবে গলায়। খুব সাবধান।'

'কি ভাবে সাবধান হবো?'

'কেন, শত হস্তেন। ত্রিসীমানায় যাবেন না।'

'তা হলে বিয়ে করাব মানেটা কি হলো?'

'ওরকম হয়। কারুর কারুর জীবনে এরকম হয়। কি করা যাবে?'

'কি করা যাবে মানে? আমার স্ত্রীকে ধরে আচ্ছা করে দাওয়াই দিয়ে দিন।'

'আমাকে ধমকালে কি হবে। ধমকান আপনার ভাগ্যকে। খুঁজে বের করুন সেই অপরাধীকে যে আপনার স্ত্রীকে রেপ করেছিল। ঠিক আপনার মতো চেহারার একটা লোক আছে।'

আমি মন খারাপ করে ফিরে এলুম আমার কর্মস্থলে। আমার মতো আর একটা লোক আছে যে, জোর করে আমার স্ত্রীকে ভোগ করেছিল। কে সেই রাসকেল।

তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে নিশ্চয় আমার শ্বশুর বাড়ির তরফের কেউ। সাহস করে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেও পারছি না। একদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কায়দা করে, দেওয়ালের ছবি, অ্যালবামের ছবি সব দেখলুম। নাঃ কোথাও আমার মতো চেহারার কেউ নেই।

সেই দিন, সেই দিনের কথা আমি কোন দিনও ভুলব না। সেদিন আমি মরীয়া। হয় এসপার না হয় ওসপার। আমার স্ত্রী শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ঢুকলুম। কবজায় তেল কমেছে। সামান্য শব্দ হতেই ফিরে তাকাল। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'তোমার কাছে আজ একটা সত্য জানতে চাই। বিয়ের আগে আমার মতো চেহারার কেউ একজন তোমাকে রেপ করেছিল। কে সে? আমি জানতে চাই কে সে?'

ছোট্ট একটা উত্তর পেলুম 'ছোটলোক। ইতর।'

পরের দিনই আমার স্ত্রী চলে গেল। চলে গেল বাপের বাড়ি। সে আর এখন আমার স্ত্রী নয়। কোনও সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। আমি কেবল খুঁজতে লাগলুম, কে সেই লোক! যে আমার আকৃতি নিয়ে আমারই সর্বনাশ করে গেল। মেয়েটাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বড় মিষ্টি ছিল সে।

আমি পাগলের মতো খুঁজতে লাগলুম। তাকে আমার চাই। সেই লোকটাই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান। আমি কোথায় পাব তারে। সেদিন মাঝরাতে আমার নির্জন ঘরে তাকে পেয়ে গেলুম। আয়নার সামনে দাঁড়াতেই তাকে পেয়ে গেলুম। সেই বিশ্রী, কামুক, লোকটা ফুলো চোখে বিষম বিপন্ন মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চিৎকার করে বললুম, 'রাশকেল।'

কোলনের শিশিটা ছুঁড়ে মারলুম তাকে। ঝনঝন শব্দ করে আয়নাটা ভেঙে পড়ল। লোকটা আর নেই। সারা ঘরে ভুর ভুর করছে বিলিতি কোলনের গন্ধ। মারতে পেরেছি। যতক্ষণ না আর একটা আয়না আসছে ততক্ষণ সেই লোকটা মৃত। যে আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেছিল।

নীপার বক

একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। যেন খণ্ড প্রলয়। চারপাশে থই থই জল। রাস্তাঘাট নেই। সব মুছে গেছে। ঘোর অন্ধকার। মাথার ওপর ঝুলছে রান্নাঘরের ছাদের মতো কালো, নোংরা আকাশ। অসংখ্য গাড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি ভেজা গাড়ির চাল সৈনিকের মাথার হেলমেটের মতো চক্ চক্ করছে। কি অবস্থা। এখন দেখছি, সেকালের ডাকাতদের মতো এক জোড়া রণপা কিনতে হবে। রোরবার-রোববার, বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠে অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে চাকরি-বাকরি আর করা যাবে না।

'তা কতক্ষণ হবে মশাই আটকে বসে আছি। আমার ঘড়িটা আবার গত রবিবার মেচেদা লোক্যালে, সাঁতরাগাছির কাছে ছেনতাই হয়ে গেছে।'

ওপাশের ভদ্রলোক বললেন, 'তা দেড়ঘন্টা হল।'

'দিস ইজ ক্যালকাটা। দিস ইজ ইওর ক্যালকাটা। এই দেড়ঘন্টায় প্লেনে দিল্লি চলে যাওয়া যায়। রাজীব নিশ্চয় এখন ডিনার খাচ্ছে!'

'আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী? একবার দেখুন না মশাই উঁকি মেরে, জলের লেভেলটা। টনসিল টাচ না করলে নেমে পড়ি।'

'তারপর?'

'খপাত খপাত।'

'শেষে গর্তে ঘপাত। অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স করা আছে?'

'তা না হলে চুপচাপ বসে থাকুন। বসার জায়গা পেয়েছেন, ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল সকালে পেছন ফিরে বসবেন, অফিস পৌঁছে যাবেন। ঘন্টাখানেকের জন্যে বাড়ি ফিরে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। আজ তো আর মাস পয়লা নয় যে, এসো হে, এসো হে বলে, ভিজে ঢোল, কাদা-মাখা মালটিকে কোলে তুলে নেবে, আর জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁগা শুকনো আছে তো ? ভেজেনি তো ? তুমি ভিজে ব্লটিং মেরে যাও ক্ষতি নেই। মাইনের টাকাটা যেন শুকনো থাকে।'

পেছনের সিটে এই সব রম্য আলোচনা হচ্ছে। তার সামনের জোড়া আসনে এক জোড়া কপোতকপোতী। মাথায় মাথা ঠেকাঠেকি করে ভি হয়ে বসে আছে। তাদের কাছে এই জল, এই আটকে যাওয়া বাস যেন বিধাতার আশীর্বাদ। প্রেমির প্রেমিকাদের পেটে যে কত কথা জমে থাকে। শেষ আর হয় না। প্রেমালাপ আর ঝগড়া দুটোরই আদি অন্ত থাকে না। আজকাল আবার জনসমক্ষেই সব চলে। সেদিন দেখি রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রবেশদ্বারে ঠোঁটে ঠোঁট লক করে একজোড়া পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন বললেন, 'এইটা কি এই সব করার জায়গা ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'সিনেমায় চুম্বন, সেনসার আর কাটছে না।'

আর সামনের আসনে এক ভদ্রলোক নোটবুক বের করে হিসেব লিখছেন। বোধ হয় লোহার কারবারী। লোহা এখন সোনা। সে যুগে মানুষ সোনার সন্ধানে ছুটত, এ যুগের মানুষ ছুটছে পার্কের রেলিং খুলতে, ম্যানহোলের-ঢাকনা সরাতে। প্রস্তরযুগ, স্বর্ণযুগ সব যুগ শেষ হয়ে এখন পড়েছে লৌহ যুগ আর চুম্মুর যুগ। সিনেমার নায়ক গান ধরে, চুম্মু খাও, চুম্মু, চুম্মু খাও চুম্মু, আর ইয়ং অডিয়েন্স্ তাল মারে।

আমার বাঁপাশের ভদ্রলোক মিনিট পনেরো আগে তোফা নস্যি টেনে দিব্যি ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার ছাড়লেন, 'হ্যাঁ গা ঘরের, জানলা বন্ধ করে এসেছিলে ?'

ও মাথা থেকে নারীকণ্ঠে ভেসে এল 'না, কটা খুলে রেখে এসেছিলুম।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর গলা নকল করে বললেন, 'রেখে এসেছিলুম। বেশ করেছিলে। গিয়ে দেখতে সব কালিয়া হয়ে গেছে।'

ও মাথা হেঁকে উঠল, 'কে জানত এমন বৃষ্টি নামবে। আমি কি জ্যোতিষী !'

ইনি সঙ্গে সঙ্গে ছক্কা মাড়লেন, 'তুমি আমার নিয়তি।'

বাসের পেট থেকে অদৃশ্য কণ্ঠ উৎসাহ দিল—'চালিয়ে যান দাদা, জ্বালাময়ী জ্বালিয়ে দিন।' ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। আবার এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, আপন মনে 'যাঃ শালা মরগে যা। আমার কি। বিছানা পাওয়া হয়ে গেল। ধরবে যখন বাতে, তখন মুখের বাত বেরিয়ে যাবে।'

আবার বেশ তোড়জোড় করে ঘুমোবার তালে ছিলেন, ও মাথা থেকে নিয়তির কণ্ঠ ভেসে এল, 'ছাতাটা তুলেছিলে তো ?'

ভদ্রলোক কেমন যেন চুপসে গেলেন, খোঁচা খাওয়া বেলুনের মতো। আমতা আমতা করে বললেন, 'ছাতা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ছাতা। জানি জানি, ওটা যখনই তোমার হাতে গেছে তখনই আমি জানি

মায়ের ভোগে।' মেয়েরা আজকাল মডার্ণ ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তা হলে সোনাদের বাড়িতেই পড়ে রইল।'

'আজ্ঞে না, ওদের বাড়ি থেকে যখন বেরুলে তখন ছাতা তোমার হাতে। সে ছাতা এখন বেহালার ট্রামে চাপছে।'

আমি বললুম, 'বেকায়দায় পড়ে গেছেন দাদা। এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকও কম যান না। ইনি হলেন সেই টাইপ। হারবো বললেই হারেগা, খামচে খুমচে মারেগা।' চিৎকার করে বললেন, 'আমার ছাতা আমি বুঝবো। পাখির খাঁচাটা কোথায় পড়ে রইল, বাইরের বারান্দায়!'

কলকাতার টেলিফোনের মতো, ওপাশ থেকে 'নো রিপ্লাই'।

মধ্য বয়সী ভদ্রলোক ফোলাভোলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দিলুম। একে বলে তুরুপের তাস।'

'কে বেশি হারে?'

'সে যদি বলেন, তা হলে আমিই বেশি হারি। আমি ঠিক পারি না মশাই। মহিলা ট্যাক্‌ল করা খুব কঠিন ব্যাপার, মোহনবাগানের মতো অবস্থা হয়। কাটিয়ে কাটিয়ে গোলের কাছে নিয়ে এলুম। সিওর গোল। মেরে দিলুম গোলপোস্টের বাইরে। অসংখ্য ছেঁদা মশাই। অসংখ্য ছেঁদা।'

'আমার স্বভাবে। এত ছিদ্র নিয়ে জেতা যায়। অসম্ভব!'

ভদ্রলোক আর একবার নস্যি নিলেন সশব্দে। তারপর কোণের দিকে হেলে গিয়ে আবার এক রাউন্ডে ঘুমের আয়োজন করলেন।

ও মাথা থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'এবার নেমে পড়লে হয় না? সারা রাত বসে থাকবেনা কি?'

আড় হয়ে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঁতার জানা আছে কি?'

ওপাশে দুই মহিলাতে কথা হচ্ছে, একজন আর একজনকে বলছেন, 'ভাই, আমাকে এই জল ঠেলে যেভাবেই হোক যেতে হবে। ছেলেটা এতক্ষণে মা, মা করে ঘুমিয়েই পড়ল হয়তো। সারাটা দিন ওই কাজের মেয়েটির কাছে থাকে। মারধোরও করে। এই চাকরি, সংসার এক সঙ্গে সামলানো যায়!'

'ছেড়ে দে না।'

'ওব্বাবা, চাকরির জোরেই বিয়ে। ছেড়ে দিলেই মারবে লাথি।'

না আর না, এবার উঠে পড়ি। যেমন করেই হোক বাড়ি তো ফিরতে হবে। সব পাখি ঘরে ফেরে। বাসের পাদানিতে ঘোলা নোঙরা জল ছলকাচ্ছে। পাশেই এক বিকল মটোরগাড়ি। পেছনের আসনে মোটাসোটা বদমেজাজী ভদ্রলোক, ক্রমান্বয়ে ঠোঁট নেড়ে চলেছেন। স্টিয়ারিং-এ অসহায় ড্রাইভার।

ধীরে ধীরে নিজেকে দুই গাড়ির মাঝখানের খালে নামালুম। হাঁটু জল। তলায় ভাঙাচোরা রাস্তা। জল-বেশ ঠাণ্ডা। স্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠল। উপায় নেই। পড়েছি যবনের হাতে। চারপাশে শুধু অচল গাড়ি। সাদা, নীল, লাল, ঘেয়ো, তালিমারা,

তাপ্পিমারা, মেহনতী স্টেটবাস। একটা ফুলসাজ-গাড়ীতে চন্দনচর্চিত বর। বড়ই উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি। লগ্ন বয়ে যায়। বরকর্তার ঠোঁটে সিগারেটের আগুন জ্বলছে নিভছে। উত্তেজনার টানাপোড়েন। গালে জলজল মতো কিসের ছিটে লাগল। ওপরে তাকালুম। ডবলডেকারের দোতলা থেকে থুতু বৃষ্টি হচ্ছে।

এ গাড়ি সে-গাড়ির মাঝখান দিয়ে নিজেকে রাস্তার বাঁপাশে এনে ফেললুম। ভয়াবহ অঞ্চল। জল হাঁটু ছাড়াল। তলায় হড়হড়ে কাদা। অদূরেই ফুটপাথের ধ্বংশাবশেষ। ভাঙা রেলিং। জনগণের ট্রাস্টিরা যতটা পেরেছে খুলে নিয়ে গেছে। সেলিং ন্যাশনাল প্রপার্টি একটা ভাল ব্যবসা। মূলধনের প্রয়োজন নেই। শুধু মেহনত। ফুটপাথের নিরাপত্তায় হাঁটার আশা ছেড়েই দিলুম। নিজের পশ্চাদ্দেশে বারকতক চাপড় মেরে বললুম, বল বীর, বল উন্নত মম শির। তারপর পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'ভয়ে ভীত হয়ো না। মানব।' খোয়ার ঢিবিতে পা পড়েছিল। জলের তলায় রাস্তার ভূগোল পৌরপিতাও জানেন না আমি তো তাঁর নাবালক সন্তান। বলো, রাখে কেষ্ট মারে কে। বাঁপাশে একটা বড় ঢনঢনিয়া মার্কা বাড়ির তলায় মেহনতী মানুষের জটলায় কল্কে ফাটছে, ব্যোম শঙ্কর। কল্কে একমাত্র জিনিস, যার কৃপায় কাটফাটা রোদেও মানুষ গান ধরতে পারে—আহা, 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।'

কলকাতার বন্দরে বড় বড় জাহাজ ভেড়াবার জন্যে পাইলট দরকার হয়। আমাকে এখন কোন পাইলটে নিয়ে যাবে। আমি তো আর কলম্বাস নই, যে ভাসতে ভাসতে আমেরিকা চলে যাব। অথৈ জলে গামলার মতো আমার টালমাটাল অবস্থা। বিশ—তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় তিন চার কদম এগিয়েছি। একটা ঠং ঠং রিকশা পাকড়াবার চেষ্টা করলুম। পাত্তাই দিলো না। দিলেও সামর্থ্যে হয় তো কুলোত না। কলকাতার রিকশা আর ট্যাকসি খদ্দের চেনে। মাতাল না হলে ওদের নেকনজরে পড়া অসম্ভব।

জয় মা বলে আরও দু-দশ পা এগোবার পর মনে হল, জলে স্রোতের টান ধরেছে। তার মানে সামনেই খোলা ম্যানহোল। কলকাতার পেটে যাবার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। আলকাতরার মতো অন্ধকার। ছায়ামানবেরা নন্দী, ভৃঙ্গীর মতো ধূসর প্রেক্ষাপটে নাচছে। কলকাতার রসের গামলায় মানুষের লেডিকেনির টাপুরটুপুর অবস্থা।

একটি বেপরোয়া চরিত্র পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অমন গাগরি ভরণে কে যায় ও চালে চললে রাত ভোর হয়ে যাবে মশাই। এ তো কিছুই নয়, সামনে—ফায়ার ব্রিগেড। সেখানে আপনার কপনি ডুবে যাবে।' ভদ্রলোক গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলেন প্রপেলার লাগানো বোটের মতো। তার সঙ্গে সঙ্গে যাও বা এধারে ওধারে দুচারটে আলো জ্বলছিল লোডশেডিং-এর ফুঁয়ে সব ধ্বংস হয়ে গেল। চারপাশ থেকে হো করে একটা শব্দ উঠল। নিচে ভরা চিত্তরঞ্জন নদী চার পাশে খাড়া খাড়া বাড়ি, মনে হল নরক থেকে ভয়ঙ্কর একটা সোরগোল, উঠে, ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গমগম করছে।

আমি অসহায়। কি ভেবে জানি না, তিনবার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ বললুম, বেশ জোরে জোরে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পেছন থেকে কে একজন জড়ানো গলায় বললেন, 'কমরেড, বিপ্লব শুরু হল, না শেষ হল?'

একেবারে কাঁধের পাশে। নাকে ভক করে গন্ধ লাগল।

মালুদা হঠাৎ শাসনের গলায় বললেন, 'হেডলাইট, ব্যাকলাইট ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছ বাওয়া। তা থামলে কেন সোনার চাঁদ। পাম্পে গিয়ে আমার মতো পেট্রল নিয়ে এসো। ট্যাঙ্কে মাল নেই বাওয়া মুফতে মাইল মারবে? মামার বাড়ি! ভাগনে! এটা মামার বাড়ি!'

মাতাল আর দাঁতাল দুটোই ভীতিপ্রদ। আমার স্পিড সামান্য বাড়ল। মাতাল তবু সঙ্গ ছাড়ে না। প্রায় পাশে পাশে ঘাড়ে ঘাড়ে। মন্দ কি। সামনে সামনে সামনে চলুক না। গাড্ডায় পড়লে সাবধান হওয়া যাবে। ওব্বাবা জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিক। আমি মন্থর হলে তিনি থেমে পড়েন। আবার হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে, 'নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনও বাকি'।

ফায়ার ব্রিগেডের কাছাকাছি এসে গানের বাণী পাল্টে গেল, 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে পেন্ডুলাম ভেজাবো না।' কি মানে কে জানে। খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, 'কমরেড আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন জানি না, আমি বাড়ি যাবার চেষ্টা করছি।'

'আমি তা হলে কোথায় যাচ্ছি। রসাতলে। আমি কে? বলতে পার আমি কে।'

'আপনি অবতার।'

'ধুস্, আম শ্যামার বর। তুমি কমরেড কার বর?

'নীপার বর।'

'তুমিও বর আমিও বর। মাইণ্ড ইট বরযাত্রী নই। তোমার পেট খালি?'

'একেবারে খালি।'

'ষ্টপ। ষ্টপ আর এক পা এগিয়ও না। ডুবে যাবে। পেটে মাল নেই, কি সাহস। সমুদ্র পার হবে?'

'আমার বউমাকে বিধবা করবে। নিষ্ঠুর। তুমি কি নিষ্ঠুর।'

ভদ্রলোক হাপুস হাপুস করে কাঁদতে লাগলেন। পরনে দামী জামাপ্যান্ট। গায়ে বিলিতি সেন্টের গন্ধ। আর আমার দরকার নেই, খুব হয়েছে। জল প্রায় কৌপিন স্পর্শ করেছে। আমি মরীয়া হয়ে সামনে এগোচ্ছি। মেছোবাজারের খালি ফলের টুকরি দুলতে দুলতে ভাসছে। আকাশ আবার ঘোর হয়ে এসেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা নামল বলে। লম্বা একটা বাঁশ উঁচু হয়ে আছে। ম্যানহোল সঙ্কেত। দূরে একটা বাড়ির সর্বাঙ্গে আলোর ঝালর ঝুলছে। তার মানে ও তল্লাটে লোডশেডিং হয়নি। বিয়ে বাড়ি। লোকজনের কালো কালো মাথা নড়ছে চড়ছে। গাড়ির গুঁতোগুঁতি। চিৎকার চেঁচামেচি। সিনেমা ভেঙেছে। ঠোঁটে ঠোঁটে হিন্দি গানের কলি। ওই অন্ধকারেই কে একজন সুরেলা গলার গেয়ে উঠল, গিলে লে গিলে লে, আরো, আরো গিলে লে; আর কি গিলবে বাবা, সারা কলকাতাটাই তো গিলে ফেলেছে। ডানপাশে পাতাল রেলের সাজসরঞ্জাম, যেন ময়দানবের কারখানা। হলদে শাড়ি পরা স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়েকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এক কাপ্তেন বলছে, 'ওর ভেতর জাপানী আছে। এপাশ থেকে ফুটো করতে করতে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মেয়েটি অমনি বাওয়া ধরল, 'আমি জাপানী দেখব। ও হুলোদা, আমি জাপানী দেখব।'

ছেলেটি বললে, 'বাড়ি চল। তোর মা তা না হলে জাপানী দেখাবে।'

অন্ধকার সমুদ্র থেকে ভেসে এল মাতালের কণ্ঠস্বর—'নীপার বর, কোথায় পালালে বাওয়া। শ্বশুরবাড়ির পাড়া যে এসে গেল।'

মালের ট্যাঙ্ক আর প্যাটন ট্যাঙ্ক দুই অপ্রতিরোধ্য। মাতাল ঠিক চলে এসেছে। বাঁপাশে লাল আলোর এলাকা। এদিকে তেমন জল নেই। সব নেমে গেছে পাতাল রেলের গর্তে। অন্ধকারে বিশাল এক চেহারা যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠল, 'লাগবে না কি স্যার, তেরো থেকে তেত্রিশ।' কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলুম। ফ্রক পরা তের চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে ঘুপটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সিগারেটে পাকা টান লাগাচ্ছে। আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

অন্ধকারে আব.՚ আর্তনাদ—নীপার বর, কোথায় গেলে বাওয়া।'

পাড়ায় এসে ঢুকলুম। আলো আছে। ঢোকার মুখেই ছাইগাদা। বৃষ্টিতে ধোলাই হয়ে পরিচ্ছন্ন কয়লার সুন্দর কৃষ্ণ চাউনি। ঝড়ে আর জলে মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার অলঙ্কার ছিন্নভিন্ন হয়ে ভিজে পথে ছড়িয়ে আছে। একটু আগেই এ-পাড়ার কেউ হয়তো চিরবিদায় নিয়েছেন। সাদাফুলের পাপড়ি আর খই পড়ে আছে।

বিশু ময়রার দোকানে গরম রসগোল্লা রসে ফুটছে। বেঁচে অখণ্ড অবস্থায় ফিরছে। পুরোটাই আমার কৃতিত্ব। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারতুম। গর্তে সমাধি হতে পারত। নিশাচরে নাঙ্গাবাবা করে দিতে পারত। প্রায় পুর্নজন্ম। হোক শেষ মাস। দশ টাকার গরম রসগোল্লা কিনে ফেললুম। আর এক খদ্দের বললেন—'আজ আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে।'

বিশু বললে—'আপনার বালতিতে ছেঁদা ছিল। ওই দেখুন আমার ছ'লিটার বালতি বাইরে বসানো আছে। ভরে উপচে পড়েছে।'

জলে ভিজে প্যান্ট ব্রিচেস। পা জলে চুপসে চামচিকে। হাতে গরম রসগোল্লা। একবার কড়া নাড়লুম। কেউ বললে না 'যাই।' উপন্যাসের বিরহিণী নায়িকার মতো কপালে সজল টিপ পরে, ঘরে প্রদীপ জ্বেলে, গবাক্ষে কেউ প্রতিক্ষায় নেই। জানালার যে অংশের জোড়, বার্ধক্যে ফাঁক হয়ে গেছে, সেই চিলতেতে জোরালো নীল আলোর নাচানাচি। টিভি-তে সাংঘাতিক কোনও বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান চলেছে। দুয়ারে নীপার বর কেঁপে মরছে।

আবার কড়া। ভেতর থেকে প্রলম্বিত প্রশ্ন—'কে-এ-এ।'

আশ্চর্য। এখন আমি ছাড়া আর কে আসবে। আমি যে আসতে পারি, এ বোধটাই নেই। হায় সংসার ! না, ধরেই নিয়েছে, গরু যখন হোক গোয়ালে ফিরবেই। গম্ভীর গলায় বললুম, 'আমি'।

ভেতর থেকে আদুরে এলানো উত্তর 'যাই' টিভিতে একগাদা 'দামড়া' ভাঁড়ামো করছে।

খুট্ করে দরজা খুলে গেল। বউ নয় শালী। কখন এসেছে কে জানে। ভেতর থেকে বোনের প্রশ্ন—'কে রে ? ও।'

আমি আমার বউয়ের পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছি। জোড়া হয়ে আছে। টিভির পর্দার আধখানা। সেই অর্ধাংশে এক দেহাতী মহিলা হাঁউহাঁউ করছে। নীপা আধ শোয়া হয়ে টিভি-দেখছিল। উঠে এল রাজহংসীর মতো। যেন ডিমে তা দিচ্ছিল। সোনার ডিমে।

'কি গো এত দেরি হল?'

প্রশ্ন শুনে গা জ্বলে গেল। শালীকে সাক্ষী রেখে কড়া কথা চলবে না। দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন—'তোমাদের এদিকে বৃষ্টি হয়নি।'

'একটু হয়েছে। অ, তাই বুঝি তুমি ভিজে গেছ?'

আমি ঢোকার জন্যে পা তুলেছি, নীপা হাঁ হাঁ করে উঠল—'ঢুকো না, ঢুকো না। রাস্তার জল, রাস্তার জল।' ওই এক পা তোলা অবস্থায়, আমি সেই বিখ্যাত হিন্দিগানের রূপান্তরিত কলি—'তেরি দুয়ার খাড়া এক যোগী [যোগী নয় বক]'। নীপার বক।

আর সেই অবস্থাতেই দেখলাম—একটু আগেই মৌজ করে সব চিঁড়ে ভাজা খেয়েছে। খালি কফির কাপ। ফুলকাটা ডিশে লাল একটা ভাজা লঙ্কা। আর টি ভি গাইছে—ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী।

প্রেম আর ভূত

অনেক শুকনো পাতা পড়ে আছে পার্কের বেনচে। বছরের এই সময়টায় গাছ পাতা ঝরায়, নতুন সাজে সাজবে বলে। জলের ধারে ধারে কচি কচি ঘাস গজিয়েছে। লেকের জলেও কিছু শুকনো পাতা আনমনে ভাসছে। দিব্যেন্দু বেনচে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতার ওপরেই বসে পড়ল। দুপুরের রোদ হলুদ নেশার মতো ঝিমঝিম করছে চারপাশে। লেক এখন ফাঁকা। বাতাসে শীত শেষের গরম হল্কা। আজ তো আর ছুটির দিন নয়। কারা আর আসবে এখন, এই লেকে বেড়াতে। দূরে একটা গাছের তলায় একটা ছেলে আর মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। নতুন প্রেম : দেখলেই বোঝা যায়। যা কথা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। হাতে হাত রেখে দুজনে বসে আছে। বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত।

দিব্যেন্দু চোখ সরিয়ে নিল। ভাবতে লাগল, একটা বছর কোথা দিয়ে কী ভাবে চলে গেল। এই সেই বেনচ। দিব্যেন্দু চিড় ধরা কাঠের দিকে তাকাল। কত দিন, কত কত দিন, সে আর স্মিতা এই আসনে পাশাপাশি বসে গেছে। আজ সে একা আর কিছু ঝরা পাতা। দিব্যেন্দু আজ এসেছে, পুরানো দিনের স্মৃতিতে ফিরে যাবে। মাঝে মাঝেই আসে, হিসেব করে, যখন তেমন কেউ থাকেনা। কেউ বুঝতেও পারে না, কেন সে এসেছে! মানুষকে মানুষ দ্যাখে, তার মন তো কেউ পড়তে পারে না। একটা লোক বসে আছে, এই মাত্র। হয় বেকার! না হয় কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সময়টা কাটিয়ে যাচ্ছে।

গতকালই দিব্যেন্দু উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছে কলকাতায় কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে! সেখানে দিব্যেন্দু একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। এই চাকরিটা সে যদি আর কিছু দিন আগে পেত ; তাহলে তার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। সে ভীরু, না স্মিতা ভীরু। বহুবার চেষ্টা করেছে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে। খুঁজে পায়নি সমাধান। মেয়েরা প্রেম চায়, না

নিরাপত্তা। একটা ভালো চাকরি, একটা ফ্ল্যাটে, নিটোল একটা সংসার !

'ঝাল-মুড়ি আর চীনেবাদাম খেয়ে তো আর সারা জীবন কাটানো যায় না !'

এই বাঁ পাশটিতে বসে ঠিক এই কথাই বলেছিল স্মিতা। সেই ছিল ওদের শেষ বসা।

'তুমি এই কথা বলছ কেন স্মিতা ! চাকরি আমি একটা পাবই।'

'তিন বছরেও পেলে না। তোমার সে ক্যালিবার নেই। মুখচোরা, লাজুকরা এ-বাজারে চাকরি পায় না।'

'তুমি আর ছটা মাস আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'আমি রাজি হলেও আমার বাড়ি রাজি হবে না।'

'তুমি রাজি করাবে।'

'আমি তিন বছ ঠেকিয়ে রেখেছি। আর কত রাখবো ! আর কতকাল খোলা আকাশের নিচে হাত ধরে বসে থাকবো !'

'আমরা দুজনেই যদি বাড়ি ছেড়ে এসে একটা কিছু করি।'

'দিব্যেন্দু, বিয়ে করতে সময় লাগে মাত্র পনের মিনিট ; তারপর ? কোথায় গিয়ে উঠবে ! হাওড়া স্টেশানের ওয়েটিং রুমে। খাবে কি ! খাওয়াবে কি !'

'কোথাও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করবো।'

'ছ'শো টাকার কমে ভদ্রলোকের থাকার মতো আস্তানা হয় না। কোথায় পাবে অত টাকা !' দিব্যেন্দু আপন মনে হেসে উঠল। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল স্মিতা তার পাশ থেকে উঠে চলে যাচ্ছে। নীল শিফন শাড়ি মোড়া অনিন্দ্য একটি শরীর। রেশমী চুলের আলগা খোঁপা নিটোল ঘাড়ের কাছে অল্প অল্প দুলছে। তীক্ষ্ণ নাক। টানা টানা চোখ, ধনুকের মতো ভুরু। শালুকের ডাঁটির মতো লতানো দুটি বাহু। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে চুলে। আগুনের সুতোর মতো ঝিলমিল করছে। দিব্যেন্দু স্মিতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল স্মিতার দূর থেকে দূরে চলে যাওয়া। তার হৃদয় থেকে একটা নরম পাখি যেন উড়ে চলে গেল। স্মিতার বাবা ডাক্তার। স্মিতার ঠাকুরদা ছিলেন হাইকোর্টের জজ সাহেব। বিলেতটিলেত ঘুরে বেড়াতেন। সাহেবী কেতার মানুষ ছিলেন। এই ধরনের নীল রক্ত যার শরীরে তার মনে বাঁধন ছেঁড়া বেদুইন-প্রেম থাকে কি করে, কি করে ! দিব্যেন্দু হাত বাড়িয়ে ছিল কার দিকে ! আজ দিব্যেন্দু যেভাবে বসে আছে একা, সেদিনও এইভাবেই বসেছিল স্থির সমাধি-ফলকের মতো। শেষ শীতের বাতাসে ঠাণ্ডার কামড়। সন্ধ্যে হয়ে গেল। ঝাপসা একটা চাঁদ ঠেলে উঠল পূব আকাশে। কুয়াশার অশরীরী আঁচল নেমে এল লেকের জলে।

স্কুল শিক্ষকের ছেলে দিব্যেন্দু স্কটিশচার্চের মেধাবী ছাত্র ভেবেছিল, লেখাপড়ায় ভালো হলেই বুঝি, ভালো একটা চাকরি হেঁটে এসে হাত ধরবে। পৃথিবীর সঙ্গে বেশ কয়েক দিনের ঘষাঘষিতে দিব্যেন্দু বুঝে গেল দুটো জগৎ পাশাপাশি ঘুরছে, কল্পনার জগৎ আর বাস্তব জগৎ। বাস্তব জগতের চাঁদে কবিতা নেই, আছে অজস্র, অতল, অন্ধকার গহ্বর। সূর্য আলো না দেখালে চাঁদ পৃথিবীতে রাতের রূপালি আলো ঢালতে পারে না। সূর্য হল সোনার চাকতি। চাঁদির চাকতি ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ এক অচল পশু।

স্মিতা ছিল তার সহপাঠী। দিব্যেন্দু স্মিতাকে কবিতা লিখে শোনাত। কলেজ

সোস্যালে কাঁপা কাঁপা গলায় আবৃত্তি করত। অত শ্রোতার মধ্যে একমাত্র স্মিতাকেই সে শোনাত। পড়াশোনার নড়বড়ে স্মিতাকে ঘন্টার পর ঘন্টা লজিক আর ফিলজফি পড়াত। আর মনে মনে ভাবত, স্মিতাকে বউ করবে। ছোট্ট নিখুঁত একটা সংসার। দোতালার বারান্দায় অর্কিড দোল খাবে। ছাদের টবে গোলাপ হাসবে। জানালা দিয়ে ধপধপে চাঁদের আলো এসে পড়বে সাদা বিছানায়। আকাশে, চাঁদ, স্মিতার ছোট্ট কপালে রূপালি টিপ। ভিজে ভিজে গোলাপী ঠোঁট। শরীরে সমুদ্রের ঢেউ। দিব্যেন্দু একদিন স্মিতার কাছাকাছি আসতে চেয়েছিল। সেইদিনই বুঝেছিল স্মিতা কত সাবধানী। দিব্যেন্দুকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ, অমন করতে নেই।' দিব্যেন্দু সেদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। মনে হয়েছিল, সে এক কাঙাল। পরে ভেবেছিল স্মিতা ঠিকই করেছে। প্রবল আকর্ষণে মানুষ বোধবুদ্ধি হারায়। তৃতীয় একটি প্রাণ এসে গেলে কে সামলাতো !

স্মিতা চলে গেলেও পদচিহ্ন রেখে গেছে। মানুষের মন তো আর সমুদ্রের বেলাভূমি নয় যে, ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যাবে। মন হল কাঁচা সিমেন্টের মেঝে। দাগটা ছাঁচের মতো থেকেই যায়। যতই পালিশ করো অস্পষ্ট ফুটেই থাকে। আলোর বিপরীতে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। দিব্যেন্দুর মন সেই দাগ ধরা মেঝে।

স্মিতার খবর সে আর রাখার চেষ্টা করেনি ; তবু খবর-তো উড়ে উড়ে আসবেই। খবর আর তুলোর ফুলে বিশেষ তফাৎ নেই। সিমূল যখন ফাটে বাতাসে পাখনা মেলে দেয় অজস্র বীজ। স্মিতা এক পাঞ্জাবী ধনকুবেরের ছেলেকে পাকড়েছে। কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, তিনটে শহরে তাদের বড় বড় তিনটে হোটেল। মানালিতে বিশাল আপেল-বাগান। তাদের পরিবারের প্রত্যেকের একটা করে গাড়ি আছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাড়ি। এক উর্দু কবি বলেছিলেন, 'প্রেমিকা যদি সুখে থাকে প্রকৃত প্রেমিকার তো তাইতেই আনন্দ। বিবাহ প্রেমের কবর রচনা করে ; দিব্যেন্দু অতটা ওপরে উঠতে পারেনি। কবি বলেছিলেন, 'প্রেমিকাকে বউ হিসেবে কাছে পাওয়ার চেয়ে তার স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন অবিবাহিত থাকাই স্বর্গীয়।' দিবেন্দ্যু ভেবেছিল বিমলের মতো আত্মহত্যা করবে। বিমল তারই কলেজে সিনিয়ার ছিল। নামকরা ছাত্র, আবার ডিবেট চ্যাম্পিয়ান। বিমল ভালবাসত মাধুরীকে। মাধুরী ভালবাসত পার্থকে। মাধুরীর প্রেমের পাল্লা হঠাৎ পার্থর দিকে বেশি ঝুঁকে গেল। একদিন খুব ভোরে দেখা গেল, হেদুয়ার রেলিং-এ মাথা রেখে বিমল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে ঘুম আর ভাঙল না। পকেট থেকে বেরুলো সামান্য এক চিরকূট। একটি মাত্র লাইন—'আমি হেরে গেছি।' ডক্টর চ্যাটার্জির সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিল বিমল। তিনি খবর পেয়ে বলেছিলেন—'প্রেম এক ধরনের পাগলামি। মরে বেঁচেছে।' এই শেষ উক্তিটিই দিব্যেন্দুকে বেঁচে থাকার শক্তি জুগিয়েছে। দিব্যেন্দু তখন উর্দু কবির নির্দেশে স্মৃতি নিয়ে অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত আত্মস্থ করে ফেলেছে। উত্তরবঙ্গের ছবির মতো শহরে, ছবির মতো এক কাঠের বাড়িতে দিব্যেন্দুর বসবাস। মাইনেও পাচ্ছে ভালো। সম্মানের চাকরি। তবু চিউইংগামের মতো স্মিতা আটকে আছে স্মৃতির চুলে। রাতে বড় একা লাগে। উত্তরবঙ্গে গিয়ে দিব্যেন্দু আবিষ্কার করেছে তার ভূতের ভয় আছে। রাতে কোথাও একটু খুট্ করে আওয়াজ হলে, তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তারস্বরে রামনাম

জপতে থাকে ! এমন কি ছেলেবেলার ছড়াটাও—'ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি, বুকে আছে রাম-লক্ষ্মণ ভয়টা আমার কি ?' এই ভূতের জন্যেই তাকে না বিয়ে করতে হয় !

দিব্যেন্দু ঘড়ি দেখল। নারসিং হোমে বিকেলের ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়ে গেছে। দিব্যেন্দু উঠে পড়ল। গাছের তলায় তলায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পথের দিকে। বেশ লোক চলাচল করছে। শহরের পথে বিকালের টান ধরেছে। দিব্যেন্দু হাঁটাতে হাঁটতে চলে এলো নারসিং হোমের সামনে। সম্প্রতি চশমা নিয়েছে। মুখটা বেশ ভারি দেখাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার জলবাতাসে স্বাস্থ্যটাও বেশ ফিরে গেছে। স্মিতার স্মৃতি মনকে কাবু করলেও শরীরকে কাবু করতে পারেনি, শরীর শরীরের কাজ ঠিকই করে চলেছে। নারসিং হোমের বাগানমতো জায়গাটা পেরিয়ে দিব্যেন্দু দোতালায় ওঠার সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল। তেমন গলগলে ভিড় নেই। বেশ নির্জন নির্জন একটা ভাব। এই হোমে সাধারণত বড় বড় অফিসের কর্মীরা কোম্পানির টাকায় চিকিৎসা করাতে আসেন।

দিব্যেন্দু তিনতলায় উঠে ঘরের নম্বর মিলিয়ে এগিয়ে গেল। চওড়া বারান্দা। ডানপাশে সব ঘর। পেতলের অক্ষরে নম্বর মারা। বারান্দায় শেষবেলায় আলো প্রবীণ মানুষের মতো পায়চারি করছে। হাহা, খোলা আকাশে গাছের পাতার ঝালর বাতাসে দোল খাচ্ছে। দিব্যেন্দু আপন মনে চওড়া প্রশস্ত বারান্দায় এ-পাশ থেকে ও-পাশ একবার ঘুরে এল। তারপর এগিয়ে গেল ষোল নম্বর ঘরের দিকে। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলল। ওপাশেই বড় জানালা। দু'পাশে সরানো নেটের পর্দা। সেই আলোয় পাতা একটি খাট। ট্র্যাকসানে সটান শুয়ে আছে একটি মেয়ে। তার মাথার লম্বা চুল খাটের মাথার দিকে ঝুলছে। দিব্যেন্দু ভেবেছিল ঘরে কেউ না কেউ থাকবে। কেউই নেই। নেটের পর্দা মৃদু বাতাসে দুলছে। বসন্ত এসেছে শহরে।

দিব্যেন্দু সামান্য ইতস্তত করে ডাকল, 'মৃণাল।' মেয়েটি দরজার দিকে ঘাড় ফেরালো। তার দুটো পা-ই সামান্য উঁচুতে, ভারি ওজন ঝুলিয়ে টান করে রাখা।

দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকতেই স্প্রিং লাগানো দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দিব্যেন্দু ঘরের মাঝখানে। বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্যে আবার বললে, 'মৃণাল, আমি দিব্যেন্দু।' বহুদূর থেকে যেন মৃণালের গলা ভেসে এল, 'আসুন। আপনি কি করে এলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন।' দিব্যেন্দু চেয়ারটা টেনে এনে বসতে বসতে বললে, 'আমি তিন দিন হল এসেছি। মাসিমার কাছে শুনলুম তোমাকে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। তাই দেখতে এলুম। কেমন আছ তুমি ?'

মৃণাল দিব্যেন্দুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'সারা জীবনের মতেই বোধহয় পঙ্গু হয়ে গেলুম। হাঁটবার আশা আর নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা ! আপনি আসবেন আমি ভাবতেই পারিনি !'

মৃণাল একবার বাঁ হাত, একবার ডান হাত দিয়ে মাথার পাতলা বালিশের তলায় কি একটা খুঁজতে লাগল। দিব্যেন্দু বললে, 'কি খুঁজছো ?' উঠে গেল বিছানার কাছে। মৃণালের দু' চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে ফিসফিস করে বললে, 'রুমালটা যে কোথায় গেল !' বালিশের তলা থেকে পাতলা একটা রুমাল বের করে দিব্যেন্দু

সাবধানে মৃণালের চোখ মুছতে গেল। যত মোছে ততই জল বেরোয়! মৃণালের চোখ দুটো ভারি সুন্দর। দীর্ঘ আঁখি পল্লব। মৃণালকে দিব্যেন্দু যখন পড়াত, তখন তার এই চোখ দুটো তাকে ভীষণ আকর্ষণ করতো। সমুদ্রের মতো নীল আর গভীর। দীঘির মতো প্রশান্ত। দিব্যেন্দু বললে, 'তুমি কাঁদছো কেন মৃণাল!' 'আমি কাঁদিনি তো? আমার চোখে ঠাণ্ডা লেগেছে।'

দিব্যেন্দু রুমালটা মৃণালদের হাতে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল। মৃণাল কেন কাঁদছে তার মাথায় এল না। দুঃখ না আনন্দে! দিব্যেন্দু জানে মৃণাল তাকে ভালবাসত। পড়াতে পড়াতে সে বুঝতে পারতো, সম্পর্কটা শিক্ষক আর ছাত্রীর মতো থাকতে চাইছে না, অন্যদিকে বাঁক নিচ্ছে। দিব্যেন্দু সেই সময় স্মিতা ছাড়া আর কারোর কথাই ভাবতে রাজি নয়। মৃণাল কিন্তু স্মিতার চেয়েও দেখতে সুন্দরী। মুখটা ঠিক মা দুর্গার মতো। একটাই তফাৎ, দু'জনের ব্যক্তিত্ব দু'রকমের। মৃণাল শীতল, স্মিতা উত্তপ্ত। মৃণাল গিরি। স্মিতা আগ্নেয়গিরি। মৃণাল গভীর, স্মিতা চটুল।

দিব্যেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে মৃণালের ছোট্ট কপালে হাত রাখল। কপালের কিনারায় মসৃণ চুলের সীমানা। মেয়েটাকে কেউ একটা টিপও পরিয়ে দেয়নি। কে দেবে! মৃণালের মা আরথ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু। আত্মীয় স্বজনও বিশেষ কেউ নেই। দিব্যেন্দুর দিকে মৃণাল তাকিয়ে আছে এক নজরে। দু চোখ জল টলটলে।

দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'তোমার টিপ কোথায় গেল মৃণাল! টিপ পরলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।'

মৃণাল বললে, 'টিপ? টিপ হারিয়ে গেছে দিবুদা।'

মৃণাল দু'হাত দিয়ে দিব্যেন্দুর হাতটা চেপে ধরল।

দিব্যেন্দু বললে, 'তুমি ভেঙে পড়ছ কেন? আমি তো আছি!'

দিব্যেন্দুর হাতে মৃণালের হাতের চাপ বাড়ল।

দিব্যেন্দু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে এক ঝলক দমকা বাতাসের মতো ঘরে এল একটি যুবক। সুন্দর চেহারা। দেখলেই মনে হয় খেলাধুলো করে। ছেলেটি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। মনে হয় ছুটতে ছুটতে এসেছে। ঘরে ঢুকেই সে বললে, 'মৃণাল, আসতে আঠারো মিনিট দেরি হয়ে গেল। বিলিভ মি, এই জ্যামের জন্যে কলকাতা ছাড়তে হবে। জানো তো, ফুটপাথে স্কুটার উঠিয়েছিলুম বলে পুলিশ আমার কান মলে দিয়েছে। তোমার জন্যে আমি ব্যাটাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

ছেলেটি এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্যে থামতেই দিব্যেন্দুর দিকে চোখ পড়ল। এতক্ষণ সে মৃণাল ছাড়া আর কারোকে দেখেনি। পাগলের মতো সাত মাইল স্কুটার চালিয়ে এসেছে। পড়ি কি মরি করে। দিব্যেন্দুকে দেখে সামান্য থতমত খেয়ে গেল ছেলেটি। আরও কিছু বলতে গিয়েও বলা হল না।

মৃণাল বিছানার পাশে একটা হাত ঝুলিয়ে দিয়ে বললে, 'ভিক্টর! দিব্যেন্দুদা আমার মাস্টারমশাই ছিলেন।' ভিক্টর হাতজোড় করে নমস্কার করলেও, দিব্যেন্দুর মাস্টারমশাই পরিচয়টা তেমন ভাল লাগল না। মনে মনে সে নিজেকে যতখানি তুলেছিল ঠিক তেমনিই

নেমে এল নিচে। মাস্টারমশাই বলে মৃণাল তার প্রেমিক আমির পেটে ভোজালি মেরে দিয়েছে। মৃণালের শীতল কপালে হাত রেখে, তার পদ্ম-ভাসা, জল টলটলে চোখের দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দু তার জীবনের চরম কথাটি বলতে যাচ্ছিল—'মৃণাল, তুমি পঙ্গু হয়ে গেলেও আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আর প্রেম নয় এবার সেবা। সারাজীবন তোমাকে সেবা করার অধিকার আমাকে দাও মৃণাল।' ভেবেছিল খুব আবেগ দিয়ে, নাটক যে ভাবে করে, সেইভাবে বলবে। তার আবেগের বেলুন ফুটো করে দিয়েছে মৃণাল। মাস্টারমশাই! মাস্টারমশাই তো ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপের অধিকারী হতে পারে না। সে তো খুব নিন্দনীয় ব্যাপার। মৃণাল ততক্ষণে ভিক্টরের পরিচয় দিতে শুরু করেছে। সে পরিচয় দিব্যেন্দুর কানে গেল কি গেল না। ভিক্টর আচারিয়া মৃণালের সহকর্মী। দু'জনেই কম্পিউটার বিজ্ঞানী। দু'জনেরই ভীষণ ভালো মাইনে। ভিক্টর প্রাণোচ্ছল, মৃণালের বন্ধু। সবচেয়ে বড় কথা ভিক্টর মাস্টারমশাই নয়।

দিব্যেন্দু আর একটু হলেই মৃণালের কপালে ঠোঁট নামিয়ে ছোট্ট একটি চুমু খাবার আবেগ প্রকাশ করতে চলেছিল। সেই অবস্থায় ভিক্টর দেখে ফেললে লজ্জার একশেষ হত। সেই অপমান থেকে বেঁচে গেছে, সেইটাই তার পরম সৌভাগ্য। মৃণাল যখন তাকে শিক্ষক থেকে প্রেমিক করতে চেয়েছিল, তখন দিব্যেন্দু পাত্তা দেয়নি। প্রেম কি কারোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে! প্রেম আর ট্রেন প্রায় এক জিনিস। আসা মাত্রই উঠে পড়তে হয়। ট্রেন যেমন কোনও স্টেশানে এক মিনিট কোথাও দু মিনিট থামে। থেমেই চলে যায়। ট্রেনের গুমটি যেমন ইয়ার্ড, প্রেমের গুমটি হল বিবাহ। দিব্যেন্দুর আর এক মিনিটও দাঁড়াতে ইচ্ছে করল না। এই প্রথম সে অনুভব করল ঈর্ষা। ভিক্টর এখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রেম আর চাকরি প্রায় একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। দিব্যেন্দু যেখানেই ইন্টারভিউ দিতে গেছে, সেখানেই দেখেছে বিশ বাইশজন, পরস্পরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। কে? কে? তুমি? তুমি?

দিব্যেন্দু নীরস গলায় বললে, ''মৃণাল, আমি তাহলে আজকে যাই।'

মৃণাল কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'আসুন। সময় পেলে আবার আসবেন।'

দিব্যেন্দু নেমে এল পথে। খুব ইচ্ছে করছিল তার, তখনি একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। গোলমালটা কোথায়? চেহারায়? বোকা বোকা মুখ। মরামরা চোখ। না কি, মেয়েদের সে খেলাতে জানে না! মেয়ে আর মাছ কি এক জিনিস। প্রেমের চারে, কথার টোপে গাঁথতে হবে, তারপর হুইল থেকে লোভের সুতো ছেড়ে ছেড়ে, জীবনের জলে খেলিয়ে খেলিয়ে তুলতে হবে। দিবেন্দু একটা ট্যাকসিতে চড়ে বসল। কিছু দূর যাবার পর খেয়াল হল হাতের মুঠোয় কি একটা ধরা রয়েছে। মৃণালের রুমাল। ভুলে হাতের মুঠোয় রুমালটা নিয়ে চলে এসেছে। নরম, ফুলফুল, ছোট্ট একটা রুমাল।

পরের দিনই দিব্যেন্দু ফিরে গেল উত্তরবঙ্গে। বসন্ত ফেটে পড়েছে শহরতলির বনস্থলিতে। দূর আকাশের পাহাড়ে অভ্ররেখা। সারাদিন কাজে-কর্মে বেশ তবু কেটে যায়। রাতে, আটটার মধ্যে শহর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। তখন! তখনই দিব্যেন্দু তার নিরালা ঘরে বসে ভাবতে থাকে। দুটো প্রশ্ন—প্রেম আছে? না প্রেম নেই? পরক্ষণেই হুহু পাহাড়ী বাতাসে দুলে ওঠে জানালার পর্দা, সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভূত আছে?

না নেই ? কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই। মৃণালের ছোট্ট লেডিজ রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছে, দিব্যেন্দু কারোকে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করে। কাকে লিখবে ?

অনশন

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ধারলো ছুরির ফলা নিয়ে ঘ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর করলে হাত কেটে যায়। বোমা নিয়ে লোফালুফি করলে ফেটে যায়। এইসবই হল ব্যবহারিক জ্ঞান। মানুষ হাতে-নাতে শিখে ফেলে। বই পড়ার দরকার হয় না। মানুষ বিয়ে করে। করে করে শেখে। অনেক কিছু শেখে। নানা রকমের ফুল, লতাপাতা, গাছ আছে। এক একরকম বর্ণ, গন্ধ। যেমন বিছুটি। লাগলেই চুলকোয়। যেমন লঙ্কা, চিবোলেই ঝাল। সেই রকম আমার অর্ধাঙ্গিনীর স্বভাব হল, কিঞ্চিৎ রাগপ্রধান। তা সঙ্গীতের যেমন বিভিন্ন ধারার রাগপ্রধানও আমাদের ভাললাগে, সেইরকম রাগপ্রধান স্ত্রীকেও আমরা আমাদের জীবনে সইয়ে নি। সাবধানে নাড়াচাড়া করি। করলেও দু' একবার বেসামাল হয়ে যে৩ে পারেহ ; তখন ভুলের মাশুল দিতে হয়। ভুল করাই তো মানুষের ধর্ম !

অ্যামোনিয়ার বোতলের গায়ে লেখা ছিল—কোনওক্রমে চোখে দু' এক ফোঁটা যদি ছিটকে লাগে, তাহলে চোখে ঠাণ্ডা জলের প্রচুর ঝাপটা মারবে। কি হলে, কি করতে হবে জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়। অনেক দিন এর-সংসার করার ফলে, ফেটে গেলে কি করতে হয় আমার জানা হয়ে গেছে, আর কি করলে ফাটবে তাও জানি। লেজ ধরে টেন না। বাঘের একটা লেজ। আমার স্ত্রীর অনেক লেজ। বড় লেজ হল, শ্বশুরবাড়ির লেজ। শ্বশুরবাড়ির কারোর সম্পর্কে কোনও মন্ত করা চলবে না। সে বাড়ির ইট ভাল, পলেস্তারা ভাল, এমন কি সিড়িঙ্গে বেড়ালটাও আসল কবুলি বেড়াল। শ্বশুর মশাইয়ের গোঁফ জোড়া, একেবারে ক্ষোদ স্ট্যালিনের গোঁফ। হ্যাসিটা মোনালিসার পুংসংস্করণ। শশ্রুমাতার ধরাধরা গলায় পারস্যের বুলবুল। তাঁরা দানধ্যানে কর্ণ, জ্ঞানে ভীষ্ম, ধর্মে যুধিষ্ঠির, বীরত্বে অর্জুন। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিজের ধারণা সকলেই অল্পবিস্তর পাগল। দিনে রাতে এক একজন বার চারেক স্নান করে। একই সঙ্গে, টি ভি, রেডিও-প্লেয়ার ও হইচই গল্প বলে। সকলেই বলতে চায়, কেউ কিছু শুনতে চায় না। যে কেউ যখন খুশি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আবার জেগে থাকার মেজাজ এসে গেলে বিছানার সঙ্গে তিন রাত কোনও সম্পর্ক থাকে না। সকলেরই স্বাস্থ্য-বাতিক। অসুখ হবার আগেই ওষুধ খেয়ে বসে থাকে। সব ভিটামিন-পাগল। শীতকালে খরগোসের মতো বাঁধাকপি আর গাজর কাঁচা চিবোয়। কথায় কথায় সকলকে উপদেশ—খুব শাক-শব্জি খাও, গ্রিন ভেজিটেবল্স। ফলে এই হয়েছে, নিমন্ত্রিতদের ভাবতে হয়—ওই বাড়িতে পাত পাতবে কি না ! সবাই তো আর ছাড়া গরু নয়, যে আস্ত একটা বাগান খেয়ে ফেলবে ! শশ্রুমাতা একটার সময় আহারে বসে দুটোর সময় ওঠেন—চিবিয়ে যাচ্ছেনতো, চিবিয়েই যাচ্ছেন, ডাটা। শ্যালক শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতে বলতে

ব্যায়াম করে। কব্জি ঘোরাচ্ছে, ঘুরিয়েই চলেছে। এদিকে কথাও বলছে। রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করছেন, কে কেমন আছে। ওটা পাঁচটা মিনিটও যেন বৃথা না যায়—পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে দেহটাকে ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। পায়ের গুলির ব্যায়াম। যিনি কথা বলছিলেন অবাক হয়ে বলছেন—'ওরকম করছ কেন ?' শ্যালক বলবে—'আপনি বলে যান। মাইন্ড করবেন না।' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসবে। হঠাৎ গোটাপঞ্চাশ বৈঠক মেরে দিলে ঝপাঝপ্। ডেনটিস্টের চেম্বারে বসে আছে, হঠাৎ কি মনে হল পায়ের ব্যায়াম করতে গিয়ে সেন্টার টেবিল উল্টে গেল। ম্যাগাজিন-ফ্যাগাজিন সব ছত্রাকার। অন্য যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা শুধু অবাক হলেন না বিরক্তও। একগাল হেসে বললে, 'লেগ-স্ট্রেট করতে গিয়ে উল্টে গেল।' 'আমরা মরছি দাঁতের যন্ত্রণায় আর আপনি করছেন লেগ-স্ট্রেট।' "আজ্ঞে, আমারও তো একই অবস্থা। দাঁত থেকে পায়ের দিকে মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছিলুম আর কি।'

সকলেরই যে মাথায় স্ক্রু ঢিলে তার প্রমাণ, আমার সহধর্মিনীকে একবার পাগল বললেই হল। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তখন একেবারে অন্য চেহারা। নাকের পাতা ফুলে উঠল। চোখ-মুখ লাল। তখন বয়েসটাও যেন কমে যায় অনেক। রাতের সমুদ্রের ফসফরাসের মতো দেহ-ত্বক জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আমি ভুলেও পাগল বলি না। স্বামী হলেও বোকা-পাঁঠা নই। কি থেকে কি হয়, আমার সব জানা আছে। আমি জানি, স্ত্রী হল চীনে মাটির বাহারী ফুলদানি। সেই ফুলদানিতে জীবনের যত দুঃখসুখের ফুল সাবধানে সাজিয়ে রাখতে হয়। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে ইয়ার্কি চলে। ইয়ার্কি চলে পুলিস-স্যার্জেন্টের সঙ্গে। এমনকি চিড়িয়াখানার বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে চুমখুড়ি মারা যায় ; কিন্তু ইয়ার্কি চলে না স্ত্রীর সঙ্গে। সব সময় মন যুগিয়ে চলতে হয়। খুশ মেজাজে রাখতে হয়। দেশলাই কাঠি আর খোলের সম্পর্ক বেশি ঘষলেই ফ্যাঁস। মাঝে মধ্যে পাগল বলে তারই পেটের ছেলে। একালের শ্যায়না ছেলে, সে পিতা স্বর্গও বোঝে না, বোঝে না জননী জন্মভূমিশ্চ। তার স্বার্থে ঘা লাগলেই সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়, আর রোজ হয় প্রাতে না হয় সায়াহ্নে মায়ের সঙ্গে বাক্য-যুদ্ধ লাগবেই লাগবে, আর ঠিক হেরে যাবার মুহূর্তে ছাড়বে সেই পশুপাত অস্ত্র—তুমি একটা পাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মা ফসফরাসের মতো জ্বলে উঠবে—তুই পাগল, তোর বাপ পাগল, তোর ঠাকুরদা পাগল, তোর চৌদ্দ-পুরুষ পাগল। আমার তখন লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, কোলা ব্যাঙের মতো ; কিন্তু লাফাই না। আমি তখন মনে মনে বলি—পাগল আর নারীতে কি না বলে, ছাগলে কিনা খায় ! অর্থাৎ পাগল শব্দটি হল মধ্যম লেজ। কর্ণে প্রবেশমাত্রই বহ্নিমাত্র অবস্থা। আমার চতুর্দশ পুরুষকে পাগল প্রমাণের পর অধস্তন চৌদ্দ পুরুষকে ধরে টানাটানি। আমার ছেলে—তস্য ছেলে তস্য ছেলের ছেলে। মানে ছেলে লেলে। চৌদ্দ ভুবনের মতো—মাঝে ভূঃ মানে আমি, এই প্রতিবেদক। উর্ধ্বে, ভুঃ, স্বঃ, জন, তপঃ, সত্য। ছটি স্বর্গলোক। অধে পাতাল, তারও সাত ভাগ অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল। সমস্ত তছনছ করে, নিজের রক্তের চাপ দুশ'দশে তুলে অবশেষে সত্যিই তিনি সাময়িক পাগল হলেন। ডাক্তার, বদ্যি, কড়া ঘুমের ওষুধ। পনের দিনের মত শয্যাশায়ী।

তৃতীয় লেজটি হল, অন্যের বউয়ের প্রশংসা। যদি কোনও ভাবে একবার বলে ফেলেছি আহা অমুকের বউটি কেমন সুন্দর, যেমন দেখতে তেমন স্বভাব। মিষ্টি মুখ। মিষ্টি কথা। শ্বশুর বাড়িটিও ভারি সুন্দর। তিন ভাই, তিনজনেই ডাক্তার। একজন দাঁতের। একজন কানের। একজন মাথার। গোটা পরিবারটাই মানুষের মুন্ডু নিয়ে পড়ে আছে। ওর নিচে কেউ আর নামেনি। বউটি আবার শিল্পী। তুলির এক আঁচড়ে একটা মুখ। নিমেষে ঝরনা, পাহাড়, বনস্থলী। এইসব কথা, মধ্যরাতে, একান্তেই হতে পারে। অনেকটা আমার স্বগতোক্তির মতো। অলস মুহূর্তে মানুষ এই রকম করতেই পারে। তার করার হক আছে। কি পেয়েছি, আর কি পাইনি। এ মতো উক্তির পর যে কোনও বাঙালি, গলার সুর থাকুক আর না থাকুক গুনগুন করে গাইবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান—

'কি পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি ॥

এই মধ্যরাতের একান্ত বিলাসিতাটুকু সব মানুষই প্রশ্রয় দিতে পারে। শ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস এই নিয়েই তো জীবন। যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না, এইটাই তো সত্য। সত্যেও ভদ্রমহিলার অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে বলবে যাও না, তার কাছেই যাও না। আমার কাছে কেন। কি কথা। এমন কথা কোনও ভদ্রলোক বলে। ভদ্রমহিলারাই বলতে পারে। আমি যেন পরস্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করার জন্যে এই সব কথা বলছি। আমার কি ভীমরতি হয়েছে। আমার এমন সোনার চাঁদ বউ থাকতে হুলো বেড়ালের মতো অন্যের হেঁসেলে ছোঁক ছোঁক করতে যাবো কেন। গিয়ে ধোলাই খেয়ে মরি আর কি। এরপর শুরু হয়ে গেল লং-প্লেয়িং—'জেনে-শুনে, দেখে-শুনেই তো বিয়ে করেছিলে। আমার জামরুলের মতো নাক, প্যাঁচার মতো চোখ, ঘুটঘুটে অমাবস্যার মতো গায়ের রঙ। শিরিষ কাগজের মতো গলা। বিয়েটা তখন না করলেই পারতে। আহা, কত কষ্টই না আমার জন্যে করেছিলে। ট্যাকে নিয়ে ঘুরেছিলে ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়। আড়াই হাত লম্বা এক একটা চিঠি। ধার করে উপহার। গাছতলায় 'বসে বসে ঘাসে টাক। তখন অত কসরৎ না করলেই পারতে'। কে বলেছিল আমার জন্যে হেদিয়ে মরতে।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস। তারপর খচমচ করে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে ধপাস। কিছুক্ষণ পরেই আমার সাধ্য-সাধনা। একবার করে হাত ধরে টেনে তুলি পরক্ষণেই ল্যাৎ করে নেতিয়ে পড়ে। যেন প্ল্যাস্টিক গার্ল। দায় তো আমার। সারারাত মেঝেতে পড়ে থাকলে, পরের দিনই মিনিটে পঞ্চাশটা করে হাঁচি। ডাক্তার-বদ্যি। কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। নিজে বাঁচার জন্যে বউকে বাঁচাতে ছুটি। কে বলেছে তোমার জামরুলের মতো নাক, প্যাঁচার মতো চোখ। অমাবস্যার মতো রঙ। তুমি আমার 'সায়রাবানু।'

আমি জানি, বড় লেজটা ধরে টানলে, একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। মধ্যম লেজে টান মারলে সাতদিন। ছোট লেজে টান মারলে গোটা একটা রাত সাধ্য-সাধনা। টেনে তুলি, আবার তুলি। ভীম ভবানী হলে পাঁজাকোলা করে মেঝে থেকে বিছানায় ফেলে ঠেসে ধরতে পারতুম। শরীরে সে-শক্তি নেই। অবাক হয়ে ভাবি, হিন্দি ফিলমের নায়করা আস্ত একটা নায়িকাকে কেমন করে পাঁজাকোলা করে ঘুরে ঘুরে সাড়ে সাতশো ফুট

লম্বা একটা গান গায়। ওইরকম হিম্মৎ না থাকলে ব্যাচেলার হওয়াই ভাল।

সংসারে মোটামুটি সবই ভাল। দুঃখ, সুখ, অসুখ-বিসুখ, টানাটানি-ছাড়াছাড়ি সবই সহ্য করা যায়, অসহ্য স্ত্রীর গোমড়া মুখ। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে। সূর্যের মুখ ঢেকে যায় ; অন্ধকার, বিষণ্ণ দিন। দিনের পর দিন। স্ত্রী যেন সেই বঙ্গোপসাগর। সব সময়েই নিম্ন চাপ তৈরি হয়ে আছে। সদা মেঘলা। সেই মুখে এক চিলতে হাসির জন্যে কি সাধ্যসাধনা ! যত তেল স্ত্রীকে ঢালা হয়, সেই তেল কড়ায় ঢাললে একটা তেলে ভাজার দোকান সারা বছর অক্লেশে চালানো যায়। সব চেয়ে মারাত্মক হল, কথায় কথায় খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। সামান্য একটু ঠুকঠাক হল, কি খাওয়া বন্ধ। গোটা সংসারকে খাইয়ে, খাবার দাবার সব তুলে রেখে, একটা বই কি বোনা নিয়ে বসে পড়লেন। অন্য সময় বই কি বোনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। একটা সোয়েটার—সে যেন ধারাবাহিক উপন্যাস। বছরের পর বছর চলছে তো চলছেই। ছিড়িক ছিড়িক ইনস্টলমেন্ট। অন্য সময় ঘর-দোর এলোমেলো টেবিলে চেয়ারে ধুলো, দেয়ালের কোণে কোণে ঝুলের ঝালর। এই সময় তিনি মহাকর্মী। যত কাজের ধুম। উদ্দেশ্য দেখানো, দেখো অনশনে আছি, কিন্তু কাজে দেহপাত করছি। আমি এক পেট খেয়ে বিছানায় চিৎপটাং তিনি শুয়ে আছেন পাশে খালি পেটে। দাঁতের ফাঁকে বড় এলাচের দানা। অন্ধকার ঘর। নীল মশারির ঘেরা টোপ। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু দাঁতে বড় এলাচের দানা কাটার কুট কুট শব্দ। অনেকটা আমার বিবেকের দংশনের মতো। স্বার্থপর দামড়া। নিজে পেট ফুলিয়ে পড়ে আছে। পাশে তোমার স্ত্রী অনশনে, তোমারি দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে বড় এলাচের দানার কিটিস কিটিস নয়, আমার বিবেক ইঁদুর আমারই জীবনকাব্য কাটছে মাঝরাতের অন্ধকারে। এই একচালেই আমার মতো খেলোয়াড় কাত হয়ে যায়। প্রথমটায় বোঝা যায় না, মানে বুঝতেই দেয় না যে, খাওয়াবন্ধ হবে। নদীতে জল মাপার জন্যে ব্রিজের পিলারে স্কেল লাগানো থাকে। জল বিপদসীমা লঙ্ঘন করছে কিনা বোঝা যায়। স্ত্রী-নদীতে রাগ বিপদসীমা ছুঁয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই। সামান্য কথা কাটাকাটি এই ইলেকট্রিক বিল নিয়ে, কি চিনির খরচ বেশি বলে, কি হয় তো বলেই ফেললুম 'আমার কি তেলকল আছে। আমার বাপের তেলকল দেখেছ বলিনি কারণ নিজেই নিজের বাপ তুলবো, এমন ছোটলোক আমি নই।' বা 'হয়তো বললুম আমার কি চা বাগান আছে।' বলতে পারতুম আমার শ্বশুরের কি চা বাগান আছে মাসে সাত কিলো চা, রোজ সাতটা মোষ এসে চা খেয়ে গেলেও এত খরচ হত না। এইসব অভিযোগ যে কোনও স্বামীই, যে কোনও স্ত্রীকে করতে পারে। না-ই যদি পারবে তাহলে বিয়ে করা কেন ? এই তো আমার তিন বন্ধু, তিন জাঁদরেল মহিলাকে বিয়ে করেছেন, জজ, প্রিনসিপ্যাল আর শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেত্রী, যে কোনও নির্বাচনে এম এল এ বা এম পি হয়ে যাবেন অক্লেশে, হেসে হেসে। আমার সেই তিনবন্ধু কি নতজানু হয়ে থাকে ? কাঁধে তোয়ালে ফেলে 'যো হুকুম মেমসাব বলে স্ত্রীকে প্রদক্ষিণ করে ! কোর্টে তুমি জজ। রোজ একটা করে আসামীকে তুমি ফাঁসিতে লটকাও, কিন্তু বাড়ীতে তুমি গদাইয়ের স্ত্রী। কথায় কথায় ক্ষেপে বোম হলে সংসার তো ভেটকে যাবে। দড়ির ওপর ব্যালান্স করে কতক্ষণ

হাঁটা যায়। হয় তো একটু চড়া গলায় বলেই ফেললুম 'বাথরুম থেকে বেরোবার পর আলোটা নেভাতে হয়, তা না হলে হাতে হ্যারিকেন হয়। সংসার করার এই এ-বি-সি-টা তোমার মা শেখাননি। এর জন্যে তো ডিগ্রি-ডিপ্লোমার প্রয়োজন হয় না।' মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে ইলেকট্রিক বিল এলে, কোনও আদমি কোনও অওরতকে, সোনা আমার, মানু আমার, খেয়াল করে আলোটা একটু নিভিও ; অকারণে পাওয়ার খরচ করো না, বলতে পারে কি ? আমি তাও বলে দেখেছি দয়া করে আলোটা নেভাও। আমার এমনই নিখাদ নাইট্রিক অ্যাসিড ধোয়া প্রেম। তাও দেখি মুখের চেহারা জামবাটির মতো হয়ে গেল। টেবিলে কাপ নামাল যেন আহাম্মদ জান থেরকুয়ার তবলায় শেষ তেহাই। ব্যাপারটা কি ? না ওই দয়া শব্দটি। ওই শব্দটিতে হিমের মত জমাট বেঁধে আছে, শ্লেষ আর ব্যাঙ্গ। এতো মহা জ্বালা। ভাষাতাত্ত্বিক চমস্কির কাছে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞান শিখে এসে সংসার করতে হবে। পাঁচশো টাকা বিলটা বড় কথা নয়। ওটা তোমার ম্যাও। তুমি মা তুললে কেন ? কেন বললে, এ-বি-সি-শিখিনি ? আর ফার্স্টবুকের এ বি সি বলিনিরে ভাই। সংসারের এ বি সির কথা বলেছি। আর মা তুলবো কেন ? বাপ তুললে গালাগাল হয়। সে বুদ্ধিটা আমার আছে। তোমার মতো নই। তুমি তো সারা দিন বাব দশেক আমাকে তোলো আর ফ্যালো। ছেলে যখনই মুখের ওপর চোটপাট করে, বলে পারবো না যাও। তুমি অমনি বলো ; তোর বাপ পারবে ? তা তুমি যখন ছেলের বাপ তোলো, তখন বেশ প্রেম প্রেম লাগে।

কত বড় ডিপ্লোম্যাট। সংসারে যত পাকছে ডিপ্লোম্যাসিটা তত বাড়ছে। রাত সাড়ে নটা-কি দশটার সময় হাঁক পড়ল—'সব খাবে এস।' আমরাও বাধ্য ছেলের মতো বসে পড়লাম যে যার জায়গায়। সন্ধ্যের দিকে একটু কথাকাটাকাটি হয়েছিল, বিষয়টা খুবই তুচ্ছ, একটা গেঞ্জি। আমার একটা গেঞ্জি আমিই কেচে ছাদের তারে শুকোতে দিয়েছিলুম। একদিন গেল, দু'দিন গেল, সাতদিন হয়ে গেল কেউ আর তোলে না ; যেন রাস্তার ইলেকট্রিক তারে আটকানো সুতো, ছেঁড়া ঘুড়ি। আমিও তুলি না। দেখছি। টেস্ট করছি, সংসারে আমার জন্যে কতটা ভালবাসা আর কর্তব্য বোধ জমা আছে ! কে কতটা ভাবে আমার কথা ! দেখলুম, ভাঁড়ে মা ভবানী। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। দৌড়-ঝাঁপ চলছে। সহজে তুমি টাঁসছ না। টাকার পাইপ লাইন ঠিকই চালু থাকবে। তবে আবার কি। সোস্যাল সার্ভিসের কি প্রয়োজন ? মোটা দাগের সেবাই যথেষ্ট। গজাল সার্ভিস। বাসের আসনে ছোট একটা পেরেক উঠে থাকলে কে আর নিজের থেকে সার্ভিসিং করতে যাচ্ছে। যতক্ষণ পাবলিক না চ্যাঁচাচ্ছে। ইঞ্জিনটা তো সব। বাস গড়াচ্ছে গড়গড়িয়ে। দানাপানি দিয়ে টাট্টুকে ছেড়ে দাও। যা ব্যাটা রোজগার করে আন। তার গেঞ্জি তিনমাস কেন, অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া তক ঝুলবে। পাজামার লজ্জাস্থান, ফেঁড়ে থাকবে। সেলাই আজও হচ্ছে, কালও হচ্ছে। বললেই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, তোমার ওটা ছাড়া আর কোনও পাজামা নেই ; জামা কিনে আনার পর যে কদিন বোতাম থাকে। তারপর একটা একটা করে ঝরতে থাকে। বোতাম তো আর ঝরাপাতা নয়, জামাও গাছ নয়, যে শীতে ঝরিয়ে বসন্তে বোতাম সাজিয়ে দেবে। প্রথমে গেল গলা, পরে গেল পেট, শেষ গেল বুক। সব হাওয়া। আর তো চলে না। জামা তো ব্লাউজ নয় যে, গোটা গোটা সেফটিপিন

লাগিয়ে ম্যানেজ করে নোবো। মেয়েদের আটপৌরে ব্লাউজে বোতাম থাকে না। কে বসাবে। আবার বসাবে। ওই গজালই সহজ রাস্তা। মেয়েদের তো বউ হয় না, যে বসিয়ে দেবে। তারা নিজেরাই বউ। আর বউ হবার পর তাদের কাজ এত বেড়ে যায়, যে তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। মা কালীর গলায় মুণ্ডমালা মেয়েদের বুকে সেফটিপিনের মালা। বললেই বলবে পরোপকার প্রবৃত্তি। ওখানে না কি স্পেয়ারও থাকে। প্রয়োজনে অন্যকে ধার দিতে পারে। সাবেকি ধারণা নিয়ে বিয়ে করলে অনেক দুর্ভোগ! জামা, প্যান্ট, ইস্ত্রি, সেলাই, বোতাম বসানো, ফিতে পরানো, মাথা টেপা ইত্যাদি নিম্নবর্গের কাজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এসেই খতম। প্রায়ই শুনতে হয়—নিজে করে নিতে পারো না। আমি একটা কেমিস্ট্রির লোক টেলারিং তো শিখিনি। সিউয়িং, কুকিং, নার্সিং এইসব আমার ছেলেকে শেখাতে হবে, তা না হলেই মরবে। গৃহকর্মে সুনিপুণা বিশেষণ ঘুরে গিয়ে ছেলেদের গায়ে লাগবে গৃহকর্মে সুনিপুণ। বলবে, কি রকম স্বামী? গ্যাস ফুরিয়ে গেলে তোলা উনুনও ধরাতে পারে। কেরোসিন স্টোভে পলতে পরাতে জানে। পোড়া কড়া মাজতে পারে। ছেলে ধরাও জানে। সবই যেন উল্টেপাল্টে গেল।

তা ওই তুচ্ছ-গেঞ্জি। যাকে বলে তিল থেকে তাল। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে বুক ধড়ফড় করে। আচ্ছা করে। কিন্তু ট্যাং ট্যাং করে এখানে, ওখানে ঘোরার সময় বুক ধড়ফড় করে না। ও সেটা হল সমতলে। ভাইয়ের বিয়ের সময় একতলা, তিনতলা দাপিয়ে বেড়ালে? বেড়াতেই হল কর্তব্য। গেঞ্জিটা নিজেও তো তুলতে পারতে? এইটুকু দয়া তো করা যেত? দেখছিলুম, তুমি কর কি না? না, তোমার তো কিছুই করা হয় না। তোমার আর একটা বউ এসে করে দেয়। সে বউ আছে কোথায়? কোথায় পুষছো তুমিই জানো? তা না হলে মাসে মাসে এত খরচ হচ্ছে কি করে? টাকায় থই পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার বুঝি সেইরকমই ধারণা। তোমার বয়সের কোনও পুরুষকে বিশ্বাস নেই।

তারে ঝোলা একটা গেঞ্জি। কোথাকার জল কোথায় গড়াল। আমাদের পরিবেশন করা হয়ে গেল। সকলেই বসে গেল, তিনি বসলেন না। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হল' তুমি বসলে না? গম্ভীর মুখে, খুব পসারঅলা ডাক্তারের মতো বললে, 'ক্ষিদে নেই। পরে খাবো।' সেই পর আর সে রাতে হল না, পরের রাতেও এল না। ব্যাপারটা লাগাতারের দিকে চলে গেল। শেষে যা হয়, দুহাত তুলে সারেণ্ডার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা, এও তো এক ধরনের অপমান, সেই ছাত্রজীবনের মতো, প্রায় কান ধরে নিলডাউনের অবস্থা। এমন কাজ আর করব না। যা হচ্ছে হোক। সংসার ভেসে যাক চুলোয় যাক, আমাকে কেউ দেখুক, না দেখুক, চোখ-কান বুজিয়ে থাকবো। বয়েস হচ্ছে। রক্তের আর সে জোর নেই। দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে পারলেই হল। বধূ-হত্যার যুগ পড়েছে, অনশনে প্রাণ বিয়োগ হলে পুলিসে আর পাবলিকে পিটিয়ে লাশ করে দেবে।

বেশ সাবধানে তেল দিয়ে, তা দিয়ে, মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটছিল। যাকে বলে ট্যাক্‌টফুলি। অনেক প্ররোচনা এসেছিল ও তরফে থেকে। ফাঁদে পা দিই নি। তবু মানুষ তো, হটঠাৎ একদিন লেজে পা পড়ে গেল। পড়ল, ছেলেকে উপলক্ষ্য করে। ঘটনাটা

সেই ঘটলো। মায়ে-ছেলেতে অনেকক্ষণ চুলোচুলি হচ্ছিল বাজারের হিসেব নিয়ে। হিসেব না কি মিলছে না। একেবারে দশ টাকার তঞ্চকতা। শেষে সেই। ছেলে বললে এটা একটা পাগল। বদ্ধ পাগল। সঙ্গে সঙ্গে কোপ পড়ল আমার ঘাড়ে—'কি শুনতে পাচ্ছ না! না এখন কালা হয়ে গেছ? পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে আমি গান গেয়ে উঠলুম—যখন কেউ আমাকে পাগল বলে। তার প্রতিবাদ করি আমি। যখন তুমি আমায় পাগল বলো। ধন্য যে হয় সে পাগলামি। ফল আরো খারাপ হল! যেন আগুনে ঘি পড়ল। একটু ভাঙচুর হল। তরতরিয়ে ছাদে উঠে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পড়ে রইল সংসার।

যখন আমার যৌবন ছিল, প্রেমে যখন টইটুম্বুর হয়ে আছি, রসে পড়া রসগোল্লার মতো, সেই সময় এমত অবস্থায়, পাইপ বেয়ে, কার্নিস বেয়ে, যার প্রাণ থাক পণ করে ছাদে গিয়ে ল্যান্ড করতুম। স্করোমুশের মতো। সে বয়েস তো আর নেই। সে মনও নেই আর। এখন মনে বাজছে ধ্যাত্ তেরিকা সুর। অনেক খোশামোদ করেছি, আর না। হয় ওসপার না হয় এসপার। থাকো বসে ছাদের গোঁসাঘরে। মানভঞ্জন পালা আর গাইব না। তোমারও অনশন, আমারও অনশন। অনশনের লড়াই চলুক। দেখি, কে হারে আর কে জেতে। হেঁকে বলে দিলুম—আমিও খাবো না। ঢ্যাং করে যেন একটা শব্দ হল কোথাও। যাত্রার দলে যুদ্ধ শুরুর আগে যেমন বাজে। যে যতই সিটি মারুক, এবার আমি কৃতসঙ্কল্প। প্রথম রাতে যে বেড়াল কাটা হয় নি, সেই বেড়াল আমি না হয় কাটবো শেষ রাতে। মরতে হয় মরবো। এ মরণ আমার আধ্যাত্মিক আখ্যা পাবে। আমি শহিদ হবো। পথের ধারে বেদী না হয় না-ই হল। না-ই হল মঠ।

ছেলে পরোক্ষে বললে, 'যত সব বয়েস বাড়ছে ততই যেন খোকা হচ্ছে। দু'দিন, তিন দিন অন্তর অন্তর দামামা বাজালেই হল। নাও, সব না খেয়ে মরো. আমি চীনে রেস্তোরাঁয় চাওমিন মেরে আসি।' মনে মনে বললুম, 'তুমি আর বুঝবে কি, সেদিনকার ছোকরা! বিবাহিত মানুষের আমরণ সংগ্রাম স্ত্রীর সঙ্গে। বাঁকা লেজকে সোজা করতেই জীবন শেষ। যাবার ক্ষণে শেষ কথা—আমি আর পারলাম না হেরে মরে ভূত হয়ে ঘাড় মটকাবো স্বামীদের এমন বরাত করেই সোজা স্বর্গে। নরক-যন্ত্রণা স্ত্রীর হাতেই হয়ে যায় কি না! ভূত হতে পারলে কত স্ত্রীর যে ঘাড় মটকে যেত।

স্নানটান করে শুদ্ধ শরীরে, শুদ্ধ বস্ত্রে, মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মজীবনী' বের করে আনলুম খুঁজে পেতে বইয়ের তাক থেকে। সেই মৃত মহামানবই এখন আমার শক্তি। তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে কতবারই না অনশন করেছিলেন। কোনওবার তিনদিন, কোনওবার সাত দিন একবার বোধ হয় পনের দিন গড়িয়েছিল। আমার সঙ্গে তাঁর তফাৎ, আমার অনশন স্ত্রীর শাসনের বিরুদ্ধে। তফাৎই বা বলি কেন! একই তো। স্ত্রীরাও তো 'হোয়াইট রেস'। ফর্সা রঙ আর সমান অত্যাচারী।

গান্ধীজী অনশনের সময় কি শুয়ে পড়তেন। আমার কাছে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর ছবি সমন্বিত একটা অ্যালবামও আছে। টেনে বের করে আনলুম। বেশ বড়সড়। এই তো একটা ছবি। সাদা বিছানায় সাদা চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। উঁচু বালিশে মাথা। মাথার কাছে তাঁর স্ত্রী। তার মানে অনশনে শোয়া 'অ্যালাউড'। অনশনেরও তো একটা

শাস্ত্র আছে। সেই শাস্ত্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। কত বড় দূরদর্শী ছিলেন। জানতেন দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবার পরেও স্ত্রী থাকবে। স্বামীদের অনশনের অস্ত্র নিয়ে লড়তে হবে।

অনশন মানে অনশনই। খাওয়া-দাওয়া কিছু চলবে না, এমন কি জল পর্যন্ত না। জিভ খুব শুকিয়ে গেলে জলে তুলো ভিজিয়ে একটু 'ময়েস্ট' করে দেওয়া যেতে পারে। এটা বইয়ে লেখা নেই। অ্যাটেনবরোর গান্ধী ছায়াছবি দেখে জেনেছি। অনশন ভঙ্গের দিন এক গেলাস কমলালেবুর রস তোমাকে খেতেই হবে। তা না হলে ভোঁচকানি লেগে মৃত্যু। হাঁউ হাঁউ করে 'সলিড' কিছু খেলেই শেষ খাওয়া।

যাক শোওয়া যখন যায় আর সেইটাই যখন অনশন-বিধি, তাহলে দোতালায় বসার ঘরের পরিচ্ছন্ন সে ফা-কাম-বেড-এ শেষ শয্যা গ্রহণ করি—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। হয় মন্ত্রের সাধন না হয় শরীর-পাতন। মন্ত্রটা অবশ্য তেমন জোরদার নয়—স্ত্রীর সঙ্গে লড়াই। ব্যাখ্যা করলে একটু গুরুত্ব অবশ্য পায়—স্ত্রী মানে শক্তি। চণ্ডি বলছেন, স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। তার মানে—নারী আদিশক্তি। সেই শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রী তৈরি করেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টা। সেই স্ত্রীদের নানা চেহারা, ভাব আর ভাষা। সেই শক্তি, সেই আদি আর আদ্যাশক্তির সঙ্গে যে ধর্ম যুদ্ধ, যুদ্ধস্থলের নাম, সংসার সমরাঙ্গন। আর অস্ত্র হল অনশন। এই নিয়ে ছেলে-মেয়েরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও, ব্যাপারটা তুচ্ছ, ছেলেখেলা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের চেয়েও মহান। সে আন্দোলন স্বাধীনতার পরই খতম। এই আন্দোলন চলবে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। সংসারনামক অনাসৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন। যৌবনে মানুষ হেলে লেলে করে বিয়ে করবে। তারপর ফুলশয্যার ফুল শুকোতে না শুকোতেই শুরু হয়ে যাবে ফাইটিং। এক জোড়া হুলোহুলীর জীবনযুদ্ধ।

বিচার-বিশ্লেষণের পর মনে বেশ আধ্যাত্মিক-শক্তি জড়ো হবে। শুধু চোখ রাখলুম আমার প্রতিযোগী কি করছে। জল বা পান খাচ্ছে কিনা। সংসারী মানুষের চা-ও এক দুর্বলতা। কাকের কা কা-র মত মধ্যবিত্তের চা-চা। এদিকে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, ওদিকে ক্ষণে ক্ষণে, ওরে চা চাপা।

মহিলা মারাত্মক, জলের ধারে কাছে গেলেন না। মস্ত বড় পানসক্ত কিন্তু একটাও পান খেলেন না। চায়ের জন্যে কোনও চাতকতা দেখা গেল না। অথচ আমার একই সঙ্গে জল খেতে ইচ্ছে করছে। চা খেতে ইচ্ছে করছে। ধমক ধামক দিয়ে সেই সব ইচ্ছে তাড়ালুম। মনকে দেখালুম, মন দেখ ওই নারীকে, কি সাংঘাতিক মনের জোর। আগের জন্মে কোনও জৈন সাধু ছিল না তো ? মন দেখে শেখো। শেষে মন, কোথাও কিছু নেই, বলে কি না, মিছরি খাবো 'সে কি রে। মিছরি খাবি কি রে। মিছরি কেউ খায়। শেষে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। আর ঘুমিয়েও পড়লুম।

সন্ধ্যের সময় কপালগুণে এসে হাজির হলেন আমাদের কুল-পুরোহিত। তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পরের দিন। যজমান তো, 'তুমি কাল একবার এস বাবা।'

'আমি তো পারবো না ভটচাজ মশাই। আমার নির্জলা উপবাস চলেছে।'

কেন ? ও বৈশাখ মাস। তুমি বুঝি পঞ্চতপা করছ। আহা ! তা করবে না ! কোন বংশের ছেলে তুমি ! প্রথম দিকটায় তুমি যখন ভেস্তে গিয়ে, নিজের পছন্দ করা পাত্রীটিকে

বিয়ে করে আনলে, তখন তোমার পিতাঠাকুর বড় আঘাত পেয়ে বলেছিলেন, বংশের কুলাঙ্গার। আমি মনে মনে হেসেছিলুম— জানতুম তুমি ফিরবে। বোম্বাই আমগাছে বোম্বাই আমই হবে। আমার বিশ্বাস আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তা তোমার উপবাস ভঙ্গের দিন একটা খবর দিও। কিছু অনুষ্ঠান তো আছেই। আমি আবার শুয়ে পড়লুম। এখন এনার্জি খরচ করা চলবে না। মানুষ একটা ব্যাটারি। যত ওঠা-বসা-ঘোরা-ফেরা করবে ততই খরচ হয়ে যাবে। শুয়ে শুয়ে একটা ধর্মপুস্তক পড়ার চেষ্টা করলুম। খাদ্যের শক্তিতে কি হয়। মল, মূত্র, কফ, পিত্ত। যাবতীয় কামনা-বাসনার উৎস, কলা, মুলো, ঘেঁচু, মেঁচু। আধ্যাত্মিক খাদ্যই তো খাদ্য। মনের শক্তিই তো শক্তি। আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে সংসার পানসে হয়ে যাবে। বৈরাগ্যের পথই আমার পথ, তখন বউকে মনে হবে কবিরাজী পাঁচন। উপকারী কি না জানি না, তবে অখাদ্য।

রাতটা কেটে গেল। শেষ রাতে আবার স্বপ্নও দেখলুম। একটা গাধা, তার পিঠে অনেক বোঝা। গাধাটা ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে আমিও চলেছি তার পেছন পেছন মাঠ-ময়দান পেরিয়ে। একটা আটচালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বসে আছেন মহাদেব স্বয়ং বাঘ ছাল পরে। ভামটাম মাখা। পাশে ত্রিশূল। 'তিনি বলছেন, কি রে গাধা। এই বুড়ো বয়সে এলি'। আমি ইংরেজিতে উত্তর দিতে গেলুম 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' আমার গলা দিয়ে তিনটে গাধার ডাক বেরলো, হ্যাঁককো, হ্যাঁককো। অবাক কাণ্ড, দেখি কি আমি আর গাধা এক হয়ে গেছি। একটা মহা অশান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলুম। আমার ভেতর গাধাটা ঢুকলো, না আমি গাধাটার ভেতর ঢুকে গেলুম।

বেলা বারোটা নাগাদ আমার অনশন আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেহাদ নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পরিণত হল। কারণ আমার বাঁ দিকটা দুর্বল মতো হয়ে গেল। বাঁ হাত আর বাঁ পা-য় তেমন জোর পেলুম না ঃ কেমন যেন থ্যাস থ্যাস করছে। মাথাটাও কেমন যেন ঝিম মেরে আসছে। সেই মুহূর্তে আমার রাগ বিদ্বেষ সব উবে গেছে। তুচ্ছ সংসার তলিয়ে গেছে। নিজের কাছে তখন নিজে এক গিনিপিগ। দেখি না, একটু একটু করে কি কি যায়। পুরো ব্যাপারটা ঘুরে গেল জীববিজ্ঞানের দিকে। আহারের প্রয়োজন আছে কি না। কতটা আহার প্রয়োজন। মধ্যবিত্তের ফ্যামিলিতে একট চাকুরীজীবী সকালে কোনও রকমে নাকে গোঁজে। সারাদিন সে পাখি। এই ছোলা, মুড়ি, বাদাম মাদাম আর চা নামক তরল পদার্থ খেয়ে দিন চালায়। রাতেও আহামরি কিছু তেমন হয় না। মাঝেমধ্যে কোনও উপলক্ষ্যে খাওয়ার মতো খাওয়া হয়। প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালোরি সব মিলিয়ে হল একটা। তা প্রতিদিনের ওই আহারেই শরীর চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল, ছোট মতো একটা ভুঁড়িও নামছিল। আমি মনে করতুম না খেয়েই তো বেশ আছি। তা নয়, ওই খাওয়াটাও খাওয়া ছিল। যাই হোক, এখন আমি দর্শক। আমার শরীরের দর্শক। কিভাবে একে একে সব পড়বে। বাঁ দিকে শুরু। ডান দিকটা আছে এখনও। এই যে শুয়ে শুয়ে কাগজ ধরে চোখের সামনে তুলে পড়ছি থেকে থেকে বাঁ দিকটা কেতরে পড়ছে। কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। দৃষ্টিও ঘোলাটে হয়ে আসছে। যেন রাজকাপুর ধোঁয়া ছেড়েছেন আর নার্গিস নাচছেন।

সন্ধ্যের পর মনে হল, আমি একটা বোতল। আমার দুটো পাশ নেই। গোল ব্যারেল,

লম্বা একটা গদা। আমাদের অনশনের খবর বাড়ি থেকে ছড়িয়ে গেছে পাড়ায়। যাবেই, বাড়ির কাজের লোক হল মধ্যবিত্তের সংসার সংবাদপত্রের রয়টার। সেই একেবারে হেডলাইন করে ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা সব একে একে এলেন। মেয়েরা চলে গেলেন আমার বউয়ের দিকে। পুরুষরা এলেন আমার দিকে। এ-ঘর ও ঘর। মাঝে পাতলা পার্টিশানের ব্যবধান মাত্র। চোখ আমার ঘোলাটে। দেহের দুটো পাশ পড়ে গেছে ; কান দুটো কিন্তু ঠিক আছে। এই ভাবেই একে একে যায়। প্রথমে বাঁ দিক, তারপর ডান দিক, অবশেষে চোখ কান দুটো কখন যায় দেখি। ক'দিন অনশনে, মাথাটাকে ঠিক রাখছি রাগের খোঁচা মেরে। ক্রোধরূপী সর্পের ছোবলে বোধটাকে সজাগ রাখছি। তা না হলে 'কোমাষ্টেজে' চলে যাবো। যেতে চাই সজ্ঞানে। রেকর্ডের গান যে-ভাবে 'ফেড আউট' করে। আমি যাবই, আমি যাবো-যাবো-যাবো।

কানে আসছে আমার প্রতিবেশী মহিলাদের কণ্ঠস্বর। তাঁরা আমার স্ত্রীকে বলছেন, 'কি আর করবো বলো, অমানুষের হাতে পড়লে এই রকমই হয়।'

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই আমার ফোঁস 'কোন্ শালা অমানুষ।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার তরফের প্রতিবেশী একজন আমার বুক চেপে ধরে বললে—উঁহু ! শেষ সময়ে রাগে না, রাগে না। এই যে শালা বললে, অমনি তোমার শালার কথা মনে পড়ল। এখন যদি, গয়া পাও তাহলে তোমাকে কিন্তু শালা হয়ে জন্মাতে হবে। মানে ডিমোশান হল। স্বামী থেকে শালা।'

আমার সাপোর্টে একজন বললে, 'স্বামী হওয়ার চেয়ে শালা হওয়া হাজার গুণ ভাল। দেখছি তো আমার শ্যালকটি আমার সব চৌপাট করে দিলো। লাস্ট আমার নতুন সাইকেলটা ছিল, সেটাও কাল হাওয়া।'

গম্ভীর গলায় একজন বললে, 'পরিবেশটা নষ্ট করবেন না আপনারা। এই সময়ে শুধু তাঁর কথা বলুন। ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। কাকাবাবুর যা অবস্থা, হার্ডলি আর ঘন্টা তিনেক।'

তার কথাও শেষ হল আর ওঘর থেকে এসে ঢুকলেন আমাদের পাড়ার বিখ্যাত খাণ্ডারণী মহিলা। খাণ্ডারণী হলেও ভদ্রমহিলার গুণ অনেক। পরোপকারী। লোকের বিপদে আপদে সবার আগে তিনিই এগিয়ে যান। সবাই তাঁকে ভয় আর ভক্তি, দুটোই করেন। আমি মিটিমিটি চোখে দেখছি। তিনি আমার সামনে এসে কোমরে দুটো হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখতে-শুনতে বেশ ভালই। চেহারায় বেশ একটা চটক আছে। বড় বড় মা দুর্গার মতো চোখ। ঘাড়ের কাছে ইয়া বড় এক খোঁপা লাট খাচ্ছে। চুপ করে থাকলে জগদ্ধাত্রী, মুখ খুললে রণচণ্ডী। আমাদের পাড়ার কামান-বউদি।

তিনি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'ইয়ারকি হচ্ছে, বুড়ো বয়সে। সারা দেশে অশান্তির শেষ নেই। পাঞ্জাবে-খালিস্তানী। কাশ্মীরে-কাশ্মীরী। ওদিকে রামশিলা, বাবরি মসজিদ। মানুষ পটাপট মরছে। আর এঁরা দেবা-দেবী একজন এঘরে দেয়লা করছেন, আর একজন ওঘরে পেছন উলটে পড়ে আছেন। এ পাড়ায় ওসব চলবে না। গণধোলাই হবে, গণধোলাই। খুব হয়েছে, উঠে বসুন।'

আমার 'ফরে'র একজন বললে, 'ওঠার ক্ষমতা নেই বউদি। দুটো অঙ্গই পড়ে গেছে।'

'তাই না কি? কত ভিরকুটিই জানে এই মাঝবয়সী মিনসেরা। সারাটা জীবন শুধু জ্বালাবে।' ভালোয় ভালোয় উঠে বসুন, নয়তো সকলের সামনে বেইজ্জত করে দেবো। আমি সব পারি। এইসব প্যাস্তাখ্যাঁচা লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।'

ভয়ে ভয়ে উঠে বসলুম। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। আমার সামনেই ডুরে শাড়ি পরা বউদির বুক। পেট। মরতে মরতেও শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। অনশন বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম বলেই মনে হল বা চরম একটা সসত্যের উপলব্ধি হল—আটচল্লিশ ঘন্টা নির্জলা উপবাসে থাকলেও প্রবল একটা ইন্দ্রিয় বেশ টগবগেই থাকে।

বউদি আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন, 'টেকো বুড়ো আর কত ভিরকুট হবে। অমন দেবীর মতো বউটাকে বিধবা করার ইচ্ছে হয়েছে। একালে আর বিধবা হয়ে আলো চালের পিণ্ডি গেলে না, স্বামীর ছবির সামনে সন্ধে বেলা ধূপ জ্বালিয়ে—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বলে গান গায় না।'

বুকে আমার মুখ জুবড়ে গেছে। অনেক দিনের আশা। আবার লজ্জাও করছে। পাঁচ জনের সামনে।

বউদি *হেঁকে* বললেন, 'অনশন ভঙ্গ।'

আমার সাপোর্টাররা বললেন, 'তাহলে তো কমলালেবুর রস চাই।'

খোঁজপাত করে দেখা গেল, কমলালেবু, অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিছুই নেই। আনাজের ঝুড়িতে গোটাকতক করলা পড়ে আছে। তাই হোক। করলাও তো 'ফ্রুট'। করলার জুস খেয়ে অনশন ভঙ্গ হবে। তারপর ঠিক হল, পাতলা ঝোল আর সরু চালের গরম গরম ভাত। একটু গাওয়া ঘি। শোনা মাত্রই সেই ছেলেবেলার অবস্থা হল। পেটখারাপের উপবাসের পর ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল দিয়ে এক থালা ভাত উড়িয়ে মনে হত পেটখারাপের কি আনন্দ।

মহিলারা ডাকাত পড়ার মতো রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। কাটা, ছেঁড়া, ধোয়া, ফোটানো, নিমেষে সব শেষ। খাবার টেবিলে সব সাজানো হয়ে গেল। আমার সাপোর্টাররা আগেই কেটে পড়েছে। নারীবাহিনী এখন দু'ভাগ। একদল আমাকে নিয়ে, আর একদল আমার বউকে নিয়ে ঢুকলো। এমন দর্শনীয় আহার জীবনে হয়নি।

আমি এইবার খুব সাবধানী। শেষ মুহূর্তে হারতে চাই না। ম্যাচ ড্র হবে। আমি বললুম, 'দু'জনে একসঙ্গে খাবার মুখে তুলবো। আপনারা, ওয়ান-টু-থ্রি বলবেন। তা না হলে কৌশল করে আমাকে হারিয়ে দেবে।'

'বেশ তাই হবে।' বলে বউদি তিন গুণলেন। দু'জনের হাত উঠছে ভাতের নাড়ু নিয়ে। যেই আমি ঠোঁটের কাছে এনে খাওয়ার ভঙ্গি করেছি, খাইনি কিন্তু, আমার বউয়ের হাত নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে বললুম, 'ওই দেখুন, খেল শুরু হয়ে গেছে।' বউদি বললেন, 'বউটাও তো কম শয়তানী নয়।'

তখন ঠিক হল, একসঙ্গে দুটো নাড়ু তিন গোণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাই হল। ভঙ্গ হল অনশন।

তারপর সে কি হ্যাঁকো-প্যাঁকো প্রেম আমাদের। যেন আবার নতুন করে ফুলশয্যা হচ্ছে আমাদের। আয় ভাই কানাই, মনের দুঃখ কাহারে জানাই। তবু পিঁপড়ের স্বভাব

যাবে কোথায়। বললে, 'বউদির বুক কেমন লাগল ? খুব মিষ্টি, তাই না।'

পাঁচ মিনিটের ভালবাসা 'ফিনিশ'। দুজনে দু'পাশ ফিরে শুলুম। পিঠে পিঠ ঠেকে রইল। মনে মন। মাঝখানে কলহের মাখন। ওপাশ থেকে পাগলি বললে, 'তুমি খেলে না কেন ? খেলেই পারতে !'

আমি বললুম, 'তুমি না খেলে খাই কি করে ?'

আমার বউ গুড়ুম করে পাশ ফিরল। আমি হয়ে গেলুম একটা পাশ বালিশ ! পৃথিবীটা কত ছোট !

লেপ

বিনয় বিয়ে করে তিনটে বাঁশ পেয়েছে। একটা জ্যান্ত। সেটি হল তার বউ। অন্য দুটি হল ঘড়ি আর লেপ। আমার কথা নয়। স্বয়ং বিনয়ের স্বীকারোক্তি। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর বিনয় চুপচাপ ছিল। না খুশি, না অখুশি, একটা তৃরীয় অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে বিনয় নীরব থেকে সরব হয়ে এখন রবরবা। কথায় কথায় সংসারের কথা আসবেই। শুরু হবে বউকে দিয়ে। বউ থেকে সেই ভদ্রমহিলার জন্মদাতায়। সেখান থেকে ঘড়ি। ঘড়ি থেকে লেপ। ঘড়িটাকে বিদায় করেছে। কব্জির কাছে ব্যাণ্ডের সাদামত গোল দাগ এখনও রঙ ধরে মিলিয়ে আসেনি। মেলাবার মুখে। বউ চিরকালের জিনিস। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মত ক্রনিক কেস। সারা জীবন ভোগাবে। আর লেপ। শীতে নামাতেই হবে। নামালেই দুজনে গায়ে দেবে। এবং পরের দিন সকালে আমাদের সেই লেপকেচ্ছা শুনতেই হবে।

বিবাহ মানেই একটি বউ এবং মনোরম একটি বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কি করে ! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমূল তুলো। এর মধ্যে সমস্যার কি আছে সরল বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রেম যখন ঘনীভূত ছিল তখন সমস্যা ছিল না। আলো নিবিয়ে লেপের তলায় ঢুকে দুজনে জড়াজড়ি করে 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' গোছের ব্যাপার। এখন এতদিন পরে অপ্রেমে সেই 'কমান' লেপকে গালাগাল দিলে আমরা শুনব কেন ? তবু শুনতে হয়। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় একটা আস্ত লেপকে তো দুটুকরো করা যায় না। কাপড়ও নয় যে জোড়া কেটে দুটো করবে। বউ আর লেপ অবিচ্ছেদ্য। দাম্পত্য প্রেম আবার অবিচ্ছেদ্য নয়। সেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে। এই হলায় গলায়, এই চুলোচুলি। তেঁতুল যত পুরোন হয় ততই টক বাড়ে। লেপের ঝগড়া, ঝগড়ার লেপ। লেপের দুই মূর্তি। বউয়ের মতই। এই মনোরম, পরমুহূর্তেই বিস্ময়। সামলানো দায়।

প্রেমে মানুষ ত্যাগী হয়। বিনয় যখন প্রেমিক ছিল (বছর খানেক মাত্র) তখন শীতে

বউকে লেপের তিনের চার অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজে একের চার অংশে হিহি করত। ছেড়ে দিত বললে ভুল হবে। বউ কেড়ে নিত। প্রথম রাতে লেপের তলায় দুটি মানুষ হলেও প্রেমে তালগোল পাকিয়ে একাকার। তখন আর সমস্যা কি? সমস্যা মাঝরাতে। বিনয়ের আদরে আদুরী বউ উঁমুমু করে পাশ ফিরলেন, লেপের তিনের চার অংশ তার সঙ্গে চলে গেল। বিনয়ের শরীরের আধখানা খোলা, উদোম পড়ে রইল পৌষের শীতে শীতল সাদা চাদরে। পা দুটোকে জড়ো করে স্ত্রীর জোড়া ঠ্যাঙে গুঁজে গরম করতে গেলেই ঘুমের ঘোরে খ্যাঁক করে ওঠে, হচ্ছে কি? এবার ঘুমোও। লেপের বাইরে হায়নার মত মাঝরাতের গাছ-গাছালির শিশির-মাখা শীত হামা দিচ্ছে। বিনয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পশ্চাদ্দেশটিকে লেপের অংশে ঠেলে দিয়ে ভাবতে থাকে—ঘুমাও, হ্যাঁ এখন ঘুমাও কবি, রাতের কবিতা শেষ। জীবনটা যেন রঙমহলের অভিনয়। প্রেমের নাটকে যবনিকা পড়ে গেছে। নায়িকা পাশ ফিরে লেপের আরামে শুয়ে শুয়ে নায়ককে বলছে, দৃশ্য শেষ, মনের মেকআপ তুলে ফেলেছি। তখন তোমাকে সহ্য করেছি, কারণ করতেই হবে। তোমাকে বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে সহ্য করাই আমার জীবিকা। আমার জীবনের দুটো দিক, একটা অভিনয়ের দিক আর একটা নিজস্ব দিক। শীতের নির্জনতায় মানুষের মনে স্যাতসেঁতে চিন্তাই আসে। মনমরা চিন্তা সব হিলহিল করে ওঠে। পায়ের পাতা দুটোই বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওই জন্যেই বলে শীত করে। করে মানে, হাতে। শীত পায়। পায় মানে পায়ে, পদে। পা দুটো আশ্রয় খুঁজেছিল। পদাঘাতে ফিরিয়ে দিলে। একটা হাত বুকের উষ্ণতায় গরম হতে চেয়েছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বললে, মাঝরাতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে! সাবাশ বেটা। ঘুমোলে মানুষের মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বউ বলে আমিই এক বুরবাক, হেদিয়ে মরি। আসলে তুমি শ্বশুরমশাইয়ের কন্যা। পাকা বাঁশ কি সহজে নোয় রে বাবা!

সামান্য লেপ থেকে বিনয়ের অভিমান বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় উঠল যেখানে বিনয় যৌবনে যোগিনী। কার বউ? কিসের সংসার? বউও শ্বশুরমশাইয়ের লেপটাও তাঁর। যাও তোমার লেপ তুমিই নিয়ে শুয়ে থাক। বিনয়ের শুধরে দেবার কেউ নেই। শ্বশুরমশাইয়ের বউ কি রে? ওই হল আর কি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে লেপ সরে যেতেই পারে, তা নিয়ে অত মান-অভিমানের কি আছে বাপ। তুমিও টেনে নাও না। এ তো পাক-ভারত লড়াই নয় যে বাউণ্ডারি কমিশন বসিয়ে সীমানা ঠিক করে দিতে হবে। বিনয় বললে, বউকে নিজের মনে করতে পারলে সে অধিকার অবশ্যই খাটাতুম।

এ আবার কি কথা! বউ নিজের নয় তো কি পরের?

বিনয়ের উত্তর শুনে ঠাণ্ডা মেরে যেতে হয়। চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন। চব্বিশ ঘন্টায় দশ ঘন্টা নিদ্রা। বাকি রইল চৌদ্দ ঘন্টা। চৌদ্দ ঘন্টার চার ঘন্টা চান, খাওয়া, এটা ওটা। বাকি দশ ঘন্টার সবটাই বিনয়ের খরচ করতে হয় জীবিকার সংগ্রামে। খুব ভাল হিসেব। তাহলে বউয়ের সঙ্গে এত ঠোকাঠুকি, মান অভিমানের সময় আসে কোথা থেকে। তুমি শ্রীকৃষ্ণ নও, তোমার বউ রাধিকা ঠাকরুণও নন যে সারাদিন কদমতলায় বসে মানভঞ্জন পালা গাইবে। আধুনিক মানুষ তুমি খাবে-দাবে, ছোটাছুটি করবে, কেরিয়ার

গুছোবে, তা না দিবারাত্র বউ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান, লেপ নিয়ে লাঠালাঠি। এইসব পান্‌সে সমস্যা আমরা শুনতে চাই না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে যা নিয়ে মাথা ঘামালে দেশের উপকার হবে।

বিনয় তখনকার মত চুপ করলেও আবার সরব হয়ে ওঠে। লেপের যে এত মহিমা কে জানত। বিনয় ক্রমশ দার্শনিক হয়ে উঠছে। বিনয়ের মতে, বউ পরের ঘর থেকে আসে আসুক, তার সঙ্গে খাট, বিছানা, বালিশ আর সাটিনে মোড়া একটি লেপ যেন না আসে। খাল কেটে কুমির এনেছ এই যথেষ্ট, সেই সামলাতেই তোমার হাড়ে দুব্বো গজাবে, সঙ্গে আর কয়েকটা ফালতু লেজুড় এনে ন্যাজে গোবরে হওয়াটা ডবল মুখ্যুমি। পরের সোনা দিও না কানে, কান যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে। হীনমন্যতায় ভুগবে। একই কক্ষপথে দুটো গ্রহ যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রথমেই যা হবে তা হল দমাস করে একটি সংঘর্ষ। তারপর দুটোতে গায়ে গা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি। তারপর যার শক্তি বেশি সে-ই ঘোরাতে থাকবে নাকে দড়ি দিয়ে চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো। সংসারে স্ত্রী জাতিই প্রবলা। প্রবলা হবার কারণ পুরুষ জাতির দুর্বলতা। আমার মানু, মানু আমার করে ফার্স্ট ইয়ারে যে সোহাগ করেছিলে সেই সোহাগের পথে তোমার পার্সোনালিটি লিক করে বেরিয়ে গেছে। ফলে সেকেণ্ড ইয়ার থেকেই তুমি কৃতদাস। ট্যাঁকে নবজাতক, ঘাড়ে সিংহজাতক।

সিংহজাতক মানে ?

শ্বশুরমশাইয়ের নাম নরেন সিংহ। এটা ট্যাঁ করে তো ওটা গর্জন করে। দুজনেরই সমান সমান বায়না। বায়না না মিটলেই এর ক্রন্দন, ওর আস্ফালন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আমার ধোপা নাপিত বন্ধ। পিরিতের তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রেম যে কত ঠুনকো তা বিয়ে না করলে বোঝে কার বাপের সাধ্য।

প্রেম ঠুনকো হোক ক্ষতি নেই। তুমিও প্রেমের বয়স পেরিয়ে এসেছ। এখন তুমি পিতা এবং স্বামী। সেই ভাবে বুঝে-সুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার করে যাও। ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ কি ? শাস্ত্র বলছে , 'দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' এই ভাব, এই ঝগড়া। সংসারে জীবন-নৌকো চলবে ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে। উঠবে পড়বে। পড়বে উঠবে।

উপদেশ দেওয়া সহজ। পড়তে আমার মত অবস্থায়, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন। শুনবে কি জিনিস ! তখনও গা থেকে গায়ে-হলুদের রঙ ওঠেনি, পাওনা শাড়ির মাড় ওঠেনি, লেপের তলা থেকে বলে উঠলেন, বাবা একটা লেপ দিয়েছে বটে, পালকের মত হালকা, উনুনের মত গরম। নজর দেখেছ ? আমি বললুম, ও তোমার যৌবনের উত্তাপ। তায় আবার পান খেয়েছ কাঁচা সুপুরি দিয়ে। লেপের আবার ভাল-মন্দ কি ! সেই এক সালু কি সাটিন, ভেতরে তুলো। সুব লেপেই যা থাকে এর মধ্যেও সেই একই মাল। সিংহকন্যা গর্জন করে উঠলেন, রাখো ! বরের লেপে শ্মশানের তুলো ভরে দেয়, বুঝলে চাঁদু ?

শ্মশানের তুলো ? সে আবার কি।

কি জানো তুমি ? শ্মশানের যত মড়া আসে তাদের বিছানা ছিঁড়ে তুলো বের করে তুলোপটিতে জলের দরে বিক্রি হয়। সেই তুলো দিয়ে তৈরি হয় ফুলশয্যার লেপ। এ

জিনিস সে জিনিস নয়। এ হল এক নম্বর মাল। আগুন ছুটছে।

আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, তোমার পিতাঠাকুর কি চৈত্র মাসে শিমুল গাছের তলায় গিয়ে হাঁ করে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়েছিলেন ? পাকা তুলো ফাটছে আর তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ধরছেন, খোলে পুরছেন। আহা, এ মণিহার আমার নাহি....। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ। ফ্যাঁসোর ফোঁসোর। তুমি আমার বাবাকে শিমুলতলায় দাঁড় করালে এরপর কোন দিন বাবলাগাছে চড়াবে। অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে রাত তিনটের সময় দেহি পদপল্লবমুদারম্ আওড়াতে আওড়াতে স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ভোরবেলা শুকনো মুখে, বসা চোখে কাকের ডাক শুনতে শুনতে মনে মনে বললুম, ইহা লেপ নহে, যীশুখ্রীষ্টের মৃতদেহের সেই আচ্ছাদন।

শ্বশুরবাড়ির জিনিস সম্পর্কে সব মেয়েরই ওই রকমের এক ধরনের দুর্বলতা থাকে। বউ বস্তুটিকে ব্যবহার করার কায়দা আছে ভাই। মোলায়েম হাতের ময়দা ডলার মত ময়ান দিয়ে মাখতে হয়, তবেই না খাসা মুচমুচে লুচি।

তা হলে শোন। সেই লেপপর্ব কোথাকার জলকে কোথায় নিয়ে গেছে। লেপের তলায় ঢুকে একদিন পা দুটোকে বেশ একটু খেলাচ্ছি। সিংহকন্যা বললে, হঠাৎ আবার দেয়লা শুরু করলে কেন ? সাতজন্মে পা ঘষ না। তোমার ওই চাষাড়ে পায়ের ঘষা লেগে লেপের ছাল উঠে যাবে।

কথাটা কিছু অসত্য বলেনি হে। তোমার পায়ের যা মাপ আর তার যা চেহারা। অনেকটা এবমিনেবল স্নোম্যানের মত।

পুরুষের পা এই রকমই হয়। পদাঘাতের পা। আঘাতের লোক তো আর পেলুম না, পদাঘাত খেয়েই গেলুম। আমার বরাতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুই লেখা আছে।

কেন ?

কেন আবার ! এই শীতে রোজ রাতে বিছানায় ওঠার আগে কনকনে ঠাণ্ডা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে লেডি ইন্সপেক্টার জেনারেলকে দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে বিছানায় উঠতে হবে। তারপর শুনবে, আরও শুনবে বিনয়ের বিনীত কাহিনী। পেঁয়াজ কি রসুন কাঁচা খাওয়া চলবে না। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে লেপের ভেতরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। মুলো খাওয়া চলবে না। পেট গরম হতে পারে। গরম পেটঅলা লোক নিয়ে কমান লেপে শোয়া যায় না। রোজ টক দই খেতে হবে। ঠাণ্ডা জলে সাবান মেখে চান করতে হবে। শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে ছোবড়া ঘষতে হবে। নিম্নবাহুতে গোলাপের নির্যাস মাখতে হবে। পরিষ্কার ধবধবে পাজামা আর গেঞ্জি পরতে হবে। কারণ লেপের তলায় চাই কলগেট নিশ্বাস, বাগিচার সুগন্ধ। লেপের তলায় নেড়িকুকুর নিয়ে কোন ফ্যাশানেবল মহিলা শুতে পারেন না। লোমঅলা, ধবধবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাউডার মাখা বিলিতি কুকুর চাই। মাথায় তেল মেখে কলুর বলদ হওয়া চলবে না। তেলচিটে বালিশ, তার ওপর সাটিনের লেপ, ম্যাগো, ভাবা যায় না ! এবম্বিধ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তোমরাই বল।

বউকে পারবে না, লেপটাকেই ডিভোর্স কর। সিংহশাবককে বল, খুব হয়েছে মা জননী, তুমি থাক মহাসুখে লেপের তলায়, আমি থাকি আমার মত কাঁথার তলায়।

শীতকালে প্যাঁজ না, রসুন না, মুলো না, মাথায় তেল নয়। মামার বাড়ি আর কি! রোজ চান? এমন অনেকে আছেন যাঁরা শরতে শেষ চান করেন, শীত পার করে ফাল্গুনের হোলিতে রঙিন হয়ে আবার চানপর্ব শুরু করেন। তোমার যদি হাঁপানির ব্যামো থাকত, তোমার বউ কি করতেন—তালাক দিতেন?

আরও একটা দুঃখের কথা বলি ভাই, ফুলকপি আমার ভীষণ প্রিয়। সারাবছর অপেক্ষায় থাকি, শীত এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে। সেই কপি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। কপি বায়ুকারক। আমার স্ত্রী বলে, লেপের যোগ্য হবার চেষ্টা কর। যা তা মাল লেপে সিঁধোলে পলিউশান হবে।

মার শালা তোর শ্বশুরবাড়ির লেপে এক লাথি।

তাই তো মেরেছি। আগে আগে হত কি, সন্ধেবেলাই হিসেব নিয়ে বসতুম। অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে বউকে অর্থনীতির উপদেশ দিতে ইচ্ছে হত। আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখ! কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। তেলটাকে সেই তিন কিলোতেই তুললে। কয়লা দু মণেই তাহলে পাকা হয়ে গেল! রোজ এক কেজি আলু লাগবেই! পাঁচ কেজি মুগের ডাল? লম্বে হ্যত। মাসে গায়েমাখা সাবান পাঁচটা? বহুত আচ্ছা। ঠুস ঠাস, ঠুস ঠাস করতে করতে পর্বত ধূমাৎ বহ্নিমান। টুক করে বলে বসল, এবার থেকে তুমিই তাহলে রাঁধ। শীতকালে তেল একটু বেশিই খাবে।

না, খাবে বললেই খাবে। একটু টানতে শেখ, কেবল ছাড়তেই শিখেছ।

আমার বাপের বাড়িতে এত টানাটানি ছিল না। হলঘরের মত সংসার আমি করতে পারব না।

ডোন্ট ফরগেট, দিস ইজ নট ইওর বাপের বাড়ি। শ্বশুরের তেল বেচা পয়সা আহ্লাদী মেয়ে দুহাতে উড়িয়েছেন। দীয়তাং ভুজ্যতামের কাল চলে গেছে। ব্যস, সিংহী অমনি ফুঁসে উঠে তাঁর চাল চালতে লাগলেন। রাতে অনশন। শয্যাত্যাগ। ভূতলে শয়ন। সাধ্যসাধনায় তিনি ভূতল ছেড়ে শয্যাতলে এলেন। ঘাড়ে লেপ চড়ানো হল। রাগ পড়ল না। স্বামী সাংঘাতিক হলেও একটি প্রাণী। মশা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর, আরও রমণীরক্ত লোভী এবং ঝাঁক ঝাঁক। মশার আক্রমণে লেপাশ্রিতা হলেও সন্ধি হয় না। একই লেপের তলায় দুই রাগী। লেপের গরম, রাগের গরম, ঘেমে মরি। তখন ছিল একদিন ঝগড়া তো পরের দিন ভাব। তিরিশ দিনের পনেরো দিন স্বামী-স্ত্রী আর পনেরো দিন ছোটলোকের বাচ্চা আর ছোটলোকের বেটি। পাশ ফিরে শুয়ে হাপর টানে। পশ্চাদ্দেশে পশ্চাদ্দেশে ঠেকলেও জ্বলে জ্বলে ওঠা, ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া। বাঘ কিংবা বিষধর সাপ নিয়ে শুয়ে থাকা।

সে তো ভালই। দাম্পত্যকলহের পর প্রেম আরও জমে ওঠে। মেঘলার পর রোদ, রোদের পর মেঘলা, কনট্রাস্ট না হলে খেলা তেমন জমে না ভাই। ঠিক রাস্তাতেই চলেছ গুরু। ঠাকুর বলতেন, রসেবশে রাখিস মা।

হ্যাঁ ভাই, তা ঠিক। সেই রস এখন জমে মিছরির ছুরি হয়ে যেতেও কাটছে আসতেও কাটছে। গত একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। আঠারো কেজি চিনির দাম নিদেন একশো আশি টাকা। বেশি মিষ্টি করেই মিষ্টির কথা বলতে গেলুম। একশো আশি টাকার চিনি খেলে

আমি যে চিতেয় উঠব ভাই। উত্তর হল, মায়ের পেট গরমের ধাত, রোজ সরবত খেতে হয়। মেয়ে হয়ে কিছুই করব না, তা তো হয় না। তুমি আর মায়ের মর্ম কি বুঝবে বল। ছেলেবেলাতেই খেয়ে বসে আছ। মা ছিল বলেই না আমাকে পেয়েছ। তা আমি ভাই একটু ভেঙচি কেটে বলে ফেলেছিলুম, আহা মাতৃভক্ত মাতঙ্গিনী, স্বামীকে শয়ে চাপিয়ে মায়ের দেনা শোধ ! কথাটা মুখ ফসকে বেরোনমাত্রই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কাশ ডিশ ভেঙে, দেরাজের আয়না চুরমার করে, বইয়ের র‍্যাক ভেঙে আধুনিক রাজনীতির কায়দায় অ্যায়সা প্রতিবাদ জানালে তিনদিন হাঁড়ি চড়ল না। দফতর চালু হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আমি বউবাজার থেকে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম—রাগ চণ্ডাল। তার তলায় লিখেছি—চণ্ডালের হাতে পড়েছি। তোরা আমাকে একটা লেপ কিনে দে ভাই, ডিসেম্বরের শীতে কেঁপে মরছি।

কেন সেই লেপটা ?

ভাই বিছানায় পার্টিসান উঠেছে। একটা রাত শুধু লেপ বয়ে কেটেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কেঁপে কেঁপে ঘুম আসছে, এসে গেছে, ঝপাৎ করে গায়ে ভারি মত কি একটা পড়ল। আচমকা। ভেবেছিলুম বউ হয়তো অনুশোচনায় ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ক'দিন চালাবে বাবা কোল্ড ওয়ার। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা চলে কি ? ওঠ ওঠ ! কেন ওরকম কর ? বলেই মনে হল, আরে বউ তো আরও একটু শক্ত হবে, লম্বামত হবে। এতো দেখছি অনেকটা জায়গা নিয়ে চৌকো মত কি একটা এসে পড়েছে। বউ নয়, লেপ। কি হল লেপটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে ? উত্তরে মিনি গর্জন শোনা গেল, হুঁ।

তোমার বাবার লেপ তুমি নিয়েই শোও। আমার ঘাড়ে কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর, লেপ তোমার।

হ্যাঁ, লেপ আমার। তা ঠিক। বউ আর লেপ দুটোই আমার ছিল। আসলটা হাত ছাড়া, ফাউ জড়িয়ে মাঝরাত্রে মটকা মেরে পড়ে থাকি। এ যেন সেই গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাবুর বাসে ঝোলা। লেপটা দু হাতে তুলে ঝপাং করে সিংহকন্যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এলুম। সারারাত লেপ নিয়ে পিংপং। তোরা ভাই আজ আমাকে একটা লেপ কিনে দে।

বেডিং স্টোরে গিয়ে আমাদের লেপ দেখা শুরু হল। দেখি একটা হাল্কা সিঙ্গল লেপ। বিনয় বললে, সিঙ্গল নয় ডবল।

ডবল কি করবি ? সিঙ্গল মানুষ !

না, ডবল কিনব। এতকাল শীতের রাতে বউয়ের লেপের তলায় নেড়িকুকুরের মত আশ্রয় খুঁজেছি। এইবার নিজের লেপে বুক চিতিয়ে পাশে একটু জায়গা রেখে শুয়ে থাকব। দেখি তুমি আস কি না তোমার অহঙ্কারের দরজা খুলে।

শাপের বর

আমার স্ত্রীর নাম স্নিগ্ধা। বেশ ভারিক্কি চালের মহিলা। স্বভাবে মোটেই স্নিগ্ধ নন। নাগ উগ্রচণ্ডী হলে বেশ মানাত। যে বয়সে সাধারণত নাম রাখা হয়, সে বয়সে মানুষের স্বভাব প্রকাশ পায় না। সেই কারণেই বোধ হয় নামঘটিত এই মারাত্মক অমিলটি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই জিনিসটির হাতে জেনেশুনেই আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটু টাইট হবার জন্যে। ইঁট-চাপা ঘাসের মত আমার জীবন এখন বিবর্ণ। যাক, দুঃখ করে লাভ নেই। কপালে লিখিতং ধাতা কোন শ্লা কিং করিষ্যতি।

এই মুহূর্তে আমার সেই তেজি টাট্টু ঘোড়ার মত স্ত্রী বিছানায় আমার পাশে শুয়ে কোঁক কোঁক শব্দ করছেন। না কুঁকড়ো খেয়ে নয়, জ্বর এসেছে কম্প দিয়ে। অর্থাৎ হাতি এখন পাঁকে পড়েছেন। আমি এক চামচিকি। ইচ্ছে করলে কুতুস করে একটা লাথি মারতে পারি। অতটা অভদ্র নই, তাছাড়া সেরে ওঠার ভয় আছে। এ জিনিস বেশিদিন শয্যাশায়ী থাকবেন না। আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি। তখন আমার এই অপরাধের শাস্তি কি হবে ভেবে আমার সেই প্রবাদোক্ত চিকিচাম হবার সাহস শীতের প্রত্যঙ্গের মত গুটিয়েই রইল।

কপালে হাত রেখে মনে হচ্ছে দুইয়ের কম হবে না, তিনও হতে পারে। এর কম হলে ঠিক মানাবেও না। স্নিগ্ধা এখন খুবই উত্তপ্ত। ঘাড়ে একটা চাদর চাপিয়েছে, তার ওপর একটা খেস, তার ওপর দুটো পাশ বালিশ। এইবার ওই বিচিত্র কম্বিনেশানকে আমি চেপে ধরি, তেনার শরীরের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেঁপে কেঁপে উঠছি। ধরিত্রী মাতা কেঁপে উঠলে সন্তানেরও তো নিস্তার নেই। সবই রসাতলে যাবার দাখিল।

মাঝে মাঝে কোঁকোর কোঁ থামলে দাঁতের বাদ্য সহযোগে দু একটি মধুর বাক্য শ্রীমুখ-নিঃসৃত হচ্ছে। জানতুম, জানতুম আমারএই অবস্থাই হবে। যে হাতে পড়েছি। (কে যে কার হাতে পড়েছে।) বাবুরা এমন বাড়ি করলেন নর্দমা দিয়ে জল সরে না। কোঁকোর কোঁ। ভাল করে চেপে ধরতেও পার না, ল্যাদাডুস। (স্ত্রীকে চেপে ধরতে পারে, এমন স্বামী কজন আছে!) তার ওপর আবার বাগানের শখ। কোঁকোর কোঁ। বাগান করেছে, বাগান! (দাঁতের বাদ্যি) আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে বসে আছেন। মশার ঠ্যালায় তিষ্ঠোয় কার বাপের সাধ্যি! আমি জানতুম এই গুলবাগিচায় আমার ম্যালেরিয়াই হবে। এইবার লিভার বাড়বে, পিলে ফুলবে। গ্যাড়গেঁড়ে পেট নিয়ে বাকি জীবনটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বাবুর গার্ডেন চেয়ারে বসে বসে শোভা দেখি, গাছের শোভা। কোঁকোর কোঁ।

ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির জলজ্যান্ত উদাহরণ। হাতের কাছে যা ছিল, বিছানার চাদর, দরজার পর্দা, কাঁথা কম্বল সবই চাপানো হয়েছে। এক-তলা, দো-তলা অবস্থা। দো-তলার গাড়ি বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে মুখ ঝুলিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি, কি বুঝছো! আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোমার মত ফেটে পড়ছেন। আর কিছু চাপাতে পারছ না। হাতের কাছে আর তো কিছু দেখছি না। চাপাতে চাপাতে দেউলে হয়ে গেছি। শেষ একটা জিনিসই চাপানো যেতে পারে, সেটা হল রোড রোলার। রাস্তা মেরামত হচ্ছে। বাইরে

দাঁড়িয়ে সেই দৈত্য বিশ্রাম করছে। একমাত্র ওটি চাপালে এটি হয়ত শান্ত হবেন। চির শান্তি। আমার সেই গরম কাপড়ের স্যুটটা পরবে ? যেটা পরে আমি লে, না লাদাখ, কোথায় যেন গিয়েছিলুম। কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। (জ্বলবেই তো ! পিলে বড় হয়েছে যে। রাত দশটা নাগাদ জ্বর এসেছে, দুঘন্টা হতে চলল। এতক্ষণে পিলে নিশ্চয়ই ইঞ্চিখানেক বড় হয়েছে। পিলে তো ভারতের অর্থনীতি নয় যে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করেও বড় হয় না !) ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। ভেবো না, তোমাকেও ধরল বলে।

সে তো ভালই। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। দু'জনে জাপটাজাপটি করে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক দেহ হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে, কোঁ কোঁ করব ! দাম্পত্য জীবনের ফাটল ফোটল ম্যালেরিয়ার পলেস্তরায় জোড়া লেগে যাবে।

জ্বরটা একবার দেখ তো। মনে হয়, ছয় কি সাতে উঠেছে !

বাব্বা ! মানুষের জ্বর-মাপা যন্ত্রে তো কুলোবে না। স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ঘোড়ার থার্মোমিটার চাই। ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার বের করে ঝাড়তে থাকি। পারা কি সহজে নামতে চায়। চুরানব্বইতে আটকে বসে আছে। খ্যাচাং খ্যাচাং করে ঝেড়েই চলেছি। হাতের খিল খুলে যাবার দাখিল। নিজের পারাই নেমে গেল, থার্মোমিটারের পারা যেমন তেমনি।

ঠুং করে একটা শব্দ হল। টেবিলের কোণে লেগে যন্ত্রের যন্ত্রণা শেষ। মেঝেতে কাঁচের কুচো। মুক্তোর দানার মত তিন চার দানা পারা কোণের দিকে টল টল করছে। নামতে নামতে একেবারে মেঝেতে গিয়ে নামল।

যাঃ বারোটা বাজালে তো। খাও না খাও, কাল সকালেই একটা কিনে আনবে। ওটা রমাদির থার্মোমিটার।

আমাদেরটা কোথায় গেল ?

কমলাদি সেবার ছেলের জ্বরের সময় নিয়ে গেল না।

তারপর কি হল ?

আর এল না। সেখান থেকে গেল ছন্দাদের বাড়ি। ছন্দা থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে তন্দ্রা.....

বুঝেছি, বুঝেছি। ক্রিস্ট্যাল ক্লিয়ার। জরু আর গরুর মতই থার্মোমিটার একবার হাত ছাড়া হলে আর ফিরে আসে না। সকালে ডাক্তারবাবু এসে ডিক্লেয়ার করলেন, জ্বরের গতি প্রকৃতির দিকে কড়া নজর রাখুন। বিছানায় ফ্ল্যাট করে ফেলে রাখুন। তিনটি অস্ত্র ছেড়ে গেলুম, ম্যালেরিয়া, বিকোলাই আর টাইফায়েড। যেটা লাগে। এতে যায় ভালই, নয় তো প্রস্তুত থাকুন। দেহনির্যাস টেস্ট করে মাল ছাড়ব।

সেটা তো আগে করলেই হয়।

কি দরকার ? দেখাই যাক না দিন দুই।

এইবার শুরু হল রিয়েল খেল। কে বাঁধবে ? শব্দময় ঝঙ্কৃত প্রভাতের বদলে এ যেন ভিন্নতর একটি দিন। ম্লিপ্পার হাঁকডাক নয়, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, টুইস টুইস। কি আশ্চর্য ! পৃথিবীতে এখনও পাখি ডাকে ! ভুলেই গিয়েছিলুম। দেয়াল ঘড়ি চলছে

খটাস খটাস শব্দে। একটা বেড়াল ডাকছে করুণ সুরে। কি সুন্দর মসৃণ, পেলব, প্রসন্ন একটি সকাল। মশারির বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি রুগীর মুখ। জ্বর একটু কম। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আহা। ঘুমোও ঘুমোও। উঠলেই বড়ো শব্দ হবে। শব্দযন্ত্র। খাটের তলায় একটি বাসি আরশোলা কেতরে কেতরে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছে। অন্যদিন সাহস পায় না।

আর দেখছি রান্নাঘরের দরজার সামনে দু বোতল দুধ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। কেটলির ওপর ছাঁকনি কার্নিসে ঝুলতে থাকা আত্মহত্যাকারী ব্যর্থ প্রেমিকার মত বাতাসে দুলছে। পড়িতে পড়িতে না পড়ি না পড়ি। সকালের সংসার অপেক্ষা করে আছে। ভিতরটা চা চা করছে।

রান্নাঘরের দরজা খুলতেই ভুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে এল দুঃখীর দীর্ঘশ্বাসের মত। অনেক আগেই এ বাতাসের মুক্তির কথা ছিল। আজ সব কিছুই লেটে চলছে। জানালা খুলতেই আলো এল। কোণের দিকে গ্যাস সিলিন্ডার তাল ঠুকে বললে, আয় চলে আয়, তোকে যমের বাড়ি পাঠাই। বড়ো ভয় পাই ওই লৌহ মুদগরকে, জঠরে যার তরল অগ্নি। ফেটে ফুটে কত যে রেকর্ড করেছে। নারী চরিত্রের মত। বেশ আছে, বেশ আছে, হঠাৎ দুম ফট। সব্যসাচী চলে গেলেন সহমরণে।

গ্যাসের দরকার কি ? হবে তো চা, দুধ জ্বাল আর ভাতে ভাত। সাহেবগঞ্জের খাঁটি গব্য টেবিলের ওপর শিশিতে যত দিন যাচ্ছে ততই আরো হলদে হয়ে আরো গরু হচ্ছে। কেরোসিন কুকারেই কাজ চালিয়ে দেওয়া যাক। গ্যাসে খোঁচাখুঁচি না করাই ভাল। তেঁটিয়া স্বভাব। যেমন আছে থাক এক পাশে।

কুকার ঝন ঝন করছে। তেল নেই, বোতল টিন সব খালি। পশ্চিমবঙ্গে কবে যে তলে তলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। থেকে থেকে ব্ল্যাক আউট। মাঝে মধ্যেই শত্রুপক্ষের অদৃশ্য বিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বোমা ফেলে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার। বাস ট্রাম দেখলে মনে হয় লোক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেভাবেই হোক বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে চাইছে। কেরোসিন তেলের বিশাল বড় লাইন এঁকে বেঁকে পড়ে আছে। মাঝ সমুদ্রে ব্লিৎসক্রিগ চলেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তেল মিলবে। লাইনে দাঁড়িয়েই মানদার ডেলিভারি হয়ে গেল। ছেলের নাম রেখেছে কেরোসিন কর্মকার। খেলার লাইনের এক্সাপার্টরাই চাকু চড়িয়ে তেলের লাইনে। ধৈর্যে কে হারাবে তাঁদের ?

আবার গ্যাসের দ্বারস্থ। ওলটানো শিবলিঙ্গটি স্তোত্রপাঠে সন্তুষ্ট করে হাত লাগাই। কোনটা যে কী, কেমন করে ঘোরায় ? রবারের কানেক্টার টিউবে সাবানের ফ্যানা মাখিয়ে দেখতে হবে নাকি ? লিক করছে কি না ! সব সমস্যা মিটলেও একটা সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, ভাত প্রায় ফুটে সেদ্ধ হয়ে এসেছে এখন ফ্যান গালার কি হবে। নারীর জীবনে বিবাহ যেমন এক সমস্যা, পুরুষের জীবনে ভাতের ফ্যানস্রাব তেমনি এক সমস্যা। সমস্যার কি আছে ? চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ। হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দাও। দু দিক থেকে ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়েই টেনিসের ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিসের মত উলটে দাও। ঢাকনার মুখ ফাঁক হয়ে সিঁই করে বেরিয়ে এল গরম হাওয়া। তার পরের ব্যাপারটা

খুবই সহজ হয়ে গেল। সামান্য একটু চিৎকার। হাঁড়ির পতন। প্রদর্শনী নম্বর দুই। প্রথম প্রদর্শনী বিছানায়। দ্বিতীয় প্রদর্শনী, চেয়ারে ঠ্যাং ছড়ানো আমি, হাতে পায়ে হলদে পোড়ার মলম। তোরা কে দেখবি আয়, কদমতলায় পোড়া কৃষ্ণ, রাধিকা বিছানায়।

একেই বলে শাপে বর। জ্বর বেশ জেঁকেই বসল। দিনে তিনবার কেঁপে কেঁপে আসে আর ঘাম দিয়ে ছাড়ে। ধরে আর ছাড়ে। পুলিশের পলিটিক্যাল মস্তান ধরার মত। আত্মীয়স্বজনরা এগিয়ে এলেন। সংসার চলতে লাগল সর্বজনীন পুজোর কায়দায়। কাকিমার বাড়ি থেকে ভাত, দু'চার পদ তরকারি। পিসিমার বাড়ি থেকে পোস্ত। জ্যাঠাইমার বউমা সম্প্রতি ঘর আলো করে এসেছেন। রন্ধনবিদ্যায় দ্রৌপদী। তাঁর হাতের নানা কেরামতি, সব আসতে লাগল লাইন দিয়ে। যেন রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে। আসছেই আসছে। অড়হর ডাল, লাউ দিয়ে মুগের ডাল, মাছ, তাড়াহুড়ো, তাই ডিম এসেছে সেদ্ধ। খাবার ঘরে সারি সারি মাল চাপা। ঢাকা খুললেই নানা বিস্ময়। আত্মীয়স্বজনরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। থালার পাশে গোল হয়ে বাটির সারি। সারির পর সারি, একসার, দু'সার। রবিবার তিনসার, চারসার।

ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, একমাস একেবারে চিৎপাত পড়ে থাকুন। কোনও কাজ নয়, স্রেফ ক্যাপসুল খেয়ে যান। আমি যখন বলব গেট আপ, তখনই গেট আপ। তার আগে নয়। কি মজা। সকালে বাজার ছুটতে হচ্ছে না। মাছের ন্যাজ ধরে টানটানি করতে হয় না। রাজার মত ঘুম থেকে ওঠো, দাড়ি কামাও, চা খাও, কাগজ ওলটাও। চান করে বসতে না বসতেই লাইন দিয়ে আসতে লাগল, বাটি, ঘটি ডেকচি, ডেড়ি ডামড়ি। এই একটা আইটেম আবার শেষ মুহূর্তে উড়তে উড়তে আসে শেষ মুহূর্তের ট্রেনযাত্রীর মত।

চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো। এই বাজারে ঘাড়ে বসে খাওয়া। একদিন দুদিন হলে কথা ছিল না, দিনের পর দিন। একদিন একটা বাগে পাঁচশো আলু, আড়াইশো পটল, দুশো ট্যাঁড়স, গোটা তিনেক করলা, একটা চালকুমড়ো, এক ডগা পুঁইশাক, আর এক হাতে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে ছোট্ট একটি কাতলা মাছ নিয়ে এক রাউন্ড ঘুরে এলুম। প্রথমে পিসিমার বাড়ি। ছি, ছি, বাবা। তুমি এত নীচ। আমাদের এতই দরিদ্র ভাব। এ তো আমাদের কর্তব্য। যাও নিয়ে যাও। আর কখনও মানুষকে এভাবে অপমান কোরো না। পিসতুতো ভাই বললে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। দেবার আগে এক কাপ চা খাইয়ে দাও।

সেই একই ব্যাগ হাতে কাকিমার বাড়ি। বড়ো মর্মাহত হলুম বাবা। তিনি বেঁচে থাকলে তোমাকে জুতোপেটা করতেন। এক সময় যৌথ পরিবার ছিল, এখনই না হয় ভেঙে ভেঙে চুরমার। তিনি তোমায় কোলে-পিঠে মানুষ করে গেছেন। আমার ছেলে কি এতই গরিব ? তুমি একটা দেড়ছটাকি কাতলা নিয়ে সাত সকালেই আদিখ্যেতা করতে এসেছ ! এ সবই হয়েছে তোমার বউয়ের পরামর্শে। পরের মেয়ে এসে এই ভাবেই ঘরের ছেলেকে পর করে দেয়। ঘোর কলি রে বাপ !

আচ্ছা আমি তাহলে আসি, বলে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লুম।

এরপর জ্যাঠাইমা। আমার ব্যবহারে তিনি এতই মর্মাহত হলেন, উপায় থাকলে

আত্মহত্যা করতেন। নেহাত সংসারে বাঁধা পড়ে গেছেন। মনটাকে ভীষণ উদার করার পরামর্শ দিলেন, যেমন আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন। তুমি গলায় ব্যাগটি ঝুলিয়ে কেটে পড়ে এখন। জেনে নিলেন কটায় খেতে বসব। ঠিক নটার সময়।

শীতলাতলায় অনেক দিন একটা সিধে মানসিক করা ছিল। আলু, পটল, ট্যাড়স, মাছ, পূজারীর হাতে দিয়ে একটি প্রণাম ঠুকে পলায়ন। হিসাব করে দেখলুম স্বার্থের পাল্লা লাভের দিকেই ঝুঁকে আছে। রোজ ওষুধ চলেছে গোটা ছয়েক টাকা। নানা রকমে টেস্টফেস্ট গোটা পঞ্চাশ টাকা, ভিজিট গোটা তিরিশ, বাকি সবই তো দাতব্যে চলেছে।

এরপর লাভের ওপর নিট লাভ, স্নিগ্ধা ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর মুখে বললে এবারে আমার জন্যে আর পুজোর শাড়ি কিনো না। চিকিৎসায় তোমার অনেক খরচ হচ্ছে।

স্পেশাল অফিসার

রামপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখবাঁধা কলুর বলদের মত। আর আমাদের এই প্রসাদ, প্রসাদ মিত্র ডাকবাংলার হাতায় বসে মনে মনে বলছেন, কি ফ্যাসাদে ফেললে প্রভু। কারুর ওয়াইফও নই মিডওয়াইফও নই, অথচ এ কি পাপ। কুকুর ছানা কোলে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। কুঁই কুঁই করলেই চাকরি চলে যাবে।

সময়—সন্ধ্যা। স্থান—একটি জেলা শহর। শীত আসছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। বেলা একটার সময় ডাকবাংলায় একটা জিপ এসে ঢুকেছিল। জিপ থেকে নেমেছিলেন সস্ত্রীক এস. ডি. ও। মেমসাহেবের কোলে ছিল এই কুকুরটি। এখন প্রসাদের কোলে।

পমেরেরিয়ানের বাচ্চা। মেমসাহেব মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসি খেলিয়ে, শরীর দুলিয়ে মন্ত্রীর হাতে কুকুর বাচ্চাটি দিতে দিতে বলেছিলেন, দিস ইজ ফর ইওর ওয়াইফ স্যার। গতবার এসে আমাকে বলেছিলেন। আই প্রমিসড হার এ বিট। আমাদের কুকুরটা তখন প্রেগনান্ট ছিল। সেন্ট পারসেন্ট পেডিগ্রিড। ঠিকমত মানুষ করতে পারলে শি উইল বি এ জয় ফর এভার।

এস. ডি. ও. ভেট দিয়ে চলে যাবার পরই মিনিস্টারের খেল শুরু হয়েছে। মিনিট পাঁচেক কুকুরটাকে ঘাটাঘাঁটির পরই তাঁর অরুচি ধরে গেল। (দলে অরুচি ধরার মত। তিনবার দল বদল করে, এই ক্ষেপে গদি পেয়েছেন।) কুকুরটা প্রসাদের হাতে দিয়ে ডি. এমের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, যত্ন করবে, আদর করবে, আনন্দে রাখবে, যেই দেখবে পেট পড়ে গেছে, দুধে তুলো ভিজিয়ে চুকচুক করে খাওয়াবে। দুধ যেন বেশি ঘন না হয়, বেশি তরল না হয়। মায়ের দুধের ডাইল্যুসানে নিয়ে আসবে জল মিশিয়ে মিশিয়ে।

কুকুরের মায়ের দুধ কতটা ঘন কতটা তরল প্রসাদের জানা ছিল না। ডাকবাংলার চৌকিদার, ঝাড়ুদার, খানসামা কেউই জানত না। পশুপালন বিভাগের প্রবীণ

পশুচিকিৎসকও জানেন না। ডিসট্রিক্ট হেলথ্ অফিসারও এ-বিষয়ে অজ্ঞ। এত অজ্ঞতায় দেশ চলছে কি করে, কে জানে! যাই হোক প্রসাদ হাফ দুধ, হাফ জল মিশিয়ে হাসপাতাল থেকে বরিক তুলো এনে নুটি করে ভিজিয়ে দুপুরে কুকুর বাচ্চাটাকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছিল দুধ খাওয়াবার। সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেঁউ কেঁউ করবে না খাবে। একটু জোর জবরদস্তি করতেই তুলোর তালটা কুকুরের গলায় চলে গেল। চোখ উলটে, দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি? প্রসাদ রেডি ছিল। কুকুরের প্রাণবায়ু বেরোলেই সেও ঝুলে পড়বে গলায় দড়ি দিয়ে। কুকুরের কান দুটো ধরে পেছনটা কৌটো ঠোকার কায়দায় কার্পেটে বারকতক ঠুকতেই তুলোর ডেলা গলা ছেড়ে পেটে চলে গেল। বিপদ কাটলেও ভয় রয়ে গেল। তুলো পেটে গিয়ে হজম হবে তো? না লিভারে মেয়েদের খোঁপার জালের মত জড়িয়ে বসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সমপরিমাণ তুলো দুধে ভিজিয়ে খেয়ে বসে রইল। সেই পক্সের টিকে যে সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও তো প্রথম নিজের ওপরেই পরীক্ষা করেছিলেন। প্রসাদ একবার ভেটিরিনারি অফিসারকেও ফোন করেছিল। সরাসরি জিগ্যেস করেনি। কায়দা করে কুকুরে তুলো খেলে কি হয়?

ডাক্তার বলেছিলেন, জুতো খেয়ে যে জাত হজম করে, তুলো তো তাদের কাছে বেলের মোরব্বা মশাই।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে এসেছে। মন্ত্রীমহোদয় স্নান সেরে শরীরে পাউডার ঢেলে ভস্মমাখা মহাদেবটি হয়ে ধ্যানে বসেছেন। মাথার ওপর পাঁই পাঁই পাখা ঘুরছে। শরীরের চাপে ডানলোপিলো দেবে গেছে। কোণের টেবিলে রুপোর ফোলডিং ফ্রেমে মন্ত্রীর গুরুদেব বাঘছালে বসে আছেন। শিবনেত্র হয়ে। আর একদিকে মা মহামায়া। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ধ্যানের মাত্রাও তত বেড়ে যাচ্ছে। জন্মপত্রিকা নিয়ে জ্যোতিষীরা অঙ্ক কষে চলেছেন। হস্তরেখাবিদরা হাতেরওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফেলছেন।

মন্ত্রীর হুকুমে প্রসাদ কুকুর কোলে পাকুড় গাছের তলায় বসে আছে। কেঁউ কেঁউ শব্দে ধ্যানভঙ্গ যেন না হয়। তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছেন। আর একবার গদি চাই। কত কাজ বাকি। নিজের এলাকায় জমিজমা বেড়েছে। বাস আর ট্যাক্সি খাটছে। এইবার সিনেমা হল, আর একটা কোল্ডস্টোর হলেই কে আর গদির পরোয়া করে! চুলোয় যাক তোদের দেশ, চুলোয় যাক রাজনীতি। চাষীর জমিতেও চাষ হবে, মন্ত্রীর জমিতেও চাষ হবে। চাষ হলেই হল। হিমঘর তো দেশের চাষ-আবাদের কল্যাণেই। অর্থনীতি বলছে ধরো, ধরে রাখো, চড়ো, আরো চড়ে তারপর ছাড়ো। মন্ত্রী বলে কি মানুষ নন! মানুষের কাজই তো গুছনো। আখের চাষের মতই, আখেরের চাষ।

রাতে মন্ত্রী বিশেষ কিছু খেলেন না। লাঞ্চে গুরুভোজন হয়েছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের স্পেশাল ডাল। সরু বাসমতী চালের দু চামচে ভাত, একটা মুরগির ঠ্যাঙ, একটা চৌকো পুডিং দিয়ে রাতের আহার শেষ করে বিশাল একটি ঢেঁকুর তুললেন। পেটের মত মুখও গুরুগম্ভীর হয়ে আছে। নির্বাচন আসন্ন। জেলায় পার্টির ভেতরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ফাটল ধরে চাকলা চাকলা। যে যেমন পারছে খাবলা খাবলা টাকা মেরে সরে পড়ছে। কোঁদল শুরু হয়ে গেছে। কোঁদল থেকে কোদাল। কোদালেই কবর তৈরি হয়। দাঁতে কাঠি খুঁচতে খুঁচতে ডাকবাংলার বারান্দায় পায়চারি করছেন আর

সুর করে বারে বারে একটি নামই উচ্চারণ করছেন, বসন্ত, বসন্ত। অসুখ বসন্ত নয়, মানুষ বসন্ত। রাজনীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হজমীপায়চারি চালাতে চালাতে প্রশ্ন করলেন, খাওয়া হয়েছে ?

প্রসাদ বললে, এইবার বসব স্যার।

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমায় নয়, তোমায় নয়, কুকুরের খাওয়া হয়েছে ?

হয়েছে স্যার।

সারাদিন ক' লিটার দুধ খেয়েছে ?

প্রসাদ বিপদে পড়ে গেল। ক'ফোঁটায় লিটার হয় জানা নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করেন ক' লিটার কেঁদেছে কোন উত্তর হয় কি ? প্রসাদ বললে, প্রায় এক বাটি।

ইডিয়েট। তোমার মাপজোকের কোনও ফ্যাকালটি নেই। চেষ্টাও কর না। সেদিন ডিসট্রিক্ট কনফারেন্সে জিগ্যেস করলুম, জেলায় কত ধান হয় ? বলতেই পারলে না। ইন-এফিসিয়েন্ট। মন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরছো, স্ট্যাটিসটিকস তোমার মুখে মুখে থাকা উচিত। যখন যা চাইব চটপট বলে দেবে। তা না, হাঁ করে নিরেট নীরেনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। দেশের বারোটা তোমরাই বাজাবে। যেমন অ্যাডমিনস্ট্রেসানের অবস্থা, তেমনি পলিটিক্সের অবস্থা। আমার কি, তোমরাই বুঝবে ঠ্যালা।

মন্ত্রী হাই তুললেন। ঘুম আসছে। জড়ানো গলায় বললেন, আমি শুয়ে পড়ছি। কাল ভোরেই বেরোতে হবে। তুমি কুকুরটকে কাছে নিয়ে শোবে। মাতৃস্নেহে সারারাত রাখবে। একটা মা বের করার চেষ্টা কর প্রসাদ। পৃথিবীতে মায়ের বড়ো অভাব। খরা চলেছে। স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, থাকার মধ্যে ছত্রিশটা দল। ভোট ভাগাভাগি। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

চৌকিদার প্রসাদকে বললে, বাবু ওটাকে হিসি করিয়ে নিয়ে শুতে যান। তা না হলে বিছানা ভেজাবে। সব সময়েই তো কেঁউ কেঁউ করছে। বুঝবেন কি করে, কোন কেঁউটা হিসির। প্রসাদ গাছতলায় কুকুরটাকে রেখে হিস্‌হিস্‌ হিস্‌হিস্‌ করতে লাগলেন। চারপাশে গাছ মাথার উপর তারাভরা আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কুকুরটা পায়ের কাছে গোল হয়ে ঘুরছে আর কেঁউ কেঁউ করছে। মানুষের বাচ্চা হিস্‌ বোঝে। কুকুরের ভাষাটা কি ? প্রসাদ বিরক্ত হয়ে বারকতক ঘেউ ঘেউ শব্দ করে কুকুরের ভাষা নকল করার চেষ্টা করল। লাভ হল না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে বিছানায় চলে এল। সাধে বলে, মা হওয়া কি মুখের কথা।

অনেক রাত প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল। পেটের কাছটা ভিজে ভিজে লাগছে। পাজামার দড়িটাকে মাতৃস্তন ভেবে মুখে পুরে মন্ত্রীর কুকুর সারারাত চুকুর-চুকুর চুষে ভিজিয়ে দিয়েছে। কেমন গুটিসুটি মেরে কোলের কাছে শুয়ে আছে। প্রসাদ বড়ো সন্তুষ্ট হল, যাক এতক্ষণে কুকুরে কুকুর চিনেছে !

হাইওয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি ছুটছে। সবুজ রঙের ঝকঝকে অ্যামবাসাডার। অন্যান্য বার প্রসাদ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে, এবারে কুকুরের ইঞ্জিনের গরমে কষ্ট হবে বলে মন্ত্রী নিজেই সামনে বসেছে। প্রসাদ পেছনের আসনে। কোলের ওপর তোয়ালে, তার ওপর কুকুর। পাশে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে দুটো ফিডিং বোতল। একটায় দুধ আর একটায়

জল। প্রসাদের নিজের চান আর ব্রেকফাস্ট না হলেও কুকুরের প্রসাধন হয়েছে। পাউডার পড়েছে গায়ে, লোমে বুরুশ পড়েছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাঝে মধ্যে প্রসাদের কোল ছেড়ে খচরমচর করে পালাবার চেষ্টা করলেও সুবিধে করতে পারছে না। একদিনেই প্রসাদ বাচ্চা সামলাবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। মন্ত্রীকে সামলাতে পারে না ঠিকই। মন্ত্রীও কি পারেন ভোটার সামলাতে, দপ্তর সামলাতে, দল সামলাতে। প্রসাদ ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কুকুরকে চুষতে দিয়েছে, তাইতেই জীবটি বোকা বনে প্রসাদের কোলে পড়ে আছে। সেই একই টেকনিক। দেশের মানুষও তো ওই একই ভাবে পড়ে আছে, রাজনীতির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষে। ওরাও জীব এরাও জীব। ওরা পাঁচ বছর পারে আর এ ব্যাটা ঘন্টা ছয়েক পারে না? বোকা বানানো কি এতই শক্ত!

মাইল চারেক আসার পর মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ একবার করিয়ে নাও। প্রসাদ রাস্তার পাশে নেমে কুকুরকে হিস হিস্ করতে করতে নিজেরই পেয়ে গেল। করার উপায় নেই। গাড়িতে ফিরে এল। মন্ত্রী বললেন, ড্রাই হয়ে গেছে সিসটেম, একটু জলের বোতলটা ধর।

আবার মাইল চারেক গিয়ে মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ ট্রাই কর। প্রতি চার মাইল অন্তর প্রসাদ নামে আর ওঠে। এদিকে নিজের পেট ফেটে যাবার অবস্থা। কুকুরের বদলে তাকে করতে বললে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করে দিতে পারে। শেষে শান্তিপুরের কাছে একটা জংলা জায়গায় প্রসাদ কুকুর নিয়ে নেমে আর সামলাতে পারল না। নিজেও বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধ হয়। পেছন ফিরেই চক্ষু চড়কগাছ। কুকুর নেই। কিছু দূরে হাইওয়ের ওপর মন্ত্রীর সবুজ গাড়ি। প্রসাদ চাপা গলায় ডাকল, আয় আয় তু তু। ডাক শুনে নিচের ঢালু জমি থেকে একটা ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুকুর উঠে এসে ন্যাজ নাড়তে লাগল। ধ্যার ব্যাটা, তোকে কে ডেকেছে। প্রসাদের মনে হল, সে যে ডাকে ডেকেছে তাতে নেড়িই সাড়া দেবে। বিলিতির ডাক আলাদা। জোরে ডাকতে পারছে না মন্ত্রী শুনতে পেয়ে যাবেন। হঠাৎ নেড়িটা ঢাল বেঁকে একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে গড়ড় গড়ড় শব্দ করতে লাগল। মরেছে। মন্ত্রীর কুকুর বোধ হয় ঝোপে গিয়ে ঢুকেছে। কামড়ে ছেড়ে দিলে রক্ষে নেই। পড়ি কি মরি করে প্রসাদ ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে সড়াত করে ফুট ছয়েক ছেঁচড়ে নেমে গেল। প্রসাদের পতন দেখে নেড়িটা ভয়ে সরে গেছে। প্রসাদ ঝোপঝাড় থেকে বাচ্চাটাকে বগলদাবা করে কামড়ের হাত থেকে বাঁচালেও নিজে আর ওপরে উঠে আসতে পারছে না। পতন যত সহজে হয় আরোহণ তত সহজে হয় না। দুটো হাত কাজে লাগাতে পারলে হয়ত হত। এক হাতে কুকুর। ছফুট ওপরে আকাশের পটে মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ দেখা গেল। তিনি কিছু বলার আগেই প্রসাদ নিচে থেকে বললে, পড়ে গেছি স্যার।

মন্ত্রীর মুখটি প্রসাদের চোখে কালো আর বীভৎস দেখাচ্ছে। পেছনে উজ্জ্বল আকাশের জন্যেই বোধ হয় ওই রকম মনে হচ্ছে। সাদা দাঁত ফাঁক হয়ে লাভাস্রোতের মত মন্ত্রীবাক্য নিঃসৃত হল।

পড়লে কি করে?

প্রসাদ কুকুরটাকে দেখিয়ে বললে, আজ্ঞে এ বড়-বাইরে করতে নেমেছিল।

ড্রাইভারের সাহায্যে প্রসাদ ওপরে উঠে এল। কেটেকুটে গেছে। হাতে বাবলা কাঁটা ফুটে গেছে। চেহারা দেখে মন্ত্রী বললেন, অপদার্থ। গুড ফর নাথিং।

এক মাসের মধ্যে প্রসাদের প্রোমোশান হয়ে গেল। যে ফাইল কিছুতেই নড়ছিল না কখনও ডিপার্টমেন্টে আটকায়, কখনও ফাইনান্স থেকে অবজেকসান নিয়ে ফিরে আসে, সেই ফাইল হঠাৎ সচল হয়ে প্রসাদকে ভাঙা চেয়ার থেকে চেম্বারে তুলে দিলে। মন্ত্রীর কুকুরের বয়েস বেড়েছে, প্রসাদের পদমর্যাদাও বেড়েছে। চেম্বার ছোট হলেও চেম্বার। টেবিলে কাঁচ। চেয়ারের পেছনে ভাঁজ করা তোয়ালে। প্রসাদের কতদিনের আশা। চেম্বারের বাইরে নেমপ্লেট। কাঠের টুকরোর ওপর সাদা হরফে লেখা—স্পেশাল অফিসার। কিসের স্পেশাল অফিসার তা ঠিক না হলেও স্পেশাল অফিসার। টেবিলে আবার ঘন্টা পেয়েছে। টিপলেই কোঁ কোঁ করে বেজে ওঠে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল চকখড়ি দিয়ে স্পেশাল অফিসারের পাশে ব্রাকেট দিয়ে কে বা কারা লিখে গেছে, ডগ। প্রসাদ মিত্র। স্পেশাল অফিসার (ডগ)। তা লিখুক। প্রসাদ এখন মিত্তির সাহেব। অধস্তনেরা স্যার সম্বোধন করে।

বিলিতি বাঁশ

হাজার পাঁচেক টাকায় আমি একটি বাঁশ কিনেছি।

সে কি মশাই, একটা বাঁশের দাম পাঁচ হাজার টাকা। কী বাঁশ।

বিলিতি বাঁশ। বাঁশের নাম রেফ্রিজারেটার। বাঁশ ভেবে কিনিনি। কিন্তু এখন বাঁশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানত আমি খাল কেটে কুমির এনেছি ! তিন দিনের বাজার একদিনে ঘাড়ে করে এনে ঢুকিয়ে দেব। সকালের খাবার রাতে ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে আসবে। আগুনে একটু নেড়েচেড়ে পাতে ফেল। ওদিকে টিভি চলছে। এদিকে চশমা চোখে গৃহিণী ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে ম্যাগাজিন পড়ছেন। পাপোশে সাদা মত গোল বেড়াল। পাঁচ হাজার টাকায় তুমি সন্ধ্যায় অফুরন্ত অবসর কিনে এনেছ। তুমি তো মার্টিন লুথার কিং হে। তিনি আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্যে জীবন দান করেছিলেন, তুমি তোমার হার্ড-আর্নড পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে সংসারের এতকালের কৃতদাসত্বের অন্তত একবেলার জন্যে হাতা খুন্তি-বেড়ির হাত থেকে মুক্তি করেছ। সকালে রাঁধ, বিকেলে খাও। এবং কত কি খাও। বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গালগলা ফুলিয়ে আট রকম সুরে স্টিরিও গলায় কথা বল। ফাটা গলা কত বড় স্ট্যাটাস সিম্বল। কথায় কথায় কেমন বলা যায়—আর বল কেন ভাই, ঠাণ্ডা জল, না খেয়েও পারি না, খেলেও গলা নেয় না। হে হে মর্ডান ভাইস। তারপর ওই আইসক্রীম আর পুডিং। খেতে ভাল ; কিন্তু পেট গরম হয়। ফ্রিজের ভাই ও একটাই সুবিধে, রোজ সকালে ইডিয়েটের মত বাজারে ছুটতে হয় না। অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় বেশ ওলট পালট খাওয়া যায় শুশুকের মত। মাখন ! নো মাখন প্রবেলম। ফ্রিজে ব্যাটা মহাজব্দ। গলে ঘি হবার উপায়

নেই। সদাসর্বদাই টাইট্‌ যৌবন। সকালে ছুরি দিয়ে সেই হালকা হলুদ স্নেহ রুটির ওপর পুরু করে প্রলেপ দিয়ে, জ্যামের অঙ্গরাগে আরও মধুর করে মুখে ভরে ফেল। ভুঁড়ি! নেভার মাইন্ড। বেল্ট আছে। হার্ট। ও তো এমনিও যাবে অমনিও যাবে। ফ্রিজে তিনদিন চমচম ফেলে রেখে ফোর্থডেতে বের করে খেয়ে দেখেছ! উঃ সে এক এক্সপিরিয়েন্স মাইরি। কোথায় লাগে সুন্দরী রমণীর মুখ চুম্বন। এক এক টুকরো কেটে কেটে মুখে পুরবে মনে হবে কে যেন পটাপট তোমার মুখে কাথবার্টসন হার্পারের জুতো মারছে। ক্ষীরমোহন রাখতে পার। রাখতে পার বেশ বড় সাইজের রসগোল্লা। খেতে খেতে মনে হবে তুমি প্যারাডাইসে উর্বশীর কোলে বসে নরম উল দিয়ে সোয়েটার বুনছ।

যাঁদের ফ্রিজ নেই তাঁদের কাছে এই সব কথা বললে মনটা বেশ হালকা হয় ঠিকই। পাঁচ হাজার উসুল হয় তিলে তিলে। তবে কে জানত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মত ফ্রিজেরও, একটা লোয়েস্ট ব্যালেন্স আছে। ফ্রিজকেও সাজিয়ে রাখতে হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সেই কড়ি, একটা আয়না, লালচেলি, একটু সোনা রুপোর টুকরো রাখার মত। বোতল বোতল জল। তেমন খরচ নেই। যে লোকটি রোজ সকালে কাঁধে একটা বস্তা ফেলে শিশি আছে, বোতল আছে হেঁকে যায় তাকে ডেকে একডজন সমান মাপের বোতল কিনে একটু স্টেরিলাইজ করে জল ভর আর রাখ। খাও আর ভর। ভর আর খাও। সামান্য কায়িক পরিশ্রমেই কার্যোদ্ধার। কিন্তু তারপর আর যা যা রাখতে হবে, যেন মেয়ের বাড়িতে জামাইষষ্ঠির তত্ত্ব। অহো, ফ্রিজের লোয়েস্ট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে গিয়ে ব্যাঙ্কের লোয়েস্ট ব্যালেন্স ধরে টানাটানি।

এক ডজন ডিম ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতে হবে। ফ্রিজের ডিম। হাত দেওয়া চলবে না। দু বোতল স্কোয়াশ। ফ্রিজের স্কোয়াশ। খাওয়া চলবে না। আপেলের সময় আপেল, কমলালেবুর সময় কমলালেবু, সারি সারি সাজিয়ে রাখতে হবে। কনডেনসড মিল্ক, মাখন, চিজ। দুটো মুরগির ঠ্যাঙ। এক চাকা মাটন। একটু মাছের টুকরো। প্রথামত ফ্রিজে, ফ্রিজের দাবি অনুযায়ী যা যা রাখার রাখতেই হবে। যখন দরজাটি খুলবে টুক করে আলো জ্বলে উঠবে। সেই আলোতে ফ্রিজের জগৎ যেন পরিপূর্ণ দেখায়। ঠাণ্ডা হিমেল ধোঁয়া। সাদা বোতল, রঙিন বোতল, গোল গোল ডিমের শুভ্রতা। নিহত মুরগীর জমাট ঠ্যাঙ। কাশ্মিরী রমণীর গালের রঙ চুরি করা হিমসিক্ত আপেল। পয়সা নেই বললে চলবে না। ধার করে মেয়ের বিয়ে দেবার মত ফ্রিজও সাজাতে হবে। ওসব চালাকি চলবে না। অনেকে বাড়ি তৈরির পর কৌপিন পরে ঘুরে বেড়ান ; রাতে জল-পথ্যের ব্যবস্থা। কি করব ভাই বাড়ি করে পেনিলেস। সে পেনি আর ফিরে আসেও না। ওই ভাবেই ইন-কমপ্লিট বাড়ি থেকে সোজা চিতায়। সে তবু ক্ষমা করা যায়। তা বলে গড়ের মাঠ ফ্রিজ ঘরের কোণে শুভ্র মাহাত্ম্যে গড়ড় গড়ড় শব্দ করবে আর নির্ভেজাল জল পরিবেশন করবে তা তো হতে পারে না। খুললেই নানারকম মাল বেরোন উচিত এবং একটু বিলিতি বিলিতি হওয়া চাই। পান্তা ভাত বেরোলে চলবে না। তবে ওই মালেরই বিলিতি সংস্করণ হুইস্কি বেরোলে, হ্যাঁ তুমি রিয়েলি ফ্রিজেল মানুষ।

যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বিয়ে করে বউকে যেমন ফেলা যায় না তেমনি

পয়সা খরচ করে কেনা এই বিলিতি বাঁশকে তো আর ফেলা যাবে না। তিনি এখন গর্ভে নানারকম জিনিস ধারণ করে বসে আছেন। হলুদবাটা, সরষেবাটা, পাকা পটল, ট্যাঁড়স। ন্যাবালাগা পাকা পেঁপে। উদ্বৃত্ত সেদ্ধ ডাল। আছে থাক। তবে একটা সমীক্ষা করে ফ্রিজ কেনা উচিত ছিল। যে পাড়ায় বাস সে পাড়ায় আর মাত্র দুটি বাড়িতে এই যন্ত্র আছে। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ একটু উগ্র মেজাজের। মাঝে মধ্যে ছুরি ছোরা চালিয়ে অন্যরকম একটু ভাবমূর্তি তৈরি করে রেখেছেন। দ্বিতীয়টি আছে জনৈকা এয়ার হোস্টেসের ঘরে। ফলে মরেছি আমি। এর তার কাছে ফ্রিজের গর্ব ফলাতে গিয়ে স্বখাত সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

একদিন সকালে নিত্যানন্দ চার বোতল জল এনে হাজির।

কি খবর নিতু, সাত সকালেই জলের বোতল বগলে। সাপখোপ বেরোল বুঝি ?

আজ্ঞে না কাকাবাবু। বাবার হার্টের অসুখ তো !

ও সেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মিশিয়ে দিতে হবে ? বেলিসপেরিস !

আজ্ঞে না। এই চারটে বোতল আপনার ফ্রিজে রেখে যাব। একটু ঠাণ্ডা জল খেলে শরীর শীতল হবে। হার্টের ঝটরপটর ভাবটা ডাক্তার বলেছেন কমতে পারে। দুপুরে দু বোতল নিয়ে যাব, সন্ধেবেলা এক বোতল আর রাতে এক বোতল। আবার সকালে চারটে বোতল রেখে যাব। সামান্য ব্যাপার কাকাবাবু। অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না তো ! অসন্তুষ্ট হবার কি আছে বলুন ? একজন হার্টের রুগী, একটু যদি ভাল থাকেন, কি বলেন ? আচ্ছা আসি। বোতল চারটে রইল, কেমন। ঠিক করে রাখবেন, যেন বেশ ঠাণ্ডা হয়।

হরিদা এলেন। হাতে একটা মাখনের থান ইট।

বিমান ভায়া !

বলুন দাদা।

এটিকে যে তোমার ঠাণ্ডা মেশিনে আশ্রয় দিতে হবে। তোমার কৃপায় এইবার আমার ব্রেকফাস্ট প্রবেলমটা মিটল। ব্রেড. অ্যান্ড বাটার, এর চেয়ে ভাল খাবার এই বাজারে আর কি আছে বল। সেই শীতকাল ছাড়া মাখন খাবার উপায় ছিল না। তুমি যে দেশের দশের কি উপকারই করলে ভাই। তোমার কাছে কোথায় লাগে সেই আহম্মক পলিটিস্যানরা। আসতে আসতেই একটু নরম হয়ে এসেছে। কি পোড়া দেশে আমরা বাস করি দেখেছ ! সাতটা মাসই গরম। হোয়্যার ইজ ইউরোপ ! ভাবতে পার সাইবেরিয়া এখন সাতফুট বরফের তলায়। যাদের ভাল হয় তাদের সবই ভাল। ফুড, ওয়েদার, লিভিং নাও এটাকে একটা ভাল জায়গায় রাখ। এ বাজারে কটা লোক মাখন খেতে পারে। নেহাত তোমার পিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের আশীর্বাদে চাকরিটা ভাল করি তাছাড়া তেমন অসংযমী নই। প্ল্যানড ফ্যামিলি। হ্যাঁ শোন, পাছে তোমার মাখনের সঙ্গে আমারটা গুলিয়ে ফেলতে পার ভেবে আমি এই র‍্যাপারের ওপর স্কেল ফেলে ফেল্ট পেন দিয়ে এক ইঞ্চি অন্তর লাইন টেনে রেখেছি। রোজ্জ এক ইঞ্চি করে কেটে নিয়ে যাব। ছ'দিন চলবে। হিসেবের কড়ি বাঘে খাবার উপায় নেই। হেঃ হেঃ ব্বাবা।

কাকিমা।

কে রে !

আমি অর্চনা!

তোমার হাতে ওটা কিসের হাঁড়ি।

রসগোল্লা।

কি হবে? তোমার জন্মদিন। ও না, সেই পরীক্ষা পাশের আনন্দ। বাবা কতদিন পরে! ঠিক মনে আছে। না খাইয়ে ছাড়বে না। গন্ডারের গোঁ।

না কাকাবাবু। বাবা পাঠালেন ফ্রিজে রাখতে। কাল গোবরডাঙ্গায় গিয়েছিলেন। মিষ্টি দেখলে তো আর জ্ঞান থাকে না, তার ওপর সস্তা দেখেছেন। চল্লিশটা আছে। রোজ দশটা করে বের করে নিয়ে যাব।

সেই রসগোল্লা। তৃতীয় দিন সকালে অর্চনার মা এলেন। দশটা বের করার পর গম্ভীর মুখে বললেন, কেমন হল?

আমার স্ত্রী বললেন, কি আবার হল?

আরও দশটা থাকার কথা, ছটা রয়েছে কেন? এই তো আমার হাতে দশ হাঁড়িতে ছয়। ষোল কেন হবে, হবে তো কুড়ি। চারটে শর্ট।

তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে হয়ত।

না, আমার হিসেব ঠিক আছে। হিসেবের কড়ি, বাঘে খেলেও বুঝতে পারব।

তার মানে তুমি বলছ আমরা খেয়েছি।

কিছু বলতে চাই না, তবে চারটে কম। এ বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই। সবকটাই নিয়ে যাই বাবা।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, তুমি খেয়েছ?

আমি? আমার না হাই সুগার। গোবরডাঙ্গার ওই মাল খেয়ে মরব নাকি। স্ত্রীর জেরা চলল। ছেলে খায়নি, মেয়ে খায়নি, যে কাজ করে শঙ্করী, সে খায়নি।অর্চনার মা যেতে যেতে বললে, তাহলে পিঁপড়ে খেয়েছে।

স্ত্রী আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, এ তোমারই কাজ। মিষ্টি খাওয়া বন্ধ। সারাদিন ছোঁক ছোঁক কর। মাঝরাতে উঠে মেরে দিয়েছ। ছি ছি লজ্জা করে না।

একেই বলে সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর।

টেলিফোন

নিজেই নিজেকে বাঁশ দিয়ে বসে আছি। বাঁশ যে কত রকমের হতে পারে ধারণা ছিল না। কেতাবে পড়েছিলাম, মুংলি, তলতা আর গেঁটে। সে সব হল কাজের। উপকারী বাঁশ। যে বাঁশ আমরা পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে থাকি সে বাঁশ অদৃশ্য এবং তার ধরন বহু। সংস্পর্শে না এলে জাত বোঝা যায় না। যেমন আমি এখন চারটে বাঁশের পাল্লায় পড়েছি। চারটেই আছোলা এবং নগদ মূল্যে কেনা। বন্ধু ভেবেই কেনা। এখন তারা মহাশত্রুর চেহারায় গলা দিয়ে গান বের করে ছেড়েছে গেছে সুখ গেছে শান্তি।

বাম্বু নাম্বার ওয়ান, টেলিফোন। একটা টেলিফোন নাও হে। কত বড় স্ট্যাটাস সিম্বল। ইয়া মোটা একটা বইতে তোমার নাম থাকবে। কত জ্ঞানী, গুণী, সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একাসনে। অজ্ঞাতকুলশীল নও। ডাইরেক্টরিতে নাম। নামের পাশে নম্বর। এই শহরের নম্বরী কয়েদী। লোককে কেমন বড় গলায় বলতে পারবে, কাল তাহলে সকালে ফোন করো। তিনি তখন মুখটা করুণ করে বলবেন, আমার যে ফোন নেই। সঙ্গে সঙ্গে তুমি কত উঁচুতে উঠে যাবে। টেলিফোনের হাতে লাটাই, স্টাটাসের আকাশে তুমি একটি ঘুড়ি। এক টানে চড় চড় করে তুমি সুনীল আকাশে নারকেল গাছের মাথার ওপর উঠে লাট খেতে থাকবে। এক কথায় ফ্রম ছাতুবাবু টু লাটুবাবু। মানুষের বর্তমান জাতিভেদ তো এইভাবে—আমার ফোন আছে, তোমার নেই। আমার ফ্রীজ আছে, তোমার ফ্রীজ নেই। আমার গাড়ি আছে, তোমার গাড়ি নেই। কিংবা আমার স্কুটার আছে, তোমার সাইকেল। আমার মোটর সাইকেল, তোমার মোপেড। আবার এইভাবেও হতে পারে—তুমি দোতলার ফ্ল্যাটে থাক, আমি থাকি আটতলায়, ছ' তলায়। অবশ্য দোতলা এইভাবে ছ'তলার জাতে উঠতে পারেন, আমার যে হার্ট ভাই। তার মানে দোতলা উইথ হার্ট ইজ ইকোয়াল টু ছ'তলা উইদাউট হার্ট।

মানুষের জাতিভেদ আবার এভাবেও হতে পারে—আমার বউ সুন্দর, তোমার বউ মাটো-সুন্দরী। আমার বউয়ের গায়ের রং দুধে আলতায়, তোমার বউ কেলে-ক্যাকটাস। অবশ্য এইভাবে কাটান দেওয়া যেতে পারে, কালো হলে হবে কি ভাই, শ্বশুর বিশাল বিশাল, বিশাল বড়লোক। তার মানে দুধে আলতার হাজব্যান্ড ইজ ইকোয়াল টু রিচ বাপের কালো মেয়ের হাজব্যান্ড।

জাতিভেদ আবার এইভাবেও হতে পারে, আমার বাড়ির দক্ষিণখোলা, তোমার বাড়ির দক্ষিণ চাপা। আমার সাউথে বাড়ি, তোমার ন্যাস্টি নর্থে। আমার ছেলে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ার, তোমার ছেলে যাদবপুরের। এই যখন জগত তখন তোমার উপায় থাকতে একটা ফোন নেবে না কেন? তাছাড়া টেলিফোন এমারজেন্সির সময় কত কাজে লাগে জানো? ধর তোমার হঠাৎ থ্রম্বোসিস হল, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। জাস্ট ডায়াল। কত যেন নম্বর? অ্যাম্বুলেন্স তেড়ে এলো, মাথার ওপর নীল আলো ঘোরাতে ঘোরাতে। কি অলুক্ষুণে কথা। কেন? থ্রম্বোসিস হবেই। আজ হোক, কাল হোক, হবেই হবে। হয় করোনারি, না হয় সেরিব্রাল। শোননি, জন্মিলে মরিতে হবে। তারপর ধর তোমার বউ বাথরুমে ঢুকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল। সে আবার কি? একটা সম্ভাবনা। হতেই পারে। এ যুগ হল সেল্‌ফ ইমমলেশানের যুগ। সকলেরই আত্মঘাতী হবার প্রবল ইচ্ছা হিক্কার মত গলার কাছে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একটু উস্‌কে দিলেই হল। ফোন থাকলে কত সুবিধে। ঝট করে ডাক্তার ডাকতে পারবে। পুলিশে খবর দিতে পারবে। বাড়িতে মাঝরাতে ডাকাত পড়তে পারে। তখন তোমার ফোন কত হেল্পফুল হবে জানো। অফিস থেকে মাইনে নিয়ে ফেরার পথে তুমি ছুরিকাহত হতে পারো। তখন তুমি হাসপাতালে গিয়ে খাবি খাবে। সেই সময়ে তোমার বাড়িতে ফোনে খবর দেওয়া সহজ হবে।

ভাল দিকও আছে। ফোন হলে ক্রশ কানেকশানে প্রেমালাপ শুনবে ঘন্টার পর ঘন্টা।

ঝগড়াও শুনতে পাবে। টেলিফোনে স্ত্রী ঝাড়ছে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীকে। স্বামী ঝাড়ছে শ্বশুরবাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা উড়ু উড়ু মেজাজের বউকে। শুনতে পাবে সিনিয়ার শাসাচ্ছে জুনিয়ারকে। শুনতে পাবে ঘুষের কথা, শেয়ার মার্কেটের কথা। টেলিফোনে এক ব্যবসাদার এক ব্যবসাদারকে ভাও বলছে। কত সব গোপন কথা রিসিভার তুললেই শুনতে পাবে। কত পাগল আছে জানতে পারবে। কুকুর পাগল, ফুল পাগল, পাখি পাগল, বউ পাগল, খেলা পাগল, ঘোড়া পাগল।

তা ছাড়া ফ্রী মেলে তুমি মাঝে মাঝে নানা রকম চিঠি চাপাটি পাবে। নতুন ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। স্টেনলেস স্টিলের বাসন পাওয়া যাবে পোস্টে। বশীকরণের মাদুলি দিচ্ছেন বিলেত ফেরত তান্ত্রিক। ভাগ্য বলে দিচ্ছেন মিডল ইস্টের পামিস্ট। দুর্বলতা কাটাবার ট্যাবলেট বেরিয়েছে রুপোলি মোড়কে মোড়া। হাঁপানির দাওয়াই বেরিয়েছে। পনেরো দিনে সারাবার গ্যারান্টি। ফুসফুস ক্লিয়ার। বাঁশি বাজানো যাবে ইচ্ছে করলে। ভুঁড়ি আর মেদ কমাবার গেজেট। পাকা চুল এক রাতে কাঁচা করে দেবার আয়ুর্বেদিক লোশান। যৌবন ফিরিয়ে আনার স্বপ্নদত্ত কবচ। কত কি যে তুমি পেতে থাকবে ধারণা নেই। পৃথিবী যে কত মধুময় জানতে পারবে।

একেই বলে গ্যাস খাওয়া। সেই ফোন এসে বসল দু' দেওয়ালের কোণে চকচকে টেবিলে 'আহা' কি শোভা। দ্বিতীয় তাকে রেক্সিন মলাটে ডাইরেক্টরী। যার কোন এক পাতায় পিঁপড়ের মত খুদিখুদি অক্ষরে আমার নাম ছাপা। শ' পাঁচেক ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ফেলেছি। নামের তলায় ফোন নং। লেটারহেড এসে গেছে। কত বড় একটা ব্যাপার। জটাধারীর মত ফোনধারী। ইউরোপ, আমেরিকা হলে কিছুই নয়। ভারতবর্ষে দিস ইজ সামথিং। পাঁচজনকে বলা চলবে। আমার কোন প্রবলেমই নেই, যেই গ্যাস ফুরোল সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটারকে ফোনে বলে দিলুম। ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়েছে, জাস্ট এ ফোন। ডাক্তার। জাস্ট এ কল। হ্যাঁ ভালই আছি। রিপিট প্রেশক্রিপশান। তিন নম্বর ওষুধটা বাদ। থ্যাঙ্ক ইউ। পোলাও খেয়ে পেট ছেড়েছে? অফিসে ফোন জানিয়ে দাও, আজ আর আমি যাব না। বিকেলে তেড়ে বৃষ্টি এসেছে? অফিস থেকেই বাড়িতে ফোন হ্যালো, হ্যাঁ শোন, খিচুড়ি লাগাও উইথ গরম গরম বেগুনি অ্যান্ড পাঁপড় ভাজা।

কিন্তু এমন সম্ভাবনার কথা আমাকে আগে কেউ বলেনি তো? এই ভাদ্রমাসের ঠিকুর রোদে ছাতা মাথায় আমি চলেছি। কোথায় চলেছি! ডাক্তার ডাকতে? পোস্ট অফিসে চিঠি রেজিস্ট্রি করতে? না আমার বাড়ি থেকে বত্রিশটা বাড়ি উত্তরে সোমাদির বাড়ি। আমার দিদি নয়। নারকেলডাঙা থেকে যে যুবকটি ফোন করছে তার দিদি। যুবকটি আমাকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করেছে। তার মানে সোমা নামক মহিলাটি সম্পর্কে আমার কে হলেন? জানার দরকার নেই। ছেলেটির গলায় প্রচণ্ড উদ্বেগ। কি জানি কোন বিপদ আপদ কিনা! তার সোমাদিকে ডেকে দিতেই হবে। মানবিক কর্তব্য। সোমাদি বাথরুমে! সেইখানে থেকেই খুশির গলায় বলে উঠলেন, ও বুঝেছি। নাড়ু ফোন করেছে। আমার তো বাথরুম থেকে বেরোতে একটু দেরি হবে কাকাবাবু। আমি কাকাবাবু! আমি তাহলে দুজনেরই কাকাবাবু! ভাল। কি করব তাহলে? আপনি শুধু জিজ্ঞেস করবেন,

টিকিট পেয়েছে কি না। যদি বলে হ্যাঁ, তহলে বলবেন, আমি মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। আসতে যেন দেরি না করে। বলবেন একা একা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে। তোড়ে জল পড়ার শব্দের সঙ্গে বাথরুম থেকে গান ভেসে এলো—আমি বনফুল গো-ও।

হ্যালো ! ভাইপো, আমার ভাইঝি, তোমার দিদি এখন স্নান ঘরে বনফুল। তুমি কি টিকিট পেয়েছ বাবা ? হ্যাঁ পেয়েছি কাকাবাবু। তবে দুপুরের নয় বিকেলের। ওর সঙ্গে কথা ছিল দুপুরের। আপনি কাইণ্ডলি সময় পরিবর্তনটা একটু বলে আসুন।

ফোন শেষ হলেও চান শেষ হয়নি। মেয়েদের স্নান হল জলহস্তীর স্নান। চলছে চলবে ! হ্যাঁ টিকিট পেয়েছে। তবে ম্যাটিনির নয়, ইভনিং শোর। ও হাউ সুইট ! ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে। কে সুইট, কাকাবাবু না সেই অদৃশ্য অজানা নারিকেল ভাইপো !

সামনের বাড়ির শিখার বাবা সেদিন খুব ঝাড় দিলেন। আপনি মশয় মিটমিটে শয়তান। ভদ্রলোক উত্তেজিত হলে খুব মশয় মশয় করেন। মুদ্রা দোষ। আমার অপরাধ ? ইই আর এ ক্রিমিন্যাল। ছুপা রুস্তম। সে আবার কি ? হিন্দী সিনেমা নাকি ? আপনি একটা ভিলেইন। ভিলেনির কি দেখলেন ? আমার মেয়ে শিখা আপনার বাড়ি থেকে ফোন করে ? হ্যাঁ মাঝে মাঝেই করে, রোজই করে। কেন করতে দেন ? সে কি। একবার রাত নটার সময় আপনার এক বন্ধু মাছ ধরার চারের ফর্মুলা জানবার জন্যে ফোন করেছিলেন। সেদিন আমার জ্বর। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছি। বাইরে বৃষ্টি। আপনার মেছো ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম, ভাই কাল সকালে ফোন করুন। সেই বন্ধু পরে আপনাকে বলেছিলেন, সামনের বাড়ির লোকটা ছোটলোক। অসামাজিক। পাড়া থেকে দূর করে দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাকে তেড়ে এলেন। আপনার ছেলে রাস্তায় দেখা হলেই বলতে শুরু করল, টেকো চলেছে টেকো। শালার পয়সা হয়েছে। একদিন বসার ঘরে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। দুর্গাপুজোয় গলায় গামছা দিয়ে একশো টাকা চাঁদা নিয়ে গেল। অসামাজিক-নির্যাতনে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আপনার মত আদর্শ সামাজিক মানুষের মেয়েকে টেলিফোনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে একঘরে হতে চাই না।

নোওও ! ভদ্রলোক সকালের সাইরেনের মত চিৎকার করে উঠলেন। বাই অ্যালাউয়িং শিখা টু ইউজ ইওর ফোন ইও আর এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং এ ক্রাইম। আপনার জানা উচিত এ বাজারে একটা আইবুড়ো মেয়ে যখন ফোন করে তখন কাকে করে ? বয় ফ্রেন্ডকে। বয় ফ্রেন্ড মানে কি ? লুটেরা। ভোমরা। ফুলে ফুলে মধু খাব কিন্তু পিঁড়েতে কভি নেহি বৈঠেগা। চোখের সামনে দেখছেন একটা মেয়ে চিটেড হচ্ছে, প্রেমের উপন্যাস আর হিন্দি ছবি দেখে ইশক্ ইশক্ বলে বলে লাফাচ্ছে, কোথাকার কে এক ডাঁশা ছেলেকে আপনারই টেলিফোনে ইনটিমেট হবার সযোগ দিচ্ছে আর আপনি কি না যার গেল তার গেল বলে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে আছেন ? এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যেই আমাদের সমাজ আজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। যেহেতু আপনার মেয়ে নেই, সেই হেতু অন্যের মেয়ে সম্পর্কে আপনার কোন ভাবনাই নেই। বাট আই টেল ইউ, ওই ফোনে যখন আর একটা মেয়ে আপনার ছেলের কানে প্রেম ঢেলে আপনার খপ্পরের বাইরে

নিয়ে গিয়ে গলায় মালাটি পরিয়ে আপনাকে কলাটি দেখিয়ে কেটে পড়বে তখনই বুঝবেন প্রেম কি ফেরোসাস জিনিস ! যৌবন উত্তম জিনিস ততক্ষণই, যতক্ষণ বৃদ্ধদের কনট্রোলে থাকে। ঘোড়ার লাগামটি গেল তো সবই গেল।

অফকোর্স ! টেলিফোন হল এমারজেন্সী। আপনার ঘরে সাজিয়ে রাখার খেলনা নয়। সকলকেই ব্যবহার করতে দিতে হবে। কিন্তু সেন্সার করে। সিনেমা, টি ভি, রেডিও, কাগজ শক্তিশালী জনসংযোগ মাধ্যম। কিন্তু ! দেয়ার ইজ এ বাট। ভালও করতে পারে খারাপও করতে পারে। সেই জন্যেই সেন্সার। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বলবে। ছেলে বন্ধু ছেলে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবে। মেয়ে বন্ধু মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু মশয় আমার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে, কিম্বা আপনি মশয় দুপুরে পরস্ত্রীকে খুঁচিয়ে তুলবেন, সে তো হতে পারে না।

খুব জ্ঞান বেড়ে গেল। এবার থেকে কাউকে টেলিফোনে আর প্রেম করতে দোব না। তিনি যে-ই হোন। অপসংস্কৃতি নট অ্যালাউড। পাশের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটের ছেলেটি সবে বিয়ে করে আলাদা হয়ে এখানে এসে উঠেছে। মটোবরাইক চালায়। মাস্তান মাস্তান দেখতে। তবে শুনেছি ভাল চাকরি করে। মাঝে মাঝে বউকে পিছনে বসিয়ে ভটভট করে হাওয়া খেতে বেরোয়। সেই বউটি একদিন ঝোড়ো পাখির মত ঘরে এসে ঢুকল, জ্যাঠামশাই জ্যাঠামশাই একটা ফোন করব। টেলিফোনের কল্যাণে বয়েস উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কাকাবাবু, জ্যাঠামশাই, এইবার দাদু হব।

হ্যাঁ বা না-এর তোয়াক্কা কে করে। রিসিভার তোল আর ডায়াল কর। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ফোন করবে ? দ্যাট্স নট ইওর লুক আউট ! কানে রিসিভার, আঙুল পাক মারছে ডায়ালে, একটা কলের চার্জ কত ? দরকার হয় পয়সা বুঝে নিন বাট ডোন্ট বি সিলি। হ্যালো, সেজদি, শোন ভাই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ধমকের সুরে আমাকে বললে, বাইরে গিয়ে বসুন। ইউ হ্যাভ নো কমান সেন্স। মেয়েদের কথা শুনতে খুউব ভাল লাগে, না ! ও পাশের সেজদি বোধ হয় জিজ্ঞেস করেছে, কাকে বলছিস ? ঘরের বাইরে যেতে যেতে শুনলুম বলা হচ্ছে, আরে একটা আনম্যানারলি বুড়ো। মুখ দেখলেই মনে হয় কুচুটে। প্রায় ঘন্টাখানেক সেজদির সঙ্গে কথা হল। দু-এক টুকরো ভেসে এলো। এই বয়েসেই কান গরম হয়ে ওঠে। মেয়ের সবে বিয়ে হয়েছে। পৃথিবী এখন গোলাপী।

হারাধনবাবুর হোমিও ডাক্তার গড়পারে থাকেন। হারাধনবাবুর শরীরের ওপর রোগের সাঁড়াশি আক্রমণ। রোগ মিলিয়ে এক ওষুধ এনে বসতে না বসতেই আর এক অসুখ প্রবল হয়ে ওঠে। উঠুক না, ক্ষতি কি ! আমার ফোন আসায় অসুস্থ মানুষটির কত সুবিধে হয়েছে ! ফোনে চিকিৎসা। রুগ্ন শরীর নিয়ে ট্রাম-বাস। বাস-ট্রাম করতে হচ্ছে না। বেঁচে থাকে বাবা ; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

হ্যাল্লো। হ্যাঁ কে ডাক্তার মনোরঞ্জন ? ডক্টর মনোরঞ্জন মুখার্জী, এমবিবিএস, এইচএমবি। না ? যাঃ রঙ নাম্বার হয়ে গেল। তুমি একবার দেখ তো ভাই। বুড়ো মানুষ, কি ঘোরাতে কি ঘুরিয়ে ফেলেছি। বয়েস হয়ে গেল মানুষের চলে যাওয়াই ভাল ; কিন্তু যেতে যে প্রাণ চাইছে না রে ভাই। মায়া, মায়া ! আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। প্রথমে

ভাবলুম পুত্রবধূর মুখ দেখছি, আর কি, এবার তো গেলেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, আর ক'টা দিন, নাতির মুখ দেখে তারপর যেখানে যেতে হয় যাব। এরপর মনে হবে নাতবউ দেখব।

হ্যাঁ—হ্যালো। কে ডক্টর মুখার্জি? কথা বলুন।

পেয়েছ বাবা! ফোনটাকে এমনভাবে দুহাত চেপে ধরলেন যেন জীবনদণ্ড। হারাধন বলছি। রুগী নম্বর পাঁচ পাঁচ তিন। খাতাটা খুলুন। হ্যাঁ খাতাটা খুলুন। তেইশ তারিখে ওষুধ এনেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তেইশ। এক পুরিয়া খেয়েছি। খেলে কি হবে!

হারাধনবাবু ফোন তাঁর বহুবিধ অসুখের এক একটিকে ঝেড়ে-ঝুড়ে বের করতে লাগলেন। বিচিত্র সব রোগলক্ষণ। শুনলে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। বেঁচে থাকতে ভয় ভয় করে। বয়েস বাড়তে বাড়তে হারাধন হবার আগেই যেন হাসতে হাসতে কেটে পড়তে পারি প্রভু!

সামনের দিকে তিনখানা বাড়ি এগোলেই এক আদুরে পরিবার আছে। আদিখ্যেতায় ভরা। কর্তা, গিন্নি, একটি ফুটবলের মত বাচ্চা মেয়ে। দোতলার দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। কর্তা বারান্দার রেলিঙে হাতের ভর রেখে সিগারেট খান। পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং গাউন। কোমরে ট্যাসেলের ফাঁস। শ্যাম্পু করা বাদামী রঙের ফুরু ফুরু চুল। গোলগাল, ফুলোফালা ঘুম ঘুম মুখ। বারান্দায় কর্তার গায়ে ঠেসান দিয়ে গিন্নি দাঁড়িয়ে থাকেন। পিঠে এলোচুল। হাতকাটা গাঢ় বেগুনী ব্লাউজ। লতাপাতা আঁকা শাড়ির আঁচল বুক থেকে খুলে বারন্দার রেলিঙে শেফালী তোমার আঁচলখানি বিছাও, শারদ প্রাতের মত লুটিয়ে থাকে। মেয়েটি থাকে দুজনের মাঝখানে। ইংরেজিতে কথা চলে, ও, নো, নো, নো, বান্টি, সেহ্বোর্ড নট বার্ড। দ্যাট্স আগলি। রাস্তার লোক মুখ তুলে চায়। রাস্তার মাথার ওপর সাইনবোর্ডের মত ঝুলে থাকেন এই সুখী পরিবার। সিগারেট, ধোঁয়া শাড়ি, গাউন, চুল, যৌবন, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা, সব মিলিয়ে আমাদের পথের ধারে—কপোত-কপোতী যথা উচচ বৃক্ষচূড়ে।

ওই বেগুনী মহিলা হঠাৎ তাঁর আদুরী মেয়েকে নিয়ে বিকেলের দিকে হাজির। বিলাইতি সেন্টের মন কেমন করানো গন্ধ। মিহি ছুরির মত কথা। করাতকলের কাঠ কাঠার সময় যেমন শব্দ হয় সেই রকম শব্দ। এক্সকিউজ মি। কেন এক্সকিউজ কেন? কি করেছেন আপনি? আর কিছু করে থাকলেও আপনি করেননি, করেছেন আপনার স্বামী। ওভাবে রাস্তায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ছোঁড়া উচিত নয়।

ও, নো নো, সে এক্সকিউজ নয়। এ হল কথার কথা। অ্যাংলো বেঙ্গলী সমাজের রীতিই হল, কথা শুরু করার আগে এক্সকিউজ মি বলা। ধাক্কা মেরে চলে যাবার সময় বা এগিয়ে যাবার সময় এক্সকিউজ মি বলা। পা মাড়িয়ে দিয়ে, সুটকেসের খোঁচা মেরে চোখে আঙুল গুঁজে দিয়ে সরি বলা। ভদ্রসমাজের নিয়মই হল, সরি বললে সাতখুন মাফ। আমার হাত ফসকে একবার একটা ফুলগাছের টব রাস্তায় এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিল। দোতলা থেকে পড়েছে। আমি বুঝতে পারছি ঘাড়ে পড়বে, ভীষণ লাগবে। চিৎকার করে তিনবার বললুম সরি, অ্যাম সরি, ড্যাম সরি। রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেল। চিৎকার, চেঁচামেচি, সাংঘাতিক ব্যাপার। অশিক্ষিতের দেশ তো।

ম্যানারস জানে না। আদব কায়দা জানে না। আমি তখন খুব রেগে গিয়ে বললুম, আন্তর্জাতিক নিয়ম জানেন না আপনারা, সরি বলার পর আর কিছু করার থাকে না। যান, ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিয়ে যান। নেহাত অজ্ঞান হয়ে গেছেন তাইত জ্ঞান থাকলে উনিও বলতেন, সরি, সরি। আফটার সরি দেয়ার শুড বি নো ওয়ারি। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস জেনে রাখুন, হঠাৎ হেঁচে ফেললে সরি বলতে হয়। আমার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে বাথরুমে হেঁচে ফেললেও সরি বলি। এটা হল সেই এক্সকিউজ মি।

এক্সকিউজ মি ?

এ মা। কি বোকা ? আপনি এক্সকিউজ মি বলবেন না। আপনি হাসি হাসি মুখে শুধু শুনে যাবেন।

আমি মুখে হাসি মেখে শুনতে লাগলুম, তিনি বলতে লাগলেন—

আমার এই মেয়েটা বাবাকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকতে পারে না। কি মুশকিল বলুন তো ? এক ধরনের ফাদার কমপ্লেক্স।

তা আমাকে কি করতে হবে ?

না না, ও রকম বুড়লি কথা বলবেন না। একজন মহিলার সঙ্গে নরম গলায়, হেসে হেসে, ওনলাইজিংলি কথা বলতে হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা সপ্রেম ঝিলিক থাকবে।

চোখে প্রেমের ঝালর ঝুলিয়ে বললুম, বলুন কি করতে পারি ?

এই মেয়ে তিনবার আসবে, একবার বারোটার সময়, একবার তিনটের সময়, একবার ছ'টার সময়। আপনার ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলবে। কটা দিন। তারপর তো আমরা কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারে চলে যাব। বান্টি। বা-আ-ন্টি ? কাম হিয়ার। ওই যে ফোন। টু থ্রি ফোর নাইন। মুকার্জি প্লিজ। মুকু। এই নাও তোমার আদরের মেয়ে। কি মেয়েই যে হয়েছে বাবা। শোনো তুমি বাপু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দাও। মেয়ে কোলে নিয়ে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকো। আমি আর পারছি না বাবা। অ্যাঁ, কি বললে ! আমার মেয়ে। আমার মতই হবে। ও নো, নো, অসভ্যতা কোরো না।

সেই মেয়ে। যেমন একগুঁয়ে তেমনি বায়নাদার। ফোন ধরলে আর ছাড়তে চায় না। কেড়ে নিতে গেলে চিল চেঁচায়, খ্যাঁক খ্যাঁক করে কামড়ে দেয়। বুকের কাছে দু'হাতে রিসিভার চেপে ধরে দেয়ালে পিঠ ঠেসে ঘাড় কাত করে বলে, আমার ফোন, আমার বাবা ফোন।

এই হল আমার বাঁশ নম্বর এক। আজকাল মাঝে মাঝেই মাঝরাতে অন্ধকার বসার ঘরে থেকে থেকে ফোন বাজে। আমি জানি কে ? একটি বৃদ্ধ মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে। নাম নেই ধাম নেই, যেন প্রেতকণ্ঠ !

হ্যালো ! কি হল আজও ঘুম আসছে না ?

না। তুমিও তো দেখছি জেগে আছ !

আমারও যে আসছে না।

আসবে না ভাই, ঘুম আর আসবে না। আমাদের দিনের পাপ যত বাড়ছে রাতের বিবেক তত আসছে।

কেমন হল ?

কি কেমন হল ?

ময়দানে খেলার নাম নরবলি। চোদ্দটা তাজা প্রাণ চলে গেল। সংবাদ বিচিত্রায় অজয়ের বাবার আর্ত চিৎকার শুনেছো ?

শুনেছি।

বল, ঘুমনো যায় ? জেগে থাক, জেগে থাক। সজাগ থাক। ঘুমোলেই মরবে। নাগিনীরা ফেলিতেছে চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস।

খ্যাঁকশিয়াল

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সুর করেই বলি, আর কতকাল, আর কতদিন ? এখনও পাক্কা কুড়িটা বছর একই ভাবে টেনে যেতে হবে। এমন জানলে কে জন্মাত। অবশ্য জন্মের ওপর আমার কোনও হাত নেই। কেউ কারুর ইচ্ছেতে জন্মায় না। জন্ম একটা রহস্য। এ রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। এটার সঙ্গে ওটা মিলে কি একটা হয়, এইটুকু বেশ পরিষ্কার ; কিন্তু আমি লাখোপতির ঘরে না হয়ে কেন মধ্যবিত্তের ঘরে হ্যাংলামি করতে এলুম সেইটুকু অপরিষ্কার। তখনই আসে ভাগ্যের কথা, পূর্ণজন্মের কথা। রহস্য তখন আরও জটিল।

মাঝে মধ্যে ভাবতে বসি, আমি কে ? আমাকে আমি ছাড়া কে আর ভাল করে জানবে। দেহের খোলে কোন বস্তুটি ঢুকে বসে আছে একটু খোঁচাখুঁচি করে দেখতে ইচ্ছে করে। তিনি নিজে কোনদিনই ধরা দেবেন না। তিনি হাবা এবং কালা। কিন্তু বেশ খেলোয়াড়। কে খেলায়, আমি খেলিবা কেন ? জাগিয়ে ঘুমাই অঘোরে যেন। এ প্রশ্ন সব ভাবুক মানুষই জীবনের কোনও না কোনও সময় করে থাকেন। প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। এই উত্তরটাই আমাকে জানতে হবে।

অনুমান বলে একটি প্রক্রিয়া আছে। এ জন্মের ব্যাপার স্যাপার দেখে পূর্বজন্ম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা। পূর্বজন্মে আমি এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিলাম। অর্থলাভী। অনেকটা হায়নার মত। টাকার লোভে এলোপাথারি চিকিৎসা করে বহু মানুষের সর্বনাশ করেছিলুম। তার ফলে, কিম্বা সেই পাপে এ জন্মে শরীরের সমস্ত কলকব্জা বেগোড়বাঁই। হার্টের পাম্প ঠিকমত চলে না। ফুসফুসের তেমন জোর নেই। লিভার দুর্বল। দৃষ্টি ক্ষীণ। মাথা জোড়া টাক। গায়ের চামড়া খসখসে। গ্রীষ্মের ঘামাচি। চব্বিশ ঘন্টা খেঁসোর খেঁসোর চুলকানি। হাত পা কাঁপে। আবহাওয়ায় সামান্য উনিশ বিশে ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচি। বদহজম। উর্ধ্ব বায়ু। অম্বল। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ভুগছি এ জন্মে। শরীরে নোনা ধরে গেছে। নিত্য ডাক্তার, নিত্য ওষুধ। গত জন্মে আমি কান মুলে নিয়েছি এ জন্মে আমার কান মুলে নিয়ে যাচ্ছে।

গতবারে শেষ জীবনে আমি একটা বাড়ি করেছিলুম। জায়গাটা ছিল আমার এক রুগীর। তাকে মেরে, বিধবাকে ফাঁকি দিয়েই সম্পত্তিটা হাতিয়েছিলুম। বাড়িটাও মন্দ

করিনি। ফাঁকি দিয়ে করেছিলুম, ইট, চুন, বালি, সুরকি, সিমেন্ট, লোহা, যেখান থেকে যা কিনেছিলুম, সব ধারে। আজ দোব, কাল দোব করে পরপারে চলে গেলুম, পাওনাদারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেবারে পালালে কি হবে, এবারে ধরা পড়ে গেছি। রোজগারের টাকা জমিয়ে জমিয়ে, না খেয়ে না দেয়ে একটা বাড়ি শুরু করেছিলুম। প্রথমে জমিতেই চোট। কে জানত পুকুর বোজানো, ধেঁস ফেলা জমি।

কনট্রাক্টার বললেন, 'নিন মশাই এবার ম্যাও সামলান। ওই দেখুন খুঁড়ে রেখেছি। ভিত গড়তেই দেউলে হয়ে যাবেন। লোহার খাঁচা করে সিমেন্টের শ্রাদ্ধ করে কংক্রিট ঢালাই মেরে গাঁথনি তুলতে হবে।' হয়ে গেল, নাচতে নেমে তো আর ঘোমটা দেওয়া চলে না। এস্টিমেট ফেস্টিমেট মাথায় উঠে গেল। স্ত্রীর গয়না বেচে বাড়ি মাটি ছেড়ে হাত চারেক উঠেই থেমে গেল। রেস্ত ফাঁক। কনট্রাক্টার মেরে হাওয়া হয়ে গেল। সে যুগে আর এ যুগে আকাশ জমিন ফারাক। এখন লেবার ক্লাস শ্লাই ফক্সের মত সেয়ানা। দেখ তো না দেখ। আমার ফাঁদা বাড়িতে আগাছার জঙ্গল গজিয়েছে। সেটা বসার ঘর হবার ছিল, সেখানে আসশেওড়া। শোবার ঘরে শেয়ালকাঁটা। রান্না ঘরে গাব ভেরেণ্ডা। যেন বোট্যানির মিউজিয়াম রে।

এখন মাঝে মধ্যে ছুটির দিনে সস্ত্রীক সেই অর্ধসমাপ্ত বাড়িতে হাওয়া গাড়ি চেপে বেড়াতে যাই। শিশুর মাড়িতে সদ্য যেন দাঁত উঠেছে। জমি থেকে অল্প মাথা তুলেই থেমে পড়েছে সাধের ইমারত। ঝোপ জঙ্গলে সর্পাঘাতের ভয় উপেক্ষা করে আমরা দুজনে সে ভিটেয় দাঁড়িয়ে কল্পনাব চোখে দেখি কোথায় কি হতে পারে। ড্রইংরুম। ওই সব সারি সারি সোফা, সেন্টার টেবল, একটা বুক কেস। চৌকো একটুকরো কার্পেট। মাথার ওপর এখন যেখানে আকাশ, সেখানে থাকত সিলিং। সাদা পংখের কাজ করা। সেই সিলিং থেকে ঝুলবে সুদৃশ্য ঝাড়। অনেক দিনের শখ ঝাড়বাতির তলায় আরাম কেদারায় আবাম কবে বসে প্রেমের গল্প পড়ব, জমিদারের কাহিনী পডব। আর ওই যেখানটায় ভাঁট ফুলের জঙ্গল হয়েছে, ওই জায়গাটা পরিস্কার করলেই আমাদের বেডরুম। এখন সবটাই জানালা, কারণ দেয়াল ওঠেনি। দেয়াল যদি ওঠাতে পারতুম তা হলে চারপাশে বড় বড় জানালা হত। দুটো দরজা থাকত, একটা ড্রয়িংরুমের দিকে, আর একটা প্যাসেজের দিকে। বাহারী পর্দা ঝুলত। ইংলিশ টাইপ সিঙ্গল খাট। দুটো জুড়ে ডবল। রাজস্থানী চাদর পাতা। ঘোড়া ছুটছে, হাতি ছুটছে, রাজস্থানী বীর লাইন দিয়ে চলেছে। চার দেয়ালে চার রকমের হালকা রঙ। কর্নার টেবিলে ফুলদানি। ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। সবশেষে সন্ধ্যা যখন প্রায় নেমে আসে তখন আমার স্ত্রী ফোঁস করে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, আর এখানটায় পোঁতা আছে আমার বার গাছা সোনার চুড়ি, বিছে হার, এক জোড়া দুল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আদর করে সহধর্মিণীর কাঁধে হাত রেখে বলি, ভালই তো, ভালই তো। অঙ্গে রাখলে ছিনতাই, গৃহে রাখলে ডাকাতি। প্রাচীন প্রথাই ছিল মূল্যবান যা কিছু মাটিতে পুঁতে গুপ্তধন করে রাখা। মনে কর তোমার স্বর্ণালঙ্কার এইভাবেই গুপ্তধন হয়ে গেল।

এরপর রিক্সা চেপে প্যাঁক প্যাঁক করে আমরা সেই জঙ্গলমহল থেকে আমাদের কপোত-কুঞ্জে ফিরে আসি। ভাঙা চেয়ারে নড়বড়ে টেবিলে হিসেবের খাতা খুলে বসি।

জমার ঘরে কিছুই নেই, খরচের ঘরে সংখ্যার পর সংখ্যা লম্বা হয়ে চলেছে এলোকেশীর চুলের মত। এ জন্ম তো আর পূর্বজন্ম নয় যে একবার স্টেথিস্কোপ ঠেকালেই বুক পকেট ঠেলে উঠবে কারেন্সি নোটে। গত জন্মে ডাক্তার ছিলুম, এ জন্মের রুগী। বাছা বাছা গোটা চারেক রুগী এক ছাদের তলায় সংসার করতে নেমেছি। স্ত্রীর হাইপ্রেসার, অ্যানিমিয়া। পুত্রের জিয়ার্ডিরা। কন্যার অ্যানিমিয়া। খরচের ঘর হনুমানের মত লম্বা হচ্ছে। ওষুধে, ডাক্তারে লম্বা করে দিচ্ছে। বাড়ি তো আর ওষুধে তৈরি হয় না, থান ইট চাই, চুন, সুরকী আর সিমেন্ট চাই, লোহা চাই।

গত জন্মে খুব সুলুকসন্ধানী ছিলুম। সেই গুণটা যাবে কোথায়? মাথায় নানা ফন্দি গিজ গিজ করছে। ছেলেটাকে নিলামে চড়াই। কোনও শাঁসালো শ্বশুর যদি কিনে নেয় বাড়িটা কমপ্লিট করা যাবে। পথ তো খোলাই আছে। স্পষ্ট বলতে হবে আপনার মেয়ে, আমার পুত্রবধূ তো আর শেয়ালকাঁটার জঙ্গলে আপনার দেওয়া ইংলিশ খাটে শুতে পারে না। মাথার ওপর একটা ছাদ চাই। দেয়াল আমার, ফাউন্ডেশান আমার, ছাদ আর পলেস্তারা আপনার। মেঝেটাও আপনার। মেয়েকে মোজেকে হাঁটাতে চান মোজেক, লাল পেটেন্ট স্টোন তো তাই। যেমন আপনার অভিরুচি। আর দরজা, জানালা, গ্রিল তো বসাবেনই। নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে না! লোকে কথায় বলে ভাল ঘরে মেয়ে দেবে। তা ঘরটা যাতে ভাল হয় সেটা আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন! পিতার একটা কর্তব্য আছে তো! এই দেখুন, মণিবাবু ছেলের বিয়ে দিলেন। অসম্পূর্ণ একতলা বাড়ি। মণিবাবু বললেন, বেয়াই মশাই এতকাল ছেলে আর আমি একঘরে শুয়ে এসেছি। এখন আর সেটি হবার উপায় রইল না। বেয়াই মশাই বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। মণিবাবু বললেন, তা ছাড়া আপনি যেসব ফার্নিচার দিলেন সেসব রাখব কোথায়? বেয়াই মশাই বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। ব্যবসায়ী লোক, কম কথার মানুষ। মণিবাবুর একতলা দুতলা হয়ে গেল। ফাশক্লাশ বাড়ি।

তা মণিবাবুর কায়দায় আমারও একটি বেয়াই জুটে গেল। কাঠ গোলার মালিক। অষ্টপ্রহর সাঁই সাঁই করে করাত চলছে। শব্দ শুনলে বুক ছ্যাঁত করে ওঠে। মনে হয় ছেলের বাপকে পয়সা দিয়ে কিনে এনে ফাড়াই চেরাই চলছে। বিয়ের বাজারে ছেলের কম ডিমান্ড! গ্যাস সিলিন্ডারের মত। অলওয়েজ ইন শর্ট সাপ্লাই। বাজারে ছেলে ফেললেই বিক্রি হয়ে যায়। দামটা বেশ ভালই পেলাম। যাক চালটা মাথায় বেশ ভালই এসেছিল।

তর তর করে বাড়ি উঠে গেল। ভেতরে কাঠের কাজ যা হল, দেখার মত। বেয়াই মশাই একেবারে ঢেলে দিলেন। বাড়ি নয় তো প্যাগোডা। মন ভরে গেল। বছর তিনেক ভালই চলল। তারপর সেই করাত কল মালিকের মেয়ে বিদ্যুৎ-চালিত করাতের মতই প্রথমে শাশুড়িকে ফেড়ে ফেলল। সেই করাত শেষে তেড়ে এল শ্বশুরের দিকে। ছেলে বলল, আর কেন? তোমরা দুই ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট এবার কাশী কিংবা বৃন্দাবন কেটে পড়। আমাদের একটু সুখে থাকতে দাও।

য পলায়তে স জীবতি। বুড়োবুড়ি এখন সন্ধেবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে সূর্যাস্ত দেখি, ধর্মকথা শুনি। পূর্বজন্মে যা হয়েছে হয়েছে। এজন্মে যা হল হল। সামনের জন্মে আমরা

দু'জনে খ্যাকশিয়াল হয়ে জন্মাব। কত পোড়া ভিটে পাব। দু'জনে সুখে যে কোনও একটায় দিন কাটাব, আর প্রহরে প্রহরে ডাক ছাড়ব হুক্কাহুয়া, হুক্কাহুয়া, হুক্কাহুয়া, কাহুয়া।

পি. এ.

উচ্চতায় মাঝারি।

বর্ণে শ্যাম।

মুখশ্রী, কখনও ভয়াবহ, কখন অম্ল-মধুর, কখনও প্রেম প্রোজ্জ্বল।

আচরণে, নেকড়ে-বাঘ সদৃশ্য।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন মানুষটি মন্ত্রী না হয়ে অন্য কিছু হলে বেমানান হত। বিধাতার আশীর্বাদে ইনি মন্ত্রীই। এবং চুনোপুঁটি নয়, বেশ ভারি মন্ত্রী। দপ্তর এঁর কটুকাটব্যে তটস্থ। ইনি স্বভাবে ব্লটিং-পেপার সদৃশ। যে কোনও মুখের হাসি সহসা মুছে দিতে পারেন। যে কোনও চোখে জল এনে দিতে পারেন। যে কোনও সংসার উদার দাক্ষিণ্যে জমজমাট করে দিভে পারেন যেমন, তেমন যে কোনও সংসারের ভিটেয় জোড়া ঘুঘুও চরিয়ে দিতে পারেন। ইনি কখনও ঝরা কখনও খরা।

'আমায় ভয় পায়' এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। 'আমি টেরিবল' এই প্রসাদগুণেই ইনি সুখ্যাত। এ হেন একজন দুরন্ত মন্ত্রীর দপ্তরে শ্যামাচরণ পি. এ. হবার সৌভাগ্য নিয়ে আদি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো ছত্রিশ সালে কোনও এক মাসে। তখন সে জানত না তার ভাগ্যে কী লেখা আছে। যখন জানল তখন আর পালাবার পথ নেই। বঙ্কিমবাবু বি এ পাশ করে ডেপুটি হয়ে ছিলেন। শ্যামাচরণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলে খেয়ে এ দপ্তর সে দপ্তরে হাতফেরতা হতে খোদ মন্ত্রীর দপ্তরে পি. এ. হয়ে বসেছে। সিনিয়াররা বললেন, বরাত তোমার ভাল শ্যামাচরণ। হলে খুব হবে, না হলে হেলে পড়বে। জিনিসটা বেশ ভালই। ট্যাকল করতে পারলেই টাকা। না পারলেই ফাঁকা। সার্কাসের সেই তম্বী মহিলাটিকে স্মরণ কর, যে বীরাঙ্গনা সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে গোঁফে চুমু খায়। এও সেই একই পদ্ধতি—টেমিং এ লিও।

সার্কাসের সিংহ আফিমের মৌতাতে থাকে। মন্ত্রী থাকেন ক্ষমতার টাটে। বিলিতি কোম্পানির ঘূর্ণায়মান কঁ্যাচোর কঁ্যাচোর চেয়ারে। গদির ওপর গদি (পশ্চাদ্দেশ বড়োই স্পর্শকাতর)। সামনে অশ্বক্ষুরাকৃতি ডবল ডেকার টেবিল। ঝকঝকে চকচকে। ব্র্যাসো দিয়ে মাজা পেতলের পেপারওয়েট মুন্ডিতোলা সারি সারি। যেন ক্ষমতার বোতাম। মেজাজের মুরগি ঘড়ি। ঠকাস্ ঠকাস্ করে ঠুকে কাগজে চাপা দিলে অরডারলি পিওন বুঝতে পারে মালিক কাপুরের মেজাজ চড়ে আছে. টুকুস টুকুস করে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারে মন্ত্রী মহোদয় এখন খেলোয়াড়ী মেজাজে আছেন। ঘরজোড়া নরম কার্পেট। পা ডুবে যায়। প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের সারি। কখনও একটা বাজে কখনও সবকটা কোলের শিশুর মত কঁকিয়ে ওঠে। ফোন বাজার দাপট দেখলে দেশের পরিস্থিতি বোঝা

যায়। যখন মৃদু মৃদু একটি কি দুটি রিরিরিং রিরিরিং করে, তখন বুঝতে হবে বিরোধীরা শান্ত, লাশটাশ তেমন পড়ছে না, ঝাণ্ডা তেমন উড়ছে না, মিছিল রাজপথে তেমন পাক মেরে মেরে ঘরমুখো অফিস যাত্রীদের পাক-দণ্ডীতে বেঁধে ফেলছে না, বিধানসভায় জুতো ঝাঁটা লাথি চলছে না। শিবিরে শিবিরে বিরাজ করছে সমঝোতার শান্তি। ফোনে তখন প্যানের প্রেমের বুলি। কিন্তু লাল, গোলাপী, নীল সবকটাই যখন তেড়েফুঁড়ে বাজতে থাকে, যখন এ কানে একটা ও কানে একটা, দুকাঁধে দুটো সরব সপ্তগ্রামে, তখন বুঝতে হবে গেল গেল অবস্থা। গদি করে টলটল, পাসরাতে ওঠে জল।

আজ সেইরকম একটা দিন। মন্ত্রীর কানে লাল টেলিফোন। তিনি খ্যাস-খ্যাসে গলায় ও প্রান্তের মানুষটিকে বেজায় ধমকাচ্ছেন। কথায় সামান্য গ্রাম্য টান। সেই টানটাকে সযত্নে ধরে রেখেছেন কারণ তিনি মনে করেন—তিনি জনতার প্রতিনিধি। ঠাণ্ডা ঘরে কাঁচ মোড়া টেবিলে, টাট সাজিয়ে বসে থাকলেও তিনি আছেন মৃত্তিকার কাছাকাছি, তাঁদের সেবক, দাসানুদাস হয়ে।

মন্ত্রী বললেন—দাঁত মেলছো মনে হচ্ছে। (ও প্রান্তে যিনি তিনি বোধ হয় হে হে করে হাসির ভাব এনেছিলেন কথায়। ডাক্তারী ভাষায় এ ব্যাধিকে বলে গ্রেট ম্যান প্রকসিমিটি রিফ্লেকস। অনেকের যেমন বাইরে যাবার নাম শুনলেই নিম্নবেগ আসে। বড় মানুষের সামনাসামনি হলেই অনেকে অজান্তেই হাত কচলাতে থাকেন আর গলা দিয়ে হেঁ হেঁ করে বিচিত্র শব্দ ক্ষেপণ করতে থাকেন। মুখের চেহারা হয় কুমোরের তৈরি কাঁচা মুখ। মাটিতে জোর করে থেবড়ে বসিয়ে দিলে যেরকম হবে, সেই রকম) ওই দাঁত আমি একটা করে খুলে স্যাপারেট পার্সেল করে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দোব হারামজাদা। মালা করে পরবে। মানকে! মানকে বড় না আমি বড় শুয়োর? মন্ত্রী সেই ভদ্র সন্তানকে শুয়োর বলে ঝপাং করে ফোন ফেলে দিয়ে পায়ের কাছে বোতামে চাপ দিলেন।

শ্যামাচরণের মাথার ওপর লাল আলো দুবুদুবু করে জ্বলে উঠল। শ্যামাচরণ স্টেনোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল, হাসি ফিউজ হয়ে গেল। পেটে মৌরলা মাছের ঝোল পাক খেয়ে উঠল অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মত। (শ্যামাচরণ হালে বিয়ে করেছে। নতুন বউ স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য ইদানীং বঙ্গসন্তানটিকে মৌরলা মাছের ঝোল সেবন করাচ্ছেন। মন্ত্রীর পি এ। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্মৃতি আর শ্রুতির ওপর। মন্ত্রীর নেকনজরে হয় প্রোমোশন না হয় লিকুইডেশান। এখন স্বামী আমার রংচটা পতপতে তেরপল ঢাকা জিপে চেপে অফিস যায়। মই বেয়ে আর একটু উঠতে পারলেই মটর গাড়ি। ফোন হবে, ফ্রিজ হবে, ট্যুর হবে। টি এ হবে)।

শ্যামাচরণ হিলহিলে ঠাণ্ডাঘরে ঢুকল। মন্ত্রী তখন দু দাঁতের মাঝে একটা টুথপিক ধরে তিরতির করে নাচাচ্ছেন! টেবিলের ওপর হাতের চেটো আঙুল নিয়ে খেলছে। শ্যামাচরণ ঢুকতেই মন্ত্রী টেনে টেনে বললেন—শুয়োরের বাচ্চা।

শ্যামাচরণ বলল—ইয়েস স্যার। (কেরিয়ার গাইড বলছে—ডোন্ট প্রোটেস্ট এ মিনিস্টার। অ্যাকসেপ্ট এভরিথিং অ্যাজ অমৃতং কালমন্ত্রী ভাষিতং)।

মন্ত্রী বললেন—বাঁশ দোবো। আছোলা বাঁশ।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : দিল্লী থেকে বাঁশ আনব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : ইউ আর এ ফুল।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : আজই আমি দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার (কেরিয়ার গাইড বলেছে, ট্যাকল এ মিনিস্টার উইথ লিমিটেড ভোকাবুলারি। প্লে ক্লেভারলি উইথ টু ওয়ারড্স—ইয়েস অ্যান্ড স্যার। প্লেস ইট বিফোর, প্লেস ইট আফটার, পাণ্ড ইট হিয়ার, পাণ্ড ইট দেয়ার অ্যাজ অফন অ্যাজ ইউ গেট ইওর চানস। হোয়েন ইউ লিভ দেয়ার শুড রিমেন নাথিং বাট ইয়েস অ্যান্ড স্যার)।

মন্ত্রী : কিসে যাব ?

শ্যামাচরণ : প্লেনে নয় স্যার, ট্রেনে।

মন্ত্রী : কেন ট্রেনে ?

শ্যামাচরণ : অ্যাস্ট্রলজার অ্যাডভাইস করেছেন স্যার প্লেনে স্যার গেলে স্যার অ্যাকসিডেন্ট হবে স্যার।

মন্ত্রী : রাজধানীর টিকিট চাই। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যাও এখুনি জোগাড় কর। (সুর করে) ইডিয়েট।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

প্যান্টটাকে ভুঁড়িতে বেল্ট ধরে টাইট করে শ্যামাচরণ চু কিত কিত করে ছুটল রাজধানীর টিকিট জোগাড়ে। ভি আই পি কোটা বললেই তো হল না, ভি আই পি-র সংখ্যা কম নাকি ? একটা ট্রেন, অনেক ভি আই পি। শ্যামাচরণের মন্ত্রী অন্যের তো তিনি মন্ত্রী নন। হু কেয়ারস হুম ? তোমার মন্ত্রী তুমি মাথায় করে দিল্লী নিয়ে যাও। এ যেন তোমার বউ তুমি ম্যাও সামলাও। শ্যামাচরণ অতি কষ্টে কান ধরে ওঠ বোস করে পাঁচটা সিমেন্টের টোপ ফেলে একটা টিকিট ম্যানেজ করল। কেরিয়ার গাইড বলছে স্ত্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস ? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইউ আর নেভার এক্সপেক্টেড টু ফুলফিল। মন্ত্রীদের কেরিয়ার তো অঙ্গীকারের শত শত মৃত স্তূপের ওপরেই হাসছে, খেলছে, ভাঙছে, জুড়ছে।

মন্ত্রী বললেন, টিকিট পেয়েছ ?

শ্যামাচরণ : পেয়েছি স্যার।

মন্ত্রী : সিকিউরিটিকে জানিয়ে রাখ। আমার ব্যাগেজ রেডি কর।

জনতার সেবক হলেও জনতা মন্ত্রীর সেবক নাও হতে পারেন। হাতের কাছে হ্যান্ডি কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মেরে দিতেও পারে। তখন ? ক্ষতি তো দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কি ? তিনি মরে ভূত হবেন। কে বলে মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল ! তাদের কোনও ধারণা নেই। শ্যামাচরণের আছে। সে দেখেছে কোনও মন্ত্রী তাঁর পি এ-কে মনে মনে অথবা সশব্দে, একশো আট বার মনুষ্যেতর প্রাণীতে সম্বোধন করলেই একটি প্রোমোশন। তার অর্থ কি তাহলে দুধ মেরে যেমন ক্ষীর পশুত্ব ঘন হলেই একটি

উচ্চপদ ? শ্যামাচরণ চা খেয়ে চেয়ারে চিতিয়ে পড়ল। ভুঁড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। আকাশে ঘন মেঘ। এল বুঝি বৃষ্টি। লাঞ্চের সময় শুরু হল শহর ভাসানো বৃষ্টি। মন্ত্রী আর পি এ যখন রাস্তায় নামলেন তখন রাজপথে যা অবস্থা, তাতে আর মটর নয় স্পিডবোট চলতে পারে।

মন্ত্রী তাল ঠুকে বললেন, তোমাদের ষড়যন্ত্র।

শ্যামাচরণ ইয়েস স্যার বলতে গিয়েও সামলে নিল। না স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা জানতে আমি আজ দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তবে নো স্যার বললে কোন আক্কেলে, অ্যাঁ। খোদার খাসি।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে যে ভাবেই হোক। আই মাস্ট ক্যাচ দি ট্রেন।

মন্ত্রী উঠলেন গাড়িতে। পেছনের আসনে তিনি। সামনে সিকিউরিটি আর পি এ শ্যামাচরণ। গাড়ি চলছে স্টেশনের দিকে। মন্ত্রী ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছেন ট্রেন যদি ধরাতে না পারিস তোকে আমি বিরোধী বলে বরখাস্ত করবো। ষড়যন্ত্র। আই নো হু আর বিহাইন্ড দিস। এর পেছনে আমার দলের ফ্র্যাকসান আছে আর আছে অপোজিশান। ড্রাইভার মনে মনে বললে, সব করবি শ্লা। আজ আছিস কাল নেই। শ্যামাচরণ বললে, অপোজিশান হল ঈশ্বর স্যার। মন্ত্রী শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা জপ করতে করতে পুরমন্ত্রীর মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। জপাৎ সিদ্ধি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনে হল সারা শহরে এক হাঁটু নোঙরা জলে থই থই করছে পালপাল শূকর। একটি দাড়িঅলা শূকর একটা লরি চালিয়ে তাঁর গাড়ির সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী ড্রাইভারকে বললেন, সাইরেন লাগাও। হঠাৎ তাঁর মনে হল গাড়ির সামনে পতাকা লাগানো হয়নি। হোয়াই। ষড়যন্ত্র। শ্যামাচরণ ! গো। গেট দি ফ্ল্যাগ। রাসকেল।

ভগবান বাঁচালেন। ফ্ল্যাগ গাড়িতেই ছিল। এক কোমর জলে নেমে শ্যামাচরণ পতাকাদণ্ডে পতাকা পরালেন। ঘন ঘন সাইরেন, দণ্ডে জলে ভেজা পতাকা, মন্ত্রীর শূকরোক্তি, সিকিউরিটির চড়চাপড় কোনও কিছুতেই জ্যাম খুলল না। মন্ত্রী মনে মনে তিনজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে ফেললেন। তার মধ্যে সাদা বর্ষাতি মোড়া ট্রাফিক পুলিশটিও পড়ল। পুরমন্ত্রী যে তার অ্যান্টি গ্রুপে, সে সত্যটিও জলমগ্ন রাস্তায় গাড়িতে বসে তাঁর খেয়াল হল। মনে মনে বললেন আই উইল সি। সি শব্দটি মনে আসতেই হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। শ্যামাচরণ ?

ইয়েস স্যার।

নেমে পড়।

শ্যামাচরণ জলে নামল। নেমেই বুঝল চাকরির জল কত ঘোলা।

মন্ত্রী—দৌড়ও। তুমি দৌড়ে ট্রেন ধরে রাখো। গার্ডকে বল মিনিস্টার আসছেন, গোও।

শ্যামাচরণ সেই হাঁটুজলে হাঁচর পাঁচর করে দৌড়তে শুরু করল। উঃ ভুড়িটাই এখন দেখছি কাল হল। লরির ফাঁক গলে, ট্রামের পাশ দিয়ে, রিকশার কোল গলে খানাখন্দ পেরিয়ে পি এ ছুটছে।

হাওড়া স্টেশন। গার্ডসাহেব বাঁশি মেরেছেন। পতাকা ঝটাপট করছে। ট্রেন ছাড়ল বলে। কাকভেজা একটি লোক ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি হাঁপতে হাঁপাতে সটান তাঁর পায়ে এসে পড়ল।

শ্যামাচরণ ঃ স্টপ, স্টপ, মিনিস্টার ইজ কামিং।

গার্ডসায়েব তলায় পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখলেন। প্ল্যাটফর্মেও পুলিশের আয়োজন ছিল, যেহেতু মন্ত্রী যাবেন। শ্যামাচরণ জ্ঞান হারাবার আগে পরিষ্কার বাংলায় বলল, বাঁচান, গাড়ি থামান, মন্ত্রী আসছেন। আমি তাঁর পি এ।

গাড়ি লেগে রইল; পুলিশ তৎপর হলেন। আসছেন, তিনি আসছেন। কামরায় কামরায় অসন্তুষ্ট যাত্রী। কে হরিদাস পাল। অবশ্য তাঁরা জানতেই পারলেন না, কেন ট্রেন ছাড়ছে না। গার্ডসাহেব বললেন টেকনিক্যাল প্রবলেম।

হঠাৎ পুলিশবাহিনী সজাগ হয়ে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। একটি মাঝারি উচ্চতার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষ গটগট করে এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পি এ শ্যামাচরণ সবে তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফাইলে নোট লেখার ভাষায় বললে—ডান স্যার, অ্যাজ ডাইরেকটেড।

মন্ত্রী চলমান গাড়ির জানালা থেকে স্নেহের গলায় বললেন, আই উইল সি।

উপসংহার ঃ সত্যিই তিনি দেখেছিলেন। শ্যামাচরণ মাছের মত জল কাটতে পারে। হি হ্যাজ প্রুভড ইট। শ্যামাচরণকে মৎস্য বিভাগের উচ্চপদে রেখে মন্ত্রী আই উইল সি করলেন। শ্যামাচরণ-দম্পতি সেই প্রবাদবাক্যের বিপরীত উদাহরণের মত লেখাপড়া শিখেও মৎস্য ধরিতে লাগিলেন এবং সুখে খাইতে লাগিলেন দীর্ঘকাল। আর মন্ত্রী মহোদয় নির্বাচনে গভীর জলে তলাইয়া গেলেন।

সাইডিং

টিফিনের সময়ে সোমনাথ বললে, 'আমার মনে হয় যূথিকা তোর প্রেমে পড়েছে।'

যূথিকা আমাদের নতুন টাইপিস্ট। এই মাসখানেক হল চাকরি পেয়েছে। শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি। দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা, না বেঁটে। মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি করে। চোখে সোনালী ফ্রেমের ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিয়ে চলে গেলে হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আরও মেয়ে আছে, তবে তাদের কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। যেমন সোমনাথ রেবাকে। একমাত্র যূথিকাই ফ্রি আছে। আর অপর পক্ষে আমরা দুজন, আমি আর বিধান। বিধানের সম্প্রতি ফ্লু হয়েছে। অফিসে আসছে না।

'কি করে বুঝলি ?

'টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝেই তোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পেছনেই বিশাল একটা জানালা। সেই জানালায় হাওড়ার পোল আটকে আছে। যূথিকা হয়ত পোলটাই দেখে। মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে প্রেম। প্রেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

'আমার দিকে তাকায় না, আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়।'

'তোর দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।'

'ঠিক বলছিস ?'

'ডেড সিওর।

হতেও পারে। সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেম কা কাচ্চে হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়ে-ছেলে একসপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় বলে, এই সংসার-সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আমার চাড়ে ভেড়াতে না পারি। বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যূথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

'আমার এখন তাহলে কি করা উচিত।' প্রশ্নটা করে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল ! মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, 'নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মর্কদ্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বি এ সোডা ওয়াটার বট্‌ল। মুখ খুললেই ভাব ভাষার গ্যাঁজলা বুজবুজ করে বেরোতে থাকবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো এখনও মুখোমুখি হয়নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।'

'দ্যাটস ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।'

'ছি ছি ছি, চোখমারা খুব গর্হিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিনু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ খোলা রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজানো।'

'আরে সে চোখমারা নয়। এ হল নজরো কা তীর মারে কষ কষ এক নেহি, দো নেহি, আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমের পাওয়ারফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মজনুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানাটমি।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে আমাদের আলোচনার সাবজেক্ট উল্টো দিকের দু সার টেবিলের ওপারে বসে খুটুস খুটুস করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে

তাকাইনি। যূথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সব মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোর ড্রেসটাও পালটাতে হবে। এই মালকোঁচা মারা ধুতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কেমব্রিকের পাঞ্জাবি গোটা চারেক বানা। স্টিমলন্ড্রিতে কাচাবি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না।'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু থাকবেই। বিনা পয়সায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব, ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রশ্ন শুনে রাগরাগ মুখে তাকাল।

'তুমি শালা জানো না কি দেবে? যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস। লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু বিয়ে। যূথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেরে দূর করে দেবে। ত্যাজ্যপুত্তুর করে দেবে। আমার কোষ্ঠিটাও আবার তেমন ভাল নয় বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ, শুধু প্রেম হয় না ভাই, বিয়ে বড়ো ঝামেলার ব্যাপার। ওটা অ্যাভয়েড করা যায় না?'

'যায়, তবে কিছু স্টিকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছাড়ান যায় না।'

'যূথিকাকে তোর কি মনে হয়।'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে রাখ প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে। হাতে গোনা যায়। আমাদের ইনসিওরেনসের মত। প্রিমিয়াম ল্যাপস করবেই। কেস ক্যাচ। ভেরি ডিফিকালট সাবজেক্ট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে ধাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে খেলা করে, তৃতীয় প্রেমে দাগা খায়। তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায় তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বিয়ের ভয়ে পেছিয়ে যাসনি। সিমটম যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ড্রিবল কর।'

'কী ভাবে করব, বলবি তো?'

'তুইও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি। চোখে চোখে ঠেকলে উদোবক্কার মত ভয়ে চোখ নামিয়ে নিবি না। ধরে রাখবি, আস্তে আস্তে সময় বাড়াবি। চোখে হাসবি।'

'চোখে হাসব কি রে। লোকে তো মুখেই হাসে।'

'আজ্ঞে না স্যার। প্রেমিকার হাসি চোখে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি।'

'ভয় করে।'

'কি ভয় করে ? কাকে ভয় করে ? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর রণে ভয় পেলে চলবে না।'

'আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মুচকি মুচকি হাসত।'

'মধু ইডিয়েট।'

'ইডিয়েট ! কেন ইডিয়েট !'

'প্রথমে চোখে চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা। প্রথম ঠুকুর ঠুকুর, তারপর ঠকাস ঠকাস।'

'যদি আবার ঠকে যাই !'

'ঠকে যাই মানে ?'

'এই তো তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মুখ চেনা। হঠাৎ হাসল আমিও হাসলুম। আমি হাসতেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালুম। আমাকে দেখে হাসেনি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল, তাকে দেখে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি ! আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি হয়েছিল ! মেয়েটা এত নিষ্ঠুর। কুকুরের মতো। ওয়ান মাস্টার ডগ।'

সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মধ্যে শিকার ফসকে যায়। প্রেমের পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের রাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জহরব্রতের মত, জয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুনে।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। যূথিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়ত হেসে হেসে ওই ভাবে কথা বলবে ! জলজ্যান্ত একটা মেয়ে। চুল, খোঁপা, আঁচল। ভাবা যায় না। ভেতরটা কিরকম গুড়ুগুড়ু করে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবার সত্য হবে। হবে তো ?

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে চেপে ধরে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কী দেখছে রে বাবা ? লোকে হাত দেখে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিল না। সোমনাথ অ্যাসট্রলজি করে শুনেছি। অবশ্য নিজে কখনও সামনে হাত ফেলে পরীক্ষা করে দেখেনি, অ্যাসট্রলজি না হোয়ারোলজি।

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার চুলে ঠেকিয়েই চাটনি চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস ছি ছি, তুই চুলে তেল মাখিস ? থার্ডক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হবি ! নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল ফুরফুরে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।'

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে যাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। ক্রীতদাস হয়ে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে যূথিকার দিকে

তাকালুম। না আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নিচু করে টাইপ করছে? কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়েছে? আমি যূথিকার না যূথিকা আমার। ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে ঠোঁটের ঘাম মুছতে মুছতে যূথিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকাঠুকির মত চোখে চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মনঘুড়িটা যূথিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরেছে। সাদা ব্রাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে। একপলকের দেখা। কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পেছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙকরা ঝলমলে মাথা? সোমনাথ বলে যায়নি কতক্ষণ অন্তর দেখা উচিত। পরের বার যখন চোখ তুলে তাকালুম যূথিকা নেই। শূন্য চেয়ার। ধার তেরিকা, গেল কোথায়? এখন তো সবে তিনটে। ছুটি হতে পাক্কা দুঘন্টা বাকি। এর নাম প্রেম। গঁদের আঁঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না রইল তাহলে আর প্রেম হল কি। বড়ো অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি। সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধুর, প্রেম ফ্রেম সব ফলস। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো। মেয়েরা হয় হিরোর প্রেমে পড়ে, না হয় ভিলেনের। আমি তো কোনোটাই নই। মাছিমারা কেরানি।

॥ দুই ॥

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে-ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যূথিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নৃপেনবাবু টেবিলে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে উট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সারা মাসের ঘুষের হিসাবে ব্যস্ত। আড়চোখে যূথিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখব না। কালকের ঘটনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। বলি না বলে বেঁচে গেল।

যূথিকা নিচু হয়ে টেবিলের নিচের ড্রয়ারটা ধরে টানাটানি করছে। সরকারি টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রয়ার আটকে যায়। আমাদেরও আটকায়। লাথালাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারি চাকুরিও করা যায় না। সবে একমাস চাকরি হয়েছে মহিলার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল, এই সুযোগ। নাউ অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি, খুলছে না? আটকে গেছে?'

উঃ। যূথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা লতপতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ।

'দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অথচ....'

'একেই বলে কলের গ্যাঁড়াকল।' বাঃ বেশ বলেছি। স্ট্রেট বলেছি, একটুও আটকায়নি।

'দেখি, সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার কায়দা আছে।'

যূথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেঁট হয়েছিল। আহা মুখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেয়ারের পাশে বসে পড়লুম। ধুতি পরার এই সুবিধে। আমার মুণ্ডুর একেবারে পাশেই যূথিকার জোড়া কল। সেন্টের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোরে শাড়ির ঘের ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সেসব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেল্লা। যূথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

'কই দেখি ?'

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই, মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই ঝটাস করে মেরে দেয়। প্রথম প্রথম ডি সি। তারপর কনভার্টারে পড়ে এ সি। আঁকড়ে মাঁকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল তো। জয় মা, দেখো মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বেইজ্জত করে দিও না। খুলতে পারলেই হিরো। ডানদিকে ঘোরাচ্ছি আর কায়দা করে টানছি। আমার ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা, ওয়ান, টু, থ্রি। কি গুরুবল ! খুস করে খুলে গেছে।

'এই নিন।' আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দরী গলায় বরমাল্য পরিয়ে দাও। এত বড় একটা দুরূহ কাজ করে দিলাম। হরধনু ভঙ্গের মত ব্যাপার।

'খুলেছে ?' যূথিকা ঝুঁকে পড়ল। ডান গালটা আমার মুখের কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাত টাইপিস্ট। কোথায় প্রেম ? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন রেখাপাত করল না। কি মন রে বাবা ! মা কালীর মত পাষাণী। এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যূথিকার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'বুঝলেন, আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।'

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, 'কি আটকে ছিল ?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যূথিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, 'ড্রয়ারের চাবি।'

বকুল বললে, 'মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দে না !'

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি ! সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটার আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি

একটা প্রমোশন চাই। বল যায় না, যদি ফেঁসে যাই, বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে সংসার চলবে না।

সোমানথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শুরু করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এইবার ? হোয়াট নেক্সট।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, 'কত আছে ?'

'কি কত আছে ?'

'হার্ড ক্যাশ ?'

সে আবার কি ! হার্ড ক্যাশ দিয়ে কি হবে ? দু-দশ টাকা পড়ে আছে। মাস শেষ হতে চলেছে !

'গোটা পনের টাকা পড়ে আছে। কোন রকমে মাসটা চলবে।'

'ওতে হবে না রে ! তোর একটা প্রেমফাণ্ড তৈরি করতে হবে। মিনিমাম পাঁচশ নিয়ে নামতে হবে।'

'পাঁশশো ! অত টাকা পাব কোথা থেকে ?'

'কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারান্টার দাঁড়াচ্ছি।'

'ধার করে প্রেম !'

'শাস্ত্রেই আছে ঋণ করে ঘি। প্রথমে পাঁচশো তারপর কেস বেশ জমে গেলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে ! তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'মেমবার ?'

'এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকি পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা।'

'লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক ? লেখা পড়া করতে হবে না কি !'

'আজ্ঞে না। অফিসের মেয়েরা বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। কালকে তুই.....'

'কালকে তুই কি করবি !'

'তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যূথিকার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি।'

'তারপর ?'

'তারপর বইটা হল টোপ ! কি বই দেখি ? ব্যাস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি, নিবি আর দিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে।'

'ভীষণ ভয় পাই রে ! ছাত্র জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই, ফেরত আর পাই না। সাহস করে চাইতেও পারি না। বই পেয়ে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কিরকম আনন্দ পায় ভাব ! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায়। সেই ভয়ে মাইরি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে। হাতে তেমনি পয়সাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে

যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম। একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেধড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর আমার কুমকুম!'

'কুমকুমটা কে?'

'আরে সেই বই-মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরি। পরে জেনেছিলুম এই মেয়েটা আমাদের মত একটু বোকা ছেলে ধরে ধরে সেই বই মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করেছিল। একটু মিষ্টি হাসি, সুর করে টেনে টেনে কথা, উয়ুঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর, ব্যাস, আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বেহেড।'

সোমনাথ ফুস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল :

'তোর প্রেম নেই। তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনেদের মত মেন্টালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মনের মানুষ একজন মেয়ে-পাগল আর একজন ব্রহ্মপাগল। পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যান পাগল বুঁচকি আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মুতো কাঁথা।'

'তুই বুঝছিস না, আমার এখন একস্ট্রা খরচ করবার মত টাকা নেই ভাই। একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।'

'তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।'

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোন বস্তাপচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসেখেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। রাজ্যের আরজি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ চিত্র দুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনায় যূথিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্র্যাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা। দেশের উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসূন গিয়ে যূথিকার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। মুলোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যূথিকাও হাসছে। কোনও মানে হয়। প্রসূন আর ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা, প্রেমেও তেমনি। কো মেয়ের সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই। ফোড়ে, ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান থেকে কেল্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড় বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যূথিকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, ব্যাস, সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। ধ্যুত, প্রসূনটা আচ্ছা হারামজাদা! কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

'সোমনাথ।'

'বল।'

'গান শিখবি?'

'গান শিখে কি করব?'

'ওই দেখ, প্রসূন ব্যাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।'

'যাক না, তাতে তোর কি? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস? ফেউ, এর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিততে হবে। রোপ ওয়াক। গেল গেল, এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস? তুমি ত শালা জীবনে কিছুই করনি। শুধু জম্মে বসে আছে, প্রেম হল ঘুড়ির প্যাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক, একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুলে ওড়া। নীলাকাশের সঙ্গে প্রেম।'

সোমনাথ আবার খসখস করে চিঠি লিখতে শুরু করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। ননপ্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ সেনস বেড়ে যায়। প্রসূন বলছে, 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে' রেকর্ডটা আমার আছে! কালই এনে দেবো। ঢং করে একটা সিকি পায়ের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক্! যূথিকার পয়সা ব্যাগ থেকে ছিট্কে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দুবার ফুঁ মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম।'

'আপনার পয়সা।'

প্রসূন হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে, 'ধন্যবাদ। হাঁ হাঁ, আকাশ ভরা সূর্য তারাটাও আছে। কি নেই আমার কাছে।'

যাঃ শালা। কি বরাত। প্রসূনের পয়সা জানলে কে তুলত! পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম। প্রেম তুমি আমাকে উদার কর। বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় একতরফা। প্রেমে গলি কি ওয়ান ওয়ে? হৃদয়ের গাড়ি ঢোকে। ঢুকে আটকে যায়। বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয়। আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায় চলে যাই। মাথায় কিছু আসছে না। সোমনাথই ভরসা।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বুঝে গেছে।

'প্রসূন লাইন দিয়েছে। দেখেছি। তোর চেয়ে ভাল ক্যানডিডেট। শীতকালে কাশ্মীরী শাল গায়ে দেয়। পাঞ্জাবিটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা। ভাল গান গায়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বেশ শক্তিশালী। বেশ কায়দা করে লড়তে হবে রে। মেয়েদের মন পদ্মপাতায় জল। যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি। এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয়। বলবি ডবল স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন। আর ফট করে জিজ্ঞেস করবি বিকেলে কি করছেন?'

'যদি বলে কেন?'

'কেনটা আবার যদি খুব চিৎকার করে বলে! পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায়!'

'আ মোলো।' সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল। 'রাশকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে। যদি ফদি আবার কি! জীবন হল, ধর তক্তা মার পেরেক।'

'যদি বলে কেন।'

'আবার শালার যদি। বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে।'

'একেবারেই জাম্‌প করে অতদূর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেই বলে বলিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ। সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

যা যা।' যূথিকাকে চিঠিটা টাইপ করার জন্যে দিতেই, সোমনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ ইশারায় হাতের ভঙ্গি মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ। যূথিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'কি সাংঘাতিক হাতের লেখা!'

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললুম, 'আমার হাতের লেখা খুব ভাল। মুক্তোর মত।' বলে ফেলতেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায়। অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে। ভেরি ব্যাড।

যূথিকা বললো 'দেখেছি। শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা, মানানসই লেখা।'

যূথিকার কথা শুনে পা কাঁপছে। উরে ব্বাবা, প্রেমের ঘন্টা বেজেছে ঢং করে। মুখে কথা সরছে না। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিরে এলুম।

সোমনাথ বললে, 'কি হল ? জিজ্ঞেস করেছিস ? কি বললে ? বিকেলে কি করছে ?'

'দাঁড়া এক গেলাস জল খাই।'

'কেন ? খিস্তি করেছে ?'

জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফিস ফিস করে বললুম, 'মরে গেছি, ফিনিশ। বুকটা কেমন করছে।'

'পেটে উইন্ড হয়েছে। একটা পান খা।'

'ভাগ শালা। বুকে হিল্লোল বইছে, হিল্লোল।'

'কেন রে। চোখ মেরেছে!'

'মোর দ্যান দ্যাট। তীর মেরেছে। তোর হাতের লেখার নিন্দে করে আমায় বললে, যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা, ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা।'

'এইতেই তোর বুক ধড়ফড়। ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি! তোর গালে হাত দিলে কি করবি ? দম ফেলে করে মরে যাবি। শোন, কোনটা মেয়েদের কথা আর কোনটা কথার কথা, আগে বুঝতে শেখ। যা জিজ্ঞেস করে আয়।'

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি। নদী বইবে কুলু কুলু। পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা। গড়গড়িয়ে চলে গেলুম।

'আজ বিকেলে কি করছেন ?'

'ক্লাস আছে।'

'কিসের ?'

'স্টেনোগ্রাফির।'

'ও।'

সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম, 'ওরে স্টোনোগ্রাফির ক্লাস আছে।'

'বলে আয় ক্লাসক্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা।'

আবার যেতে হল, 'ক্লাস-ক্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা 'কোরবানী।'

'কোরবানী।' যেন লাফিয়ে উঠল। 'কে বললে ?'

'গ্রেট সোমনাথ।'

'ঠিক আছে।'

সোমনাথকে এসে বললুম, 'ঠিক আছে।'

সোমনাথ বললে, 'সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে, জানবি সে অসুস্থ। স্ত্রী-রোগে ভুগছে।'

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া। বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না, হলে বসে প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার একশেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্ল্যাডিয়েটার কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউবয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দু প্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায় সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার এক কদম পেছনে যূথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যূথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ লাগছে না। হাতে ফোলডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা হাতে তেমন রোমান্টিক লাগে না। যাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব বলে তো আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে আগে গটগট করে চলেছে। স্টিম ইঞ্জিন চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছনে পেছনে চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে, বগিও সেই দিকে যাবে। ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাদা রেস্তোরাঁর অন্ধকার গর্ভে গিয়ে ঢুকল। বেশ মনোরম পরিবেশ। প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই পাখা মুড়ে বসতে পারে। ফিসফাস, খুসখাস, ঘেঁষাঘেঁষি। দুল, চুড়ি, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড়, গলা, চিবুক সব একাকার।

সোমনাথ তো খুব গ্যাটগেটিয়ে মেয়ে বগলে ঢুকল। মেয়ে ঢুকল ছাতা বগলে। আমি ঢুকলুম কোঁচা বগলে। কিন্তু! কিন্তু আর যদিতেই আমার জীবনটা শোঁয়াপোকার মত কুঁকড়েই রয়ে গেল। প্রজাপতি আর হল না। কত বিল হবে কে জানে। টাকা কে দেবে! আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে।

সোমনাথের বাঁ পাশে যূথিকা। আমি বসেছি উল্টো দিকে একা। সোমনাথ মেজর জেনারেলের মত হাঁকল 'ওয়েটার'। বাব্বা কি দাপট। 'মেনু প্লিজ'। মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে, 'জিরাপানি।' সেটা আবার কি রে বাবা! মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার 'রোগনজুস। নাস। স্যালাড। আইসক্রীম ভ্যানিলা। মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল। হাত নিসপিস্ করে উঠল। একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, ক'টাকার ধাক্কা। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। নেভি ব্লু স্যুট পরা ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়াঘেরা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'তারপর ম্যাডাম! সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে। এইটাই

হল ওর টেকনিক। বিরাট পার্সোন্যালিটি মেগালোম্যানিয়াক। ম্যাডাম বলে যূথিকাকে দেয়ালঠাসা করে বসল। ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে কিলিবিলি খেলছেন। নাকছবি, দুল, চশমা, আলো পড়ে চিক চিক করছে। স্বপ্ন স্বপ্ন।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যূথিকার কোলে থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ফরেন?'

'হ্যাঁ ফরেন। আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে।'

সোমনাথ ছাতাটা আবার যূথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল। মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠল। উঃ ভাবা যায় না। সোমনাথের কি সাহস রে বাবা। মেয়েরা বোধ হয় এই রকম হাতকেই বলে অ্যাগ্রেসিভ হ্যান্ড। আমি একটা ভ্যাবাচ্যাকা জরদ্গবের মত উল্টো দিকে বসে আছি। প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক।

ঢক ঢক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল। সোমনাথ বললে 'নে খেতে থাক অ্যাপেটাইজার।'

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শুধু ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চুমুক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মুখ ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেয়েদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না। মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।

খাবার এসে গেল। সে এক এলাহি ব্যাপার! ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি যেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শুরু করল। যূথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দুজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে যূথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপকিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাণ্ড দেখে আমার মুখ শুকিয়ে আসছে। হয়ে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে।

আইসক্রীম এসে গেল। মাঝখানে আবার কায়দা করে পাতলা পিচবোর্ড গোঁজা। সোমনাথ বললে 'পিচবোর্ড নয় রে, ওটা বিস্কুট। ওকে বলে ওয়াফার।' যূথিকা আদুরে গলায় বললে, 'আইসক্রীম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমনাথ বললে 'কিছু হবে না ম্যাডাম। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খেলে গলায় ঠাণ্ডা লাগে না।'

সোমনাথের কথা যেন বেদবাক্য। যূথিকা হেসে হেসে খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল। হাত ধোয়ার গরম জল এল বাটিতে। এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিলুম গুরুপাক খাওয়া হল তো, তাই জিরাপানির মত লেবুপানি এসেছে। সোমনাথ বললে 'মূর্খ, একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটা হাতে চটকে দে। ইট কাটস দি গ্রিজ।' পেছনের দিকে মুণ্ডু ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বেয়ারা, বিল।'

কি আদেশের সুর! এ সব ছেলে পৃথিবী শাসন করতে পারে, যূথিকা তো সামান্য

মহিলা। বিল এল। আমার জিভেতে তালুতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘড়ি খুলে দিতে হবে। না সোমনাথই পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোঁটে সিগারেট বাঁকা। নাক ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে। নাকের কাছটা কোঁচকান। চোখ দুটো হয়ে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের তাসের চাল দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ-টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় যূথিকার পিঠে তবলায় তেহাই মারার মত করে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বললে, 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। কত কায়দাই জান ? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যূথিকা যে ভাবে তোমার বক্ষলগ্না, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেক্ট স্বামী স্ত্রী।

রেস্তোরাঁর উল্টো দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফের চাঙড়ার ওপর হলদে হলদে পাত পাতা শোয়ানো। বিশাল দোকান। বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মঘাই পান। একটায় কিলপাতি জর্দা। আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আয়।'

বুঝলাম এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট। সাড়ে তিন টাকা খসে গেল। যূথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোঁট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাথের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন আমার কাছে দুটো টিকিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করে এনেছি, বাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। একটু ইজি না করে দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি, কাল তোকে সব বলব। হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। পেছনে এবার একটা বগি। আর একটা বগি সাইডিং এ পড়ে রইল। সেই বগির ভেতরে কে একজন হুই হুই করে হেসে উঠল, মূর্খ মূর্খ। প্রেম বলে কিছু নেই। আছে লটকালটকি, আছে শানটিং।

শেষযাত্রা

বৃন্দাবন বসাক মারা যাচ্ছেন। বাড়িতে নয় হাসপাতালে। পয়সাকড়ি আছে। পয়সার জোরে সেরা হাসপাতালে স্থান পেয়েছেন। স্পেশাল নার্স নিযুক্ত করা হয়েছে, সর্বক্ষণ তদারকি করার জন্যে। বুড়ো ইদানিং খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে আর ছেলের বউরা মিলে হাসপাতালে ভরে দিয়ে এসেছে।

আত্মীয়স্বজন, পুত্র, পুত্রবধূ, ডাক্তার, নার্স, চারপাশে সবাই ছড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তার এই শেষ সময় বিশেষ খোঁচাখুঁচি করতে চাইছেন না। ইংরেজিতে বলছেন—লেট হিম

ডাই পিসফুলি। পুত্রবধূরা নানারঙের সিনথেটিক শাড়ি পরেছেন। সেন্ট মেখেছেন। চোখে কাজল টেনেছেন। গায়ে গন্ধ মেখেছেন। কায়দা করে খোঁপা বেঁধেছেন।

বড়ছেলে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে দামী সিগারেট খেতে খেতে মেজকে বলছেন, বউবাজার থেকে ভাল দেখে একটা খাট আন, নিউমার্কেট থেকে ফুল আন। মেজ বলছেন আনতে চলে গেছে।

মেজছেলের চামড়ার কারখানা। কারখানার কর্মচারীদের এই সব কেনাকাটার কাজে লাগানো হয়েছে। ফোরম্যান নিজে তদারকি করছেন। তিনি খাট কিনতে কিনতে ভাবছেন—শালারা পাঁচশো টাকা মাইনে দেয়, এই মওকায় শ তিনেক খেঁপে নি। পাশে একজন মেকানিক দাঁড়িয়ে ছিল ল্যাংবোটের মত। তাকে বললেন—রাজু টেম্পো বোলাও। ফার্নিচারের দোকান থেকে রাজু বেরিয়ে যেতেই মালিককে বললেন—খাটটার একটা ভাউচার করে দিন, পাঁচশো লিখবেন না, সাতশো লিখুন।

মেজপুত্রবধূ বড়বউকে বললেন—বড়দি গঙ্গাজল রেডি কর। বড় ছোট হাত-আয়নায় মুখ দেখছিলেন। সেটাকে হাত ব্যাগে ভরে ছোট একটা শিশি বের করলেন, তারপর ব্যাগটা হাঁটকে, পাঁটকে আক্ষেপের সুরে বললেন—ইস রুপোর চামচেটা আনতে ভুলে গেছিরে মেজো। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা চামকে আনিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—চামচে আনবার আর সময় নেই: এই নিন ড্রপার।

মেজ বললেন, ভালো করে ধোয়া তো?

বড়ছেলে বললেন—এখন আর অত বাছা-বিচার কি? লাস্ট মোমেন্ট? চল এক এক ফোঁটা করে মুখে দিতে থাকি। লাস্ট রাইটস—শেষকৃত্য।

বড় ড্রপার হাতে বাপের কাছে এগিয়ে যেতেই বৃন্দাবন ফিস ফিস করে বললেন—তাড়া আছে?

বড় ছেলে চমকে সরে এসে ডাক্তারকে বললেন—হি ইজ টকিং।

ডাক্তার বললেন—সজ্ঞানেই মৃত্যু হবে। যে কলে মানুষ চলে তার সবই প্রায় থেমে এসেছে; স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরেই বেঁচে আছেন। ইচ্ছাশক্তির জোর কতটুকু বলুন? গেল বলে।

বড়ছেলে স্ত্রীর হাতে শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—নাঃ ঝামেলা হয়ে গেল, সন্ধের সময় আমার একটা ককটেল পার্টি ছিল।

বউ বললেন—আমারও তো একটা এনগেজমেন্ট ছিল। কি আর করবে বল? কর্তব্য তো করতেই হবে।

বড় ডাক্তারের কাছে সরে এসে বললেন—মানুষের ইচ্ছাশক্তিটাকে মেরে ফেলা যায় না? ওটা কি ক্রিমিনাল অফেনস্?

ডাক্তার বললেন—ওর যেমন বাইরে থেকে জন্ম দেওয়া যায় না, মারাও যায় না। ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটু ধৈর্য ধরুন। শক্তিটা অটোমেটিক কমে আসবে।

—মহা মুশকিল হল, বলে বড় ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন।

এমন সময় মেজ ঘরে ঢুকে বললেন—দাদা খাট আর ফুল এসে গেছে। কত দেরি?

বড় আক্ষেপের সুরে বললেন—এখনও তো স্পষ্ট কথা বলছেন।

—মাই লর্ড ? তাহলে কি হবে ?

—তোরা থাক, আমি ঝট করে একটা কাজ সেরে আসি।

বড় বেরিয়ে গেলেন। মেজ শিশি আর ড্রপার হাতে বাপের কাছে এগিয়ে যেতে বৃন্দাবন সেই একই কথা বললেন—তাড়া আছে ?

মেজ বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলেন। বউকে বললেন, তোমরা থাক, আমি চট করে একটা কাজ সেরে আসি।

—এর মধ্যে যদি মারা যান ?

—ভয় নেই, নিচে সব ব্যবস্থা করা আছে। লোকজন আছে।

বউমা তখন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না ?

জন্ম-মৃত্যু কি বলা যায় মা। যখন হবার তখন ঠিকই হবে।

বড় বউ চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়তে লাগলেন। মেজবউ উল বের করে সোয়েটার বুনতে শুরু করলেন। নার্সকে বললেন, সময় হলে বলবেন, মুখে গঙ্গাজল দিয়ে দেবো।

ডাক্তার বৃন্দাবনের নাড়িটা দেখতে লাগলনে, বৃন্দাবন ফিসফিস করে বললেন—ব্যস্ত হবেন না. আমি যাবার আগে একটু টাইম দিয়ে যাব।

বয়েস

রোজ সকালে বিষ্ণুবাবু কি করেন ? ঘুম থেকে ওঠেন। না, বিষ্ণুবাবু রাতে ঘুমোতে পারেন না। অতএব ঘুম থেকে ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। তবে, হ্যাঁ, বিছানা ছাড়েন। বিছানা ছাড়েন সংসারের গুঁতোয়। তাঁর শোবার ঘরের বাইরের জগৎ হৈ-হৈ করে জেগে ওঠে গোটাকতক নাতি-নাতনি। গোটা দুয়েক পুত্রবধূ। গোটাতিনেক ডাকসাইটে ছেলে। একটি মুখরা ঠিকে-ঝি। সঙ্গে ততোধিক মুখরা তারা মেয়ে অ্যাসিসটেন্ট। সব মিলিয়ে এক বিচিত্র কনসার্ট। ঐক্যতান নয়, অনৈক্যতান।

বিষ্ণুবাবু বারকতক চা চা করে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নেন। দরজার বাইরে করিডর প্রশস্ত দুদিকে। একদিকে ছড়ানো জুতো, ঝাঁটা, হাত মোচড়ানো আলুর পুতুল। অন্যদিকে খানকতক বই, খাতা পেনসিল আর একটি চেয়ারে বসে থাকা অসহায় একটি চরিত্র। এ বাড়ির গৃহশিক্ষক। বিষ্ণুবাবু শুধু চায়ের প্রত্যাশী। গৃহশিক্ষক ভদ্রলোককে দেখলে দুঃখ হয়। তিনি ছাত্র-ছাত্রী দুটোরই প্রত্যাশা নিয়ে ঠায় বসে থাকবেন। কোন কোন দিন দুটোই পেয়ে যান। কোন কোন দিন একটা। কোন কোন দিন একটাও না।

চায়ের কি হল রে ! দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক মেরেই বিষ্ণুবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের আধোআলোকিত ঘর অনেক ভাল। বাইরেটা বড়ো বেশি পরিষ্কার স্পষ্ট। 'হোওচ্ছে'.রান্নাঘর থেকে একটা কর্কস কণ্ঠ উড়ে গেল। বড় বউয়ের গলা।

বিষ্ণুবাবু তিনবার হাঁকবেন। এর মধ্যে চা এলো এলো, না এলো তো ভাঁজকরা একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। অবশ্য ক্যালেণ্ডারে একটা দাগ মেরে রাখবেন। হিসেবটা থাকা চাই মাসে কদিন চা পেলেন আর কদিন পেলেন না।

'কোই কি হোলো,' গৃহশিক্ষকের তৃতীয় হাঁক। 'ওরে মেথা কোথায় গেলি, মাস্টার বসে আছে।' ইস, সেই মাস্টার। বিষ্ণুবাবু সিটকে গেলেন। কতদিন বলেছি মাস্টার নয়, মাস্টারমশাই। বাড়ির দুটো বউই জানোয়ার। ছোটটার বউ আনার সময় বেশ বাজিয়ে আনতে হবে। ও একদিনের দেখায় ঠিক চেনা যায় না। ছদ্মবেশে বাড়ির আনাচে কানাচে দিবারাত্র ঘুরতে হয়। তবেই মা লক্ষ্মীদের আসল রূপ ধরা যায়। মাছের কানকো তুলে দেখার মত এক ঝলকের দেখায় জিনিস ঠিক্ বোঝা যায় না। ঠকে মরতে হয়। আজকাল আবার কানকোতে আলতা মাখানো থাকে।

'কি হোলো চায়ের ?' জামার গলার বোতাম লাগাতে লাগাতে বিষ্ণুবাবু দ্বিতীয়বার তাগাদা লাগালেন। এক কাপ চা করতে হাতে সব পক্ষাঘাত হয়। সবকটার গলা শোনা যাচ্ছে কিন্তু চা হাতে এদিকে আসার গরজ কারুর নেই। মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। একটু পালটে নিই, মানুষ বৃদ্ধ না হইলে উপেক্ষিত হয় না। দরজা দিয়ে আর একবার গলাটা বাড়ালেন। একি ! মাস্টারমশায়ের পাশে একটা খালি কাপ রয়েছে মনে হচ্ছে। তার মানে। আমারটা ভুলেই মেরে দিয়েছে। বিষ্ণুবাবু গুটিগুটি শিক্ষক মশায়ের কাছে এগিয়ে এলেন। কি মশাই কি পেয়েছেন ? করুণ মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে না। চা, ছাত্রী কোনটাই আসেনি।' বিষ্ণুবাবুকে খালি কাপের দিকে তাকাতে দেখে বললেন, 'ওটা বোধ হয় কালকের। কাল সকালের কাপটা।'

'কেন আসেন আপনি ? কি জন্য আসেন ?' অসহায় ভদ্রলোককে বিষ্ণুবাবুর সোজা প্রশ্ন। কড়া প্রশ্ন।

'পড়াতে আসি।'

'কে পড়ে ? দায়টা কার, আপনার, না যে পড়ে তার ?'

'আজ্ঞে যুগটাই তো পালটে গেছে। পড়াশোনায় সব তেমন মন নেই। মায়েদেরও শাসন কমে গেছে।'

'বাপেরা কি করছে ? বগল বাজিয়ে বংশবৃদ্ধি করছে ? কাল থেকে আর আসবেন না আপনি।'

'খাবো কি ? ছেলে ঠেঙিয়েই তো সংসার চলে। ভাত ভিক্ষে।'

'তবে মরুন। হাঁ করে বসে থাকুন।' বিষ্ণুবাবু গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেলা আটটার মধ্যে বাজার ফেলতে না পারলে ছেলেরা খেয়ে বেরোতে পারবে না। চায়ের জন্য বাজারের দেরি এ যুক্তি সংসার মানবে না। বিষ্ণুবাবুর পিন্ডি চটকে দেবে। চাকুরে ছেলে বলে কথা। সংসার মাথায় করে রেখেছে। তার আদর আগে না অবসর ভোগী বুড়ো বিষ্ণুর আদর আগে।

সেই বিষ্ণুবাবু চায়ের অপেক্ষা না করেই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের জন্যে। টাকাটা রাতের বেলাতেই বিষ্ণুবাবু নিয়ে রাখেন। চশমার খাপে ভরে রাখেন, হিসেবটা

এখনো মা লক্ষ্মীরা চায় না। তবে মাঝে মাঝে কানে আসে, একি বাজার ! একটা মাত্র কপি ! ওমা, এই কটা আলু, সে কিরে ছোটো ! দেখ বড়, মাছের টুকরোটা ! তারপর থেকেই বিষ্ণুবাবু বাজারের থলেতে প্রতিটি জিনিসের 'কেজি প্রতি দাম' গ্রাম এবং দাম মন্তব্যসহ একটি চিরকুটে লিখে ভরে রাখেন। যেমন মাছ (কাটা পোনা) ১৮ টাকা কেজি করে দুশো গ্রাম (আঁসসহ) ৩ টাকা ৬০ পয়সা। গতকল্য ষোলো টাকা ছিল। ফুলকপি প্রতিটি ৫৫ পয়সা হিসাবে দুটো ১ টাকা ১০ পয়সা। গতকল্য প্রতিটি ৫০ পয়সা ছিল। একবার ভেবেছিলেন বাজারের দায়িত্বটা ছেড়েই দেবেন। তারপর ভাবলেন, না, শ্রমের বিনিময়েই পাত পাতবেন। বলতে যেন না পারে বুড়ো বসে বসে ভাত মারছে।

পাড়ার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার ভাবলেন, শীতের সকাল এক কাপ চা খেলে মন্দ হয় না। তারপরই মনে হল জীবনে যা কখনো করেননি তা এই বয়েসে কি করে করবেন। চ্যাংড়া ছেলে-ছোকরার সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে চা খাবার বয়েস চলে গেছে।

ধোঁয়া ওঠা কেটলির দিকে তাকাতে তাকাতে বিষ্ণুবাবু বাজারের পথে পা বাড়ালেন।

সাদা ধবধবে সোয়েটারের ওপর ঘি রঙের গরম চাদর। মাথার সব চুলই প্রায় ধবধবে সাদা। পায়ে চকচকে জুতো। সবাই ভাবেন বৃদ্ধের কি সুখ ! তিন চাকুরে ছেলে, দু বউ। আহা কি সুখের সংসার।

বিষ্ণুবাবুর বাড়ি থেকে গৃহশিক্ষক বেরিয়ে এলেন শুকনো মুখে বিরক্তি নিয়ে। মনে তার গজগজানি, সামান্য কটা টাকার জন্য ভদ্রলোকের কি হেনস্তা। পান বিড়ির দোকানে টাবু সবে সিগারেট ধরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে দোকানের মালিককে বলল, 'উরে বাপারে, কত বড় মানি লোক, ওঁর মত শিক্ষক এ তল্লাটে ছিল না। আমার বাবাকে উনি পড়িয়েছেন এখন অবশ্য বয়েস হয়েছে। তাহলেও।'

শেষ কুত্তা

এমনিই আমাদের সংসার হাওয়া খেয়ে চলছে, তার ওপর দাদাকে নিয়ে এক অশান্তি। মেজাজ করে রেখেছে একেবারে দুর্বাসা মুনির মত। পান থেকে চুন খসলেই হল। তেলে বেগুনের মত জ্বলে উঠবে, আর যত কোপ আমার ভালো মানুষ বউদির ওপর। খেটে খেটে বেচারার সোনার বর্ণ কালি হয়ে গেছে। দাদার ভয়ে একেবারে টুঁ শব্দটি করে না। সবই দেখি, করার কিছু নেই। বেকার বসে আছি আজ বছর তিনেক। যাও বা একটা চাকরি জুটেছিল, চলবে না চলবে না করে তাও চলে গেল। পাক্কা তিন বছর হয়ে গেল, ধর্মঘটের নেতারা প্রতিষ্ঠানের আষ্টেপৃষ্টে দরমায় দাবির ফিরিস্তি সেঁটে, বন্ধ গেটের সামনে পালা করে অষ্টপ্রহর তাস পিটে চলেছে, আর আমরা মাসে মাসে চাঁদা দিয়ে চলেছি। মালিকরা অন্য স্টেটে গিয়ে কারখানা খুলে বসেছে। হায় আন্দোলন !

একটু আগে দাদা অফিস থেকে ফিরেছে। আসার আগে একটা টিউশানি সেরেছে।

ছেলে ঠেঙানো কি জিনিস, সে আমি জানি। বকে বকে মুখে ফেনা উঠে যায়। শিক্ষকতা করতে গেলে খাঁটি গব্যঘৃত খেতে হয়। এ বাজারে সে মাল জুটবে কোথায়!

বউদি বোধ হয় চা করে নিয়ে গিয়েছিল। চিনি কম, কি লিকার পাতলা, কি হয়েছিল কে জানে! মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল খুব হম্বিতম্বি চলছে। বউদি যথারীতি নীরব! এ কায়দাটা বউদি ভালো রপ্ত করেছে। দু'পক্ষরই সরব হলে আগুন জ্বলে যেত।

হঠাৎ কাপ ডিশ পড়ার শব্দ হল। এ কি! দাদার আর যাই থাক ভাঙাচোরার স্বভাব তো ছিল না। ভয়ে ভয়ে ঘরের বাইরে থেকে উঁকি মারলুম। এ দেশে ইদানীং বউ মারার হিড়িক পড়েছে। বড়ো ছোঁয়াচে রোগ। বউদি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে, দাদা চেয়ারে কাত। মেঝেতে কাপ আর ডিশ পড়ে ছত্রখান। ঢাল বেয়ে চা গড়িয়ে চলেছে। দাদা দু'হাতে বুকে, মাঝখানটা চেপে ধরে আছে। সর্বনাশ! হার্ট অ্যাটাক নাকি? থ্রম্বোসিসের সঙ্গে চা আর বাথরুমের ভীষণ যোগ।

লাফিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলুম, কি হোলো দাদা?

কোন রকমে ফিসফিস করে বললে, হয়ে গেছে। বড়ো যন্ত্রণা।

বউদি ছুটে এসে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ঠাকুরপো, ডাক্তার!

এই অবস্থায় মানুষের আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। কোনও রকমে সাইকেলটা বের করে ছুটলুম, ডক্টর চঞ্চল মিত্রের চেম্বারের দিকে। আর কোনও নাম আমার মনে এল না। ডক্টর মিত্র বিলেত ফেরত হার্ট স্পেসালিস্ট। তিনি ছাড়া আর কে দাদাকে সামলাতে পারেন। চৌষট্টি টাকার ধাক্কা। তা হোক। জীবন বড়, না টাকা বড়?

ডক্টর মিত্রের চেম্বারে লাইন পড়ে গেছে। নীল রঙের ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি রাস্তার একপাশে বাপ-কা বেটার মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই ভয় আর ভক্তি দুটোতেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভেতরের চেম্বারে রাগী রাগী চেহারার অসম্ভব ফর্সা এক মানুষ একভজনের ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু, দাদা হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে গেছেন।

ফার্স্ট না সেকেন্ড অ্যাটাক?

আজ্ঞে ফার্স্ট।

ভেবেছিলুম বলবেন, আমার সময় নেই, হাতে পেসেন্ট রয়েছে। অন্য কাউকে ধরে নিয়ে যান। তা কিন্তু বললেন না। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, চলুন। যাঁর প্রেসার দেখছিলেন, তাঁর হাত থেকে প্রেসার মাপা যন্ত্র খুলে নিলেন। ভদ্রলোক রাগ-রাগ গলায় বললেন, কী হল?

ডাক্তারবাবু শান্ত গলায় বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও মারা যাবেন না, এটা হল লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন। এমার্জেন্সি। বসে বসে ম্যাগাজিন পড়ুন, গান শুনুন। এই ভাস্কর!

ভাস্কর মনে হয় অ্যাসিসট্যান্ট। ভারি সৌম্য চেহারা। বললে, বলুন স্যার?

গান চালিয়ে দাও, সফ্‌ট মিউজিক। আমি আসছি।

ব্যাগ হাতে ডাক্তারবাবু আমার পাশে পাশে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আমার মানসিক দুর্বলতা অনেকটা কেটে এসেছে। প্রকৃত যিনি বৈদ্য, তিনি তো

শুধু ফী নিয়ে প্রেসক্রিপশান লেখেন না, তিনি রুগীর মনে, রুগীর আত্মীয়-স্বজনের মনে এক ধরনের ভয়শূন্যতা সৃষ্টি করেন। মনে হয় যেন ঈশ্বরের হাতে সব সমর্পণ করে দিতে-পেরেছি। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?

ডাক্তারবাবু বললেন, ভয় পাবেন না, ফার্স্ট অ্যাটাক, মনে হয় সামলে দিতে পারব।

আমার চোখে জল এসে গেল। মনে হল, সব ডাক্তারই কি এমন না ইনি হৃদয় নিয়ে আছেন বলেই এমন হৃদয়বান!

কি ভাবে জানি না, দাদা বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। মাথার কাছে বউদি বসে, হালভাঙা নাবিকের মত, ঘটনা-স্রোত যেদিকে নিয়ে যায়। পায়ের কাছে শিশু ভাইপো। চোখে জল টলটল করছে। ডাক্তারবাবুকে দেখে বউদি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। ভাইপো কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, আমার বাবা।

ডাক্তারবাবু স্টেথিসকোপ-ধরা হাত তুলে বললেন, কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সামান্য কথায় রুগীর ঘরে অদ্ভুত একটা বিশ্বাস নেমে এল। শমন যেন থমকে দাঁড়াল। মৃত্যু নামক জোঁকের মুখে নুনের ছিটে পড়ল। দাদা হঠাৎ চলে গেলে সংসারের কি হবে রে বাবা। ভাবা যায় না। সব চেয়ে বিশ্রী অবস্থা হবে আমার। বউদি আর ভাইপোকে বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন। যে মেয়েটিকে ভালবাসি তাকে আর বিয়ে করা যাবে না। ভীষ্মের বরাত নিয়ে সংসার সমরাঙ্গনে শরশয্যার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে।

রুগীকে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তারবাবু মুখ তুলে বললেন, না বাড়িতে হবে না, হাসপাতালেই নিয়ে যেতে হবে। বায়ুর উর্ধ্ব চাপ নয়, হার্টের সাউন্ড সুবিধের ঠেকছে না।

হাসপাতালের নাম শুনে বুক কেঁপে উঠল। বাবা কয়েক বছর আগেই ফ্রি-বেডে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অসীম অবহেলায় কুকুর বেড়ালের মত মারা গেছেন। হয়তো বেঁচেই ফিরতেন, যদি না হাসপাতাল-কর্মীরা সেই সময় আন্দোলনে নামতেন। রুগীদের সেই সময় কি অবস্থা। নাকে নল আছে, সিলিন্ডারে অকসিজেন নেই। সিলিন্ডারে অকসিজেন আছে, তো নাক থেকে নল খুলে গেছে। দেখার কেউ নেই। বোতলে স্যালাইন নেই, হাতে ছুঁচ ঢুকে আছে। বেডপ্যানের জোগাড় নেই, কুম্ভক করে বসে আছেন। বিছানায় তলায় রাস্তার কুকুর ঢুকে বসে আছে। আন্দোলনকারীরা ইটপাটকেল ছুঁড়ে বোমা ফাটিয়ে এমন এক দক্ষযজ্ঞ করলেন, দুচারটে হার্টের পেশেন্ট হার্টলেস ওয়ার্লর্ড থেকে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, বলে পগার পারে চলে গেলেন। বাবাও তাঁদের মধ্যে একজন।

সেই হাসপাতালের নাম শুনে গলা শুকিয়ে গেল। বউদি মৃদু গলায় বললে, তা হলে তো অ্যাম্‌বুলেন্‌স চাই। সে তো আজ বললে কাল আসবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, সে যুগ নেই। এখন রিসিভার তুললেই নিমেষে চলে আসে। আপনারা বোধ হয় অনেক দিন পরীক্ষা করে দেখেননি! মানুষ আর কতকাল অমানুষ থাকবে! আমাদের দেশে সবই ছিল, মানুষ ছিল না। মানুষ আবার মানুষে ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন না? দেশের চেহারা পালটাতে শুরু করেছে।

ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসান দিলেন। বললেন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে

অ্যামবুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। চেম্বারে রুগী না থাকলে আমার গাড়িতেই পৌঁছে দিতুম।

বউদিকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললুম, ফীজটা দাও।

বউদি ফিস্‌ফিস্‌ করেই বললে, টাকা কোথায়, শেষ মাস না!

ডাক্তারবাবু শুনে ফেলেছেন। এক মুখ হেসে বললেন, কিছু ভাববেন না। ফীজ দেনে-অলারা ঘর আলো করে বসে আছেন। বুঝেছি হাত খালি। আপনারাই বরং কিছু টাকা রাখুন, পরে শোধ করে দেবেন।

বউদি আর আমি অবাক হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই কি সেই পৃথিবী! যাকে আমরা বলি হৃদয়হীন, নিষ্করুণ। যা কিনা টাকার বলবেয়ারিং-এ ঘুরছে! এখন আমার বলতে ইচ্ছে করছে, সত্য সেলুকাস কি.....।

বিশ্বাস থেকে যেমন অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে তেমনি বিশ্বাস। অ্যামবুলেন্স সত্যিই এসে গেল। হাসি হাসি মুখ দু'জন স্ট্রেচার-ধারী স্নেহের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি কেস? হার্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে তো এ স্ট্রেচার চলবে না। বিমান, তুমি ওই স্পঞ্জ লাগানো, ইলেকট্রনিক লেভেল কন্ট্রোল লাগানো, শকপ্রুফ বিদেশী স্ট্রেচার নামাও। রুগীকে রেকর্ড প্লেয়ারের মত সমান রাখতে হবে।

বাবা! সে আবার কি জিনিস! দেশটা রাতারাতি ইওরোপ, আমেরিকা হয়ে গেল না কি! চাকা লাগানো সুদৃশ্য একটি স্ট্রেচার নেমে এল। কোথাও কোন দাগ নেই। বাগান থেকে তুলে আনা শিশির ভেজা ফুলকপির মত টাটকা। ওঁরা দাদাকে এমন সযত্নে বিছানা থেকে তুলে স্ট্রেচারে রাখলেন, যেন মা তার কোলের শিশুটিকে সাবধানে দোলায় শুইয়ে দিচ্ছে। ঈশ্বর দ্যাখো, মানুষের প্রতি মানুষের কি ভালবাসা? আমার দাদাকে আমিও বোধ হয় এত ভালোবাসি না। দাদা এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে তাই এত বড় একটা ব্যাপার টের পেল না। পেলে আর বলতে পারত না, রোজ যেমন বলে, ভালোয় ভালোয় এবার সরে পড়তে পারলেই বাঁচি।

ঝড়ের বেগে অ্যামবুলেন্স চলেছে। মাথার নীল আলো চক্রাকারে ঘুরছে। অ্যামবুলেনস দেখে সমস্ত গাড়ি পথ ছেড়ে দিচ্ছে। সাংঘাতিক লরিও বাধ্য পশুর মত একপাশে সরে যাচ্ছে। ট্র্যাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে নিচ্ছে। ভাবা যায় না! একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, কি প্রধান মন্ত্রী, কি রাষ্ট্রপতির বরাতেই এমন খাতির জোটে। দেশটা কবে এমন হয়ে গেল! কালও কি এমন ছিল! গাড়ির ভেতরে গুনগুন করে পাখা চলছে। চারপাশে কাঁচ দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা, বাইরের কোনও শব্দই কানে আসছে না। আমি বউদি আর ভাইপো মান্তু একপাশে চুপ করে বসে আছি। সামনে স্ট্রেচারে দাদা। দাদার পায়ের কাছে বিমানবাবু।

হাসপাতালের গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকছে। কি আশ্চর্য, কয়েক দিন আগেও গেটের মাথার আলোকিত লেখাটি ভেঙে ত্রিভঙ্গ হয়েছিল। আজ একেবারে কটকট করে জ্বলছে। ফুটপাথে কিছুদিন আগেও দেখেছিলুম আবর্জনা পড়ে আছে কাদা মাখামাখি হয়ে। আজ

সব সাফসুফ। চারপাশে তকতক করছে। মনে পড়ল, বিদেশী একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় আমাদের হাসপাতালকে বলেছিলেন, শূকরের খোঁয়াড়। সেই ভদ্রলোককে আজ একবার ডেকে নিয়ে এলে হয়।

অ্যামবুলেন্‌স এমার্জেনসির সামনে এসে দাঁড়াল। খুট শব্দে আমাদের দরজা খুলে গেল। সাদা পোশাক পরা দু'জন কর্মী সামনে দাঁড়িয়ে। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে মালার মত। তাঁরা খুব বিনীতভাবে বললেন, ডক্‌টর মিত্র ? হার্ট ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনারা চলে আসুন।

আমরা নেমে দাঁড়ালাম। সত্যি বলছি, এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। এতকাল যা শুনে এসেছি, যা দেখে এসেছি সব মিথ্যে। শুনেছি, এমার্জেনসিতে কেলোর কীর্তি হয়। কোনও অ্যাটেনডিং ফিজিসিয়ান থাকেন না। আর. এম ও-কে কোয়ার্টার থেকে গান পয়েন্টে টেনে আনতে হয়। মরণাপন্ন রুগী মেঝেতে কাতরাতে থাকে। কীভাবে আমাদের ব্রেন-ওয়াশ করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী অপ-প্রচারকের দল !

ডকটর মিত্রের সত্যিই কোনও তুলনা হয় না। শুধু অ্যামবুলেন্‌স নয়, হাসপাতালেও খবর দিয়ে রেখেছেন। জুনিয়র ডাক্তার দু'জন বললেন এঁকে আমরা কার্ডিয়াক ইউনিটে নিয়ে যাচ্ছি। বেড নাম্বার থার্টি টু। ওই যে দক্ষিণ দিকের ব্লক। আপনারা সুপারিনটেন্‌ডেন্টের ঘর থেকে খাতাপত্তর সই করে আসুন। কোনও ভয় নেই। চিয়ার আপ।

করিডর ধরে সুপারিনটেন্‌ডেন্টের অফিসের দিকে যেতে যেতে মনে হল বিলেতের হাসপাতালে চলে এলুম না কি। চারপাশ ছবির মত ঝকঝকে তকতকে। ডিসইনফেকট্যান্টের পরিচিত গন্ধ। পাশ দিয়ে সিস্টার আর ডাক্তাররা হেঁটে চলেছেন এমন ভাবে, যেন অনুপ্রাণিত হাঁটা। উদ্দেশ্যহীন প্রমোদভ্রমণ নয়। কোথাও উঁচু গলায় কথা নেই। এয়ার কন্ডিশানিং প্ল্যান্টের ঝিরিঝিরি জল পড়ার শব্দ।

সুপারের ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে বললেন, আসুন, বসুন। আমি দেখেছি আপনারা এসেছেন।

কি করে দেখলেন ! পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। প্রশ্নের প্রয়োজন হল না। সামনেই একটি ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায় সারা হাসপাতাল ভাসছে।

ঘরে আর একজন ডাক্তার ছিলেন। সুপার তাকে বলছেন, ব্যাপারটাকে আপনি ছোট করে দেখবেন না। আমরা এখানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে আসিনি। জনসেবাই আমাদের প্রোফেসানের মন্ত্র, শপথ। আপনাদের আমি বলেছি, যত দিন না ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ আসছে, ততদিন একটা করে ইনজেকসান দেবেন আর নিড্‌লটা খুলে ফেলে দেবেন। থ্রো অ্যাওয়ে দি নিড্‌ল। নিড্‌ল বড়, না জীবন বড় ডক্‌টর সেন ?

জীবন ! কিন্তু প্রশ্নটা হল টাকার।

টাকার জন্যে কোনও ভালো কাজ আটকে থাকে না। চাই ইচ্ছে। উইল টু ডু। আমাদের দেশে পুলিশ-খাতে কত ব্যয় হয় ! ফরেন ট্যুরে কত টাকা যায় ! তীর্থস্থানে

এই যে এত বড় বড় মন্দির তৈরি হয়েছে, কীভাবে হয়েছে? সাধু সন্ন্যাসীরা টাটা বিড়লা নয়। সব হয়েছে মনের জোরে, অদম্য ইচ্ছায়। মানুষকে মানুষ ভাবতে শিখুন ডক্টর সেন। জমানা বদল গিয়া। এতকাল অর্থটাকেই আপন ভেবেছেন, স্বার্থকে ভেবেছেন, অর্ধাঙ্গিনী। মানসিকতা পালটান। আমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছি। চাঁদে আমাদের রকেট ল্যান্ড করেছে। মঙ্গলের পাশ দিয়ে হুস্ করে উড়ে গেছে। ডক্টর গাঙ্গুলীকে আপনি বাড়ি যেতে বলুন। এই প্রোফেসানের তিনি অযোগ্য। রুগীর দিকে যিনি হাসি-হাসি একটি মুখ তুলে ধরতে পারেন না, ধৈর্য ধরে রুগীদের দুটো কথা শুনতে যিনি বিরক্ত হন, হি হিমসেল্ফ ইজ এ রুগী।

ডক্টর সেন বললেন, এঁরা অপেক্ষা করছেন স্যার!

ও হ্যাঁ। আমি আজকাল বড়ো ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছি। আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য করতেন, সামান্য একটু কো-অপারেশান!

আমাদের এই অবস্থাটা হল ঈশ্বরের টিথিং ট্রাবল। ঈশ্বর হবার মুখে মানুষের এই রকম হয়। অলরাইট। আপনি ফার্স্ট ফ্লোরের সব কটা ল্যাভেটারি একবার ইনসপেকট করুন। তারপর একবার দেখে আসুন। ধোবীখানার পেছনে কোনও উৎপাত জুটেছে কি না। বুঝতে পারছেন, কি বলছি? হাসপাতাল হল জীবনদায়িনী কারখানা। ভাং, জুয়া, ডিস্টিলারি। ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। দশ চক্রে ভগবান ভূত।

উত্তেজনায় দুম্ করে খাতা খুলে বললেন, সরি। একটু শব্দ হয়ে গেল। নিন বলুন, নাম ঠিকানা, বয়স, মেল, ফিমেল, ম্যারিট্যাল স্ট্যাটাস, বেকার না সাকার, আশ্রিতের সংখ্যা, মাসিক উপার্জন।

ঝট্‌ঝট্ সব লেখা হয়ে গেল। আমরা এখন তা হলে কি করব স্যার। কার্ডিয়াক ওয়ার্ডের বত্রিশ নম্বরে তা হলে যাই আমরা? বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

যাবার প্রয়োজন নেই, এখানে বসেই দেখুন। ওয়ার্ডে বাইরের কাউকে আমরা অ্যালাউ করছি না। বাইরে থেকে কখনও তাঁরা ঝগড়া নিয়ে আসেন, সমস্যা নিয়ে আসেন, ভাইরাস নিয়ে আসেন, সামটাইম্স একস্‌ট্রিম কেসে অস্ত্রও নিয়ে আসেন। আমাদের সিসটেমটা এখন 'কাউন্টার-ডেলিভারি'। কাউন্টারে রুগী জমা দিয়ে, কাউন্টারেই ডেলিভারি নেবেন। আচ্ছা, সি থার্টি টু।

প্যানেলে সারি সারি বোতামের ভেতর সুপার দেখে দেখে একটা টিপলেন। পর্দায় দাদা। বাপ্‌রে কি এলাহি ব্যবস্থা। দু'জন ডাক্তারবাবু, তিনজন নার্স, ঝক্‌ঝকে বেড। বেশ বোঝা গেল ই. সি. জি. হচ্ছে। মাথার দিকে অকসিজেন সিলিণ্ডার।

সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললুম, স্যার সিলিণ্ডারে মাল আছে তো!

সুপার ইণ্টারকম তুললেন। পর্দায় দেখা গেল, একজন সিস্টার রিসিভার তুললেন। সুপার বললেন, চেক সিলিণ্ডার।

আবার একটি সন্দেহের কথা বলে ফেললুম, স্যার আমার বাবার নাক থেকে অক্‌সিজেনের নল খুলে পড়ে গিয়েছিল, অ্যাণ্ড হি...।

হতে পারে, হতে পারে, অনেক সময় ভোঁতা নাক হলে, কি গোঁফ থাকলে ওরকম হয়। আমাদের দিশি স্টিকারও তেমন জোরদার নয়। সাবধানের মার নেই।

আবার ইণ্টারকম ! ও প্রান্তে নির্দেশ গেল, দু'জন সিস্টার সারারাত দুপাশ থেকে দুটো নল ধরে বসে থাকবে। এবং তৃতীয় জন নজর রাখবে ওরা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, একটা বেডপ্যান এখন থেকেই দিয়ে রাখো। এর নাম দূরদর্শিতা। ভদ্রলোক শুনছি অফিস থেকে এসেই আক্রান্ত হয়েছেন, বাথরুমে যাবার সময় পাননি। আমার কথা হল, চাইতে যেন না হয়। জাস্ট লাইক নেমন্তন্ন বাড়ি। বারে বারে ঘুরিয়ে যাও। রিপিট অ্যাণ্ড রিপিট ! ওকি ইনজেকসান। নিড্‌ল নিড্‌ল। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট নিড্‌ল।

ইণ্টারকম ছেড়ে দিলেন। ভয়ে বললুম, স্যার আমরা গরিব মানুষ, তিনজন নার্স, এই এলাহি ব্যাপার, এ তো স্যার অমিতাভ বচ্চন...

থামুন মশাই। শিক্ষা আর স্বাস্থ্য স্টেটের দায়িত্ব। রাশিয়ার কথা শোনেননি !

এটা তো স্যার রাশিয়া নয়।

ভালো কিছুর অনুকরণ কালে সাচ্চা হয়ে যায়। যান বাড়ি যান। তেমন কিছু হলে মেসেঞ্জার যাবে।

আচ্ছা, কেসটা কি খুব সিরিয়াস। টেঁসে যাবার চান্‌স আছে ?

আজ্ঞে, হার্ট জিনিসটা তো ঠিক বোঝা যায় না, কখন কি করে বসে ?

ঠিক ঠিক, দেহটা পুরুষের হলেও হৃদয় একেবারে মেয়েমানুষ। নাঃ, রিশক না নিয়ে টপকে একবার রেফার করি। স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হীরের চেয়েও মূল্যবান !

সুপার রিসিভার তুললেন, হ্যালো ডকটর বাসুলী, কি স্যার রেস্ট নিচ্ছেন ? আই অ্যাম সরি। কিন্তু উপায় নেই, আমি আপনার নির্দেশমত কাজ করতে বাধ্য। একটি মধ্যবিত্ত কার্ডিয়াক পেশেণ্ট, ফার্স্ট অ্যাটাক, স্ত্রী, একটি বাচ্চা। রাইট স্যার, বড়লোক দুনম্বরী মাল নয়, খাঁটি মধ্যবিত্ত, অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, হ্যাঁ স্যার, মরলে ফ্যামিলি পথে বসবে। কী স্যার ? অ. ভেবে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আপনি আসছেন, যে অবস্থায়, মানে পাজামা, অ লুঙ্গি ! শ্যাণ্ডো। প্যাণ্টটা স্যার গলিয়ে নিলে হত না। অ, সময়, হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় একটা ফ্যাকটার। রাইট স্যার, আমি বাইরে আছি।

সুপার রিসিভার নামালেন। ভারতবর্ষের এক নম্বর আসছেন, .ন নম্বর একজন সিটিজেনের জন্যে। ভাবা যায় না।

টেবিলের তলায় আঁচড়াবার শব্দে সুপার নিচের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, ব্যাটা, তুমি এইখানে ! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, আমি তোমায় টিভিতে খুঁজছি, অ্যাণ্ড ইউ আর হিয়ার। শেষ কুকুর।

উত্তেজনায় সুপার সেই শেষ লেড়িটিকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুললেন। দৃকপাত নেই। ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে কুকুর কামড়াচ্ছে, তবু ছাড়ছেন না। দরজার দিকে এগোচ্ছেন আর বলছেন, জলাতঙ্কে মরি সেও ভালো, শেষ কুকুর আমি বিদায় করবই। আমি চাই কুকুর-মুক্ত পরিবেশ। ডগ-ফ্রি অ্যাডমিন্‌সট্রেশান। কামড়া, কামড়া, ব্যাক বাইট, ফ্রণ্ট বাইট। আজ আর তোমায় ছাড়ছি না।

বাইরে এসে দুম করে কুকুরটাকে আছড়ে ফেললেন। শেষ লেড়ির শেষ চিৎকারে হাসপাতালের আকাশ কেঁপে গেল। আর সেই কাঁপন থামতে থামতে, নীল আলোয় অন্ধকার চিরে এগিয়ে এল ডক্টর বাসুলীর গাড়ি।

ছুটি

বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু ধুঁকতে ধুঁকতে বিরাট অফিসবাড়ির লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চুল পেকে পাটের মত চেহারা হয়েছে। চারপাশে ঝুলে আছে এলোমেলো, বহু ব্যবহৃত ঝুলঝাড়ুর মত। চুলের আর অপরাধ কি ? সারা জীবন মাথার ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপটা গেছে ! জীবনটাকে দাঁড়িপাল্লায় ফেললে, সুখের দিকে পড়বে ছটাকখানেক, বাকিটা দুঃখ। যখন যেখানে পা ফেলেছেন, সবই পড়েছে বেতালে। একেই বলে মানুষের ভাগ্য। সেই কথায় বলে না, বরাতে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি ?

বগলে রঙচটা ছাতা। হাতে একটা মার্কিনের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু দরকারি কাগজপত্র, আর একটা চশমার খাপ। খাপে ময়লা একটা দু টাকার নোট, পথ-খরচ। আর ছোট্ট একটা ঠোঙায় গুটিকয় বাতাসা। রক্তে চিনি কমে গেছে। ডাক্তারের নির্দেশ, মাথা ঘুরলেই একটু চিনি খাবেন। চিনির যা দাম ! ওই পথ চলতে চলতে মাঝে মধ্যে একটা দুটো বাতাসা ফেলে দেন মুখে।

লিফটের সামনে তেমন ভিড় নেই। অফিস অনেক আগেই বসে গেছে। লেটের বাবুরাও সব এসে গেছেন মনে হয়। আজকাল অফিস একটু কড়া হয়েছে। কাগজে পড়েছেন। সত্যি মিথ্যে জানেন না। লিফটের সামনে গন্ধটন্ধ মাখা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘর্মাক্ত, রোদে পোড়া, সচল ঝুলঝাড়ু সদৃশ প্রসন্নবাবুকে দেখে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। প্রসন্নবাবু মনে মনে হাসলেন। মা জননী, জীবনের বসন্ত বড়ো ক্ষণস্থায়ী। হেসে নাও হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়। ওই চুল পাকবে, গোলাপী গাল কোল্ড স্টোরে রাখা আপেলের মত ধেসকে যাবে। সরু কোমরটি হবে হাতির গোদা পায়ের মত।

ওপর থেকে লিফট নেমে এল নিচে, লাল আলোর অক্ষর কমাতে কমাতে। জীবনটা যদি লিফটের মত হত ! উলটো হাতল ঘুরিয়ে বয়েসটাকে কমাতে কমাতে শূন্যে নিয়ে আসতেন। আবার মাতৃজঠরে, আবার ভূমিষ্ঠ। অন্নপ্রাশন। তারপর বেশ হিসেব করে দুঁদে ছেলের মত বড় হওয়া, ফার্স্ট ফ্লোর, টপ ফ্লোর। একেবারে টঙে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেন। সব ক্ষুদি ক্ষুদি মানুষ, পৃথিবীর পিঠে যেন পোকা ঘুরছে।

সাত নম্বর তলায় লিফট থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সেই পুরনো কর্মস্থল। সব এখন পালটে গেছে। বেশিরভাগই নতুন মুখ। কেউ তাঁকে চেনে না। যারা চেনে, তারাও যেন না চেনার ভান করে। একজন মানুষ রিটায়ার করে চলে গেলে, তাকে আর মনে রেখে লাভ কি ! তার কাছ থেকে কি আর পাওয়া যাবে, দুঃখের কাঁদুনি ছাড়া। উলটে বরং যাবে। এক কাপ চা ভদ্রতা করে খাওয়াতে হলে, এ বাজারে তিরিশটা পয়সা। ওর সঙ্গে কুড়িটা পয়সা জুড়লে এক পিঠের বাসভাড়া।

লম্বা হলঘরে সেই পরিচিত অফিস এখন কত অপরিচিত। ঘিঞ্জি, নোংরা। কোনও যেন ছিরিছাঁদ নেই। ক্যাডাভ্যারাস। যে যেখানে পেরেছে, একটা করে টেবিল চেয়ার পেতে বসে পড়েছে। কিছু টেবিল নতুন। কিছু সেই বৃটিশ আমলের। আকার, আকৃতি

দেখলেই ডায়ার কিংবা টেগার্টের কথা মনে পড়ে। যে অফিস দেখে এখন ঘৃণায় নাক সিঁটকোচ্ছেন, সেই অফিসেই সারাটা জীবন ফাইল নেড়ে অক্লেশে কাটিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে এ অফিসও ছিল না। যুদ্ধের পর একটা ভাঙা টিনের চালার তলায় অফিস বসত। গ্রীষ্মে জীবন বেরিয়ে যেত। মাথার ওপর হ্যান্ডা পাখা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দে গরম বাতাসের ন্যাজ নাড়ত। ছাতাধরা কুঁজোয় জল। নোংরা টুলের ওপর একপাশে কেতরে থাকত। মুখে একটা পিচবোর্ডের ঠুলি। সারাদিন কাজ করো, আর ঢোঁকর ঢোঁক জল খাও। সে সময় অফিসে তবু কাজ হত। ডাক্তার রায়ের আমল। নিজে স্বপ্ন দেখতেন, অন্যকেও সেই স্বপ্ন দেখাতে জানতেন। বড় বড় পদে বেশ কিছু স্বদেশী করা মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। কাজে গাফিলাতি হলে জবাবদিহি করতে হত। সাসপেনসান কিংবা ট্রানসফারের ভয় ছিল। কাগজে কোনও দফতরের সামান্যতম সমালোচনা হলে ফাটাফাটি হয়ে যেত। তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। তখন অফিসে অফিসে এত সুন্দরী মহিলা ছিল না। টেবিলে টেবিলে প্রেমালাপ ছিল না। প্রজাপতি উড়ত না ফুরফুর করে। ঘুসঘাস ছিল না, থাকলেও খুব সামান্য, খুব লুকিয়ে চুরিয়ে, জায়গা বিশেষে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে সব যেন কেমন হয়ে গেল ! স্বাধীনতা যত পুরানো হতে লাগল দেশটা যেন পচে ফুলে উঠল। চিকিৎসার বাইরে চলে গেল সব। নতুন বাড়িতে অফিস এল। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল জোয়ারের জলের মত। অসংখ্য কেতাদুরস্ত অফিসার। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা ! ফাইলই বাড়ল। দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে প্রসন্নবাবু দূর কোণের দিকে তাকালেন। তিনি যে চেয়ারে, যে জায়গায় শেষ বসে গেছেন সেখানে একজন হৃষ্টপুষ্ট মহিলা এসেছেন। খেঁকুরে প্রসন্নর জায়গায় ভরভরন্ত রমণী। কাঁধকাটা ব্লাইজ বেয়ে পাইথনের মত হাত নেমেছে। যাকে যখন ধরবেন তার আর নিষ্কৃতি নেই। মুখটি যেন তিল ফুলের, নীল শাড়ি ফর্সা রঙ, কোণটা যেন আলো হয়ে আছে। বয়েস হয়েছে, চোখে চালসে, শরীর ঢকঢকে, দুপা হাঁটলে হাঁপ ধরে, তবু মেয়েছেলে দেখার চোখ সরে না। মানুষ একটা জীব বটে ! যত দুর্ভোগ বাড়ে, তত ভোগের আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে। বাবু প্রসন্ন, স্থির হও।

প্রসন্নবাবু নিজেকে উপদেশ দিয়ে, সরাসরি টেবিলের মাঝখান দিয়ে অশোক বসুর আসনের দিকে এগোতে লাগলেন। অশোক বসুই এখন একমাত্র ভরসা। রিটায়ার করেছেন প্রায় তিন বছর হল, এখনও পেনসান পেপার তৈরি হল না, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরত পেলেন না। আর কয়েক মাস পরেই মেজ মেয়ের বিয়ে। কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। দর কষাকষি চলছে। রফা একটা হবেই। মেয়ে যখন, আইবুড়ো তো আর ফেলে রাখতে পারেন না। জীব-ধর্ম বলে কথা !

প্রসন্নবাবু অশোক বসুর টেবিলের সামনে এসে মৃদু গলায় ভয়ে ভয়ে ডাকলেন, 'বাবা, অশোক'। বয়েসে অনেক ছোট। ছেলের বয়সী। বাবা ছাড়া আর কি বলবেন ! বড়ো স্নেহের ডাক। বয়ঃকনিষ্ঠদের আজকাল তিনি এইভাবেই ডাকেন। এর মধ্যে তেমন কোনও স্বার্থ নেই। যে বয়েসে এসে ঠেকেছেন সে বয়েসে স্বার্থের কথা আর তেমন করে ভাবা যায় না। এখন সব জিনিসই হলে হবে, না হলে না হবে। হিসেবের খাতার

শেষ পাতায় দেনা-পাওনার অঙ্ক মেলাতে বসলে চোখ খুলে যায়। সারা জীবন পেতে হবে, পেতে হবে করে, কি পেয়েছেন ! এ যেন আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়ে কোঁচড় ভর্তি ইটের টুকরো নিয়ে ফেরা। সেই দেনেঅলা মালিক একজন। তিনি যাকে দেন তাকে ছপ্পর ভরে দেন। যাকে দেন না, তাকে কিছুই দেন না, এমনকি তার পাওনা টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসান সব আটকে রেখে দেন। ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়। কত অসহায় প্রাণী এই সামান্য জাগতিক আকর্ষণে ভূত হয়ে বড় বড় অফিসবাড়ির কার্নিশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বড়বাবুর কানের কাছে, খোনা খোনা গলায়, বাতাসের সুরে বলে যায়, বঁড়বাঁবু, আঁমাঁর পেঁনসাঁন, আঁমাঁর ফঁভিঁডেন্ট ফাঁণ্ড। বড়বাবু ভাবেন, কি যেন একটা শুনলুম। কানের পাশে হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার মত শব্দটাকে উড়িয়ে দেন, ও কিছু নয়, মনের ভুল। যারা মানুষ খুন করে, তারাও মাঝরাতে অনেক অশরীরী শব্দ শুনতে পায়, তুমি আমায় মারলে তুমি আমায় বিধবা করলে, শিশুর আর্তনাদ, নারীর আর্তনাদ, যুবকের মৃত্যুকালীন চিৎকার, কণ্ঠনালীর উন্মুক্ত ভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসা, বাতাস আর রক্তের ঘড় ঘড় শব্দ। তারা গ্রাহ্য করে না। শোনার মত না শোনাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। সাধনায় কি না হয় ?

একটা শতচ্ছিন্ন, পুরনো কেস ফাইল খুলে, অশোক বসু ধ্যানস্থ ছিলেন। হয়তো লর্ড ক্লাইভের আমলের কোনো কেস। আজও যার ফয়সালা হয়নি। দু পক্ষে চিঠি-চাপাটি চলছে তো চলছেই। অনন্তকাল চলবে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের স্লোগানই হল, চলছে চলবে। অশোক বসু বিরক্তি-ভরা গম্ভীর মুখ তুলেই, প্রসন্নবাবুকে দেখে বিগলিত হাসিতে গলে একেবারে মাখমের মত হয়ে গেলেন। প্রসন্নবাবু বড়ো অবাক হলেন। এখানকার আকাশে তো কোনওদিন সূর্যোদয় দেখেননি ? আজ হঠাৎ কি হল। উনি যা শুনবেন ভেবেছিলেন, তা হল, অ, আবার এসেছেন ? আপনার তাগাদায় মশাই অফিসে তিষ্ঠনোই দায় হল ! ক'বছর হল মশাই ? মাত্র তিন বছরেই হেদিয়ে গেলেন। পেনসান পেপার তৈরির ঝামেলা জানেন ? আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। সে মশাই আমাদের হাতে নেই। আমরা পাঠিয়েছি। ভাগ্যে থাকলে আজও হতে পারে, আবার দশবছর পরেও হতে পারে। আপনি এখন মনে করুন গর্ভাবস্থা চলছে। সময় হলে ডেলিভারি হবে। টানা হ্যাঁচড়া করলে, তিন তরফেরই বিপদ। প্রসূতি মরবে, বাচ্চা মরবে, জেলে যাবে গাইনি।

অশোক বললেন, বসুন বসুন। অঃ, বাইরে আজ ভীষণ রোদ। চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে। আহা শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। এ দেশে বৃদ্ধরা বড়ো অবহেলিত। হালের বলদের মত। যতদিন শক্তি, ততদিন খাতির। যেই বসে গেল, টানতে টানতে নিয়ে যাও কষাইখানায়।

প্রসন্নবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বসতে অবাক হয়ে পুত্রসম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই শুষ্ক পৃথিবী কি আবার জলসিক্ত, স্নেহসিক্ত, করুণাসিক্ত, বড় নির্ভর একটি স্থান হয়ে উঠল নাকি ! মানুষ মানুষের কথা ভাবছে ! চোখে জল এসে গেল। সকালেই পরিবারের সঙ্গে এক পক্কড় হয়ে গেছে। টাকার জোর না থাকলে সংসার এক

বিতিকিচ্ছিরি জায়গা। এ যেন মুদিখানার দোকান। স্নেহের কিলো একশো টাকা, মমতা দেড়শো টাকা, সেবা দুশো টাকা, ভালোবাসা পাঁচশো টাকা। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে লেনা-দেনা। মানুষ তাই নিয়েই মেতে আছে। জুতো, ঝাঁটা, লাথি খেয়েও মরার সময় হাতে পায়ে ধরাধরি, আরও কিছুকাল, আরও কিছুকাল।

অশোক বসু গলা চড়িয়ে কাকে যেন বললেন, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও।

প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটা রাতারাতি অন্তর্যামী হয়ে গেল নাকি? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ঠিক টের পেয়েছে তো?

শুধু জল নয়। জলের পর চা এসে গেল। কাপের দিকে হাত বাড়াতে ইতস্তত করছিলেন। কে জানে বাবা, কার জন্যে চা এসেছে? আগে তো কখনও এমন হয়নি!

চায়ের কাপটা প্রসন্নবাবুর দিকে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে অশোক বসু বললেন, নিন, চা খান। চা খান। গ্রীষ্মের তেষ্টা জলে যাবার নয়। গরম চা না খেলে মিটবে না।

প্রসন্নবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে ঠোঁটের কাছে কাপ তুললেন। পানসে চা। তবু চা তো। একচুমুক মেরেই থমকে গেলেন। পুরনো দিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল:

সেন সায়েব বলে এক সায়েব এসেছিলেন এই অফিসে। বেশ মিহি চেহারা, মিহি গলা। অর্থনীতির এম. এ। মানুষকে বড়ো অদ্ভুত কায়দায় তিনি অপমান করতেন। জনৈক মন্ত্রীর এক আত্মীয়কে নিয়োগপত্র ছাড়তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। একদিন কি দু'দিন হলে কিছু বলার ছিল না। মাত্র বারো ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। সেন সায়েব ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আসুন আসুন। কতদিন আপনাকে দেখিনি। কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনি। বুঝতেই পারি নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। আপনাদের মত সিনিয়ার কিছু কর্মী আছে বলেই প্রশাসন এখন ভেঙে পড়েনি। আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।'

বেল টিপে বেয়ারা ডেকে বললেন, এক কাপ চা নিয়ে এসো।' চা এসে গেল। প্রসন্নবাবু ভয়ে ভয়ে একটি চুমুক মারলেন। খুব সাবধানে যাতে কোনও রকম শব্দ না হয়। দ্বিতীয় চুমুকের জন্যে কাপটাকে সবে ঠোঁটের কাছে এনেছেন সেন সায়েব পাইপ চিবোতে চিবোতে বললেন, 'কত বয়েস হল আপনার?'

কাপ থেকে ঠোঁট সরে এলো, প্রসন্নবাবু বললেন, 'আর বছর দুই বাকি আছে।'

'তার মানে বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছেন। ভীমরতি ধরেছে।'

প্রসন্নবাবু আত্মরক্ষার জন্যে সামান্য প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আজ্ঞে না ভীমরতি ধরবে কেন? এখনও বেশ শক্ত-সমর্থই আছি।'

'বয়েস কত বছর কমিয়েছেন?'

'এক বছরও না।'

'ছেলে মেয়ে কটি?'

'দুই ছেলে এক মেয়ে।'

'সেদিকে হিসেব ঠিক রেখেছেন অ্যাঁ।'

'তার মানে স্যার?'

'এদিকে অপদার্থ হলেও ওদিকে বেশ পদার্থ আছে, কি বলেন?'

'আপনি কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তা পারবেন কেন ? ইনক্রিমেন্টটি বন্ধ করে দিলে বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল ?'

'আমার তো স্যার আর ইনক্রিমেন্ট নেই। স্কেলের শেষে বহুদিন হল পৌঁছে গেছি।'

'এবার তা হলে দয়া করে ভেগে পড়ুন না। চেয়ার দখল করে বুড়ো হাবড়ারা আর কতকাল বসে থাকবে। কিছু ইয়ং ছেলে না এলে চাকায় যে জং ধরে গেল।'

অশোক বসুর পেছনে তামাটে আকাশে সন্ধানী চিল উড়ছে। রোদের প্রখর তাপে গাছপালা ঝিমিয়ে পড়েছে। পুরনো দিনের কথা ভেবে চায়ে চুমুক দিতে সাহস হচ্ছে না। বলা যায় না অতীত আবার ফিরে আসতেও পারে।

ছেঁড়া ফাইলটা বাঁধতে বাঁধতে অশোক বসু বললেন, 'সামনের মাসেই যাতে আপনি পেনসান ড্র করতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব। আর এক মাসের মধ্যেই আপনি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা অবশ্যই পাচ্ছেন। মেয়ের বিয়ের দিন পাকা হল ?'

'দর কষাকষি চলছে পাত্রপক্ষের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো। যা বাজার দর তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সব হয়ে যাবে। আপনি সৎ মানুষ। আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না।'

প্রসন্নবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, 'বাবা অশোক, এ সব কথার কথা নয় তো। সত্যিই হবে ?'

'আপনি দেখুন না, হয় কি না। আর আপনাকে ঘুরতে হবে না। আমারও মেয়ে আছে প্রসন্নদা, আমাকেও একদিন রিটায়ার করতে হবে। ঘুঁটে পুড়লে গোবরের হাসা উচিত নয়।'

বিবর্ণ ছাতাটি বগলে নিয়ে প্রসন্নবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা।' অশোক বসু প্রবীন মানুষটিকে সম্মান জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি ভালো করলে তবেই না আমার ভালো হবে ? প্রসন্নদা, একদিন সকলকেই যেতে হবে। এখানকার বিচার এখানে না হলে ওখানে গিয়ে হবেই। সেখানে ঘুস চলে না। খুঁটি ধরে পার পাওয়া যায় না।'

চারপাশে তাকাতে তাকাতে প্রসন্নবাবু দরজার দিকে চললেন। চেনাজানা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই যেচে যেচে কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রায় সমসাময়িক হরেনবাবু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমারও যাবার সময় হল রে ! আর এক মাস। বয়েসটা না ভাঁড়ালে তোর সঙ্গেই যেতে হত। তুই তো সাধু, তোর কথাই আলাদা। আমরা ছিলুম ম্যানেজমাস্টার। তা ভাই ম্যানেজ করে কি আর হোলো। বছর কয়েক দাসত্বের কাল বাড়ল। সেই তো মাথা হেঁট করে যেতেই হবে !'

সহকর্মী হরেন উদাস মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বগলে বিবর্ণ ছাতাটি চেপে ধরে প্রসন্ন বললেন, 'দাসত্বই আমাদের জীবন রে ভাই। এই বাড়ি যেদিন আমাদের ছুটি বলে বাইরে বের করে দিয়েছে, সেদিন থেকে আমরা জীবনেরও বাইরে চলে গেছি। কিছুই আর নেই, শুধু দিন গোনা। ক্যালেন্ডারের পাতা ওলটানো।'

'নতুন ভাবে বাঁচা শিখতে হবে। একটা কিছু করতে হবে।'

'কিছুই করার নেই রে ভাই। ভাবনাটাই শেষে মরে যায়। জীবনটাই যে পুরনো হয়ে গেছে। পৃথিবীতে শুধু যৌবনের আয়োজন। আমরা স্টেজের বাইরের চরিত্র এখন। দর্শকের আসনে বসে থাকা। আমরা তো তেমন বড় হতে পারিনি। একেবারেই মিডিয়কার। কীর্তনের দলের দোহার দেখেছিস? মূল গায়েন গাইলে, রাধার এ কি হোলো। দোহাররা অমনি গেয়ে উঠল, এ কি হোলো। আমরা হলুম সেই দোহার। এ কি হোলো করার জন্যেই জন্মেছি।'

প্রসন্ন অফিসের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। শহর যেন রোদের উত্তাপে পরিশ্রান্ত বলদের মত ধুঁকছে। ট্রাম চলেছে নড়বড়, নড়বড় করে। যৌবনে এই সময়টায় তিনি অফিসের বাইরে টিফিন করতে বেরোতেন। চারপাশে সবই রয়েছে। সেই কাটাফল, চিঁড়ে, মুড়ি, ছোলা, বাদাম ভাজা। আখের রস। তেলেভাজা, আলুর চপ, জিলিপি। সার সার মিষ্টির দোকান, পান, সিগারেট, ঠাণ্ডা জল। সবই সেই আগের মত। নাটক চলছে, চলবে। এক প্রসন্ন যায়, তো শত প্রসন্ন আসে। জীবন অনেকটা পায়ের কড়ার মত। যতই কাটো না কেন, আবার ঠিক গজাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে রাজভবনের সামনে দিয়ে বৃদ্ধ প্রসন্ন টুকটুক করে হেঁটে বাস রাস্তার দিকে এগোতে লাগলেন। আজ আর তেমন হতাশ বোধ করছেন না। টাকাকটা পেলে মেয়েটাকে সামনের শীতেই পার করবেন। আর বহু দিনের ইচ্ছে, হরিদ্বারটা একবার ঘুরে আসবেন। সুষমারও যেমন বরাত।

সেই চড়চড়ে রোদে, পিচগলা রাস্তায় হঠাৎ বউয়ের কথা মনে পড়ল। কম সহ্য করেছে। বেচারা আর পারছে না। বয়েস বেড়েছে। নানারকম মেয়েলি রোগে ধরেছে। মেজাজ তো একটু খিটখিটে হবেই। আর কত খরচ হবে, হাজার, দু'হাজার। সস্ত্রীক ঘুরে আসবো হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী। শরীর নিলে কেদারনাথ। জীবনে একবার, মাত্র একবার সঞ্চিত অর্থের বেহিসেবী খরচ। বেহিসেবী কেন? এ তো আমার উপার্জন। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে চোখের সামনে ভাসতে থাকবে তুষারশুভ্র হিমালয়। সংসার নয়, জীবনের চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়া নয়, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল নয়, হিমালয় দেখতে দেখতে নিঃশব্দে সরে পড়া।

হাওড়াগামী একটা ভিড় বাসে টুক করে লাফিয়ে উঠলেন। হিমালয়ের কথা ভেবেই বাতাক্রান্ত পায়ে কেমন জোর এসে গেছে। বগলের ছাতা কণ্ডাক্টারের কোমরে খোঁচা মেরেছে। শঙ্কিত হলেন। এই সামান্য অসাবধানতার ফলে কত কথাই না শুনতে হবে। খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। কেরানীর কি যে অভ্যাস! সারা জীবন বগলে ছাতা, হাতে একটা নরম কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ! সাধে লোকে কেরানীকে ঘেন্না করে!

কণ্ডাক্টার ছেলেটি কিন্তু কিছুই করল না। বরং ভেতরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল। অবাক হলেন। এমন তো আজকাল হবার নয়। এখন তো তেরিয়া-মেরিয়ার যুগ। ভেতরে ঢোকার সময় আর একপ্রস্থ অবাক হবার পালা। টুঁ মেরে, গোঁত্তা মেরে, পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে, এপাশ থেকে ওপাশ থেকে ছোঁড়া তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সহ্য করতে করতে, বাসের মধ্যে নিরাপদ মধ্যাঞ্চলে যেতে হল না। যাত্রীব্যূহ মন্ত্রবলে যেন দু'ভাগ

হয়ে গেল, যেন সেই যমুনা ! বৃদ্ধ প্রসন্ন কৃষ্ণ-কোলে নন্দের মত অক্লেশে ঢুকে গেলেন। শুধু তাই নয়, বেশ রাগী রাগী চেহারার স্বাস্থ্যবান একটি যুবক সরে গিয়ে, সুন্দর এবং সুস্থভাবে দাঁড়াবার মত জায়গা ছেড়ে দিলেন।

বাস চলেছে। প্রসন্নবাবু চলেছেন। একটা হাত ছাতা সামলাচ্ছে, আর একটা হাত টাল সামলাচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে। হলেও কিছু করার নেই। এই ভাবেই যেতে হবে। মধ্যবিত্ত মানুষকে কোন্ সরকার এর চেয়ে বেশি সুখে রাখবে ! ইংরেজ রেখেছিল। সে সময় দেশ বড় ছিল। জনসংখ্যা কম ছিল। ভয়ও ছিল সমালোচনার। সামনের আসনের পাশের দিকে যে যুবকটি বসেছিল, সে হঠাৎ বললে, 'আপনার ছাতা আর ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে, দু'হাতে ভালো করে ধরে দাঁড়ান।'

প্রসন্নবাবু নির্দেশ পালন করলেন। এ এমন কিছু অবাক প্রস্তাব নয়। শহরবাসী যত স্বার্থপরই হোক এটুকু এখনও করে। এতেও অবশ্য স্বার্থ আছে। মুখের কাছে, কাঁধের কাছে হাঁটুর কাছে কিছু ঠেকলে অস্বস্তি হয়। যুবকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি বসুন।'

'কেন বাবা ! তুমি নামবে ?'

'না নামবো কেন ? আপনি বসুন। আপনাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গরমে ঘামাচ্ছেন। বসলে একটু বাতাস পাবেন।'

'না, বাবা, না, তুমি বোসো আমি বেশ আছি।' প্রসন্নবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন। কারুর দয়া তিনি চান না। নিজের জোরে বাঁচতে চান।

ছেলেটি শুনলো না। জোর করে বসিয়ে দিল। 'আমার দাঁড়াবার বয়েস। আপনি পিতৃতুল্য। আপনি বসলে আমার শান্তি।'

'এসব আজকাল কেউ আর মানে না বাবা।'

'আজ না মানুক একদিন আবার মানতে হবে। এখন সব নেশায় আছে। ঘোর একদিন কাটবেই।' ছেলেটির কথা শুনে প্রসন্নবাবুর চোখে জল এসে যাবার উপক্রম হল। আজ পৃথিবীর হল কি। সিন্দুকের ডালা খুলে পুরনো দিনের সব অলঙ্কার বেরিয়ে পড়ছে নাকি ! জড়োয়ার কাজ করা সাবেক কালের বেনারসী, টায়রা, বাজুবন্ধ, চন্দনকাঠের জাফরি টানা ময়ূর পাখা। মানুষ মানুষে তা হলে আবার ফিরে ফিরে আসছে ?

প্রসন্নবাবু যার পাশে বসলেন, তিনি একজন গোলগাল মধ্যবয়সী মানুষ। তিনি আরও অবাক করে দিলে বললেন, 'জানালার ধারে বসবেন ? আরও বেশি হাওয়া পাবেন।'

প্রসন্নবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না ভাই, এই বেশ আছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'যাবেন কতদূর ?'

'কদমতলা।'

বাস ব্রিজে উঠে পড়ল। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাস আসছে। বাসের দুলুনিতে ঢুল ধরছে। একবার বোধ হয় পাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে গালাগালি খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ভদ্রলোক কিছুই বললেন না। স্নেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে শুধু একবার তাকালেন।

কদমতলায় নেমে দু পা এগোতেই, পেছন থেকে একটা মটোর গাড়ি এসে দাঁড়াল। চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বললে, 'জ্যাঠামশাই, উঠে পড়ুন।'

ছেলেটির নাম মোহর। বড় লোকের ছেলে। অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি। যেচে কোনওদিন কথাই বলেনি। এভাবে গাড়ি থামিয়ে লিফট দেওয়া তো দূরের কথা! প্রসন্নবাবু সামনের আসনে ভয়ে ভয়ে উঠে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। জীবনের একবার না দুবার মটোর চেপেছেন। মটোরে চাপারও কায়দা আছে। গুড়ি মেরে, শরীরটাকে সামনে ঠেলে, পাশে মোচড় মেরে আসনে ফেলতে হয়, তারপর পা-টিকে টুক করে ভেতরে তুলে নিতে হয়। দরজা বন্ধ করারও কায়দা আছে! প্রসন্নবাবুর মাথা ঠুকে গেল। ছাতি আটকে গেল। অনেকটা হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এলেন। লজ্জার ব্যাপার! সারা জীবন বড়লোক থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। আজ একেবারে পাশাপাশি। মোহরের অঙ্গ থেকে বেশ একটা সুবাস বেরোচ্ছে। পাশে পড়ে আছে দামী সিগারেটের প্যাকেট। সোনালী লাইটার। পেছনের আসনে কি একটা শুইয়ে রেখেছে টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে মোহর বললে, 'দু'এক দিনের মধ্যে বাবা বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন বলো তো?' প্রসন্নবাবু ভয় পেলেন। বড়লোক তো অকারণে কিছু করেন না। তাঁদের সময়ের অনেক দাম। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া কোনও দেনা নেই তো! এত দিনে হয়তো খুঁজে পেয়েছেন।

মোহর বললে, 'যদ্দূর মনে হয়, বাবা একজন সৎ মানুষ খুঁজছেন। আমরা যে ব্যবসা করি, সেই ধরনের ব্যবসায়ীদের একটা সমিতি আছে। সেই সমিতিতে উনি অ্যাকাউন্টেন্ট হবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবেন। অনেক দিন ধরেই ভাবছেন, আপনার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। আমাকে দু'তিন দিন বলেছেন। আজ আপনি বাড়ি আছেন?'

'আমি তো সব সময়েই বাড়িতে। কোথায় আর যাবো বাবা!'

'তা হলে আজই আসবেন, ধরুন আটটা থেকে নটার মধ্যে।'

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে মোহর চলে গেল। প্রসন্নবাবুর মনে হল, শরীরে বেশ বল পাচ্ছেন। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, সে মাটি আর তেমন টলছে না। মোহরের পিতা জহরবাবু সত্যিই যদি একটা চাকরি দেন, তাহলে সেই ইচ্ছেটাকে মনের সুপ্ত কোণ থেকে আর একবার টেনে বের করে আনবেন। ছোট্ট একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই। জীবনে বড় বাগানের শখ ছিল। একটুকরো জমি পেলে ফুলের হাসি দেখতেন। দু'পাশে দুটি মন্দির ঝাউ। এক চিলতে পথ। নানা বর্ণের জবা। টগর। মল্লিকা। শীতে প্রজাপতি উড়বে।

বসার ঘরে এক প্রৌঢ় বসে আছেন। সামনে গেলাস। চায়ের কাপ। পেছন থেকে দেখে বুঝতে পারেননি। বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। আঙুলের আঙটিতে আলো খেলছে। সামনে এসে চিনতে পারলেন। শিশিরবাবু। সাঁতরাগাছির সেই শিল্পপতি। এঁরই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের দুরাশা এখনও নাড়াচাড়া করছেন। বিজ্ঞাপন মারফত যোগাযোগ। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। পছন্দ না হয়ে উপায় নেই। প্রসন্ন, তোমার মেয়েভাগ্যটি বড় ভালো! একথা সারা জীবন তিনি শুনে এলেন। মেয়েটিকে দেখে নিজেরও তাই মনে হয়। ভুল

করে অথবা শখ করে এক রাজকুমারী এই দুঃখের সংসারে এসে পড়েছে।

'কি সৌভাগ্য ! কতক্ষণ এলেন ?' প্রসন্নবাবু হাত জোড় করলেন। মেয়ের পিতার যেমন করা উচিত।

শিশিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আরে আসুন আসুন। বেশ কিছুক্ষণ এসেছি। বসুন, বসুন, খুব গুরুতর কথা আছে।'

প্রসন্নবাবু ছাতাটিকে মেঝেতে শুইয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসলেন। কি এমন কথা ! একটা শুকনো ছোট্ট একটি পাতার কুঁড়ি মুখ তুলেছিল, আজ বোধহয় সেটিও শুকিয়ে গেল। গরিবের দুরাশায় যতই জল ঢাল, কিছুই হবার নয়।

শিশিরবাবু উল্লাসের গলায় বললেন, 'প্রস্তুত !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রস্তুত।'

'কি বলুন তো ?'

'আজ্ঞে, হয়ে গেল। যা হবার নয়, তা হবার নয়।'

'খুব বুঝেছেন যা হোক। বাড়িতে পাঁজি আছে ? শুভস্য শীঘ্রং।'

'পাঁজি ? শুভ ? কি বলছেন আপনি ?'

'সামনের শ্রাবণেই। শীতের জন্যে আমি আর অপেক্ষা করব না।'

'তার মানে ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি তো।'

'হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন। আমার কোনও দাবি নেই। যা দেবেন। শাঁখা সিঁদুর হলেও আপত্তি নেই। ওই মেয়েই আমার পুত্রবধূ হবে।'

'ভুল করছেন না তো ?'

'ভুল ! কাল রাতে আমি কী স্বপ্ন দেখেছি জানেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। আপনার মেয়ে মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে। কী অপূর্ব তার রূপ ! যেখানে তার পা পড়ছে, সেই জায়গাটাই স্বর্ণময় হয়ে যাচ্ছে। ভোর হতেই গুরুদেবের কাছে ছুটলুম। তিনি বললেন, মা আসতে চাইছেন, আর দেরি নয়।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'থেকে থেকে আপনি কি বলছেন, কি বলছেন করবেন না। বেয়ানকে ডাকুন। শাঁখ বাজান, শাঁখ বাজান। আজ বড় আনন্দের দিন।'

'আমি যে বড় গরিব !'

'সেইটাই তো আপনার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য ! সেইজন্যেই তো আপনি খাঁটি মানুষ। ধনী হলে আপনার মেয়ে হত আপস্টার্ট, আপনি হতেন দু'নম্বর কারবারি। পাঁজিটা একবার আনান না মশাই।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ সব পাকা করে শিশিরবাবু উঠে যেতে না যেতেই জহরবাবু এলেন। ছফুট লম্বা। চোখে গোলড ফ্রেমের চশমা। পরনে ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবি। ধনী মানুষকে প্রসন্নবাবু ভয় পেতেন। তাঁরা সাধারণত অহঙ্কারী হন। বড় বড় কথা বলেন। পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। জহরবাবুকে দেখে তা মনে হল না। বিনীত, নিরহঙ্কার। চেয়ার টেনে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন ?'

'বয়েসের তুলনায় ভালই।'

'ভেরি গুড। রিটায়ার করার পর সাধারণত মানুষ বড় ভেঙে পড়ে। ছেলে কি বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপত্তি নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনাকে আমরা মাসে হাজার করে দোবো। তার বেশি আপাতত সম্ভব হবে না।'

'হাজার।' প্রসন্নবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কেন কম হয়ে গেল?'

'আজ্ঞে না, আমি ভাবতেই পারছি না।'

'দিন কতক পরে, ধরুন পুজোর সময়, আরও একটু বাড়াতে পারব। কাল থেকে তা হলে লেগে পড়ুন।'

'বেশ।'

'গাড়ি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। গাড়িই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এই বয়েসে আর বাসট্রাম ঠ্যাঙাতে হবে না।'

'আজ্ঞে।' প্রসন্নবাবুর সব কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে এতকালের পরিচয় তার চেহারা তো এরকম নয়। জহরবাবু কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। কথা পাকা করে উঠে চলে গেলেন। প্রসন্নবাবুর মনে হতে লাগল, সংসারের ওপর দিয়ে ফুর-ফুর করে বসন্তের দখিনা বাতাস বইছে। সাবেক কালের আলমারির মাথায় বসে কোকিল ডাকছে মিহি সুরে। এ সুখ এতকাল ছিল কোথায়।

রাতের আহারে বসেছেন। রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। সামনে বসে স্ত্রী সুষমা। এক সময় সুন্দরীই ছিলেন। এখন সংসারের আঁচে পিতলের প্রতিমার মত ঝলসে গেছেন।

মুখে রুটি ঠুসে প্রসন্ন বললেন—

'সবই তাহলে হল?'

'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

'বড় দেরিতে, বুঝলে, বড় দেরিতে।'

'তা হোক, কথায় বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'এখন হাজার দেবে বুঝলে। পুজো নাগাদ আর একটু বাড়বে। এবার থেকে কুমড়োর ঘ্যাঁটে তুমি একটু ছোলা দিও, আর নামাবার সময় এক চামচে ঘি দিয়ে সাঁতলে নিও। বেশ টেস্ট হবে।'

'তুমি কুমড়োয় ছোলার কথা ভাবছ, আমি ভাবছি খান ছয়েক করে ফুলকো লুচির কথা। হাজারে আমাদের দু'জনের বেশ ভালই চলে যাবে। রোজ একটু করে দুধ, এক টুকরো মাছ এ বয়েসে দরকার বুঝলে?'

'আমি আবার একটু অন্য রকম ভাবছি। আর একটু দূর ভবিষ্যতের কথা। পঞ্চাননতলায় সিধুরা সেই বিশাল পুকুরটা বুজিয়ে প্লট প্লট করে বেচছে। পি এফ আর গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা থেকেই যাবে। মেয়েটাকে তো ওঁরা এমনিই নিয়ে চললেন। ওই টাকাটায় ছোটখাটো একটা একতলা বাড়ির কথা ভাবলে কেমন হয়। আমাদের

অবর্তমানে তোমাকে দেখকে কে?'

'আঃ, তুমি ওসব অলুক্ষণে কথা বোলো না বাপু। কে আগে যাবে, তোমার জানা আছে?'

'বয়েসে তোমার চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড় আমি। গণিতের হিসেবে, চাকরির নিয়মে আমারই ডাক আসবে আগে। আফিসে ছাঁটাইয়ের সময় বলত, লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড আর রিটায়ারের সময় বলত ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড। যাক ওসব বাজে কথা। এতকাল আমরা যে খাওয়ায় অভ্যস্ত সেটাকে আর পালটে দরকার নেই। শরীর ওই সুরেই বাঁধা হয়ে গেছে। বরং দেরিতে হলেও ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক। ধরো আমি যদি নব্বই বছর বাঁচি। হ্যাঁগা, একটু গুড় আছে নাকি? শেষ রুটিটা তা হলে।'

'গুড় নেই গো, একটু চিনি নেবে? বোসো রস করে দিচ্ছি।'

'না না, চিনির অনেক দাম।'

'এখনও তুমি দামের কথা ভাবছ। সামনের মাস থেকে তো...'

'এখনও সবই হাওয়ায় ভাসছে সুষমা, পৃথিবীকে আমি তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। বড় বেশি নাটক এখানে। কাপে আর ঠোঁটের চুমুকে অনেক ফসকাফসকির ব্যাপার থাকে। দাও, আর এক গেলাস জল দাও। এখন কি আর আমাদের ভোগের বয়স আছে! ত্যাগের বয়েস।'

হাতমুখ ধুয়ে প্রসন্নবাবু চৌকিতে বসে স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তা হলে কোমর বেঁধে লেগে পড়। শ্রাবণ আর মাত্র দু'মাস। মৌ কোথায়? শুয়ে পড়েছে?'

'শোবে কি গো? ও তোমার পাঞ্জাবির গলায় তালি মারছে, কাল তো তোমার বেরনো! এ আর তোমার সেই সরকারি অফিস নয় যে ছেঁড়া ট্যানা পরে যাবে। যাবে গাড়িতে, আসবে গাড়িতে, তুমি বাপু সবার আগে দু-একটা ভালো ধুতি-পাঞ্জাবি করাও।'

'হ্যাঁ সে তো করাতেই হবে। অনেক দিনের শখ, তোমাকে দু'একটা ভালো শাড়ি পরাই, মেয়েটাকে একটু সাজাই। মেয়ের ভাবনা অবশ্য আমাকে আর ভাবতে হচ্ছে না। জামাই বাবাজী ভাববে। আচ্ছা, আমি তাহলে শুয়ে পড়ি কি বল। আজ একটু বিশ্রাম নিই। অনেক দিন পরে, কাল থেকে আবার বেরনো। হ্যাঁগা, রোজ দাড়ি কামাতে হবে নাকি?'

'তা হবে না! মার্চেন্ট অফিসে চকচকে মুখ চাই।'

'তা হলে, তুমি বাপু আমাকে সকাল সকাল ডেকে দিও। কেমন? সব অভ্যাস প্রায় ভুলে এসেছি।'

ছোট খাটটিতে প্রসন্নবাবু মশারির একটি পাশ তুলে ঢুকে পড়লেন।

মহুয়া বড় হবার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর শয্যা আলাদা হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এই একক ব্যবস্থায় বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। এখন সয়ে গেছে। কত কি ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুম এসে যায়। আজ মনে মনে ভাবলেন, বিছানা, বালিশ, মশারি সব কিছুর চেহারা এবার পালটে ফেলবেন। শয্যা মানুষের একটা বিলাস। অনেক বাড়িতে দেখেছেন, বিছানায় কি কায়দা। ছোবড়ার গদি, ফুলো তোশক, বাহারি চাদর, সুন্দর বালিশ। দেখলেই মনে হয় আঃ, বলে শুয়ে পড়ি।

বহুকালের তোশক। জায়গায় জায়গায় তুলো সব গুটিয়ে পাকিয়ে ড্যালা ড্যালা হয়ে গেছে। দাম্পত্য জীবনের কত দুঃখের, কত সুখের স্মৃতি জমে আছে এই রঙ্গভূমির মত শয্যাভূমিতে। এখানে যৌবনের দিন ঝরে গিয়ে পড়ে আছে পত্রহীন শুষ্ক কঙ্কাল।

বালিশে মাথা রেখে আজ বেশ একটা সুখানুভূতি আসছে। ঘর অন্ধকার হলে আশেপাশের আলো, শব্দ এসে ঢুকছে। বেশ লাগছে! এমন ভাল বহুদিন লাগেনি। প্রসন্ন? নিজেকেই নিজে ডাকালেন। এতদিনে তা হলে একটু সুখের মুখ দেখবে! শুকনো ডালে আবার দু একটি সবুজ পাতা আসবে! শরীরে আসবে চেকনাই। যা যা ভোগ করা হয়নি, একে একে ভোগ করবো। মহুয়া শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে, সুষমা আবার পাশে এসে শুতে পারবে!

'তোমার জল চাপা রইল।'

সুষমা জলের গেলাস রেখে চলে গেল। বাইরে মা আর মেয়ে কথা বলছে। কানে ভেসে ভেসে আসছে। বেশ একটা পূর্ণতার অনুভূতি আসছে। আঃ, চোখের সামনে কত কি দৃশ্য ভেসে আসছে। বেনারসী পরে মহুয়া চলেছে শ্বশুরবাড়ি। হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে বসে আছি, আমি আর সুষমা। পঞ্চাননতলার জমিতে বাড়ির ভিত উঠেছে। নাঃ, তোশকটাকে ধুনিয়ে, নরম, সমতল একটা বিছানা তৈরি করাতেই হবে। তুলো ধোনা দেখতে বেশ মজা লাগে। টংটং করে টঙ্কারের শব্দ। তুলো উড়ছে ফুর্‌ফুর্‌ করে। জীবনের দুঃখ আর সুখ টঙ্কারের শব্দে উড়ছে, আবার এসে জমা হচ্ছে একই জায়গায়। পাঁজা পাঁজা তুলো।

বুকের বাঁ দিকে টং করে একটা শব্দ হল। মাথায় যেন বেজে উঠল স্কুল-ছুটির ঘন্টা। সব যেন হই হই করে বেরিয়ে আসছে, ছুটি ছুটি। কানের কাছে জাহাজের ভোঁ বাজছে। পাটাতনে নোঙর তোলার শব্দ। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকার চেষ্টা করলেন, সুষমা, তুমি কোথায়? এ যে ভীষণ অন্ধকার! তুমি আমার হাতটা ধর। মহুয়া। ধুনুরির টঙ্কার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। তুলো উড়ছে রাশি রাশি। আর কিছু মনে রইল না।

না থাকারই কথা। প্রসন্নবাবুর ছুটি হয়ে গেল। সুষমা তখনই কিছু জানতে পারল না। কাল যে মানুষটা বেরোবে, তার জন্যে পরিষ্কার ধুতি চাই, পাঞ্জাবি চাই, রুমাল চাই, একটা গেঞ্জি চাই, জুতোর চেহারাটা একটু ভাল না হলে চলে! নটার মধ্যে খেতে বসাতে হবে। সময়ে রান্নার অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। মা আর মেয়েতে যখন টুকি-টাকিতে ব্যস্ত, প্রসন্নবাবু তখন নিঃশব্দে চলে গেলেন। হৃদয়হীন হৃদয়ের কারসাজি।

সকালে মানুষটিকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এলো ঠিকই, তবে এ গাড়ি সে গাড়ি নয়। এ হল ছুটির পর ঘরে ফিরে যাবার গাড়ি। ফুলে ঢাকা প্রসন্ন সিদ্ধান্ত, যেদিকে যাবার কথা সেদিকে না গিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেলেন।

পাখিরা চিরকালই কথা বলে। সেকালের মানুষ সে ভাষা বুঝত। একালের মানুষ বোঝে না। বুঝলে, শুনতে পেত, প্রসন্নবাবুর বাড়ির কারনিশে বসে দুটি পাখি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে :

'লোকটি সুখ নিয়ে চলে গেল, দুঃখ নিয়ে আবার যেন ফিরে না আসে।'

অংশীদার

গণেশ আমার ব্যবসার পার্টনার, জ্যাঠামশাই তখন ঠিকই বলেছিলেন, দেখ জগন্নাথ, বেকার থাকা তবু মন্দের ভাল, কিন্তু পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে যেও না, মরবে, বাঙালীর পার্টনারশিপ টেঁকে না। বাঙালীর স্বভাব অতি সাংঘাতিক, দুজন বাঙালী যদি নৌকা চেপে সমুদ্র পাড়ি দিতে যায়, তো একজন যখন ঘুমোবে আর একজন তখন নৌকোর তলা ফুটো করবে। ভরাডুবি হবে জেনেও এই কাজ করবে।

জ্যাঠামশায়ের কথা শুনিনি। না শুনে আমার আজ এই হাল। হেলেন অ্যান্ড এসবি কোম্পানির ফুটপাতে চোপসানো বেলুনের মত দাঁড়িয়ে আছি, হাতে সাত হাজার টাকার বিল, নাচতে নাচতে এলুম, টাকাটা আদায় হলে লিলিকে বলেছিলুম কাশ্মীরে গিয়ে স্ফূর্তি করব। অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন, 'কতবার টাকা নেবেন মশাই? তিনদিন আগে আপনার পার্টনার এসে টাকা নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে মানে? এই তো বিল আমার কাছে, টাকা আমার পার্টনারের কাছে? অলৌকিক ব্যাপার!'

'অলৌকিক-ফলৌকিক বুঝি না মশাই, এই দেখুন ফাইল, এই দেখুন আপনাদের কোম্পানির স্ট্যাম্প মারা রিসিটেড বিল, আমাদের চালান।'

চোখ ছানাবড়া, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খাচ্ছি। ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, লোকের স্রোত বইছে, হাই-হিল জুতো পরে মাথায় ফুলের ছাতা মেলে হেলেদুলে এক মেমসাহেব চলেছে, কোন কিছুই মনে ধরছে না। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে বলত—জগন্নাথটা উল্লুকের মত দাঁড়িয়ে আছে।

'হারামজাদা!'

পাশ দিয়ে চাপ চাপ দাড়িওলা একটা গুন্ডামত লোক যাচ্ছিল, ততটা খেয়াল করিনি। লোকটি ঝপাত করে থেমে পড়ল, 'আমাকে বললেন?'

'আজ্ঞে না, আপনাকে এসব বলব কেন?' মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেছি।

'তবে কাকে বললেন?'

'আজ্ঞে, আমার পার্টনার গণেশকে।'

'কেন? উল্টে গেছে?'

'আজ্ঞে না, নিজে সোজা আছে, আমাকে উল্টে দিয়েছে।'

'সিগারেট আছে?' লোকটি একটা সিগারেট চাইল, সিগারেট আর নস্যি একা ভোগ করার উপায় নেই। ভাগীদার জুটবেই। সিগারেট ধরিয়ে লোকটি বললে, 'শালা!'

'কে, আমি?'

'না, না, আপনি কেন শালা হতে যাবেন? আমার রিয়েল শালা, বউয়ের ভাই পঞ্চানন।'

'শালা তো শালা হবেই।' স্বস্তির গলায় বললুম।

'আরে না মশাই না, এ শালা হল সেই শালা।' ভীষণ রেগে গেছে লোকটি। এক

টানে সিগারেটের আধখানাই পড়পড় করে পুড়ে গেল।

'মানে, সেই ইতর শালা ?'

'ইতর ! চামার শালা।'

'কি করেছেন পঞ্চাননবাবু ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'আর বাবু বলে সম্মান করতে হবে না বলুন, পঞ্চাশালা।'

'আপনার শ্যালক হলেও, আমার তো নয়, কি করে বলি বলুন ?'

'আরে মশাই, ও হল সব শালার শালা।'

'কি করেছেন তিনি ?'

'তিনি আমার স্ত্রীর নেকলেস নিয়ে হাওয়া মেরেছেন।'

'ছিনতাই ?'

'না, না, ছিনতাই নয়, চোরের ওপর বাটপাড়ি, নেকলেসটা হাত সাফাই করে ওর হাতে দিয়েছিলুম ঝেড়ে দেবার জন্যে, পৃথিবীটা শালা পাল্টে গেছে। কারোর মধ্যে এতটুকু সততা নেই, অনেস্টি নেই। বিশ্বাসের দাম দিতে জানে না। বিশ্বাসঘাতকের দল।'

স্ত্রীর গয়না হাতসাফাই করাটা খুব ভাল কাজ নয় ইয়েবাবু।

'ইয়েবাবু নয়, পলটুবাবু।'

'হ্যাঁ পলটুবাবু। ওটা খুব নোংরা কাজ, নীচ কাজ।'

'আপনাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। কি বাবু ?'

'জগন্নাথবাবু।'

'হ্যাঁ, জগন্নাথবাবু। ওসব জ্ঞানের কথা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগেই মানায়। স্ত্রীলোক গয়না পায় স্বামীর দৌলতে। আমি আমার বউকে বিয়ে করেছিলুম বলেই আমার শ্বশুরমশাই ধারদেনা করে দশভরি গয়না দিয়েছিলেন। বিয়ে না করলে মেয়েকে গয়না দিতেন। গবেট।'

'কে গবেট ?'

'আপনি আবার কে। যাক, আলাপ যখন হয়েই গেল, তখন চলুন কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।'

আগেই বলে রাখছি, তিনটের পর আমি শুধু চা খেতে পারব না। মোগলাই-টোগলাই চাই। পকেটে সে রকম মালকড়ি আছে তো।'

বেশ, মজার লোক, নিজের দুঃখে এতক্ষণ খুব কাবু কাবু লাগছিল। এই লোকটিকে পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। দুঃখ ভাগ করে নিতে পারলে, সেই প্রবাদের মত, একের বোঝা দশের লাঠি।

কাঠের কেবিন। ঘ্যানঘ্যান করে একটা কেবিন-ফ্যান ঘুরছে। চারটে পায়া থাকলেই যদি টেবিল হয়, তা হলে সেই রকম একটা টেবিলের দু-পাশে দুটো চেয়ার। চটচটে একটা মরিচ আর একটা নুনদানি। আবার একটা পর্দাও ঝুলছে। মেয়েছেলে ফেয়েছেলে নিয়ে কেউ এলে, ওই ময়লা পর্দাটা ঝড়াং করে টেনে দিলেই আড়াল তৈরি হবে। পাশের কেবিনটায় পর্দাটানা রয়েছে। মাঝে মাঝে চুড়ির কিনিকিনি শোনা যাচ্ছে।

বয় এসে দাঁড়াতেই আমাকে আর অর্ডার দিতে হল না। পলটুবাবুই হুকুম জারি

করলেন, দুটো মোগলাই, একটায় ডবল ডিম আর মাংসের কিমা, বেশি পেঁয়াজ আর আদা কুচি। বয় চলে গেল। পলটুবাবু বললেন, 'আপনারটা লাইটই থাক। বলা যায় না, পেটে সহ্য হবে কি? হবে না।

পলটুবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন। অল্প একটু জল খেয়ে বললেন, 'চোখের সামনে দিয়ে সিলভার অ্যারো বেরিয়ে গেল, কিছু করতে পারলুম না। ইস ইস শালা আমাকে হেল্পলেস করে দিলে।'

'সিলভার অ্যারো? সেটা আবার কি?'

'আরে ঘোড়া মশাই, ঘোড়া। ব্যাঙ্গালোর রেসে শনিবার দৌড়চ্ছে। ভেবেছিলুম, ট্রিপলটোটে খেলে একটা নেকলেস দুটো করে আনব। শালা পথ মেরে দিল। সেই বউই ভাল, যে বউতে শা:া নেই।'

'আপনি রেস খেলেন? রেসে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।'

'তা হয়। আমিও হয়েছি। তবে জেদ চেপে গেছে। ঘোড়ার লাগাম আমি ধরবই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কি অমন জন্তু মশাই! মেয়েছেলে নাকি? সারা জীবন ছলনা করে যাবে। মানুষ বলবে, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা। ওই তো চারটে পা, একটা ল্যাজ, পিঠে একটা জকি। কতকাল ছলনা করবে? আমি শেষ রাতে স্বপ্ন পেয়েছি—সিলভার অ্যারো, সিলভার অ্যারো।'

মোগলাই এসে গেল। পলটুবাবু ছুরি কাঁটা নিয়ে ডিসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা বড় মাপের টুকরো মুখে পুরে বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, বিপদে আপদে। আপনার কেসটা কি?'

'আমার কেস, ওই বাঙালীর পার্টনারশিপ, একটা ব্যবসা করেছিলুম। গণেশ আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। বেটা খুব বেগোড়বাঁই করছে। টাকা-ফাকা সরাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই চোখ রাঙায়। ভয় দেখায়। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি।'

'মালটাকে হাটান না, হাপিস করে দিন।'

'হাপিস মানে?'

'গুম করে দিন। লোকটা ছিল, লোকটা আর নেই।'

'মার্ডার?'

'মার্ডার-ফার্ডার জানি না, মাল লোপাট।'

'কিভাবে?'

'ও অনেক রাস্তা আছে, আমার গুরু জানে।'

'রেসের গুরু?'

পলটুবাবু ছুরি দিয়ে প্লেটের গায়ে ট্যাং ট্যাং করে শব্দ করলেন, বয় এসে দাঁড়াল। 'পেঁয়াজ আনো।'

বয় চলে যেতেই পলটুবাবু বললেন, 'গুরু আমার নাম্বার ওয়ান, আইন জানে, ক্যারাটে, কুংফু জানে, ভাল ডাক্তারের মত ছুরি চালাতে জানে। কি রকম চোট দিয়েছে?'

'এই মাত্র সাত হাজার।'

'সাত হাজার? কোন মানে হয়! সাতবার একুশটা ঘোড়া ছোটানো যেত! মালটাকে

জোটালেন কোত্থেকে ?'

'জুটে গেল ! এখন আর নামাতে চাইছে না। ব্যবসা থেকে আমাকেই আউট করে দেবে দেখছি। কোর্ট-কাছারি কে করবে ? আইন দিয়ে হটাতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা, কারবার লাটে উঠে যাবে।'

পলটুবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কোর্ট-কাছারি ছাড়াও অন্য রাস্তা আছে। ধোলাই।'

'কে ধোলাই দেবে ? আমার ক্ষমতা নেই।'

'কাপড় ধোলাই করার যেমন লোক আছে, মানুষ ধোলাই করারও তেমনি লোক আছে।'

'তাতে তো আর টাকা ফিরবে না, জোচ্চুরিও বন্ধ হবে না।'

'তাহলে মালকে পগারপার করে দিতে হবে।'

'মার্ডার ?'

'মার্ডার আবার কি ? আজকাল মার্ডার বলে কিছু নেই। যাকে পার ধর আর মার।'

'না মশাই, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। সাত হাজার গেছে, আরও হয়তো যাবে। যায় যাক।'

'যায় যাক বলে কোনও শব্দ আমার ডিকশেনারিতে নেই। ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। গণেশের পেট আমি ফাঁসাবই, ছুরি দিয়ে নয়, দৈব দিয়ে।'

'মাদুলি ফাদুলি ?'

'বাণ মেরে, বাণ মেরে শুকিয়ে দেব, দিন দিন মড়া কাঠের মত চেহারা হয়ে যাবে।'

'ধ্যুস, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই ?' পলটুবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'হিন্দুর ছেলে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস নেই। কি আমার সাহেব রে !'

'নেই তা কি করব ?'

'এখুনি বিশ্বাস হবে। এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, আপনি তো তুচ্ছ, আপনার বাবারও বিশ্বাস হবে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমরা রাস্তায়। অফিস ভাঙা ভীড় বাসে ট্রামে। পলটুবাবু বললেন, 'একটা সিগারেট ছাড়ুন। খুব খাইয়েছেন মশাই। পৃথিবীতে সাধুও যেমন আছে, শয়তানও তেমনি আছে ! মিলেমিশে এই জগৎ ! আপনার মনটা বেশ ভালই।'

সিগারেট ধরিয়ে ভুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।

'নিন চলুন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দু'শালাকেই যমের বাড়ি পাঠাব। পণ্টা আর গণশা। নেকলেস, আর সাত হাজার। হজম করতে দেব না।'

'কোথায় যাবেন ?'

'সিরিটি।'

'সেটা আবার কোথায় ?'

'কাছেই। বাসে ঘন্টা দেড়েক লাগবে।'

'সিরিটি যাব কেন?'

'সেখানে আমার গুরুর আশ্রম। মহাশ্মশানের পাশে। তান্ত্রিক মন্ত্র পড়ে একটা জবাফুল মাটিতে ফেলে দেবেন, আকাশ থেকে হুড়মুড় করে প্লেন ভেঙে পড়বে, ব্রীজ থেকে ট্রেন ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, শোবার ঘরে খাটের তলায় দপ করে আগুন লাফিয়ে উঠবে, সিলিং থেকে ফ্যান খসে পড়বে মাথার ওপর। আলমারির তলা থেকে সাপ বেরোবে ফোঁস করে। যখন যেখানে যা দরকার, ঠিক তাই ঘটে যাবে। চলুন, চলুন, আর দেরি না।'

গণেশের ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিল। ধরে এনে ব্যবসায় ভেড়ালুম। তিন বছর না যেতেই বিয়ে করে বসল। বাঙালীর ছেলে বিয়ে করে সাহেবদের মত হনিমুনে 'গল কুলু, মানালি, কত কি। তখন কি জানতুম ছাই. আমারই ট্যাঙ্ক ফুটো করে বাবুর থপথপানি। আদুরে বউকে নিয়ে দেড় মাস আদিখ্যেতা। দেখাই যাক না, কি হয়। গণেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তা না হলে সারা জীবন জোচ্চুরি করে যাবে। আজ আমার সঙ্গে, কাল রামের সঙ্গে, পরশু হরির সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতেই বাস এসে পড়ল। পলটু 'উঠুন' বলে ঠেলে ঠুলে উঠিয়ে দিলেন।

সিরিটি জায়গাটা আদি গঙ্গার ধারে। কলকাতার এত কাছে এমন একটা অদ্ভুত জায়গা আছে, আমার জানাই ছিল না। পলটুবাবুর গুরুদেবের আশ্রম একেবারে নদীর ধারে। ঢালু জমি আশ্রমের পেছন দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে মজা নদীর দিকে।

সেখানেই শ্মশান। আধপোড়া মৃতদেহ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। গোটাকতক শেয়াল সেই বীভৎস জায়গায় খ্যা খ্যা করছে। কালো কালো কুকুর ঘুরছে। জ্বলজ্বলে চোখ। চারপাশে পচা গন্ধ। বিশাল একটা বটগাছ। তলাটা অন্ধকার। বাঁধানো বেদি। মাঝে মাঝে কালপেঁচা ডেকে উঠছে। একটা দুটো করে বাদুড় ডাল থেকে খসে পড়ে সুইস সুইস শব্দে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত।

একটা একতলা কোঠাবাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে আশ্রম বলে মনে হবার কথা নয়। সামনেই উঁচু রোয়াক, পথ পাশ দিয়ে ঘুরে গা-ছমছম করা বটতলার অন্ধকার পেরিয়ে পেছনে আদি গঙ্গার ঢালে গিয়ে পড়েছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন মা ছিন্নমস্তা। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এক হাতে নিজের মুণ্ডু, কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত উঠে মুখে ঢুকছে। নিজের রক্ত মা নিজেই পান পরছেন।

পলটুবাবুর সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হল। ভেতরে উঠোন। উঠোন ঘিরে উঁচু দালান। টকটকে লাল রঙের মেঝে। সারি সারি বড় ছোট ঘর। একটি মেয়ে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছিল। শ্যামবর্ণা, কিন্তু ভারি মিষ্টি চেহারা। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'উনি এখন বিশ্রাম করছেন একটু। আজ অমাবস্যা, সারারাত পুজো আছে তো?'

পলটুবাবু বললেন, 'তা থাক, আমাদের খুব জরুরী দরকার। বেশি দেরি করলে, গুরুজীর পাওয়ারের বাইরে চলে যাবে। গুরুজী গুরুজী আমরা এসে গেছি।'

পলটুবাবুর দাপট কম নয়, গটগট করে দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমাকে

ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'চলে আসুন না, ভয় পাচ্ছেন কেন ?'

প্রথম যে ঘরটা, সেটা বোধহয় ঠাকুরঘর। বেশ বড়। ধূপধুনো ফুল বেলপাতা সব মিলেমিশে কেমন একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে। একপাশে উঁচু বেদিতে তারা-মূর্তি। বিশাল একটা প্রদীপ জ্বলছে থিরথির করে, সামনে আসন পাতা। চারপাশে ছড়ানো পুজোর জিনিস।

ঘর পেরিয়ে ঘর।

'গুরুজী ! গুরুজী !'

ভেতর থেকে ভেসে এল গম্ভীর গলা, 'অসময়ে কেন ?'

'বিপদে পড়ে গেছি গুরুজী।'

লাল টকটকে চেলি পরে গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ একটি খাটে শুয়ে আছেন। খোলা গা। লাল পৈতে। মুখটি বেশ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল। 'তোর তো পদে পদেই বিপদ। সঙ্গে আবার কাকে নিয়ে এলি ?'

'আমার এক বন্ধু। দুজনেই বিপদে পড়েছি।'

'কি বিপদ ?'

মেঝেতে দুজনে বসে পড়লুম। পলটুবাবু সব বললেন। নেকলেস হাতিয়ে শ্যালক বেপাত্তা। সাত হাজার মেরে আমার পার্টনার হাওয়া।

গুরুজী সব শুনে বললেন, 'আমার কি করার আছে ?' আমি আমার সাধনভজন নিয়ে একপাশে পড়ে আছি। তোদের এসব ছেঁচড়া ব্যাপারে আমি কি করব ?'

'গুরুজী, সেবার আপনি জগাইকে সাত মাস হাসপাতালে ফেলে রেখেছিলেন।'

'কোন জগাই ?'

'ওই যে আমার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। আমাকে একদিন ধরে খুব ধোলাই দিয়েছিল।'

'বারবার ওসব কাজ হয় না রে পলটু। তাছাড়া এই কিছুদিন আগে আমি একটা বড় কাজ করেছি। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই।'

'কি বড় কাজ গুরুজী ?'

'একটা বিমান দুর্ঘটনা আর একটা ট্রেন দুর্ঘটনা। আমার বহুত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন মাসতিনেক আমাকে ক্রিয়াকলাপ করতে হবে।'

'ও দুটো কাজ কেন করলেন গুরুজী ?'

'প্রয়োজন ছিল।'

পলটু ঘষটে ঘষটে গুরুজীর খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাদুটো জড়িয়ে ধরল, 'সামান্য কাজ গুরুজী। এ তো আপনার কাছে ছুঁচো মারা।'

'একটা নেকলেস আর সাত হাজার টাকার জন্যে জলজ্যান্ত দুটো লোককে মেরে ফেলবে ? শুয়োর।'

'পাপের শাস্তি গুরুজী। গীতাতেই তো আছে। বিনাশায় চ দুষ্কৃতকারিণাং।'

'তোরা কি এমন সুকৃতি করেছিস ?'

'আমি না হয় বদ গুরুজী, কিন্তু আমার বন্ধু ! পার্টনার মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে।'

'তাতে তোর কি রে শালা ?'

'পরের দুঃখে আমার মন যে কাঁদে।'

'আহা ! আমার শ্রীচৈতন্য রে !'

পলটুবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। পা ধরে ঝুলোঝুলি। আমি একবার ফিসফিস করে বললুম, 'ছেড়ে দিন না মশাই। যা হবার তা হবে। নিজেরা বোকা বনেছি, বোকাই থাকি। পরের অনিষ্ট করে কার কি লাভ হবে ?'

'কি যে বলেন। অন্যায় যে সহে, অন্যায় যে করে তব ঘৃণা তারে যেন.....'

'সে তো ঈশ্বরের ঘৃণা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঘৃণা, সেই শাস্তিই তো গুরুদেব নামিয়ে আনবেন।'

গুরুজী এতক্ষণ শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন। এইবার ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পা দুটো খাট থেকে নেমে এসে ঝুলতে লাগল ড্যাং ড্যাং করে। বেশ গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা। গুরুজী হঠাৎ ডাকতে শুরু করলেন, 'মায়া-মায়া।'

সেই মেয়েটি ঘরে এল। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে হয়ে যেত। বউকে খাওয়াবার মত পয়সাকড়ির অভাবে আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে আছি। এই তো সবে লিলি বলে একটা মেয়েকে নাড়াচাড়া করে দেখছি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে লিলি বাতিল।

গুরুজী বললেন, 'একটা বড় বাটি করে একবাটি জল আনত মা।' মায়া চলে গেল। আমার চোখও পেছন পেছন চলল। নাঃ, গুরুর চেলা বনে বাকি জীবনটা পদসেবা করেই কাটিয়ে দিই।

মায়া আবার এল। চেটাল একটি কাঁসিতে টলটলে জল। মেঝেতে গুরুজীর পায়ের কাছে সামনে ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখল। সেই সময় কিছু কিছু জিনিস দেখে আমি প্রায় মরে যাবার মত হলুম। শরীর নয় তো, মরণ-ফাঁদ।

গুরুজী সেই জলের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পলটু, তোমার নেকলেস তোমার বাড়িতেই আছে, তোমার বউয়ের কাছে। আর তোমার ? কি নাম তোমার ?'

'জগন্নাথ।'

'জগন্নাথ। বেশ। তোমার স্যাঙাতকেও আমি আমার জল দর্পণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখটা গোল। নাক থেবড়া। চোখ দুটো মার্বেলের মত। জোড়া ভুরু। ডান ঠোঁটের ওপর কাটা দাগ। কি মিলছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ঠিক মিলছে।'

'মিলতেই হবে। কি নাম বলেছিলে ?'

'গণেশ।'

গুরুজী স্তব্ধ হয়ে চোখ বড় বড় করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি আশ্চর্য। আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গুরুজীর চমক ভাঙল। 'ছ' থেকে সাত মাসের মধ্যে গণেশের ফাঁসি হবে।'

কথা ক'টা বলেই খুব ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, 'তারা, তারা। তোরা এখন যা।

যাবার আগে মাকে প্রণাম করে যা।'

ঠাকুরঘরে মায়া হাঁটু মুড়ে বসে পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। মনে মনে বললুম, আমার যদি একটা সংসার থাকত। এইরকম একটা শ্যামলী বউ! লিলি? যেমন নাম তেমন ছিরি। হান্টারওয়ালী ববচুল। ঠোঁটে লাল রঙ, মুখে মেকআপ, কটাসুন্দরী!

টেলিফোন বেজেই চলেছে। কেউ ধরে না কেন? বাড়িসুদ্ধ সব একসঙ্গে সুইসাইড করেছে নাকি? অবশেষে কেউ একজন ধরেছে।

মেয়েলি গলা।

'হ্যালো'।

'গণেশ আছে?'

'কে আপনি?'

'আমি যেই হই না, গণেশ আছে কি নেই!'

'নেই, কলকাতার বাইরে গেছে।'

'অত পাঁয়তাড়া না করে এই কথাটাই তো আগে বললে হত।'

ফোনটা দুম করে নামিয়ে রাখলুম। বেটা কলকাতাতেই আছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেস ঠোকার আগে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই। এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ভাল। নয়তো উকিলে খাবে হকের পয়সা। আমি নিজেই একবার যাব। আজই যাব, ওকে না পাই ওর বউকে বলে আসব।

ট্রাম থেকে নামতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি এল। ট্রাম রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিলুম। রাস্তাটা নেহাত কম চওড়া নয়। দুপাশে খাড়া খাড়া বাড়ি। দু'একটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান। এমন কিছু জোর বৃষ্টি নয়। পিটির পিটির। সময়টা দুপুর-দুপুর, তাই রাস্তা নির্জন। পেছনে একটা মোটর সাইকেল আসছে ঝড়ের বেগে। ওই শব্দটাকে ভীষণ ভয় পাই। ছেলেবেলার আতঙ্ক আর কি! একবার ধাক্কা খেয়েছিলুম। যতটা সম্ভব রাস্তার বাঁ ধারে সরে গেছি। ভীষণ শব্দ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর দুপাশ খাড়া খাড়া বাড়ি। শব্দটা সেই কারণেই আরও জোর মনে হচ্ছে।

সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কি ঘটছে বোঝার আগেই ছিটকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়লুম। মোটর সাইকেলটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সোজা হয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কোমরে ভীষণ লেগেছে। পড়বার সময় বাঁ দিকে লাট খেয়েছিলুম, বাঁ হাত মনে হয় ভেঙেই গেছে। হাঁটু দুটো অক্ষত নেই। কপালটাও কেটেছে নিশ্চয়। আচ্ছা জানোয়ার তো! কোনও রকমে উঠে বসতে পেরেছি। উঠে দাঁড়াতে পারব কি! সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় একটি মহিলার মুখ। কি লজ্জার কথা! মেয়েদের সামনে বেইজ্জত। উঠে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। বাড়িটার দেওয়াল ধরে কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালাম। পা কাঁপছে মাথা ঘুরছে। কোমর সোজা হচ্ছে না। উল্টো দিকেই একটা লাল রক। একটু বসতে পারলে ভাল হত। আবার যেন মোটর সাইকেলের আওয়াজ আসছে কানে। সর্বনাশ! আবার ফিরে আসছে নাকি? খুব দ্রুত আসছে। এবার মারলে আর বাঁচব না। বাঁচার একমাত্র রাস্তা কোনও রকমে রকে গিয়ে ওঠা। ঝড়ের বেগে যমদূত এগিয়ে আসছে। ওই তো রক, না আর হল না। শূন্যে উড়ে গেলুম যেন! শরীরের সমস্ত

হাড়গোড় খুলে গেল। মোটর সাইকেলের তীব্র শব্দ। কোথাও সশব্দে জানালা বন্ধ হল। মেয়েলি চিৎকার।

একটা শিশি ঝুলছে। স্বচ্ছ একটা নল হাতে এসে ঢুকছে। নাকে আর একটা নল। শরীরটা সীসের মত ভারী, কে যেন বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।'

খুটখুট জুতোর শব্দ। চোখে ঝাপসা দেখলেও দেখতে পাচ্ছি একটা মুখ, মাথায় সাদা টুপি, সাদা অ্যাপ্রন, নীল পাড় শাড়ি। তিনটি মাত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারলুম। মার্ডার, পুলিশ, গণেশ। তারপর আমি কিরকম এক আলোর স্রোতে ভেসে গেলুম। যেতে যেতে দেখলাম, একটা ফাঁসিকাঠ, গোল দড়ির ফাঁস, গণেশ। একপাশে গুরুজী লাল চেলি পরে, আর একপাশে আমি। আমার হাতে পুলিশের ব্যাটামের মত করে পাকানো, শী.ন স্যান্ড সরকার কোম্পানির পার্টনারশিপ ডিড।

এইসব কথা আমি কি করে লিখলুম জানি না আমি যদি লিখে থাকি, তাহলে আমি মরিনি। কারণ মরা মানুষ আর যাই পারুক, লিখতে পারে না। আর আমি না মরলে, গণেশের ফাঁসি হয় না। ফাঁসি না হলে, দৈব মিথ্যা হয়ে যায়। তাহলে কি যে হয়েছে, কে জানে!

কারণ

বাজারে ঢুকেই দেখি সদানন্দবাবু। হাতে একটা চটের ব্যাগ, যার একটা হাতল নেই, একদিকে হেলে আছে। চোখে একটা রঙচটা চশমা। এই সাত সকালেই সারা মুখে একটা খুঁতখুঁতে ভাব লেপ্টে আছে। ভোরের বাজার। সবে বেপারীরা মালপত্র সাজিয়ে বসা শুরু করেছে। তেমন ভিড় নেই। সদানন্দবাবুকে দেখলেই আমার একটি মাত্র প্রশ্ন কি কিছু হল? এই একটা প্রশ্ন অনেক কিছু কভার করে।

কিছু হল! মানে অনেক কিছু। যেমন সদানন্দবাবুর দুই ছেলে পাশ-টাশ করে অনেকদিন বসে আছে। তাদের চাকরির কিছু ব্যবস্থা হল কিনা? বড় জামাইয়ের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট চলছে, তার কি হল? মেজ মেয়েকে সেদিন পাত্রপক্ষ দেখে গেছে, পছন্দ হল কিনা! ছোট খোকা ফুটবল খেলতে গিয়ে অণ্ডকোষ ফুলিয়ে এসেছে, হোমিওপ্যাথি হচ্ছিল, তার কি হল? সদানন্দবাবুর এক্সটেনসান হল কিনা! স্ত্রী জনডিসে ভুগছিলেন, মালা পরেছিলেন, সেই মালা পরার পর জনডিস কমেছে কিনা? সদানন্দবাবু নিজে ভীষণ কন্সটিপেশান আর অর্শে কষ্ট পাচ্ছিলেন, ইসবগুলের ভুষি খেয়ে কিছু ফল পেলেন কিনা? বাড়ির নিচে একঘর ভাড়াটে, বছরখানেক ভাড়া বন্ধ রেখেছে, সেই ঝামেলার কিছু হল কিনা? আমার এক প্রশ্নের ঢিলে অনেক পাখি মারার চেষ্টা।

সদানন্দবাবু একটু মুচকি হাসলেন। সেই হাসিতেই সব প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ কিছুই হয়নি। যা ছিল সব একই রকম আছে। মুচকি হেসে সদানন্দবাবু পকেট থেকে একটা ছোট নস্যির ডিবে বের করে তালে তালে বার কতক টুসকি মারলেন,

তারপর ঢাকনা খুলে মাঝারী ধরনের এক টিপ নস্যি নিয়ে বেশ জোরে সশব্দে নাকে টানলেন। আমার দিকে ডিবেটা এগিয়ে দিতে গিয়ে কি ভেবে হাফ-হাতা সাদা লংক্লথের জামার পাশপকেটে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নস্যি বা সিগারেট আগের মত কাউকে অফার করতে পারছি না।' আমি বললুম, 'না-না, নস্যি আমি নিই না, সিগারেটও খাই না, বদ অভ্যাসের মধ্যে চা-টাই আছে।'

'ওঃ খুব বেঁচে গেছেন, অনেক পয়সা মশাই সেভিংস হয়। আমার দেখুন সারাদিনে এই ছোট এক ডিবে বরাদ্দ আর এক প্যাকেট সিগারেট।'

'আপনার এই থলের হাতলটা মেরামত করিয়ে নেন না কেন?'

'এটাও ব্যয় সঙ্কোচের একটা কৌশল।'

'কি রকম?'

'ইচ্ছে থাকলেও বেশি বাজার করতে পারব না। এক দিকটা হেলে যাবে। আমরা হলুম সেকালের মানুষ। খেয়েই ফতুর। টেরিলিন মেরিলিন বুঝি না। শ্যাম্পু সাবান, টনিক মনিক আমাদের কালে ছিল না। সেই অভ্যাসটা রয়ে গেছে। এই ব্যাগের মেরামতিটা গিন্নির মাথা থেকে বেরিয়েছে। একখানা মাথা মশাই।'

কথা বলতে বলতে বেপারীর ঝাঁকা থেকে সদানন্দবাবু একটা বেশ বড় পটল তুলে নিয়ে দম জিজ্ঞেস করলেন। দু টাকা কিলো। হাত থেকে পটল পড়ে গেল। সে কি মশাই। কালও যে দেড় টাকা ছিল! সদানন্দবাবু বিস্ময়মাখা মুখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, পটলের গায়ে একটা আঙুল আলতো করে ছুঁইয়ে রাখলেন।

আমি কি বলব? বেপারীকেই বারকতক প্রশ্ন করলুম। তার উত্তর দেবার সময় কোথায়। সে তখন নানারকম তরিতরকারি সাজাতে ব্যস্ত। আমরা হলুম বাজারের মধ্যে নিতান্তই হাঘরে খদ্দের। আমরা ভেগে গেলেই সে খুশি হয়। বার বার বিরক্ত করায় সে উত্তর দিতে বাধ্য হল, 'জানেন না ভোরবেলা বৃষ্টি হল।' উত্তর শুনে সদানন্দবাবুর মুখের শক্ত ভাব নরম হয়ে হাসিতে ছেয়ে গেল। 'তাই বল।' সদানন্দবাবু টপাটপ পাললায় পটল তুলে ফেললেন। এইবার আমার অবাক হবার পালা। সদানন্দবাবু বললেন, দাম তো বাড়বেই, বেড়েই চলবে, তার জন্যে কেনা তো আর বন্ধ করা যায় না; কিন্তু কারণটা জানতে না পারলে মনটা খুঁতখুঁত করে। আজকে তাড়াতাড়ি পটলের দাম কিলোতে পঞ্চাশ পয়সা বাড়ার কারণটা যেই জানতে পারলুম আমি খুশি হয়ে গেলুম। বিনা কারণে কিছু হয়ে যাবে সে আপনি-আমি কেউই সহ্য করব না।'

সদানন্দবাবু পটলের পাললায় আমাকে ফেলে মাছের বাজারের দিকে চলে গেলেন।

বাড়ি ফিরে দ্বিতীয় কাপ চা খেতে খেতে মনে হল সদানন্দবাবু ঠিকই বলেছেন, জীবনের সবচেয়ে বড় খোঁজা হল ঈশ্বর নয়, মোক্ষ নয়, অর্থ নয়, কারণ। কারণ শব্দটা বিবিধ-ভারতীর বিজ্ঞাপনের কায়দার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল—কারণ, কারণ, কারণ। কারণটাই হল সব জানার বড় জানা। পাখার দিকে তাকিয়ে দেখলুম স্থির। আজ তো বিদ্যুৎ বন্ধের দিন নয়। কি ব্যাপার, কারণটা কি? কে বলতে পারে কারণ? ওরে আজকের কাগজটা নিয়ে আয় তো। কাগজ এল। হ্যাঁ এই তো প্রথম পাতাতেই রয়েছে, ব্যান্ডেলে গোটাকতক বয়লার পটল তুলেছে। বয়লারের বিকল

হবার কারণ ? হ্যাঁ সে কারণও রয়েছে, খারাপ কয়লা। কোলিয়ারী খারাপ কয়লা দিচ্ছে কি কারণে ? কে বলতে পারে। দেখি রান্নাঘরে গিয়ে। 'তুমি কি আজকাল খারাপ কয়লা পাচ্ছ ?' 'আমি তো কয়লায় রাঁধি না। গ্যাসে রাঁধি।' 'তাই নাকি ? কয়লায় রাঁধনা কেন, কি কারণ ?' 'কারণ মোটা হয়ে গেছি, কয়লায় রাঁধতে গেলে বসে বসে রাঁধতে হবে, ভুঁড়িতে লাগে !' 'বেশ ! একটু চা খাওয়াবে ?' 'দুধ ছাড়া খেতে হবে।' 'কারণ ?' 'হরিণঘাটা আজ দুধ দেয়নি।' 'কারণ ?' 'আস্ক হরিণঘাটা বাবা।' ইংরেজি বলছে যে। আমার সাদামাটা স্ত্রী হঠাৎ ইংরেজি বলতে শুরু করছে কি কারণে ? কারণ আর জানা হল না। কি কারণে ? বেশি বকালে অফিসের ভাত পাব না।

অতঃপর চটি পায়ে গলিয়ে মিল্কবুথের দুগ্ধবালিকাদের কাছে গেলুম। 'আজ দুধ আসেনি কেন ভাই !' 'বাছুরে খেয়ে গেছে' 'হরিণঘাটায় বাছুর' এল কোথা থেকে, সেখানে তো সবই টিনের গরু। না ভাই ঠিক বলছ না।' 'কি করব বলুন, সকাল থেকে ওই একই প্রশ্ন, মাথার ঠিক নেই। আজকের কাগজেই কারণ আছে।' আবার বাড়ি এসে কাগজ পেতে বসলুম। হ্যাঁ এই তো রয়েছে ! করপোরেশান ঘোলা জল দিচ্ছে, গুঁড়ো দুধ গোলা যাচ্ছে না। করপোরেশান ঘোলা জল দিচ্ছে কেন ? ও সে তো কমিশান বসেছে বোধ হয়।

স্ট্যান্ডে এসে দেখি বাস নেই, লোক থই-থই করছে, সাড়ে আটটার খদ্দেরও দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কি ? দাঁড়িয়ে কেন ? বাস নেই। বাস নেই কি কারণে ? গুমটির স্টার্টার বেজার মুখে বললেন, কেন রোজই সেই এক প্রশ্ন ! আমাকে জিজ্ঞেস করেন কি কারণে ? স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করুন। চেয়ারম্যানকে এখন এখানে এই মুহূর্তে পাই কি করে। স্ট্যান্ডের কাছেই বন্ধুর ওষুধের দোকান। গোটাকতক চেয়ারে আমাদের জন্যে পাতাই থাকে। বাস যখন থাকে না চেয়ার তখন থাকে। চেয়ার বসা গেল। সুশীলবাবু দোকানের মালিক। ডাক্তারখানায় কিছুক্ষণ বসা মানেই গ্যারেজে গাড়ি রাখার মত ব্যাপার। ছোটখাটো মেরামতের কথা মনে পড়বেই। সকালে পায়খানার সময় মনে হল পেটটা যেন দুবার মোচড় দিল, গোটাকতক আমাশার বড়ি খেলে মন্দ হয় না। দাও সুশীল একপাতা অ্যান্টিএমিবিক কিছু। শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছে, তেমন আর এনার্জি পাই না, দাও সুশীল একপাতা মাল্টিভিটামিন। আরে শরীরের মধ্যে লিভারটাই তে মেন, সেটাকেও তো একটু তোয়াজ করা দরকার। দাও সুশীল গোটা তিরিশ ওই অ্যালোপাথিক কবরেজি বড়ি। বাসের পাত্তা নেই, এদিকে দশটাকার ওষুধ গস্ত হয়ে গেল। বন্ধু হলে হবে কি ! সুশীলের কম মাথা ! কেমন দুটি চেয়ার-ফাঁদ পেতে রোগ ধরছে।

একটা বাস এল। হে-রে-রে-রে-রে করে সকলে প্রাণের মায়া ছেড়ে দৌড়োলুম। ড্রাইভার, কনডাকটার সকলেই হাত পা নেড়ে বোঝাতে চাইছেন, এ বাস যাবে না। প্রচণ্ড আশাবাদী যাঁরা তাঁরা সিট আকড়ে বসে রইলেন। আমরা যারা ঝুলছিলুম নেমে এলুম। কনডাকটাররা গুমটির দিকে গটগট করে চলেছে—হ্যাঁ ভাই যাবেন না কেন ? হ্যাঁ ভাই ? উত্তর কি আর দেয় ! ছোট কথা কানে ঢোকে না, শেষে বিরক্ত হয়ে একজন বললেন, 'ড্রাইভারের আজ মন খারাপ।' আমরা কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, 'কেন

কেন ? মন খারাপের কারণ ?' কনডাকটার বললেন, 'ব্যাচেলার লোক, কাল নাইট শোতে হিন্দি ছবি দেখে রেখার জন্যে মন খারাপ হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, খালি এপাশ ওপাশ করেছে আর রেখা রেখা বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে। ভিড়ের মধ্যে মায়ের মত চেহারার এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, এগিয়ে এলেন। 'আহারে ! তা হ্যাঁ ভাই একটা বিয়ে দিয়ে দিলে হয় না। আমার সন্ধানে ভাল মেয়ে আছে।' এক ভদ্রলোক মহিলাকে ঠেলে এগিয়ে এলেন সামনে 'কই কোথায়, পাইলটদা কোথায় ?' উঃ কি খাতির, বাবাকে শালা বলে আর বাসে ড্রাইভারকে পাইলটদা। গুঁতোর চোটে রামনাম। একজন-হাত তুলে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকা ঝাঁকড়াচুল জুলপিওলা গাঁট্টাগোট্টা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ওই তো পাইলটদা।' যে ভদ্রলোক পাইলটদার খোঁজ করছিলেন তিনি একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি খুব মজার মজার কথা বলতে পারি। একটু হাসাবার চেষ্টা করব ?' ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন এগিয়ে এলেন 'আমি গান গাইতে পারি।' দেখতে দেখতে সেই পাইলটদার দশ গজ দূরে একদল গুণী মানুষের জমায়েত তৈরি হল। কেউ নাচতে পারেন, কেউ গাইতে পারেন, কেউ ম্যাজিক জানেন, একজন মাথা নিচু করে পা উপর দিকে তুলে পি-কক হয়ে হাঁটতে পারেন। আমি কিছু পারি কিনা একজন জিজ্ঞেস করলেন। 'অল্পস্বল্প অ্যাকটিং করতে পারি।' 'তাহলে দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? চলে আসুন চলে আসুন, পাইলটদার মেজাজ ঠিক করতে পারলেই বাস চলবে।'

পাইলটদা এদিকে নির্বিকারে বসে বসে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে যিনি গাইতে পারেন তিনি টিফিন কৌটো বাজিয়ে গান ধরলেন, 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানী।' যিনি নাচতে জানেন তিনি পাছা দুলিয়ে ধুম ধুম করে খানিক নেচে নিলেন। ব্রিফ কেস মাটিতে রেখে জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক ফুটপাতে পি-কক্ হয়ে পা দুটো খচাখচ নাড়তে লাগলেন। এইবার আমার পালা। গলা খাদে নামিয়ে শুরু করলুম, 'বাঙলার ভাগ্যাকাশে আজ....।' এত হট্টগোলের মধ্যেও কান আমাদের খাড়া ছিল। যতই হোক লম্বকর্ণের জাত তো ! আর একটা বাসের আওয়াজ দূরে শোনা গেল। আমরা পোজিশান নেবার জন্যে হুড়মুড় করে দৌড়োতে শুরু করলুম। জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক সোজা হতে ভুলে গিয়ে হাতেই ছুটছিলেন, আমি সোজা হবার কথা মনে করিয়ে দিলুম। বাস অবশেষে এল কুঁচকি কণ্ঠা বোঝাই হয়ে। মানুষের শরীর যেহেতু রবারের মত আমরা আরো শ দুয়েক ঠাসাঠাসি করে ধরে গেলুম। স্টার্টার পাইলটকে চেঁচিয়ে বললেন, 'মিউজিক, তারপর নিজে হাতের পেনসিলটাকে কনসার্ট কনডাকটারের কায়দায় দোলাতে লাগলেন, ড্রাইভার তখন তালে তালে বাসটাকে ব্রেক করে ছেড়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সমস্ত ফাঁক-ফোকর ময়দা গাদা করে বাসটাকে একপাশে ফেলে রেখে চা পিতে গেলেন। দেখতে দেখতে আমাদের ঘামে বাসের ভিতরে একটা জলাধার তৈরি হয়ে গেল। চোখের চশমার কাঁচ বাষ্পে ধোঁয়াটে হল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক আমার বুকের সঙ্গে লেপটে ছিলেন, ফিস ফিস করে বললেন, 'সরকার বাহাদুর আমাদের কত উপকার করেছেন বলুন তো। এই ধরনের সান বাথ নিতে গেলে, মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা খরচ, আর এ দেখুন চল্লিশ পয়সায় হয়ে গেল।'

বকুলতলায় বাস থেকে নেমে বাঁচলুম। বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়তে যত গড়িমসি। রাস্তায় একবার গড়াতে শুরু করলে আবার উল্টো ব্যাপার। তখন থামানো মুশকিল। বকুলতলায় বাসটা একটু থেমেই ভীষণ ঝাঁকি মেরে এগিয়ে গেল। একটা পা রাস্তায় আর একটা পা তখনো ফুটবোর্ডে। বায়ুসেবী সন্তানদের পায়ের জটলায় জড়াজড়ি হয়ে আছে। বেশ কিছুদূর বাসের সঙ্গে জড়ানো পা নিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে গেলুম। প্রথমে চোখ থেকে চশমাটা ছিটকে পড়ল তারপর এক এক করে খুচরো পয়সাগুলো পাশপকেট থেকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গড়িয়ে গেল, সবশেষে আমি পদচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়লুম করপোরেশানের একটা ময়লা তোলা ঠ্যালাগাড়ির চাকার ওপর। এসব ঘটনা শহর কলকাতায় এত স্বাভাবিক, কেউই গ্রাহ্য করে না, না পথচারী, না ভুক্তভোগী, না বাসযাত্রী। চটিটা খুলে বাসের পাদানিতে আটকে ছিল, কে দয়া করে লাথি মেরে পথে ফেলে দিল। সেটা চলন্ত বাস থেকে প্রায় বিশগজ দূরে গিয়ে পড়ল চিৎপাত হয়ে। বাঁ পায়ে চটি, ডান পা খালি। কাপড়ের কাছাটা খোলা। পাঞ্জাবি ঘামে জবজবে। বুকের কাছে আবার খানিকটা জায়গা সিন্দুরে লাল। মনে হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি করে নামার সময় কারুর সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়ে এসেছি। এই দাগটুকুই নিট লাভ। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে জুতোটা উদ্ধার করে নিয়ে এলুম। ইতিমধ্যে কাছাটাও সামলে নিয়েছি। খুচরো পয়সার কিছু কুড়িয়ে পেলুম, কিছু গড়িয়ে চলে গেছে। চশমাটা নাকের ডগায় চলে এসেছে।

অফিসে তখন টেবিলে দ্বিতীয় দফার চা পড়ে গেছে। বড়বাবু পেনসিল দিয়ে কানের গর্তে সুড়সুড়ি দিতে দিতে একচোখ আধ বোজা, আর একচোখ খোলা রেখে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার মশাই, আজ এত দেরি, কারণ কি? চেয়ারে নিজেকে আস্তে আস্তে বসিয়ে মুখে কয়েকটা হাসির রেখা ভাসিয়ে উত্তর দিলুম, 'একাধিক।' পেনসিলটাকে কান থেকে বের করে সামনের ফাইলে একটা পদ্মফুল আঁকতে আঁকতে বড়বাবু বললেন, 'শুনি।' আমি গেঞ্জির সুতোর মত কারণের সুতো ফড়ফড় করে খুলে গেলুম।

'ভোর সাড়ে চারটের সময় উঠে আমি এক গেলাস ত্রিফলার জল খাই, তারপর খাই এক গেলাস গরম চা, তারপর বার দশেক পেটটাকে খামচে বাথরুমে যাই। আজ হল কি, ভোরে বৃষ্টি, ঘুম ভাঙল না, যখন ভাঙল তখন সাড়ে ছটা। এই বেলায় ঘুম ভাঙলেই সর্বনাশ! বড়বাবুকে সাসপেন্সে রেখে, একটু জল খেলুম। তারপর আবার শুরু করলুম। 'যাই আর আসি কিছুতেই তিনি খালাস চান না। কাপের পর কাপ চা। খাবার ঘরে খালি কাপের লাইন পড়ে গেল। আমার স্ত্রীকে বলাই আছে, এ রকম পরিস্থিতিতে যেমন করেই হোক আমাকে একটু ভয় পাইয়ে দিতে হবে। দিলেই কাজ সারা। কারণ আমার একটু নার্ভাস ডায়েরিয়ার ধাত আছে। স্ত্রী ডালের হাতা ধরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমার মেয়ে আসছে কাল। ব্যাস সেই যে বাথরুমে ঢুকলুম, পেটে পিঠে এক হয়ে পিচবোর্ড হয়ে গেল।'

বড়বাবু পদ্মফুলের পাপড়িগুলোকে বেশ খেলাতে খেলাতে বললেন 'সেটা আবার কি? মেয়ে আসছে বলায় ভয় পাবার কারণ?'

কারণ মেয়ে নয়, আমার নাতি। যে সকালে কাঁদে, দুপুরে কাঁদে, রাতে কাঁদে,

মাঝরাতে কাঁদে। আর যখন কাঁদে না তখন সমস্ত কিছু ভাঙে। কাপ ভাঙে, ডিশ ভাঙে, কাঁচের গেলাস ভাঙে, চশমা ভাঙে, দেয়াল ভাঙে, দরজা জানলা আঁচড়ায়। শেষে হাতের কাছে কিছু না পেলে যাকে পায় তাকে খামচায়।'

'হুঁ, এ তো দেখছি ব্রাওনিয়ার কেস' বড়বাবু পেনসিল চিবোতে চিবোত বললেন। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। স্ত্রী আর শিশুরোগে বিশেষজ্ঞ। অফিসের তাবৎ মহিলা তাঁর পেশেন্ট।

বড়বাবু বললেন, 'হোমিওপ্যাথি কথা বলে, বুঝেছেন মশাই। ওই যে রেবা দত্ত—' কথাটা শেষ না করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে হল, কারণ একটু দূরেই রেবা দত্ত বসে বসে একটা ঢাউস উপন্যাস পড়ছিলেন, বই থেকে চোখ তুলে কটমট করে বড়বাবুর দিকে তাকালেন। বুঝলাম রেবা দত্তর গুহ্য তত্ত্ব অফিসে ফাঁস হয়ে যাক, এটা তার পছন্দ নয়। বড়বাবু প্রসঙ্গ পালটে বললেন, 'আমি আপনাকে কয়েক পুরিয়া দিয়ে দেবো, দেখবেন নাতি আপনার বালগোপাল বনে গেছে।' আমি আশান্বিত হয়ে বললুম, 'আপনার কাছে এমন ওষুধ আছে যা আমাদের বাসগুমটির স্টার্টারকে খাওয়ালে সহজে বাস পাওয়া যাবে ? ব্রেকডাউনের প্যাঁচে ফেলে আমাদের বাপের নাম খগেন করে দেবে না ?' বড়বাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'সব আছে বাবা, সব আছে। তবে কি জানেন, সিমটম দেখে চিকিৎসা। কয়েকটা খবর আমার চাই, যেমন লোকটিকে দেখতে কেমন, রোগা না মোটা, কালো না ফর্সা ? টক খেতে ভালবাসে, না ঝাল কিম্বা মিষ্টি ? ডান পাশ ফিরে শোয়, না বাঁ পাশ, অথবা চিৎ হয়ে ? নাক খোঁটে কিনা ? ফ্যামিলিতে কারুর একজিমা ছিল কিনা ? সামনের দাঁত দুটো কেমন ? মাথার চুল পাতলা না ঘন !' বড়বাবুর ফিরিস্তি আর শেষ হল না।

সেদিন অফিস থেকে প্রায় হেঁটেই বাড়িতে ফিরতে হল। কারণ ? কারণ একাধিক। ময়দানে খেলা ছিল, পথে মিছিল ছিল, রাস্তায় বৃষ্টির জল ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, গ্যারেজে গাড়ি বসেছিল, বাস যাত্রী বহন না করে বরযাত্রী বহন করছিল, ট্রাম আউটলাইন হয়েছিল, ট্যাক্সি স্ট্রাইক করেছিল।

পাড়ায় যখন ঢুকলাম বেশ রাত। বাড়িতে আলো থাকলেও রাস্তায় একটুও আলো নেই। ঘোর অন্ধকার। রাস্তার একপাশে পর্বত প্রমাণ মাটি। তিলোত্তমা কলকাতার অঙ্গ প্রসাধন। রাস্তার মুখটাতেই বৃদ্ধ ঘনশ্যামবাবু রাস্তার একপাশে লাঠিতে ভয় দিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন। চোখে রুপোর ডাঁটির ঘোলাটে চশমা। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, 'কে যায় ?'

নাম বললুম। বৃদ্ধ বললেন, 'তা বেশ, আজ কেমন ?'

কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলুম, 'ওখানে অন্ধকারে বসে কেন ? বাড়ি যাবেন না ?' 'যাবো রে ভাই যাব, রাত ন'টায় চাঁদ উঠবে, তখন গলিটায় একটু আলো পড়বে, সেই সময় ঠুকঠুক করে চলে যাব। তার আগে যাই কি করে অন্ধকারে !'

ঘনশ্যামবাবুকে চাঁদের আশায় গলির মুখে বসিয়ে রেখে বাড়ি ঢুকে চা খেতে খেতে দেখি আকাশে ঘন কালো মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পুবের আকাশে চাঁদ উকি মেরেই মেঘের তলায় ঢুকে গেছে। দেখে ভীষণ ভয় হল। চাঁদ যদি না ওঠে ঘনশ্যামবাবু সারারাত গলিতে উবু হয়ে বসে বসে ভিজবেন সূর্য ওঠার অপেক্ষায় !

প্রেম

আমার সেই বয়েসে একবার প্রেমে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল। সেই বয়েসে, যে বয়েসে ঠোঁটের ওপর কচি কচি গোঁফের দূর্বো জন্মায়। দাড়িতে দু-এক গোছা ছাগুলে চুল দেখা যায়। গলাটা একটু ভারি ভারি হয়। মানুষ পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। সবজান্তা, হাম-বড়া ভাব। লঘু গুরু জ্ঞানশূন্য। সব কথাতেই এক কথা যান যান, আপনি কি বোঝেন, আপনি কি জানেন ? সেই বয়েস।

প্রেমে পড়তে হলে একটি মেয়ে চাই। যে-সে মেয়ে হলে হবে না। সুন্দরী হওয়া চাই। ডানা কাটা না হোক, দেখলে যেন প্রেমের উদয় হয়। নায়িকাদের বর্ণনা কত উপন্যাসে পেয়েছি। ছায়াছবির পর্দায় দেখেছি। চাঁদের আলোর ঝিলিক ফুটছে। গাছের ডাল ধরে নায়িকা গান গাইছে। ঝোপে কোকিল ডাকছে কু-উ-উ।

আমার বন্ধু সুখেন সেই বয়েসেই আমার চেয়ে অনেক বেশি পেকেছিল। হিন্দী সিনেমা দুমুড়ি চালে দেখত। ইংরাজি ছবির হিরো-হিরোইনের নাম কণ্ঠস্থ ছিল। বুকপকেটে ম্যারিলিন মোনরোর ছবি পুষত। সে এক ছেলে ছিল বটে।

সুখেন বললে, সব মেয়েই তো আর প্রেমে পড়ে না। যেমন ধর, সকলের সর্দি হয় না। ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো একবারই হল। কারুর আবার বারো মাসই সর্দি। সকাল হল তো ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচি। একে বলে সর্দির ধাত। এই রকম কারুর কাশির ধাত, কারুর পেট খারাপের ধাত। সেই রকম কোন কোন মেয়ের প্রেমের ধাত থাকে। ধাত বুঝে এগোতে হয়।

সে আমি কি করে বুঝব ভাই ?

খোঁজখবর নিতে হবে। অতই সোজা চাঁদু। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখ। তারপর ঝোপ বুঝে মার কোপ। রাস্তায় ঘাটে, বাসে ট্রামে যেখানেই দেখবি কোন মেয়ে তোর দিকে পুটুস করে তাকিয়েছে, তুই ক্যাবলার মত চোখ সরিয়ে নিবি না, তুইও তাকাবি কটমট করে। বড় বড় চোখে। মেয়েটা যদি আবার তাকায়, তোর চোখে চোখ পড়বেই। চোখে জাদু থাকে, জানিস ?

না ভাই।

কি জানো তুমি ? চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার তুমি আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

তুই চোখ মারতে বলছিস ? ও ভাই অসভ্য ছেলের কাজ।

তুই একটি গর্দভ। চোখ মারা নয়। চোখে ভাবের খেলা। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেছিস ? এই চোখে জল, এই চোখে হাসি, এই চোখে প্রেম, এই চোখে ঘৃণা। সব চোখে-চোখেই মনের প্রকাশ। তেমনভাবে তাকাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে।

ও ভাই আমি পারব না। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আমি কি সুচিত্রা সেন ?

দূর মড়া ! সুচিত্রা সেনের মত অভিনয় ক্ষমতা, চোখের ভাষায় কথা বলছি। বাড়িতে বড় আয়না আছে ?

তা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়াবি, দাঁড়িয়ে চোখের ট্রেনিং শুরু করবি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না। হাসবি কাঁদবি রাগবি গলবি চমকাবি চমকে দিবি। মুখের কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। সব চোখে। চোখকে খেলাবি। এই হল তোর প্রেমের প্রথম পাঠ। এইটে উতরে গেলে দ্বিতীয় পাঠ।

মনে মনে ব্যাপারটা চিন্তা করে সুখেন ইয়ারকি করছে বলে মনে হল না। সত্যিই তো, বশীকরণ বলে একটা ক্রিয়া অবশ্যই আছে। তা না হলে পাঁজিতে এত বিজ্ঞাপন থাকে কেন ? জাদুকর পি. সি. সরকার হল-সুদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করে কত খেলাই তো দেখিয়ে গেছেন। সেই সময়ের খেলা। নটার সময় সাতটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন।

আমাদের পাড়ার কার্তিককে মেসমেরাইজ করে এক গুণী ব্যক্তি নাম রেখে গেলেন কাকাতুয়া। বলেছিলেন ফিরে এসে ঠিক করে দোব। তিনি আর ফিরলেন না। সেই থেকে কার্তিক কাকাতুয়া। কাকাতুয়া বললে সাড়া দেয়। কার্তিক বললে সাড়া দেয় না।

দুপুরবেলা বড় বউদির ঘরে চোখের ট্রেনিং শুরু হল। কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে। সব তাহলে কেঁচে যাবে। বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়ার পর সবাই ধুঁকতে থাকে। বড় বউদির নাক ডাকে। আমার ছোট বোন পিয়া কলেজ চলে যায়। এই হল সাধনার উপযুক্ত সময়।

নিজের চোখে আগে কখনও আমি অমন করে দেখিনি। কেউ দেখেছেন কিনা সন্দেহ আছে। আমরা সাধারণত আয়নার সামনে দাঁড়াই, ঝট করে চুল আঁচড়াই, সট্ করে সরে আসি। এ একেবারে নিজের মুখোমুখি ফেস টু ফেস। নিজেকে নিজে দেখা। কখনও প্রেমের দৃষ্টিতে, কখনও ঘৃণার দৃষ্টিতে, কখনও আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে, আও না পেয়ার করে, লাভ করে, আও না।

দুপুরটা কয়েকদিন এইভাবেই বেশ কাটল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি ঠেকিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে চোখে চোখে কথা বলে। হঠাৎ একদিন পিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি জানতুম না ধরা পড়ে গেছি। পিয়া কোন্ সময় পিছন থেকে দেখে সরে পড়েছে। মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছিল। চুপি চুপি বড় বউদিকে বলেছিল, দাদা দুপুরবেলা তোমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে বল তো। আমাদের পুসিটাকে আয়নার সামনে বসিয়ে দিলে ঠিক ওই রকম করে। ফ্যাঁসফোঁস, থাবা-মারা।

বড় বউদি বড়ো চালাক মেয়ে। দুপুরে বিছানায় পড়ে রইলেন মটকা মেরে। সাধনার পথে বেশ কিছু দূর এগিয়েছি। একেবারে তন্ময়। চোখে চোখে হাসি চলছে। বউদি বললে, কি হচ্ছে ?

চমকে উঠেছিলুম। ধরা পড়ে গেছি, কি লজ্জা।

বললুম অভিনেতা হব তো, তাই একটু চোখ সাধছি।

সে আবার কি ? লোকে তো গলা সাধে, চোখ সাধা জিনিসটা কি ?

আছে, আছে। সে তুমি বুঝবে না বউদি।

কোনরকমে পালাতে পারলে বাঁচি। ছাদের ঘরে পুরনো বইয়ের গাদা থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা বই পেলুম, ত্রাটক সাধনা, তিনচার হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে সবুজ একটা বিন্দু লাগিয়ে পদ্মাসনে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক, যেন চোখের পলক না পড়ে। পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড, মিনিট, এক দুই পাঁচ দশ, ঘন্টায় চলে যাও। তারপর দিনে।

'তোমার চক্ষুদ্বয়ে জ্যোতি খেলিবে। অলৌকিক দৃশ্যসমূহ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। চরাচরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। উড্ডীয়মান পক্ষীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইলে ভস্ম হইয়া পড়িয়া যাইব। যাহার দিকে তাকাইবে সেই তোমার বশীভূত হইয়া কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় পদপ্রান্তে পতিত হইবে, কম্পমান শাখার ন্যায়।'

ভজন করনা চাহি রে মনুয়া, সাধন করনা চাহি রে মনুয়া। সেই সাধনে অ্যায়সা ফল ফলল ! একদিন রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়ে চলেছে। একটিকে মনে বড়ো ধরে গেল। মনে হল প্রেমের ধাত। সুখেন যেমন বলেছিল, সর্দির ধাত কাসির ধাত পেটের অসুখের ধাত। মিষ্টি, নরম নরম চেহারা। অবাক জলপানের মত মুখ। মা দুর্গার মত চোখ। ডুরে শাড়ি পরেছে। রাস্তায় যেন কাঁপন ধরেছে।

ভ্রূচাপে নিহতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোহপি মারোদ্যমম্।
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্‌বৃত্ত স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি॥

টাটকা গীতগোবিন্দ ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসতে লাগল। হে সুন্দরী, তোমার নজরোকা তীর ভুরুর ধনুর ছিলে টেনে অমন করে আর মেরো না, আমার মর্ম ফেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সখি। এ তো তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তোমার কালো কুটিলকেশ আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছে, এও স্বাভাবিক। তোমার বিম্বফলতুল্য রাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু তোমার ওই সদবৃত্তস্তলমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে। আমি সইতে পারি, না বলা কথা, মন নিয়ে ছিনিমিনি সইব না, সইব না। গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করে ভীষণ সাহস এসে গেল। বল বীর নয়, তাকাও বীর। কি ভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না। একটি মেয়ে আর একটিকে বললে, দ্যাখ ভাই, পাগলটা তোর দিকে কি ভাবে তাকিয়ে আছে ! তারপর রাস্তায় ষাঁড় দেখে মেয়েরা যে ভাবে হুটোপাটি করে পালায়, সেইভাবে দুজনে গলাগলি, টলাটলি করতে করতে পালাল। একজনের পা থেকে চটি ছিটকে নর্দমায় পড়ে গেল। অনেক দূরে গিয়ে তারা আর একবার ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যেন দেখছে ষাঁড়টা কত দূরে !

মনে বড়ো ব্যথা পেলুম। আরও অবাক হলুম, সবাই যখন বলতে লাগল চোখ রাঙাচ্ছ কেন ? তোমার চোখ রাঙানির আমরা তোয়াক্কা করি না হে। যার দিকে তাকাই তিনি একই কথা বলেন, চোখ পাকাচ্ছ কেন ? মাথা ঠাণ্ডা কর, মাথা ঠাণ্ডা কর। গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে বলতে হয় !

বড় বউদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠলুম, এ আবার কে রে ! চোখ দেখলে মনে হয়, এখুনি গেয়ে উঠবে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।'

চোখের পাতা পড়ছে না, মণি দুটো পাথরের মত স্থির। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। কান ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, আর করব না স্যার।

চোখের ডাক্তার বললেন, এ কি করে এনেছ হে। একে বলে চোখ ঠিকরে যাওয়া। কি করে এ রকম করলে ? ভূত দেখলে এ রকম হতে পারে। আমরা পড়ে এসেছি। দেখলুম এই প্রথম। তুমি বোসো বোসো।

আউটডোরে কোন পেশেন্ট কখনও এমন খাতির পায় না। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে, অন্য রুগীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি একের পর এক ছাত্র আর অন্যান্য ডাক্তারদের ডেকে এনে দেখাতে লাগলেন। এ রেয়ার কেস, পড়া ছিল, দেখা ছিল না। তাঁরা আসেন, সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখেন, চোখে যন্ত্র লাগান, আর বলেন, রেটিনা হুপ করে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তারী ভাষা বোঝা যায় না। রেটিনা শব্দটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হুপ্ শব্দ তো হনুমানে করে। তার মানে, কিছু একটা হনুমানের মত লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

চোখের পাওয়ার মাপতে মাপতে ডাক্তারবাবু বললেন সত্যি করে বল তো বাবা, কি করে এমন করলে ? ভূত নিশ্চয়ই দেখনি, চোখের সামনে কাউকে কি খুন হতে দেখেছ ?

আজ্ঞে, ত্র্যাটক সাধনা।

সেটা কি বস্তু ভাই ? পিশাচ সাধনার ধরনের কিছু ?

আজ্ঞে না, দেয়ালে সাঁটা একটা সবুজ বিন্দুর দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে বসে থাকা।

সর্বনাশ। একে বলে ফিক্সড স্টেয়ার। আই বল সকেটে সেঁটে গেছে। এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে ?

আজ্ঞে, প্রাচীন গ্রন্থ।

সেটিকে পুড়িয়ে ফেল। খবরদার, ওসব আর ভুলেও করতে যেও না। এই নাও তোমার চশমার পাওয়ার। সঙ্গে গোটাতিনেক ব্যায়াম রইল। প্রথম : চোখ নাচানো। ডাইনে ঘোরাও, বাঁয়ে ঘোরাও, ওপরে তোল, নিচে নামাও। দ্বিতীয় : ব্লিংকিং। অনবরত চোখ পিটপিট কর। নন-স্টপ। তৃতীয় : কাপিং। হাতের তালু দিয়ে দু'চোখ ঢেকে, মাথা পেছনে হেলাও। শেষ উপদেশ : সুখে আছ, তাই থাক, ভূতের কিল খেতে যেও না, কেমন ?

চোখ বাঁচাতে শুরু হল চোখের ব্যায়াম। চোখ ঘোরানো, চোখ নাচানো, চোখ পিটপিট, পাতা ফেলা আর খোলা। সুখেন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। সেই সময় বাজারে একটা গানও বেরিয়েছিল, বলা কি যায় সহজে, বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা। চোখ ওই রকম করতে করতে এমন মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়ে গেল, সব সময়েই করে চলেছি, অজান্তেই করে চলেছি।

পিতৃবন্ধু বিধুজ্যাঠার মাথায় মাথায় তিন মেয়ে। সব ক'টি মেয়েই বেশ সুন্দরী। পিতৃদেব একদিন সকালে বললেন, বিধুবাবুর বাড়ি থেকে চট করে একবার গুপ্তপ্রেস পাঁজিটা নিয়ে এসো তো।

বিধুজ্যাঠার বাড়িতে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল বড় মেয়ে রেখা। জিজ্ঞেস করলুম, বিধুজ্যাঠা আছেন, বিধুজ্যাঠা ?

রেখা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ, বাবা আছেন।

রেখা পেছোতে শুরু করেছে। চোখেমুখে একটা ভয়, একটা কেমন যেন বিস্ময়ের দৃষ্টি। আমি এক পাও এগোইনি, দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি বললুম, একবার ডেকে দাও তো, একবার ডেকে দাও তো।

রেখা প্রায় ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। যেতে না যেতেই বিধুজ্যাঠা এলেন, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। আদুর গা। সাদা মোটা পইতে বুকের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল।

বাঁজখাই গলায় বললেন, কি চাই ?

সাধারণত এভাবে কথা বলেন না। অবাক হলুম। বললুম, পাঁজি আছে, পাঁজি ? বাবা একবার চাইলেন।

হ্যাঁ, আছে ছোকরা—বলে ঠাস করে গালে এক বিরাশি সিক্কার চড় হাঁকালেন।

এ আবার কি ? চড় আবার কবে থেকে পাঁজি হল ! কিছু বোঝার আগেই আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, চল তোমার বাবার কাছে।

তিন মেয়ে রকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, অসভ্য ছেলে।

বাড়ির সামনের হারাধন মুদী দোকানের টাটে বসে বসেই চেল্লাতে লাগল, কি করেছে জ্যাঠামশাই, কি করেছে জ্যাঠামশাই ?

আমি হাঁ হয়ে গেছি। অপরাধ জানলুম না, ফাঁসিতে চলেছি।

বাবা বললেন, কি, করেছিল কি, বিধুদা ? জুতো পায়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিল ?

তার চেয়েও অনেক, অনেক গর্হিত কাজ, চোখ দিয়ে আমার মেয়েদের অশ্লীল, কামার্ত ইঙ্গিত করেছে।

ইজ ইট ?

ডিফেন্সের কোন সুযোগই পেলুম না। কিল, চড়, ঝাঁটা, জুতো লাঠি। মিনিট দশেক শরীরের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প চলে গেল। বড় বউদি এসে উদ্ধার করলেন। বড়দা বেরিয়ে এসে বললেন, কি হয়েছে কি ?

বাবা আর বিধুজ্যাঠা দুজনেই সমস্বরে আমার অপরাধ পেশ করলেন।

বড়দা বললেন, ছি ছি, না জেনেশুনেই, এত বড় একটা ছেলের গায়ে হাত তুললেন ? সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটা ছেলের গায়ে ? জানেন না, ও গুরুতর একটা চোখের অসুখে ভুগছে। মেজর মিত্রর চিকিৎসায় আছে।

দুজনেই সমস্বরে বললেন, অ্যাঁ ! বল কি ? কই, তোমরা আগে তো কিছু বলনি ! ছি ছি ছি।

বিধুজ্যাঠা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ক্ষমা কর বাবা। তুমি একবার আমার বাড়িতে চল। আমরা সবাই মিলে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আজ আর আমার যাবার মত অবস্থা নেই জ্যাঠামশাই।

বিকেলের দিকে ভীষণ জ্বর এসে গেল। চোখ বুজিয়ে পড়ে আছি। সর্বঅঙ্গে বিষ ফোঁড়ার মত ব্যথা। বউদি এসে কপালে হাত রেখে বললে, দেখ কে এসেছে তোমাকে দেখতে।

চোখ খুলে দেখি রেখা।

ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। এখনও হয়তো আমার চোখ সেই ভাবেই নাচছে। আবার না জুতো খেতে হয়!

বউদি বললেন, তাকিয়ে দেখ কে এসেছে।

আমি ইচ্ছে করে প্রলাপ করতে লাগলুম, না না, আমি আর যাব না, আর পাঁজি আনতে যাব না মা!

রেখা ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল, বউদি, আমিই দায়ী, আমিই দায়ী। কিছু হবে না তো? সেরে উঠবে তো?

বউদি বললেন, সারা শরীর বিষিয়ে উঠেছে। তা ছাড়া বড়ো অভিমানী ছেলে, দেহের চেয়ে মনে বেশি লেগেছে।

চার বছর পরে মুসৌরীর এক হোটেলে আমি আর রেখা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কাঠের মেঝের ওপর আমাদের সুটকেস। তখনও খোলা হয়নি। সামনে কাঁচের জানলা। সকালের রোদে হিমালয়ে সোনা খেলছে। রেখার কাঁদে আমার একটা হাত। রেখার একটা হাত আমার কোমরে। রেখার মাথা আমার কাঁধে।

আমি বলছি, সেদিন জুতো খাইয়েছিলে, আজ অন্য কিছু খাওয়াও।

রেখা বললে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন?

আমি বলছি, আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন?

চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। দরজার কাছ থেকে হোটেলবয় বলছে, কফি, মেমসাব!

তাঁরাই সুখী যাঁদের মন অর্থ বিকল। মন যদি সবকিছু গ্রহণ করতে চায় তাহলে এ যুগে বেঁচে থাকার মত দু:সহ যন্ত্রণার আর কিছু নেই। আমরা অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে পারি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাসে অভ্যস্ত। বর্তমান কালের নৈতিক অবক্ষয় এক নতুন অভিজ্ঞতা।

সবকালের সবসমাজেই কিছু না কিছু দুর্নীতি ছিল। ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী ছিল। চরিত্রহীন নারী-পুরুষ ছিল। অবাধ্য ছাত্র ছিল। ভোগী স্বার্থপর মানুষ ছিল। তারা থাকত যে যার এলাকায়। ছোট ছোট পচা মশা-ভ্যানভ্যানে ডোবার মত। দুর্নীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এখন দুর্নীতির সমুদ্র, উত্তাল, সুনীতির তট প্লাবিত করে, আদর্শ-টাদর্শ সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

সুনীতির দুর্নীতির চেয়ে আরও আতঙ্কের হয়ে উঠেছে যে জিনিস, তা হল মূল্যবোধহীন মানুষ। বস্তুর গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্কের বাঁধন খুলে পড়ে গেছে। আদর্শপরায়ণতা এখন উপহাসের বস্তু। যিনি কর্তব্য করতে চান তিনি মূর্খ। এক ধরনের বুদ্ধিমান মানুষ নতুন মূল্যবোধের হৃদয়হীন এক সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। ধূর্ততার ইট আর স্বার্থপরতার পলেস্তরা দিয়ে সেখানে নতুন ইমারত তৈরি হবে। গড়ে উঠবে প্রয়োজনের সংসার।

পুরুষের প্রয়োজন হবে নারীকে, নারীর প্রয়োজন হবে পুরুষকে। বিবাহ নয়, হবে চুক্তি। জৈব সম্পর্কের আলগা বাঁধনে সন্তান-সন্ততি আসবে, যাদের বলা হবে মানুষের বাচ্চা। বেড়ালের কাছ থেকে শিখতে হবে সন্তান পালনের নীতি। বেড়াল জননীর সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক তদ্দিনই যদ্দিন না তার চোখ ফুটছে। চোখ ফুটে একটু চলে-ফিরে বেড়াতে শিখলেই মায়েরা অন্যরূপ। বাচ্চা সোহাগ করে কাছে এলেই ফ্যাঁস করে থাবা। তফাৎ যাও। নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও। কিছুদিন পরেই দেখা যাবে বাচ্চা মাকে দেখলে ফ্যাঁস করে তেড়ে যাচ্ছে। কেউ আর কাউকে চেনে না। সম্পর্কিত শত্রু।

সিংহের কাছ থেকে মানুষ শিখবে। সিংহজননী তার শাবকদের নিয়ে পাহাড় বা উঁচু কোনও জায়গায় উঠে যায় তারপর একের পর এক বচ্চাদের ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় খাদে। যে শাবকটি খাদ বেয়ে উঠে আসতে পারে সিংহজননী তাকেই মানুষ করে।

মানুষ ছাড়া জীবজগতের শিক্ষাই হল, স্নেহ মমতা দয়া করুণা ভালবাসার কোনও দাম নেই। শক্তিতে বাঁচো, স্বার্থে বাঁচো, লড়াই করে বাঁচো। পৃথিবীতে আসা মৃত্যুর জন্যে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন :

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা
ল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

লক্ লক্ করে জ্বলছে সর্বশরীর। মুখগহ্বর, গ্রাসিতে সকল দিকে সকল ভুবন। প্রচণ্ড

তোমার তেজ অতি-দুর্নিবার, সর্বব্যাপী হয়ে বিষ্ণো ! দহিছে সংসার।

ভগবান বলছেন : কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অর্জুন, আমিই প্রচণ্ড কাল লোকক্ষয়কারী, লোকনাশ হেতু আমি এসেছি ধরায়। মানুষ এতকাল এই সত্যটিকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে। অর্জুনের মত কাতর কণ্ঠে বলেছে : নমোস্তুতে দেববর প্রসীদ। তোমার রূপ সংবরণ কর, শান্ত হও।

ভীত মানুষ, সংসারে আশ্রয় খুঁজেছে, পিতা-মাতার নির্ভরতা খুঁজেছে, নারীতে ভালবাসা খুঁজেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বজননী খুঁজেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, বিরহের গানে বাতাস কেঁপেছে, সাহিত্যে সম্পর্কের জয়গান হয়েছে, আদর্শের স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। ঈশ্বরের কল্পনা করে মানুষ স্তব-স্তুতি করেছে ! উপনিষদের ঋষি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছেন :

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পূষণ অগাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

যে সত্য প্রকৃতই সত্য তা আমরা ভুলে থাকতে চাই। যে সত্য হল প্রতি মুহূর্তে আমাদের ক্ষয়, বিনাশ, একের হাতে অন্যের সংহার, মৃত্যু। ঋষিরা বলেছেন, হে জ্যোতির্ময়, তোমার জ্যোতির্বলয় সংবৃত কর। তেজোপ্রভা সংবৃত না হলে তোমার সত্যরূপ দর্শন করার সাধ্য আমাদের হবে না।

ঋষিপন্থা ছিল নিজের আধারকে বিশাল করে মানুষের ক্ষুদ্রতা, পঙ্কিলতাকে ধারণ করার মত একটা অবস্থা সৃষ্টি করা। নিৎসের যরথুস্ত্র বললেন :

Verily, a polluted stream is man. One must be a sea to be able to receive a polluted stream without becoming unclear.

বিসর্জন নাটকে রঘুপতি জয়সিংহকে বলছেন :

মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।

দুর্বলের সত্য এক রকম, সবলের সত্য আর এক রকম। সবল বলবে, বিবেক আবার কি বস্তু। বিবেকের দংশনই বা কি। The bite of conscience, like the bite of a dog into a stone, is a stupidity. সবলের বিবেক থাকে না, বিবেক হল দুর্বলের।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে : Happy is the Country which has no history. সেই দেশই সুখের যে দেশের কোনও ইতিহাস নেই। হেগেলের কথায় : A State has no aim, we alone give it this name or that. সবল দেশ দুর্বল দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি সব চলে যাবে সবলের হাতে। বিজ্ঞান মানুষকে যত না বাঁচাবে তার চেয়ে মারবে বেশি। ইতিহাসে এই হল রাষ্ট্রের স্বরূপ। সহ অবস্থান, বিশ্বশান্তি সবই হল আমাদের কল্পনা, আরোপিত লক্ষ্য। প্রতি বছরে প্রতিরক্ষা খাতে আমেরিকায় ব্যয়বরাদ্দ বাড়ছে। দশ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। এখন

আরও বেড়েছে। ভান্‌স প্যাকার্ড বলছেন : Any cutbacks would throw some constituents out of jobs and hit some of their local industries. বিগ পাওয়ারসদের মধ্যে যেই শান্তির আদিখ্যেতা শুরু হয় অমনি আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ টলমল করে ওঠে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে কোথাও কোথাও একটা যুদ্ধ চাই।

ইতিহাসের লক্ষ্য কি আমাদের জানা নেই। ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের জানা আছে।

যে কোন দেশের সমাজে একদল মানুষ কালে সভ্য হতে হতে দুর্বল হয়ে পড়ে। নখের ধার কমে যায়, দাঁতের জোর কমে যায়, মন উদার হয়, তখনই বেজে ওঠে মৃত্যুর ঘণ্টা। দেশের সেই অংশ যে অংশ, সভ্যতার ধার ধারে না, যাদের আমরা নিউ জেনারেশান বলি, তারা তেড়ে আসে। অসভ্যতার কখনও ভ্যাকুয়াম থাকতে পারে না। মেকি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ সব চুরমার হয়ে যায়। সভ্যতা হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের সামগ্রী।

তবু এত যুগ ধরে সভ্যতা বেঁচে আছে কি করে ?

এই ব্যাপারে নিৎসের ব্যাখ্যা ভারি সুন্দর। দুর্বল, অসুস্থ মানুষ সবলের চাপে একক হয়ে পড়ে ? মনে বনে কোণে শুরু হয়ে যায় তার একক সাধনা। সে হয়ে যায় শান্ত স্থিতধী, জ্ঞানী। যেমন যার দুটো চোখ, তার চেয়ে যার একটা চোখ সে ভাল দেখে কারণ তার একটা চোখে দুটো চোখের দৃষ্টি এসে জমে। অন্ধের আবার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, শ্রবণশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর হয়। It is precisely the weaker nature who being more delicate and freer makes progress possible.

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলুম, আংশিক মানসিক পক্ষাঘাত ছাড়া এ যুগে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সরে থাকা যাবে না, মরে থাকতে হবে। মাকিয়াভেলির কথা কত সত্য ছিল, the form of government is of very little importance, although the half educated think otherwise.

মাসী

নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলুম। জেতার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ফলাফল যখন বেরলো, শুধু আমি নয়, আমার হয়ে যারা খাটাখাটি করেছিল তারাও অবাক। তাদের অবশ্য বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। দেয়ালে হাজারখানেক পোস্টার সেঁটেছিল, আর দিনসাতেক একটা সাইকেল-রিকসা ভাড়া করে, ভাঙা মাইক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিল, জিতেন চক্রবর্তীকে ভোট দিন। মাইকটার আবার নিজস্ব কিছু বক্তব্য ছিল। সব সময়েই একটা সি সি আওয়াজ করত, মাঝে মাঝে আবার ধমক-ধামকও দিত। কাকে ভোট দিতে বলছে, তিনি কোন দলের, সে দল জনসাধারণের জন্য কি করেছে বা করতে চায়, কিছুই বোঝা যেত না। আর সেই কারণেই আমাকে দুর্বোধ্য কবিতা ভেবে সকলে ভোট দিয়ে এলেন। সবাই ভাবলেন, জেনে ঠকার চেয়ে না জেনে ঠকা অনেক ভালো। তাছাড়া জনপ্রতিনিধি হল মেয়েমানুষের মত। মানুষ সবসময় নতুন নতুন জিনিস চায়।

ঘরেরটিকে ছেড়ে পরের পেছনে দৌড়োয়।

যাক আমি এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এম. এল এ.। আমার সাপোর্টাররা দুশো চকোলেট বোমা এনে দড়াদ্দম ফাটাতে শুরু করে দিল। পাড়ায় অন্য দুই হার্টের রুগী, আর ক্যানসারের রুগী আছেন। এখন তখন অবস্থা। সাপোর্টারদের ডেকে বললুম, এ তোমরা কি করছ ভাই, পাঁচজনের অসুবিধা করে এ তোমাদের কি আনন্দ।

হেড সাপোর্টার বললে, আপনি চুপ করে থাকুন জিতুদা। একটাও কথা বলবেন না। মনে করুন, আপনার মৃত্যু হয়েছে। আপনি এখন আমাদের সম্পত্তি। লোকের সুবিধা করার জন্যে কেউ এম. এল. এ. কি মন্ত্রী হয়! ছিলেন স্কুল মাস্টার কিছুই জানেন না। অনেক কিছু জানার আর শেখার আছে। বসুন চুপ করে। ইঁটখোলার মালিক নগেনের লরিটা এসে গেলেই, আপনার গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে, কপালে চন্দন লেপে আমরা বিজয় মিছিল বের করবো। আজ রাতেই গোটা দুয়েককে মায়ের ভোগে পাঠাবো।

মায়ের ভোগে মানে?

আপনার মত সেকেলে লোক নিয়ে আমাদের মহাজ্বালা। কিছুই জানেন না, এম. এল. এ. হয়ে বসলেন। মায়ের ভোগ মানে, কেটে কুচিকুচি করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

মার্ডার?

আমরা আর মার্ডার বলি না। বলি লাশ ফেলে দেওয়া।

সে কি? লাশ? লাশ ফেলে দেবে কেন?

লাশ ফেলায় আমরা ভীষণ পেছিয়ে আছি। নির্বাচনের আগে একটাকে চেষ্টা করা হয়েছিল, সে ব্যাটার অখণ্ড পরমায়ু। বেঁচে উঠে, আমাদের রেকর্ড নষ্ট করে দিলে। অফসাইডের গোলের মত, হয়েও হল না। জেনে রাখুন জিতুদা, লাশের হিসাবেই পার্টির পোজিশান আর স্ট্রেংথ। রাজনীতিতে দাদা বোষ্টুমের স্থান নেই। কাপালিক হতে হবে, নাগাসন্ন্যাসী হতে হবে। নৃমুণ্ডমালিনী হতে হবে।

বেশ বুঝলাম, আমি আমার হাতের বাইরে চলে গেছি। যেভাবে নাচাবে সেইভাবে নাচতে হবে।

এ পাড়ার সবচেয়ে কুখ্যাত চোর বিধুশেখর দেখা করতে এলেন। হাতে ফুলের তোড়া, মিষ্টির বাক্স। মাল খেয়ে চোখের কোল দুটো ব্যাঙের মত হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখেই আমার হাড় পিত্তি জ্বলে উঠল। বিধু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। অমায়িক হেসে বললেন, দাদা, লাইনে নতুন এসেছো, তাই একটু কষ্ট হচ্ছে। বেশ্যার প্রথম রাতের মত। কাপড় খুলতে লজ্জা করে। জোর করে খুলে দিতে হয়। তারপর বলতেও হয় না! নিজেই খুলে দেয়।

লোকটার কথা শুনে মাথায় আগুন জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কি? আঙুল তুলে বললুম, গেট আউট।

লোকটা নড়ল না। বসেই রইল ফোলা ফোলা মুখে ভাগাড়ের হাসি। আমাদের লম্ফঝম্ফ শেষ হতেই বললে, প্রথম রাতে ওরাও ওই রকমই করে। করলেও কি নিস্তার পায় রে দাদা। মাসী আছে না। ভেটারেন মাসীরা জানে কি করে কাপড় খোলাতে হয়। কি করে পরপুরুষের সঙ্গে শোয়াতে হয়। প্রথম রাতের খদ্দেরদের একটু বেশি চার্জ দিতে

হয়। বাধা একটা বাড়তি আনন্দ দাদা। আমি তাই তৈরি হয়ে এসেছি। মিষ্টির বাক্সের তলায় একটা খাম আছে। ওটা তোমার নয়, তোমার গৃহিণীর। শুনলুম গয়না-টয়না বেচেছিলে। দেখেছ, সব খবর রাখি। আমরা হলুম এই জমানার নাক, মুখ, চোখ, কান। পারো তো, একে একে উদ্ধার করে দিও।

খুব রেগে গিয়ে বললুম, দেশের সেবা করবার জন্যে আমি, আমার পরিবার, সবাই বিবস্ত্র হতে রাজি আছি। জানেন আমার পিতামহ স্বদেশী করতেন।

বিধু ভিলেনের মত হেসে বললেন, বালক! খোকা! খোকাবাবু, তোমার দেশ কোথায়, যে সেবা করবে?

কেন? যাঁরা আমায় ভোট দিয়েছেন, তাঁরাই আমার দেশ, তাঁদেরই আমি সেবা করব। জীবন দিয়ে।

আহা, আমার মানিক রে! বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগের ভাষায় কথা বলছে রে। আজকাল আর একা দেশ সেবা করা যায় না চাঁদু। সেই স্বদেশীযুগ আর নেই। সেবা করে পার্টি। পার্টির দেশ অনেক ছোট। সাপোর্টাররাই হল দেশ। তোমার চামচারাই হল দেশ। তোমার স্ত্রী পুত্রই হল দেশ। তুমি নিজে হলে একটি দেশ। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে একবার ছিঁড়েছে। এইবার বুদ্ধিমানের মত চামচে কালচার করো, নিজের একটা কিংডাম তৈরি করো। খোকামি করে আখের নষ্ট কোরো না। জেনে রাখো তুমি হলে আমাদের শিখণ্ডী।

বিধুশেখর চলে গেলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার আনন্দ-টানন্দ সব চলে গেল। বাইরে নগেনের ইঁট খোলায় লরি থামার শব্দ হল। তাসা বাজছে চড়াক চড়াক করে। মালা এসেছে। আবীর এসেছে। এক হোটেলঅলা পেটি পেটি কোল্ড ড্রিঙ্কস পাঠিয়েছে। ব্যাটা একটা বার লাইসেন্স চায়। একটু পরে ওরা আমাকে নিয়ে বিজয় মিছিলে বেরোবে। তবু আমি নিরানন্দ। মনে হচ্ছে সত্যিই আমি এক সেই, বসে আছি সেজেগুজে একা ঘরে। মাসী গেছে প্রথম রাতের খদ্দের ধরতে দরজায় শিকল তুলে।

গরলপুত্র

কোন কালেই বেঁচে থাকাটা এখনকার কালের মত এমন লাঠালাঠির ব্যাপার ছিল না। সব সময়েই যেন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা। জীবন যুদ্ধ!

সেকালের মানুষ সকালে উঠে কি করতেন? এক গেলাস চিরতার জল খেয়ে ভোরবেলা মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার প্রয়োজন হত। তখনকার মানুষের শরীরে মন বলে একটা বস্তু ছিল। পাখির ডাকে, ভোরের বাতাসে, সে মনে পুলক লাগত। আকাশ, পৃথিবী, জল, ফল, ফুল দেখার অবকাশ ছিল। প্রাণ ছিল, এখন তো সব প্রাণহীন প্রাণ। ঘড়ির মত টিক টিক করছে। চলে কিন্তু ভাবে না।

তখনকার মানুষের ভোগ ছিল, এখন দুর্ভোগ : রাতে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি। বেগুন ভাজা, মুচমুচে আলুভাজা। মাছের কালিয়া অথবা ডিমের কারি। একবাটি ক্ষীর। তখন চিংড়ির মালাইকারি খুব হত বাড়িতে বাড়িতে, পাড়া ম ম করত মাংস রান্নার ফ্লেভারে। ভোরে না বেড়ালে হজম হবে কি করে! দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে। কত ভোগ এখনও বাকি। তিন তীর্থ শেষ হয়েছে, সাত তীর্থ বাকি। বাতে ধরলেই বিপদ। বাবু তাই ভোরে চিরতার জল খেয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন। ফেরার পথে পছন্দসই একটি রুই কি ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছেন। গৃহিণী দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কর্তাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

ওমা, কি সুন্দর মাছ এনেছ গো? আহা রূপোর বরণ কান্তি।

পুবে সূর্য উঠছে লাল হয়ে, এদিকে এয়োস্ত্রীর সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। পুত্রবধূদের উল্লাস, কলরব। পরিপূর্ণ সংসারের সুখ উথলে পড়ছে।

গিন্নি ভাবছেন, বাবা বলেছিলেন, দেখেশুনে তোকে ভাল হাতেই দিয়ে গেলুম মা। এখন তোর বরাত।

তখন মানুষ ক্রমশই বড় হত। এখন উল্টোটাই হয়। ছোট হতে হতে জীবন ক্রমশই উঞ্ছবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন নীতি বাক্য ছিল, ওহে সংসারী মানুষ, আয় বুঝে ব্যায় কর। কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। সেই বাক্যে আজ কর্ণপাত করলে, কোট আর কাটা হবে না, বড়োজোর লাল একটা ল্যাঙোট হতে পারে।

মাঝে মাঝে ভাবি, যাদের ভাল, তাদের সব ভাল। ইউরোপ, আমেরিকা ধনীদের দেশ। ইচ্ছে করলেই মেয়েরা সেখানে বারো হাত, চোদ্দ হাত শাড়ি পরে ফরফরিয়ে ঘুরতে পারে। কিন্তু পারে না। তিন ছটাক কাপড়ের বিকিনি পরে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। ওই পোশাক যৌবনটিও কেমন খোলতাই হয়। মনে মনে বসন্তের জোয়ার বইতে থাকে। এদেশের পুরুষমানুষের মত ওদেশের পুরুষকে অমন ছোঁক ছোঁক করে মরতে হয় না। সায়েবদের চোখের দৃষ্টি ওই জন্যে একেবারে সোজা। বীরের মত সাধুদের মত চাহুনি। আমাদের দৃষ্টি ওই জন্যই তেড়ছা, ছিঁচকে চোরের মত। মেয়েরা অম্ন দৃষ্টি একেবারে পছন্দ করে না, প্রায়ই বলতে শুনি, দেখ ভাই দেখ, লোকটা কি রকম শকুনির মত তাকাচ্ছে দেখ।

মানুষ যা চায়, তা না পেলে ছোঁচা হয়ে যায়। বেড়ালের মত চুরি করে হাঁড়ি খেতে ছোটে। সারা মুখে চুন কালি মেখে ফিরে আসে। সব ব্যাপারটাই আমাদের হাঁড়িখেকো বেড়ালের মত। শখ আছে সঙ্গতি নেই। ধনপতি সদাগর আকাশে উড়ছেন তো আমাদেরও উড়তে হবে। লাট খেয়ে পড়লেন হাজার টাকা মাইনের ছা-পোষা কেরানী। পাওনাদার এসে প্যান্ট খুলে নিয়ে গেল।

রোজ দশ টাকার বাজার করতে যার দাঁত ছরকুটে যায় তিনি পাশের বাড়ির কালোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিস্তিতে কিনে ফেললেন ফ্রীজ। এইবার সেই ফ্রীজ ভরতে কাবলীওলার কাছে হাত পাত। ফ্রীজের সঙ্গে ফ্রীজের মালিকও ফ্রীজ হয়ে গেলেন। ডিম খাচ্ছেন, মাছ খাচ্ছেন, আর চোখ ক্রমশই কপালে উঠছে। টেঁসে না গেলে দেউলে হতে হবে।

অতীতের মানুষ বাজেট রেখে চলতেন। কাল দশ টাকার মাছ খেয়েছি এখন তিনদিন নিরামিষ। এ নিয়ে সংসারে কোন বিদ্রোহ হত না। এ যুগের গৃহিণী বলবেন, সে কি কথা ! আমাদের লকুবাবু মাছ না হলে একগাল ভাতও মুখে তুলবেন না। ছেলের এমন লবাবি মুখ হয়েছে না। আমরা ছেলেদের নবাব বানিয়েছি, আদরের আতিশয্যে, অতিমানব ধারার অতি আগ্রহে, নিজেদের স্বভাবের বিরোধী করে তুলেছি। সংসারের স্বাভাবিক দুঃখ-সুখের বাইরে রেখে এমন একটা মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছি, তারা আর পরিবারের একজন নয়, একজন মহামান্য অতিথির মত।

কারুর কিছু জুটুক না জুটুক, ছেলের সকালে চাই ডিসমেদ্ধ, একপো দুধ, রুটি, মাখন, কলা, মাছ চাই, মাংস চাই তার ওপর বিজ্ঞাপনে দেখা স্ট্যামিনা বাড়াবার টনিক চাই।

সে যুগের ছেলেমেয়ে কিভাবে মানুষ হত ! বিদ্যাসাগর কি হাফবয়েল খেয়ে অ্যাংলো স্কুলে পড়তে যেতেন ? তিনি তো ছাত্রজীবন থেকেই ভাতে ভাত রেঁধে খেতেন, পিতাকে খাওয়াতেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যা হয়েছিলেন তার ধারে কাছে আজও কেউ যেতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি পড়লে তিনি কি ছিলেন এই আত্মবিস্মৃত জাতি জানতে পারবে।

বিবেকানন্দ কি বিকেলে কাজুবাদাম খেতেন ? ঠ্যাং তুলে বসে থাকতেন মহামান্য অতিথির মত ? পিতামাতা চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন কি ? আহা, বাছা আমার বলে মাথায় তুলে নৃত্য করতেন ? নেতাজীর শৈশব কি রকম ছিল ? কাবাব না পেলে থালা ছুঁড়ে বলতেন কী, ড্যাম ইট !

যাঁদের নাম ভাঙিয়ে বাঙালী এখনও চালাচ্ছে, তাঁরা কেউ ধনকুবের ছিলেন না। নিজেদের ব্যারণ কিংবা লর্ড ভাবতেন না। বড় হবার বীজ ভিটামিনে নেই, আছে চরিত্রে। আমাদের সবকিছুই এখন ক্যারিকেচারের মত।

নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ে চলেছি। সংসার করছি, সংসারকে নিয়ন্ত্রণ রাখার মত ব্যক্তিত্ব নেই। আগেকার দিনের কর্তারা একবার 'না' বললে, কারুর বাবার ক্ষমতা ছিল না, 'হ্যাঁ' করার। সামান্য একটু গলা খাঁকারিতে সমস্ত বাড়িটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। কি হচ্ছে কি, বললেই সব বাঁদরামি ঠাণ্ডা। এখন সংসার চালাবার ধারাটাই আমরা বদলে ফেলেছি। যিনি ভালমানুষ তিনি সাত চড়েও রা কাড়বেন না। ন্যায়েও তাল দিচ্ছেন অন্যায়েও তাল দিয়ে চলেছেন। সবাই মাথায় চড়ে নাচছেন। সংসারে তিনি প্রয়োজনের মানুষ। গরু যদ্দিন দুধ দেবে তদ্দিনই তার খাতির। দুধ ফুরোলেই খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবে। খোঁয়াড়ে হয়তো দেবে না, তবে বাড়ির পরিবেশটাকে এমন করে তুলবে মনে হয়ে যেন খোঁয়াড়।

সংসারে আর এক ধরনের গৃহী পাওয়া যাবে তাঁদের সমাজবিরোধী বললেও অন্যায় হবে না। সংসার করছেন কিন্তু দায়িত্ব পালনে কাতর, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের খবর রাখেন না। এঁরা ঠিক উদাসী নন, জোর করে ধরে সন্ন্যাসীকে গৃহী করা হয়েছে, তা নয়। এঁরা সূক্ষ্ম বিচারে এক ধরনের অপরাধী। চরিত্রে বাঁধন নেই। রেস খেলছেন, মদ্যপান করছেন, অন্যান্য ব্যাপারেও বেশ সড়গড়। সংসারে অহরহ চুলো জ্বেলে রেখেছেন।

আসল কথা, মানুষ আর নেই। কিছু প্রাণী আছে, যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, আয়েসী। নাচালে

নেচে ওঠে। কি করলে ভাল হতে পারে, সেই জ্ঞানটাই হারিয়ে গেছে। কোন বাড়িতেই আর শান্তি নেই। খেয়োখেয়ি, চুলোচুলি। সবাই স্বাধীন। প্রাণ যা চায় তাই করব। মানামানি আবার কি!

যাঁরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁরা পথ বের করে ফেলেছেন। মুখ বুজে একপাশে পড়ে থাকি। যার যা প্রাণ চায় করে যাও। যদ্দিন পারব আবদার রাখার চেষ্টা করব।

এ যুগে সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছেন এই মনোবৃত্তির মানুষ, স্রোত বইছে উল্টোদিকে, সরে থাকার উপায় নেই, ভেসে চল। এঁদের প্রায়ই চোখে পড়বে, বাসে ওঠার দাঙ্গায় এঁরা নেই, একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন উদাস মুখে। ভাবছেন, এ তো মানুষের আচরণ নয়, ক্ষিপ্ত পশুর। শাসকরা তো মানুষ চান না, পশুই চান। পশুর ছবি তিনটি, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। র‍্যাশানে পচা চাল, খুপরিতে নিদ্রা আর মৈথুন। কোন কালে মহিলা এত সহজপ্রাপ্য ছিল! ফ্রি-সেক্সের নামে চতুর্দিকে পর্ণোগ্রাফির স্রোত বইছে। ছায়াছবি মানেই যৌনতা, খুন, জখম, রাহাজানি, বলাৎকার। এর বাইরে আর কিছু নেই।

মানুষকে প্রাথমিক স্তরে রাখতে পারলে রাজত্ব চালানো সহজ হয়ে যায়। 'মেটো' তো মানুষকে ফেলে রাখ। পোকার মত কিলবিল করুক, এক জায়গায় অনেক মানুষ মানে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি। অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়! প্রতি মুহূর্তের বাঁচার সংগ্রামেই ক্লান্ত। ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই। বিচার-বুদ্ধি লুপ্ত, আকৃতি মানুষের, চরিত্র পশুর, এই ধরনের জীবকে সহজে কিনে ফেলা যায়, খেপিয়ে তোলা যায়, যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়।

গণতন্ত্রের প্রহসনে এরা একনম্বর উপাদান।

নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিক, অনুদার, নীচ। সামান্য কিছু পেলেই এরা হাত তুলে জয়ধ্বনি দেবে, কখনও এক হতে পারবে না। এদের সব দাবিই হবে ব্যক্তিগত। আমাদের বলে তেড়ে আসতে পারবে না। কয়েকটাকে কিছু দিলেই তারা নেতা হয়ে বাকিগুলোকে নাচাতে পারবে। মানুষটাকে মারতে পারলেই সমস্যা সহজ। কুকুর কখনো দাবি করবে না, আমার জন্যে স্বর্গ তৈরি করে দাও। তার দাবি একটুকরো হাড়। মানুষের দেবশক্তি জেগে উঠলে ভয়ের কথা, সে আর তখন ভয় পাবে না। অথচ ভয়ই হল একমাত্র অস্ত্র।

অল্প কয়েকজনের জন্যে দানবীয় ব্যবস্থা রেখে বাকি সকলকে ঠেলে দাও নরকে। যমদূত তৈরি রাখো, সময় মত ড্যাণ্ডোস মারো। পেশাদার গুণ্ডাদের কুচকাওয়াজ চলুক। কোন কিছুই সহজপ্রাপ্য রেখো না। তেল নেই, চাল নেই, শিক্ষা নেই, বিদ্যুৎ নেই, পরিবহন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, বাসস্থান নেই। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে থাকতে বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। ছেলেধরা কলসীর মধ্যে বাচ্চাকে রেখে বিকলাঙ্গ তৈরি করে। রাজনীতির কারখানায় বিকলাঙ্গ তৈরি হচ্ছে। ন্যালা খ্যাবলা মানুষের দল, স্বভাবে শয়তান। কোন কালে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা এমন ভয়ঙ্কর ছিল! প্রতি মুহূর্তে জীবনমরণ সমস্যা। সংস্কৃতির বড়াই। অন্য দেশের মানুষ গ্রহান্তরে চলে গেছে। আমাদের মুখে বড় বড় কথা। ব্রেশট, ডিস্কো, কামু, কাফকা, ১৯৮২ সাল। শতাব্দী শেষ হতে চলেছে, কম্পিউটার কোটি মাইল দূরের উপগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আর এদিকে উন্মত্ত জনতামানুষ থেঁতো করছে। চোখ খুবলে তুলে নিচ্ছে, পেট্রল ঢেলে জ্যান্ত মানুষ

পোড়াচ্ছে ; শিশু, নারী কারুকেই নিষ্কৃতি নেই। এরই নাম শাসন। এরই নাম নেতৃত্ব। এরই নাম রাজনীতি। এরই নাম প্রগতি।

কে বলেছিলেন, মানুষ অমৃতের পুত্র ! মানুষ চিরকালই গরলপুত্র। বিশেষত আমরা।

বড়ি ও শ্বশুরমশাই

'এই শীতকাল, এমন মিঠে রোদ, একটু বড়িটড়ি ত দিতে পার।' ডাল দিয়ে ভাত চটকাতে চটকাতে অসীম ব্যাজার ব্যাজার মুখে কথা ক'টা স্ত্রীকে মিহি করে বলল। হুকুম-টুকুম নয়। একটা সামান্য অভিলাষ। এইটুকু বলে থেমে থাকলে ক্ষতি ছিল না। সে আর একটু এগিয়েই বিপদ ডেকে আনল। 'মাও গেছেন খাবার বারোটাও বেজে গেছে।'

মনোরমা মাথা নীচু করে সরষের তেল দিয়ে আলুভাতে মাখছিল। মুখ না তুলেই বলল, 'রাখো রাখো, মা যে তোমাকে রোজ পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াতেন তা আমার দেখা আছে। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কোর না।'

'হ্যাঁ, মায়ের কথা বললেই ত তোমার গায়ে জ্বালা ধরবে। সেই লাস্ট নাইটিন সেভেনটি সেভেনে একবার নারকোল, ছোলাটোলা দিয়ে মোচা হয়েছিল, সেভেনটি ফাইভে হয়েছিল থোড়। তারপর থেকে লাগাতার চলছে, ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাছের ঝাল ; মাছের ঝাল, আলুভাতে, ভাত, ডাল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।'

'আমারও।'

'হ্যাঁ আমার যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও তাই হবে। শুধু হবে না, ডবল ডোজে হবে। বেশ কৌশল শিখেছ। তোমার ঘেন্না ধরার কারণটা কি ?'

'কেঁচো খুঁড়তে যেও না সাপ বেরোবে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। মোচা, নারকোল, থোড় না নিয়ে এলে আমি কি জন্ম দেবো ?' ধপাস করে আলুভাতের একটা টেনিস বল পাতে ফেলে দিয়ে মনোরমা উঠে গেল। রান্নাঘরে গনগনে উনুনে মাছ ভাজা হচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে এল। গরম তেলে মাছ বিজবিজ করছে মনোরমার মেজাজের মত। একবার যদি সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া দুম করে মেঝেতে পড়ে মনোরমার ঠোঁট ফসকে বেরোনো বাক্যের চেয়েও অসীম আহত হবে। বড় ভয় পায় এই মুহূর্তকে। মনোরমা থালার সামনে উবু হয়ে বসে ভীত অসীমের পাতে একটি চারাপোনা ফেলে দিল। ন্যাজের দিকটা নুনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ আগের কথার যে উত্তরটা মনে মনে মকশ করছিল তা বলা যেতে পারে।

'গর্ভে মোচা ধারণ করতে গেলে কলা গাছের বীজ চাই, সে কথা আমি জানি ; কিন্তু ওই তিন বস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে তোমার মুখ ত তোলো হাঁড়ির মত হবে। এ ত আর তোমার ড্রেসিং নয়। ঘাড়ে পাউডার, ভুরুতে পেনসিল, কপালে

কুমকুম। মোচা ড্রেস করার একটা আলাদা আর্ট আছে। সে আমার মা জানতেন।'

কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোরমা বললে, 'হ্যাঁ তোমার মা সব জানতেন। কবিরাজের মেয়ে ছিলেন ত। শেকড়-বাকড়, পাতা-মাতা, কচু-ঘেঁচু।'

'আর তুমি হলে অ্যালোপ্যাথের মেয়ে মাছ, মাংস, লিভার পিলে।'

'আমি কার মেয়ে সে ত ভালো করেই জানো। অত ঠেস দিয়ে কথা বলার কি আছে ? ডাক্তারের মেয়ে হলে তোমার মত মোচা-খেকোর গলায় কি আর মালা দিতুম। টাকার জোরে ব্যারিস্টার জুটত।'

অসীম হেসে ফেলল। দুজনের ঝগড়া এই ভাবেই শুরু হয়ে হাসিতে শেষ হয়। মনোরমা বড় ভাল মেয়ে। একা সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। সহজ সরল মেয়ে। বেশি খাটাতে চায় না বলে অসীম সাবেক কালের খাবার ফ্যাচাং বাড়িতে ঢোকাতে চায় না আবার সুযোগ পেলে বলতেও ছাড়ে না।

অসীম অফিস চলে গেল। মনোরমা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঠিক করে ফেলল, যা থাকে বরাতে আজ সে সারা দুপুরে বসে বসে বড়ি দেবে। কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার। ডাল বেটে, নুন দিয়ে ফেটিয়ে একটা সাদা কাপড়ের ওপর টুকুস টুকুস করে পেড়ে যাওয়া। সমস্যা নাক নিয়ে। নাক উঁচু উঁচু না হলে বড়ি দেখে নাক-উঁচু মানুষের মন ভরে না। থ্যাবড়া নাকী মেয়ে যেমন বিয়ের বাজারে অচল, চ্যাপ্টা নাক বড়িও তেমনি সমঝদারের সমালোচনার বস্তু।

শঙ্করীর মা বাড়িতে কাজ করে। সেই হ'ল মনোরমার উপদেষ্টা। উপদেষ্টা বললে, 'আজ ত হবে না মা। ও রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে বাটতে হবে। তুমি আজ ভিজিয়ে রেখ, কাল সকালে আমি বেটে দোব।' কাল মানে রবিবার। সেই ভাল। রবিবার ছুটির দিন। অসীমের সাহায্যও পাওয়া যাবে।

রবিবার বেলা একটা নাগাদ ডালবাটা রেডি হয়ে গেল। কালো জিরে ভাজছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এইবার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা ছাদে বসে বড়ি দেবে।

'তোমার এই ধুতিটা নিচ্ছি।'

অসীম লাফিয়ে উঠল, 'কেন ? আমার ওই সাধের নতুন ধুতিটা তোমার কোন কম্মে লাগবে ?'

'বড়ি দোব।'

'বড়ি দেবে আমার ধুতিতে ? মামার বাড়ি ! নিজের শাড়িতে দাও।'

'আটপৌরে নতুন শাড়ি নেই। তোলা শাড়ি একটা দেড়শো-দুশো টাকা দাম। সোনার বড়ি হলে দেওয়া যেত। ডালের বড়ি কি ফুল ভয়েলে দেওয়া যায় ?'

'তাহলে বিছানার চাদরে।'

'চাদরে ? অপবিত্র জিনিস। তোমার কোনও ভয় নেই। বড়ি খুলে নিয়ে কেচে দোব, ইস্তিরি করে নিলেই যেমন নতুন তেমনি নতুন। ধুতিটা ত পড়েই থাকে। তুমি ত প্যান্ট আর পাজামা পরেই সারা জীবন কাটালে।'

রাজি না হয়ে উপায় কি ! বড়ির হুজুক সেই তুলেছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ সার সার বড়ি অসীমের কাঁচি ধুতির ওপর থেবড়ে থেবড়ে বসে গেল। তেমন টিকোলো নাক সবক'টার হল না। শঙ্করীর মা জ্ঞান দিলে, 'ভগবানের সৃষ্টিতেই মা কত খুঁত। মানুষের হাতে সব কি সমান হয়। পাড়া বড়ির নাক ধরে আর টানাটানি করুনি ; জন্মের পর মানুষেরই আর কিছু করা যায় না। এতো ডালের বড়ি।'

বড়ির পুংলিঙ্গ বড়া। কিছু বড়া হল, কিছু বড়ি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মনোরমা এসে অসীমকে বললে, 'এই যে মশাই। তোমার কাগজপত্র নিয়ে ছাতে উঠে যাও। ইজিচেয়ার পেতে বসে বসে পড় আর বিড় পাহারা দাও।'

'যথা আজ্ঞা।' ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে অসীম কাগজ পড়ছে। কিছু দূরেই কাপড়ে সত্যাগ্রহীর মত বসে আছে সার সার বড়ি। মিঠে রোদ, মিষ্টি হাওয়া, পাখির ডাক। কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে। দু' একটা কাক মাঝে মাঝে পাশে হেঁটে হেঁটে খড়খড় করে বড়ি ঠোকরাতে আসছে।

অসীম হুস করলেই উড়ে পালাচ্ছে। এ এক ভাল জ্বালা যা হোক। একেই কি বলে, যমে মানুষে টানাটানি। কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়। অসীমের চোখ বুজতে বুজতে বুজেই গেল।

মনোরমার চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। 'এ কি ? আমার বড়ি কোথায় ?' মনোরমার হাতে বিকেলের চা। অসীম চোখ মেলে দেখলে, ফাঁকা ছাদ। কোথাও বড়ির নামগন্ধ নেই।

'তুমি তুলে নিয়ে গেছ।'

'তুলে নিয়ে যাব কি। ভাল করে শুকনোই হল না।'

'ভৌতিক ব্যাপার ত ? আচ্ছা রসিকতা ! আর কেউ এসেছিল ?'

'কে আবার আসবে ? তোমাকে পাহারায় রেখে গেলুম তাহলে কি জন্যে ?'

'কাকের ত এত ক্ষমতা হবে না ? দশহাত ধুতি ঠোঁটে করে নিয়ে পালাবে।'

'পারে, ওরা সব পারে। এক সঙ্গে একশো কাক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে...।' মনোরমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই দেখ ? আমগাছের ডালে ওটা কি ঝুলছে।'

অসীম আমগাছের মগডালের দিকে তাকাল, সাদা একটা কাপড় ঝুলছে।

'হ্যাঁ, ওই ত তোমার সেই বড়ি। ওই ত আমার সেই নতুন কাপড়। ওখানে গেল কি করে ?' হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতার আড়ালে তিনি বসেছিলেন ন্যাজ ঝুলিয়ে। কাপড়-সমেত এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ মারলেন, হুপ করে।

'আরে এ ত সেই বীর হনুমানটা।'

'আমার কাপড় ! সর্বনাশ হয়ে গেল মনোরমা। টেনে টেনে ফর্দাফাঁই করে দিলে।'

'আমার বড়ি ? আমার এতক্ষণের পরিশ্রম। মুখপোড়া হনুমানে খেয়ে নিলে ! কার জন্যে বড়ি দিলুম আর কার ভোগে গেল !'

'একছড়া কলা আনো, কলা। কাপড়টা অন্তত উদ্ধার করি।'

'কলা কোথায় পাব ?'

'তাহলে ?' তাহলে, দু'জনে ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনা করলে। 'হে বাবা

রামের বাহন ! হে পবনসুত। হে বাবা গান্ধীজীর চেলা। হে ভগবান হনুমান।' হনুমানের কোনও সুমতি দেখা গেল না। অসীম রেগে বলল, 'ঠিক আমার শ্বশুরমশাইয়ের মত একগুঁয়ে।'

'অ্যাঁ, কি বললে ?'

'তখন তোমাকে কি বলেছিলুম ? কাপড়ে দিও না। কাপড়ে দিও না। শুনলে ?'

'কে বড়ি বড়ি করে লাফিয়েছিল ?'

'ওই যে আমার শ্বশুরমশাই কাঁচি ধুতি পরে খাচ্ছেন।'

আবার ভীষণ ঝটাপটি হয়ে গেল দু'জনে। আর সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ধুতিটা আমগাছের ডালে ঝুলে রইল একটা সিজন ধর্মঠাকুরের নিশান হয়ে।

বাড়িঅলা

অনেকদিনের ইচ্ছে, ছোট্ট-খাট্টো একটা বাড়ি তৈরি করব। বেশ বাংলো প্যাটার্নের। চারপাশে ছবির মত বাগান। রুমালের মাপের সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। গ্রীষ্মের বিকেলে পাশাপাশি দুটো বাগানচেয়ারে বুড়ো-বুড়ী বসে বসে ফুরফুরে হাওয়া খাব। আকাশে একটা, দুটো করে তারা ফুটবে ! পশ্চিম আকাশে ক্ষয়া চাঁদ উঠবে। হ্যাঁ, গোটাদুয়েক মন্দির ঝাউ বসাব। হাওয়া লেগে যে ঝাউয়ের একটা দুটো পাতা নয়, সারা গাছটাই দুলতে থাকে ওড়িশী নর্তকীর ছন্দে। তারপর যেদিন ছেলের বিয়ে দোব। ভাবা যায় না। হলদে আর নীল রঙের ফুটকি ফুটকি আলোর মালা ঝোলাব সারা বাড়িতে। হাল্‌কা হলুদ রঙের দেয়ালে স্বপ্নের মায়া গড়াতে থাকবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। আলোর মালা দিয়ে গাছ সাজাব। মনে হবে, কলকাতার উপকণ্ঠে বসে নেই, বসে আছি হাওয়াই দ্বীপের মায়ালোকে। অদৃশ্য সুন্দরীরা গাছের ফাঁকে ফাঁকে নেচে চলেছে। বেনারস থেকে সবচেয়ে বড় ওস্তাদ আনাব। সানাইয়ের মিঠে সুর ধূপের ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়বে। অবশেষে একদিন দক্ষিণের জানালা খোলা শোবার ঘরে, ধবধবে সাদা বিছানায়, আমি চললুম গো বলে শুয়ে পড়ব। কোনও ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, শ্বাসকষ্ট নেই, সজ্ঞানে স্বর্গে গমন। স্বর্গেই যাব, জীবনে আমি কোনও পাপকর্ম করিনি। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী হলেও, আমার স্বভাবটি ভাল। প্রতিবেশীর ভাল দেখলে বুক ফেটে যায় ঠিকই, তবে সেই সাবেক কালের বধূদের মত, বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। নিয়মমত দেবালয়ে যাই। নিজের ভালর সঙ্গে অন্যের ভালও কামনা করি। সুন্দরী মহিলাদের দিকে আড়ে আড়ে তাকালেও, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গর্জন করতে থাকি—মা মা।

কথায় বলে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

সঞ্চয়ের দিকে ষোল আনা নজর দিলুম। যেটুকু খরচ না করলেই নয় ; সেইটুকু বজায় রেখে বাকি সব ছাঁটাই। রাজনৈতিক নেতাদের মত একটা স্লোগানই তৈরি করে ফেললুম—ইকনমি, ইকনমি, মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। আগে একটা বাড়ি, তারপর অন্য

সব।

বাড়িতে শিশু যখন কেউ নেই তখন দুধেরও কোনও প্রয়োজন নেই। চায়ের জন্যে ছোট এক টিন গুঁড়ো দুধেই এক মাস চলে যাওয়া উচিত। না চললে র চা। গৃহিণী মাসখানের মধ্যেই রব তুললেন, পড়ুয়া ছেলেরা দুধের অভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি কমে যাচ্ছে। অঙ্ক কষতে পারছে না। স্মৃতিশক্তি কমে আসছে।

আমি বললুম, ওসব কিছু না। ও ব্যাটা মায়ের দিকে গেছে। তোমার মোটা মাথাটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ও মগজের গোড়ায় জোলো দুধ যতই ঢাল, কিস্যু হবে না। একটা বাছুরকে দুধ খাওয়ালে, সে কি আইনস্টাইন হবে। অকাট্য যুক্তি। এ যুক্তি জজেও মানবে। উঠতি বয়েসের ছেলেদের শরীরের জন্যে এক মুঠো ভিজে ছোলা, দু'এক কুঁচি আদাই যথেষ্ট। ছোলাপোষ্য ওয়েলার ঘোড়া দেখেছ। বড়বাজারের পাতাখেকো ষাঁড় দেখেছ!

মাছও বাতিল। আমরা মানুষ, বেড়াল নই। পচা মাছ ছাড়া ভাত উঠবে না, তা ত নয়। নিরামিষের মত আহার নেই। দেহ পবিত্র থাকে, মন পবিত্র থাকে। বই খুলে দেখালুম। মাছ, মাংস, ডিম খেলে আমাদের কোলনে এমন সব জীবাণু জন্মায় যা আমাদের শত্রু। শরীর বিষিয়ে তোলে। নিরামিষ আহারে যে-সব জীবাণু জন্মায় তারা আমাদের বন্ধু। তলপেট শত্রুর দখলে চলে যাক, এই কি তোমরা চাও?

গৃহিণী বললেন, কোলন কাকে বলে?

তলপেটের ডানপাশে খাবলে ধরে দেখিয়ে দিলুম, এই সেই বিখ্যাত কোলন যার প্রদাহকে বলে কোলাইটিস। হলে সারে না। ধীরে ধীরে মৃত্যু। শাকপাতা খেয়ে নিজের বাড়িতে দীর্ঘজীবি হবে, না পচা মাছ খেয়ে পটল তুলবে।

মৃত্যুভয়ের চেয়ে বড় ভয় আর কিছু নেই। মাছ বাতিল হল। বেশ বড় দুটো খরচ বাঁচানো গেল। এইবার তেল। খাওয়ার আর মাখার। মেয়েদের চুল সাংঘাতিক তেল খায়। ভাল করে মাখলে, এক এক খেপে দুশো গ্রাম। শরীরে আজকাল আর তেমন তেল কেউ মাখে না। কুস্তির পালোয়ানরা মাখে। আমাদের পালোয়ান হবার শখ নেই। আমরা বাড়িওয়ালা হতে চাই।

গৃহিণীকে শোবার ঘরে ডেকে, ম্যাগাজিন খুলে চিত্রতারকাদের চুল দেখালুম।

রেশমের চামর দুলছে পিঠের ওপর। তোমার ইচ্ছে করে না, অমন চুলের মালিক হতে?

লাজুক লাজুক মুখে বললে, ওরা কত যত্ন নেয়।

তুমিও নাও। তেল মাখা বন্ধ করে মাঝে মাঝে চুলে ব্যাসন ঘষ, তোমার চুলও ওই রকম হয়ে যাবে। তোমার লজ্জা করে না?

মাথার বালিশের খোলটা দেখালুম। খুনের মামলায় কোর্টে যেভাবে অপরাধের চিহ্ন এক, দুই করে দেখানো হয়।

এই দেখ তোমার বালিশ! এই বুড়ো আঙুল টিপসই দেবার মত চেপে ধরলুম। কেমন? এইবার তুলছি দেখ! এত আঠা, বিছানা ছেড়ে আধ হাত ওপরে উঠে আসছে। উচ্চ সমাজের ফ্যাশানেবল মহিলারা এই জিনিস দেখলে ছি ছি করবেন!

একে বলে শকথেরাপি। এই চিকিৎসায় পাগল ভাল হয়। স্ত্রী তেল মাখা ছাড়লেন। দেখতে, দেখতে ভৈরবীদের মত চেহারা হল। তা হোক। এ ত ঘরের বউ। বিশ্বসুন্দরী হবার জন্যে ত আর হনুলুলু ছুটবে না।

হার্টের ভয় দেখিয়ে তেল খাওয়াটাও বন্ধ হল। ঝাল, ঝোল, ভাজা খেয়ে বিধবা হতে চাও, না সেদ্ধ খেয়ে সধবা ?

নেচার কিওরের বই খুলে দেখিয়ে দিলুম, ভারতবর্ষের জনৈক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন ! সাবান চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। জল, আর হাত এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কিছু নেই। চামড়া উজ্জ্বল আর মসৃণ থাকবে। সহজে বুড়ো হবে না। আমার কথা নয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা। যিনি নব্বই বছরেও যুবক।

সাবানের খরচও বেশ কমে গেল। চল্লিশ পাওয়ারের বেশি আলো কোথাও রাখলুম না। বাঙালীর চোখে চালসে ধরবেই। চশমা নিতেই হবে। ষাটের পর ছানি অপারেশন। ইলেকট্রিক বিল যতটা কমে ততই ভাল। মাসে দশ টাকা বাঁচা মানে কুড়িখানা ইট। যা বাঁচবে তাকে বাড়ি তৈরির মাল মশলায় নিয়ে এলে কষ্টকেও আনন্দ মনে হবে। যেমন কাজের মহিলাটিকে ছাড়িয়ে দিলে মাসে ষাট টাকা বাঁচবে। তার মানে এক বস্তা সিমেন্ট। এক বছরে বারো বস্তা। তার মানে একতলার গাঁথনি।

বাথরুমে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, ভয়ঙ্কর লো-প্রেসার মশাই। খাওয়া-দাওয়া ঠিক হচ্ছে না। একটু প্রোটিন খান। সকালে হাফবয়েল। রাতের দিকে হোয়াইট মিট, স্ট্যু করে। এক গেলাস দুধ। কাজকর্ম করে খেতে হবে ত। আজ বাথরুমে পড়েছেন, কাল যদি পথে উল্টে পড়েন, বাঁচবেন ?

এ কান দিয়ে শুনলুম ও কান দিয়ে বের করে দিলুম। যত সব কেতাবী কথা। সারা ভারতের নব্বই ভাগ মানুষই ত তাহলে উল্টে পড়বে। উল্টে উল্টে, কেতরে কেতরেই এদেশ চলবে ! এটা কি বিলেত ! রিডার্স ডাইজেস্ট পড়লুম, স্রেফ জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কায়দাটাই জানি না. ল্যাদাড়ুসের মত বেঁচে আছি। সাঁ করে টান, সিঁ করে ছাড়। আসলে রাতের খাওয়াটা বদহজম হচ্ছে। একাহারী হলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। যে বয়েসের যা। খরচও বাঁচবে। দু' টাকা বাঁচা মানে একটা ভেনটিলেটার।

জগাছার কাছে চার কাঠা জমি ওরই মধ্যে সস্তায় পাওয়া গেল। তিন হাজার টাকা কাঠা। একটু একটেরে। স্টেশান থেকেও যেমন দূর, বাস স্টপ থেকেও তেমন দূর। মাইল দেড়েক হাঁটতেই হবে। তা হোক। হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কত লোক শখ করে হাঁটে। কত বীর হেঁটে বিশ্ব ঘুরে আসছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

এদিকে ভিটামিন আর প্রোটিনের অভাবে কত্তা গিন্নির গোহাড়গিলের মত চেহারা হয়ে গেছে। তা যাক। ভুঁড়ো নাদা হয়ে সারা জীবন পরের বাড়িতে বাস করার চেয়ে কঙ্কাল হয়ে নিজের ভিটেয় ঘোরা ঢের ভাল। এই যে রোববার রোববার যখন সস্ত্রীক নিজের জমিতে যাই, মন ভরে ওঠে। মনে হয় টাকে চুল গজিয়ে উঠছে আনন্দে। সত্যিই কি আর গজায় ! মনে হয় জায়গাটা আগাছায় ঢেকে আছে। মনুষ্যাকৃত্যের গন্ধও পাওয়া যায়। তা যাক। কল্পনায় মানুষ কত কি দেখতে পায় ! আমি বাগান দেখি, গোলাপ

দেখি, ঝাউ দেখি। আমার বাংলো প্যাটার্নের হলুদ বাড়ি দেখি। আমার স্ত্রী অবশ্য এ সব দেখতে পায় না। মেয়েরা বড় বস্তুবাদী।

জগাছা থেকে একদিন ফিরে এসে আমার স্ত্রী দাঁত ছিরকুটে পড়লেন। ডাক্তার বললেন, কি করেছেন মশাই অ্যাক্যুট অ্যানিমিয়া! ডাক্তারদের যা ধর্ম। তিলকে তাল করেন। কোন্ বঙ্গললনার অ্যানিমিয়া আর অম্বল নেই! জনৈক কবিরাজ আমাকে অ্যানিমিয়ার টোটকা শিখিয়েছিলেন, নতুন কড়ায় থোড় রেঁধে খাওয়া। এমন কিছু খরচ নয়। এই সময় অ্যালোপ্যাথি করতে গেলে, বাড়ির স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। বারো হাজার জমিতে গেছে। বর্ষার আগে লিন্ট্যাল অবধি তুলে ফেলে রাখব। তারপর লোন পেলে বাকিটা শেষ করব। দোতলা আমি করব না। একতলা করব, তবে সম্পূর্ণ করব। আধখ্যাঁচড়া নয়।

বোশেখে ভিতপুজো হয়ে গেল। আমার স্ত্রী কোন রকমে গেলেন। বাড়ি করার চিন্তাটা আমার কাছে ভিটামিনের মত হলেও আমার স্ত্রীর শরীরে তার কোনও প্রভাব দেখছি না। সব সময় যেন ধুঁকছে। অসুখ ত মনে। মনটাকে শক্ত কর। বলে বলে আর পারলুম না।

মার খাওয়া কুকুরের মত ফিরে এল। আসার পথে যত মন দুর্বল করা কথা। আমার আর বাড়ি দেখা হল না। যাক, তোমরা সুখী হও। আমি ওপর থেকে দেখব। কথা শুনে নিজের চোখেই জল এসে যাবার যোগাড়।

মাসখানেক ছুটি নিলুম। বাড়ি বেশ তর তর করে উঠছে। আমার স্ত্রীর শরীরও তরতর করে ভাঙছে। হাত-পা মুখ ফুলছে। অনেকের বাড়ি সহ্য হয় না। কি জানি বাবা! সত্যি সত্যিই চলে যাবে নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা বলতে লাগলেন কি বাড়ি বাড়ি করছ। আগে স্ত্রীকে বাঁচাও। ছেলে বড় হচ্ছে। সে একদিন স্পষ্টই বলে বসবে সত্যি মিথ্যে জানি না, আগে ব্রিজ তৈরির সময় প্রত্যেক পিলারের তলায় একজন করে মানুষ বলি দেওয়া হত। বাবার হয়েছে তাই। মায়ের সমাধি তৈরি করছে।

মনে বড় আঘাত পেলুম। বাড়ি কি শুধু আমার জন্যে। ঠিক আছে তোমরা যখন চাইছ না, তখন কাজ বন্ধ থাক। চিকিৎসাই হোক। জীবন আগে তারপর বাসস্থান। আজকাল চিকিৎসার খরচ ত কম নয়। এই পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা, ওষুধ, ইনজেকসান। শেষে বায়ু পরিবর্তন।

এদিকে বর্ষা এসে গেল। ইটের গায়ে শ্যাওলা পড়ে এল। আগাছা মাথা তুলেছে। কি আর করা যাবে! ব্রেস্ত ফাঁক। এখনও পাঁচ ছ' ফুট তুললে তবে লিন্ট্যাল। তবে ঋণের আবেদন। হাঁটাহাঁটি, ধরাধরি, তবে লোন। শরীরে আর সে শক্তি নেই।

অ্যানিমিয়ার রুগী সেরে উঠছে। উঠলে কি হবে, বয়েস ত বেড়েছে। এ বয়েসের শরীর একবার ভাঙলে আর আগের মত হয় না। পুরনো বাড়ি যতই রিনভেট কর না, মনের মত হয় না।

রবিবার একা একা জগাছায় যাই। হাঁটুভর জঙ্গল। গাঁথনির ওপর বসে বসে ভাবি এইটা হবে বসার ঘর, বসার ঘর থেকে বেরিয়ে পুব পশ্চিমে লম্বা করিডর। দক্ষিণে শোবার ঘর, একটা দুটো। সব ডবল জানালা। ফুল ফুল গ্রিল বসানো। উত্তরে স্টোর,

রান্নাঘর, বাথরুম। বেশ খোলামেলা একটা ডাইনিং স্পেস। দুপাশে চওড়া বারান্দা। পশ্চিমে উঠোন। উঃ যা হবে না!

ভাবতে ভাবতে ঘোর লেগে যায়। দিনের আলো নিবে আসে। পায়ের কাছে কাঠবেড়ালী খেলতে আসে, একজোড়া ঘুঘু চরতে আসে, পোকামাকড় লাফায়, সরীসৃপ সরসর করে বেড়ায়। আমার ভয় করে না।

আমি উঁচু গলায় বলি, আমি তোদের বাড়িঅলারে ব্যাটা। তিনমাস ভাড়া বাকি পড়েছে। এবার কেস করব।

কিন্তু কোন্ আদালতে!

সাত টাকা বারো আনা

বেশ পাকা পকেটমাররাই মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রী হয়ে জন্মায়। এই মহাসত্য আমার অজানাই থেকে যেত যদি না আমি বিবাহ করতুম। এর মধ্যে আবার আর একটি সত্য আছে। সেটাও আমার আবিষ্কার। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মতই আকস্মিক। অথচ সাংঘাতিক। বেদান্ত বলেছেন সত্য গুহায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনতে হয়। যে স্বামী নাড়ুগোপালের মত হামা দিয়ে প্রাক-বিবাহ পর্বে স্ত্রীরূপী নাড়ুটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই এই ফাউ সত্যটি লাভ হয়। কি সেই সত্য! প্রেমিকা যদি স্ত্রী হয়ে জীবন-আঙিনায় নৃত্য করতে আসেন, তাহলে তিনি ত নেত্যকালী হবেনই, সেই সঙ্গে 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মত শুধু পকেটমার নন, চোরও হবেন। অনেকটা অ্যালসেসিয়ান চোরের মত। অ্যালসেসিয়ান চোর জিনিসটা কি? একটু ব্যাখ্যার দরকার। ছিঁচকে চোর আছে, সিঁদেল চোর আছে, যে বস্তুটি বলছি সেটি কি? অ্যালসেসিয়ানের ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি খুব প্রখর এবং বিশ্বস্ত। সেই অ্যালসেসিয়ান যদি চোর হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করা বউয়ের মত হবে। এমন বউয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় বড় সাংঘাতিক।

বুক পকেটে সাত টাকা আর পাশ পকেটে বারো আনা। জামা ঝুলছে হ্যাঙারে। সংসার খরচের টাকা, আলুকাবলি, ঘুগনি, ফুচকা খাবার টাকা, সিনেমা দেখার টাকা, সবই সেই মহীয়সীর হাতে জমা করে দিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা টাকায় লেংচে লেংচে আমার মাস চলে। লোকলৌকিকতা হলে সেই অর্থেও সংসার খাবলা মারে। তখন টিফিনে মুড়ি আর গুটিকয়েক বাদামদানা খেয়ে দিন চালাতে হয়। প্রেমের তুফানে অর্থনীতির নৌকোর তলা ফেঁসে গেছে। মনকে বোঝাই, ওরে মন, পস্তাও মাৎ, প্রেম বড় পবিত্র মাল। লায়লা-মজনুর কথাই স্মরণ কর। রামী-চণ্ডীদাসের কথা ভাব। বিল্বমঙ্গলের উদ্দেশে প্রণাম কর। প্রেম যুগে যুগে। পচা বাদাম চিবিয়ে মুখের বারোটা বেজে গেছে। কুছ পরোয়া নেহি। অধর সুধা পানে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

অফিসবারে সকালের দিকেই যত ফ্যাঁকড়া বেরবে। হঠাৎ জগন্নাথবাবু আসবেন।

বললেন, আচ্ছা মশাই সিমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আপনার কেউ জানাশোনা আছে ? নেই ! হেলথ ডিপার্টমেন্টে ? তাও নেই ! মোটর ভিহিকলস ? তাও নেই ! কি আছে আপনার ? খালি আপনি আছেন আর আপনার ছায়া আছে ? সমাজের কোনও কাজেই লাগবেন না ? সমাজবন্ধু হতে পারেন না ? ওয়ার্থলেস বাঙালী।

অথবা কাকে স্টেনলেস স্টিলের চামচে ঠোঁটে করে নিয়ে নিম গাছের বাসায় গিয়ে ছেলেকে পুডিং খাওয়াচ্ছে। একটু পেড়ে এনে দাও না গো। জীবনে যে টুলে উঠে বাল্‌ব পরাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয়ে মরে, সে উঠবে নিম গাছে ! বলো কি ম্যাডাম ! আহা তুমি উঠবে কেন ? রকে গোবিন্দ বসে আছে। তাকে গোটা দুই টাকা দিলেই পেড়ে এনে দেবে।

বারো আনা দামের চামচের জন্যে দু'টাকা খরচ।

তা ত বলবেই। তুমি যে সোনার চামচে মুখে দিয়ে জন্মেছিলে ! আমি বলে কত কষ্ট করে পাঁচ কেজি কাপড় কাচার গুঁড়ো কিনে চামচেটা ফিরে পেয়েছিলুম। সুন্দর চামচে ! আমার চামচে !

তোমার চামচে ত কি হয়েছে, ওটা ত নেতার চামচে নয়। যে কাকে নিয়ে গেছে বলে, চলবে না, চলবে না করার লোক কমে যাবে !

মাদ্রাজী মহিলা হলে আমি তোমাকে আজই তালাক দিতুম। জান কি, তাদের স্টেনলেস স্টিলের প্রাণ। কিংবা, আমার সেই প্রেমাঙ্গিনী বাথরুম থেকে বিকচ্ছ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, ওগো শুনছ !

একি ? তুমি যে হিন্দী ছবির নায়িকা হয়ে আছ, একেবারে সত্যম শিবম সুন্দরম্‌। সেনসার না কেটে ছেড়ে দিলে কি করে ? এখুনি সামনের আসনের দর্শকরা যে সিটি মারবে !

আঃ রসিকতা রাখ। কি হবে ?

হাউসফুল হবে।

রসিকতা কোরো না। সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার আঙুল থেকে এক ভরির আঙটিটা সিলিপ করে প্যানে পড়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

ওমা সে কি ! আমার বিয়ের আঙটি ! একবার দেখ না, হরিয়াকে যদি ধরতে পার। হাত ঢুকিয়ে বের করে এনে দিতে পারে কিনা দেখুক।

আজ সেই রকম একটা দিন। শ্যালক আসছেন শোলাপুর থেকে। তিনি চিংড়ির মালাইকারি ছাড়া আর কিছু খান না। ক্ষীর সহযোগে খানছয়েক ফুলকো লুচি চলতে পারে। আর নতুন ফুলকপি উঠেছে। ভাপিয়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। শ্যালকের মালমশলা যোগাড় করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে গেল। তেড়েফুঁড়ে রাস্তায় বেরোতেই পিতার বয়সী শশাঙ্কবাবু গুপ্ত প্রেস আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে এক কুচকটালে প্রশ্ন করে বসলেন। গাদী খেলার কায়দায় ঝুল কেটে পালাতে চাইছি। পথ পাচ্ছি না। সাবেক কালের মানুষ, আমার চেয়ে ভাল খেলেন। কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে দিচ্ছেন না।

মুক্তি যখন পেলুম, তখন আর বাসে যাবার সময় নেই। এদিকে আজই

ইনকামট্যাক্সের হিয়ারিং-এর দিন। অনেক চেষ্টায় একটা ট্যাকসি ধরে ফেললুম। আগে চাকরি, পরে খরচের হিসেব। গাড়িতে উঠেই মনে পড়ল, পকেটে পড়ে আছে সাত টাকা বারো আনা। সাত টাকা বারো আনায় চার চাকায় চাপা যায় না। ঝাঁকামুটের চার্জও অনেক বেশি।

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। গোটা পঞ্চাশ টাকা পকেটে রাখা উচিত। যেতে হবে বাম্বুভিলা। সেখানেও কিছু পূজা অর্চনা আছে। আসতে আসতে পকেটটা একবার চেক করার ইচ্ছে হল। সাত টাকা আছে না গেছে। বুকপকেটটা আমি ইচ্ছে করেই হরেক রকম কাগজে ঠেসে রাখি। একে বলে 'অ্যান্টি-পকেটমার ডিভাইন।' টুক করে টাকা তুলে নোব, তা হবে না। বিশল্যকরণীর সন্ধানে জাম্বুবানের মত গন্ধমাদন ঘাড়ে করতে হবে। স্ত্রী মোরে করিয়াছে জ্ঞানী।

লন্ড্রির বিল বেরুচ্ছে, র‍্যাশানের ক্যাশমেমো, কোষ্ঠীর ছক ; বাজারের হিসেব, যাবতীয় ভেজাল, সবই ঠিকঠাক বুক পকেটে বহাল, টাকা সাতটাই নেই। সর্বনাশ ! পাশ পকেটেও তেমন ঝঙ্কার উঠছে না। আধুলি আর সিকি সরব দম্পতির মত সাড়া দিচ্ছে না। সিকি আধুলিকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তার মানে পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে কলকাতা শহরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বেরিয়েছিলুম। আমি কি নাগা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াব। [illegible]জের এই অবস্থাকেই বলে, বাবু একেবারে ফায়ার।

যে কেশদামে একদা হাত বোলাতে বোলাতে বলতুম চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, সেই কেশভারে তিনি চিরুনি চালাচ্ছিলেন বেশ আয়েস করে, আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন, একি ফিরে এলে ?

ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ। হুম করে গলা দিয়ে বাঘের মত গর্জন বেরুল।

কি, বড় বাইরে পেয়েছে।

মাঝে মাঝেই আমাকে অসময়ে নিম্নচাপে কাহিল হয়ে ফিরে আসতে হয় ঠিকই, তবে আজ যে অন্য কারণ। দাঁত চেপে বললুম আজ্ঞে না। সব ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ, তোমার কি কোন কালেই আক্কেল হবে না, বলতে কি হয় যে, তোমার পকেট সাফ করে দিয়েছি।

বাইরে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে, শোবার ঘরে ঢুকে গুপ্তধন খুঁজছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায় টাকা রাখি ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমেলের ট্যাকটিস। একে বলে ম্যানুভার। যুদ্ধক্ষেত্রে আর সংসারে কোনও তফাৎ নেই। তিন পাট বিছানার যে-কোনও এক পাটে খামে ভরা গোটা কতক কুড়ি টাকার নোট থাকা উচিত। খাটের চার পাশ। চার পাশের কোন পাশে আছে ? মাথার দিকে না পায়ের দিকে ? ডান পাশে না বাঁ পাশে। প্রথম পাটে, না দ্বিতীয় পাটে, না তৃতীয় পাটে। সাত ঝামেলায় স্মৃতি এখন এতই বিপর্যস্ত, কিছুই মনে থাকে না। কোথায় টাকা রাখলুম ডায়েরীতে লিখে রাখতে হয়। কম্বিনেশান তালার কোডের মত। এক জায়গায় পর পর দুদিন ত আর রাখা যাবে না।

—কি খুঁজছ অমন হন্যে হয়ে বল না। হয়ত সাহায্য করতে পারি।

—থাক তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে

কাজ নাই, তুমি এখন সরে পড়।

—বিছানাপত্তর অমন ওলট-পালট করছ কেন? বিছানায় ছারপোকা নেই।

—কি খুঁজছি তুমি ভালই জান। যদি সরিয়ে থাক, দয়া করে খামটা দিয়ে দাও। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—মাইরি বলছি আমি নিই নি। আমি নিলে বলে নি।

ভাল মানুষের মত মুখ করে তিনি সরে পড়লেন। এখন ডায়েরী ভরসা। সাত তারিখে রেখেছিলুম মায়ের ছবির পেছনে। আট তারিখে বিভূতি গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের আঠাশ পাতায়। ন তারিখে দেরাজের তলায়। দশ তারিখে কাপড়ের আলমারির তৃতীয় তাকে হলদে শাড়ির ভাঁজে। মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকতে হয়। ভুলেও ভাবতে পারবে না, তস্করের ডেরায় মাল সাজানো। এগার তারিখে বাথরুমে সেভিংসেটের ভেতরে। বারো তারিখে পুরনো খবরের কাগজের গাদায়। তেরো তারিখে রেকর্ডপ্লেয়ারের স্পিকারের তলায়। কাল কোথায় রেখেছি। মরেছে, কোনও এনট্রি নেই।

সারা ঘর তোলপাড়। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। গাড়ি হর্ণ দিয়ে অধৈর্য প্রকাশ করছে। এখন তিনিই ভরসা। আমারই টাকা আমাকে চাইতে হবে ভিখিরির মত। এখন আর খোঁজার সময় নেই। পরে এক জায়গায় চোখ বুজিয়ে বসে ধীরে ধীরে ভাবতে হবে। অফিস থেকে এলুম, জুতো খুললুম, অবিনাশ বাইরের ঘরে বসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। তারপর, তারপর কি হল! দেশলাই কোথায়, বাতি কোথায়? হই হই, রই রই। তারপর? আর মনে পড়ছে না।

হ্যাঁগা, কোথায় গেলে?

বলো, কি বলছ?

গোটা কুড়ি টাকা দেবে?

কোথায় পাব?

কোথায় পাব মানে! আজ ত সবে পনের তারিখ। সংসার খরচের টাকা নেই।

তোমাকে আমি টাকা দোব না। তুমি নিলে আর দিতে চাও না। শেষ মাসে বড় বিপদে পড়তে হয়। আগে দুচার টাকা এদিক ওদিক থেকে সরাতুম, পুষিয়ে যেত। এখন কোথায় যে রাখ খুঁজে পাই না।

ও এখন আর সরাও না! আমার দু'টাকার নোটের বাণ্ডিল থেকে রোজই সরছে। জান কি, আমি নম্বর লিখে রাখি!

তোমার সন্দেহ বাতিক।

ও তাই নাকি। তাহলে সকালে সাত টাকা চার আনা সরল কি করে। ক্লিন হ্যাপিস্। একবার বলার ভদ্রতাটাও হল না। পথে বেরিয়ে বিপদের একশেষ।

ভুলে গেছি। তুমি সব আনলে, একটু মিষ্টি আনলে না। ওই টাকায় মিষ্টি আসবে।

আবার হর্ণের শব্দ। কি টাকা তাহলে দেবে না?

দিতে পারি এক সর্তে।

ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে?

ও তো তোমার ঘড়ি নয়। বাবার দেওয়া।

বেশ, তাহলে আমার বাবার দেওয়া এই সোনার তাবিজ।

ওসব তাবিজ-মাবিজ নয়, কথা দাও আজ রাতেই ফিরিয়ে দেবে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, তোমার ওই ন্যাজে খেলা চলবে না।

বেশ তাই হবে। ফিরে এলে কান ধরে আদায় করে নেবে।

ট্যাকসিচালক বললেন, কি মশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি?

না না, ঘুমবো কেন? টাকা খুঁজছিলুম। কোথায় যে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

আপনি ব্যাগ ব্যবহার করেন না?

না।

ভালই করেন। ব্যাগ মানেই পকেটমার। ও হবেই হবে।

আমার আবার দু-জায়গাতেই ভয়, ভেতরে বাইরে।

আরে মশাই, ভেতরের পকেটেই রাখুন, আর বাইরের পকেটেই রাখুন, পকেটমারের হাত থেকে রেহাই নেই। আমার বাড়িতেও পকেটমার হয়।

ছেলে বুঝি বড় হয়েছে! হিন্দী সিনেমা যতদিন না দেশ থেকে যাচ্ছে ততদিন বাপের পকেট গড়ের মাঠ হবেই।

ছেলে নয় মশাই, স্ত্রী। সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। ওকেই বলে খাল কেটে কুমির আনা। আপনি আমার মত করতে পারেন।

কি বলুন তো?

সেরেফ চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যেমন?

আপনিও চুরি করে ফাঁক করে দিন।

ও বাব্বা, সে একবার দুবার চেষ্টা করে দেখেছি। কোথায় যে রাখে! রান্না ঘরে শ' খানেক কৌটো। কোনটার মধ্যে যে মাল আছে, কে জানে?

ওদের টাকা রাখার ফিকসড কতকগুলো জায়গা আছে, যেমন মিটসেফ, চালের টিন। ছাড়া শাড়ির আঁচল। বালিশের খোল। একটু চেষ্টা করলেই সন্ধান পেয়ে যাবেন!

আমি তো খুচরো পয়সা কোনোদিন চোখেই দেখতে পাই না। এই আছে, এই নেই।

খুচরো বাড়িতে ঢোকাবেন না। শেষ নয়া পয়সা শেষ করে বাড়ি ঢুকবেন। অন্যের হাতে যাওয়ার চেয়ে নিজের হাতেই যাওয়া ভাল! খরচ করার আর কোনও রাস্তা না পেলে শেষ দশ পয়সায় একটা ওজন নিয়ে নেবেন।

সময় বিশেষে অন্যের কাছে নিজের স্ত্রীর নিন্দে করতে পারলে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়। সর্বক্ষণ আমার সেই এক কাজ, নিজেকে অনুসরণ করা। অবিনাশ। কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। দেশলাই, বাত্তি, আমার জামা ছাড়া তারপর পকেট থেকে টাকার খাম বের করে কোথায় রাখলুম। কোথায় যেন রাখলুম। বাথরুমে?

ইনকাম ট্যাকস অফিসার কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, খেয়াল করিনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মশাই ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি?

কি বলতে কি বললুম কোথায় রেখেছি বলুন ত ?

কি রেখেছেন ? কালো টাকা ? ধমকের সুর।

আজ্ঞে না, সাদা টাকা।

সাদা টাকা আর নেই। সবই কালো। কই দেখি, রেন্ট রিসিটটা দিন।

বাম্বুভিলা থেকে বেরিয়ে অফিসে আসার পথে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। নাও, বোঝো ঠ্যালা। ট্যাক্সি ভাড়া মেটাবার পর পকেটে মাত্র ছটা টাকা পড়ে আছে। যাই হোক চটিটাকে টানতে টানতে এক মেরামতঅলার কাছে নিয়ে এলুম। আজকাল যা বাজার পড়েছে, দেড়টা টাকা খসে গেল। কোন কোন পেশায় মানুষের বিপদটাই হল মূলধন। চাপ দিয়ে রস বের করার মত, নিঙড়ে টাকা বের করে নাও। ট্যাকসের ফাঁড়া কাটতে না কাটতেই আর এক ফাঁড়া। ছেঁড়া চটি। চটি সারাতে বিদ্যুৎ চমকের মত পূর্ব রাতের জায়গা। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। আমার নিউকাট জুতোর শুকতলার ভেতরে। এমন একটা জায়গা অন্য কারুর কল্পনায় আসবে না। যাক, এখন আমার কাজে মন আসবে। ঘিনঘিনে চিন্তাটা চলে গেল। সারা মাসের রসদ। হারালেই হাতে হারিকেন।

সন্ধ্যের পরে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলুম। আসতে আসতে ভাবছি, শ্যালক মহারাজ এতক্ষণে তোফা চিঁড়ে, বাদাম ভাজা খাচ্ছেন। একটু পরেই ফুলকো লুচি চিংড়ির মালাইকারি। কিন্তু কোথায় সেই দশাসই ঘরজোড়া নয়নলোভন, ব্যাঘ্রলালা-উৎপাদনকারী শ্যালক মহোদয়। আমার স্ত্রী রত্নটিই বা কোথায় গেলেন !

মানুর মা বললে, জামা কাপড় ছাড়ুন চা করে দিচ্ছি।

ওরা কোথায় গেল ?

বউদিরা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। বেলাবেলিই গেছেন। ফিরে আসার সময় হয়েছে।

যাক বাবা, ওরা আসার আগে গুপ্ত স্থান থেকে টাকাটা বের করে রাখি। দেখতে পেলে হাসাহাসি করবে। জুতোর র‍্যাকে ছেড়া খোঁড়া জুতো, জুতোর বাকসের অভাব নেই। এক জোড়া বাইশ শো বাইশ হাফ-বুট শ্যালকের মতই খুশ মেজাজে বসে আছে। কিন্তু আমার নিউকাট জোড়া কোথায় ? জুতো কি মালিক ছাড়াই বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

মানুর মা, এখানে আমার এক জোড়া জুতো ছিল, কোথায় গেল জান কি ?

জুতো ! মনে হয়ে দাদাবাবু পরে গেলেন। বউদি আপনার ধুতি পাঞ্জাবি বের করে দিলেন, তারপর জুতোটা পায়ে গলিয়ে দাদাবাবু বললেন, বেশ ফিট করেছে। বউদি বললেন, তাহলে ওইটাই পরে চল। বেশ জামাই জামাই দেখাচ্ছে।

সেকি ? জুতো আর চশমা, হ্যাঁ আর একটি বস্তু, স্ত্রী, যার যায়, তার তার, এই রকমেই ত শুনে এসেছি এতকাল। নয়া জমানায় স্ত্রী হাত পালটাপালটি হয়, আজকাল হামেসাই হচ্ছে। জুতোটা ফিট করেছে বলে পরে চলে গেল। যেমন বউ তার তেমনি ভাই। সব যেন গামছা হাতে জন্মেছে। গামছাবতার। লম্বা গলা দেখলেই লাগাও আর মারো টান। পঁয়তাল্লিশ টাকার জুতোর শুকতলায় পাঁচখানা কুড়ি টাকার নোট। জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকবে। জুতো চোর মুখিয়ে থাকবে। ধর্মের স্থানেই যত অধার্মিকের উৎপাত হয়ে গেল। একেই বলে গ্রহ। পেয়েও হারালুম।

সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল। খবর শেষ হয়ে গেল। দুই মালের তবু দেখা

নেই। গেছে ত গেছেই। মানুর মা বসে বসে ঢুলছে। দুধ ওতলানর মত একশো টাকার শোক মনে উতলে উতলে উঠছে। উদাসীনতার পাখার বাতাস মারছি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

পৌনে ন'টা নাগাদ গাড়ি থামার শব্দ হল ! উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। শ্যালকের জন্যে নয়, জুতোর জন্যেই উতলা হয়ে দরজা খুলে বাইরে ছুটে গেলুম। রোমান্সের সবুজ পাতা কবে শুকিয়ে ঝড়ে গেছে জীবন-তরু থেকে। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয় ! জীবনসঙ্গিনী না ফিরলেই সুখী হতুম। কেউ পরে চলে যাক না। দিন কতক পরেই বাপ বাপ বলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমার সেই জুতো জোড়ার মত। পরলেই ফোসকা। ভেসলিন, গ্লিসারিন, তুলো, সব হার মেনে গেল। জুতোয় টক দই, কেরোসিন, স্বভাব আর কিছুতেই নরম হয় না। প্রেমের কোন লক্ষণই নেই। যে জগাই মাধাই, সেই জগাই মাধাই। দেখলেই কলসির কাণা ছোঁড়ে। শেষে জুতো বিশেষজ্ঞরা বললেন, ও মশাই খাঁটি গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই কিছু হবে না। পা গলিয়ে আর পিরিতের দরকার নেই। স্বভাব না যায় মলে। পরম ভট্টারকের জুতো করে তাকে তুলে রাখ। শান্তি পাবে। এক জোড়া চপ্পল কিনে নাও, আর লেংচে লেংচে চলতে হবে না। তোমার দুঃখে আমাদের বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। জুতো তাকে তুলে রাখা যায়। বউকে তো আর তুলে রাখা যাবে না, ঠিক নেমে আসবে।

শ্যালক সূর্যবাবু নেমে আসছেন। আমার ধুতির ফুলপাড় কেমন ঝিলিক মারছে। আমার নজর পায়ের দিকে। যাক জুতো জোড়া পায়েই আছে। শ্যালকের পেছন পেছন আমার সহধর্মিণী নামছেন। চলন বলন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ বল পেয়েছেন। এমনিই খুব বলবতী। যখন বলতে শুরু করেন তখন আর সহজে থামান যায় না। এত আর প্রেস ফ্রীডম নয়। যে অর্ডিনানস করে চেপে দেওয়া যাবে। এ হল নারী স্বাধীনতা, যার শুরু আছে, শেষ নেই। বাপের বাড়ির লোক পেয়ে আজ একটু বেশি খরখর করছেন।

গাড়ি থেকে মালপত্তর নামছে ত নামছেই। বাবা কত কি কিনেছে। সারা দক্ষিণেশ্বরটাই কিনে এনেছে। ক্লিং করে মিটার তুলে গাড়ি চলে গেল। অন্ধকারে এবার তেমন দেখতে পাচ্ছি না। শ্যালকের পায়ে সেই জুতো জোড়াই ত ?

সূর্যবাবু বললে, কি দেখছেন অমন করে। আপনার জুতো আমার পায়ে দারুণ ফিট করেছে। সেম সাইজ। আপনি বাঁ দিকে কেতরে চলেন, আমিও বাঁ দিকে কেতরে চলি। আপনিও প্রেমিক আমিও প্রেমিক। আপনি ফেঁসেছেন, আমি ফাঁসিনি।

স্ত্রী বললেন, ধরো, ধরো।

কাগজে মোড়া বেশ ভারি একটা কি হাতে এসে গেল। স্পর্শে মনে হচ্ছে, কাপ ডিশ। অনেক স্বামীই তোয়ালে জড়ান ছেলে ধরে, বোকা বোকা মুখে স্ত্রীর পেছন পেছন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসেন। সামনে বেটার হাফ চলেছেন বুক ফুলিয়ে। বেশ মূল্যবান উপহার দিয়ে লোক যেভাবে বিয়ে বাড়িতে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। ইনিও সেই ভাবেই চলেছেন। আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতুম, আমাকেও নিদারুণ বুদ্ধুর মত দেখাচ্ছে। মন কেবলই উসখুস করছে, কখন তুমি জুতো জোড়া খুলবে, আমি অমনি তাক বুঝে নোট ক'খানা বের করে নোব। পায়ের চাপে ভেপ্‌সে কি অবস্থা হয়েছে

কে জানে !

খাবার টেবিলের ওপর একে একে কেনা জিনিস সাজাতে সাজাতে আমার শ্যালকের বোন বললেন, আজ একেবারে প্রাণ খুলে কিনেছি। তোমার সঙ্গে বেরলে কেনাকাটা করে তেমন সুখ হয় না। যা কিনতে যাব তুমি অমনি বলবে, উঁহু, উঁহু, বাজে খরচ। এই দেখ কেমন কাপডিস কিনেছি। পাথরের চাকি বেলন। আঃ লুচি বেলেও সুখ। আজই উদ্বোধন হবে। এই নাও তোমার অ্যাশট্রে। আর এখানে সেখানে ছাই ফেলবে না। বুদ্ধ মূর্তিটা দেখ, আহা তুমি যদি ওই রকম শান্তশিষ্ট, ধ্যানস্থ হতে। সংসারের চেহারাই পাল্‌টে যেত। অমন গুলিখোরের মত মেজাজ করেছ কেন ? বাইরে মনে হয় তোমার কোন'ও মেয়েছেলে আছে !

হ্যাঁ, এক মেয়েছেলেতেই চক্ষু চড়ক গাছ !

আমার মত মেয়ে তুমি পাবে না গো ! পড়তে অন্যের পাল্লায়, হৃদয়ে হ্যাফশোল লাগাতে হত। এই দেখ, দু ডজন চুড়ি কিনেছি, শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। এবার যখন তোমার সঙ্গে সেজেগুজে বেরব না, তখন দেখবে, চড়চড় করে সকলের বুক ফাটবে। ফিস ফিস করে বলবে, দ্যাখ দ্যাখ, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

আমি বাঁদর !

মানুষের মত ত কিছুই দেখি না, সব সময় দাঁত খিচোচ্ছ।

স্বামীকে বাঁদর বললে কি হয় জান ?

নরকে যেতে হয়। তোমার সঙ্গে সংসার করার চেয়ে নরকে গিয়েও সুখ। তোমার ড্যাঙোস আর খেতে পারি না। এই নাও তোমার ফুলদানি আর ধূপদানী। নাও হাত পাত। ভক্তি ভরে মায়ের প্রসাদ খাও, মনে মনে বলো, মা আমার স্বভাবটা একটু ভাল করে দাও মা। বলো, আমি যেন একটা মানুষ হতে পারি। অমানুষ করে রেখেছ মা।

হাতের তালুতে গোল-মত একটা প্যাঁড়া বসিয়ে দিয়ে, তিনি হুট-পাট করে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকলেন। আমার নয়, শ্যালকের বড় খিদে পেয়েছে।

শ্যালক সূর্যকান্তের জামা, কাপড়, জুতো ছাড়ার তেমন কোনও ইচ্ছেই দেখা যাচ্ছে না। এলিয়ে বসে আছেন সোফায়। বড় ক্লান্ত। মনটা বড় ছটফট করছে। জামা কাপড় না ছাড়ুক, জুতোটা অন্তত খোল ! তোমার পদতলে আমার অর্থ দলিত হচ্ছে।

সূর্য, জামা কাপড় ছেড়ে, পাজামা পরে, মুখে হাতে জল দিয়ে বেশ ফ্রেশ হয়ে বোসো না। ভাল লাগবে। সূর্যকান্ত ডান থেকে বাঁ পাশে এলিয়ে পড়ে বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জামাইবাবু। গেলুম ট্যাকসিতে, এলুম ট্যাকসিতে, কি আর এমন পরিশ্রম। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এত আমার নিজের বাড়ির মত।

প্রথম দিনেই তোমার ত হলে বেশ চোট হয়ে গেল ! কি বল ?

এইভাবেই খেজুরে আলাপে মনটা ঘুরিয়ে রাখি ! কখন বাবু উঠবেন। কখন বাবু জুতো ছাড়বেন। বাবুই জানেন। বউয়ের ভাইয়ের হালচালই আলাদা। জামাইয়ের চেয়ে আদর বেশি। একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধের ভূত কান ধরে মোচড় মারবে।

সূর্যকান্ত একগাল হেসে বললেন, আমার এক পয়সাও খরচ হয়নি। দিদি কার হাতে পড়েছে, দেখতে হবে ত ! যেই টাকা বের করতে যাই, অমনি বলে, টাকার গরম তোর

বউকে দেখাস।

মনে মনে বললুম, আচ্ছা, তাই নাকি ? সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। সারা মাসের সংসার খরচ হাওয়ায় উড়ছে। যত টানাটানি রোজ মাছের বেলায়, একটু এদিক-ওদিক খাওয়ার বেলায়।

হেঁসেল থেকে আদরের সুর ভেসে এল। সূর্য জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। গরম গরম ভাজছি। আমার জন্যে কোনও মধুর নির্দেশ এল না। আমি ত কাঙাল। খেতে বোস, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল। চারপাশ নিশুতি। বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেলরে দিদি, বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল, বলতে বলতে, সূর্যকান্ত বেশ পরিতৃপ্ত বাঘের মত গোটাকতক হাই তুলে ফুলতোলা চাদরে লটকে পড়ল। বোন এলেন মশারি গুঁজতে ! আমার ওপর হুকুম হল, ঘরের মশারিটা ফেলে ভাল করে গোঁজো, হাঁ করে বসে আছ কেন ? দেখছ ত, আমি একটা কাজ করছি।

যো হুকুম ! আমি তো আর তোমার শ্যালক নই !

দালানে ঘুটঘুট করে ঘড়ি চলছে। বাইরে সূর্যকান্তর নাক ডাকছে। আমার পাশে তার বোন যে ভাবে এলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে জেগে নেই। এই তো সুযোগ। এই তো চোরেদের বেরবার সময়। যাই, নিজের টাকা, নিজেই চুরি করে আনি।

ডান পাটির সুখতলা তুলে ফেললুম। ফাঁকা। তবে কি বাঁ পাটিতে। সে পাটিতেও বিধবার হাহাকার। যাঃ টাকা নেই। মহারাজ হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই। মাঝরাতে পা ছড়িয়ে বসে আছি, সামনে দুপাটি নিউকাট। পেছন থেকে কাঁধের ওপর দুটো হাত এসে পড়ল। কে রে বাবা, ভূত নাকি !

না, আমার সহধর্মিণী।

কি গো, মাঝরাতেই জুতো পালিশ করতে বসলে কেন ?

ঘুম আসছে না। তাই ভাবলুম কাজটা একটু এগিয়ে রাখি ! সকালে তো একেবারেই সময় পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, যেতে আসতে সূর্য তো এই জুতোটাই পরবে। বলছিল, পায়ে বেশ ফিট করেছে।

দেখেছ, প্রসাদের কি গুণ ! তুমি কি ভাল হয়ে গেছ গো, শোনো, বৃথাই খুঁজছ, মাল আর ওখানে নেই। কাপ, ডিশ, অ্যাশট্রে, চুড়ি হয়ে গেছে। এ পিঠ ও পিঠ, দু পিঠ ট্যাকসি ভাড়া হয়েছে। গোটা পঁচিশ পড়ে আছে। কুড়ি টাকা আমার ধার শোধ। পাঁচ টাকা কাল সকালে তোমাকে দিয়ে দোব। জুতোর তলায় কেউ টাকা রাখে ! ছিঃ ! মা লক্ষ্মী। জুতোর তলায় চোরা চালানকারীরা সোনার বিস্কুট রাখে। চলো শোবে চল। ঝাড়তে গিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম।

তুমি জুতো ঝাড়তে গিয়ে, সারা মাসের হাত খরচ ঝেড়ে দিলে ! আমার মাস চলবে কি করে ?

ও তুমি ভেব না, যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামনি।

সূর্যর নাক গাঁক করে ডেকে উঠল।

আমি অদৃশ্য কাত্যায়নের দিকে কবজি তুলে ধরে মনে মনে বললুম, কাত্যায়ন নাড়ীটা একবার দেখ তো, বেঁচে আছি না মরে গেছি !

আমার ভূত

আমার ছেলেকে আমি সায়েব বানাবো।

রঙে নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে ? আমি কালো ? আমার ছেলে ঝুল কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হয়ে ছেলের সমালোচনা করা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা কেমন যেন আবলুস কাঠের মত হল ? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ ক'লা, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি ! কালো জগৎ আলো।

সায়েব পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভর্তি করতে হবে।

পয়সা যখন আছে কেন করব না। কিন্তু পয়সায় ত আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাঁপা। শুনেছি, শিশু যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে গর্ভসলিলে হেঁট মুণ্ডু উর্ধ্ব পুচ্ছ তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চিৎকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পুরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলের লেখক চাই। আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল, সল বেলো স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস। এমন কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইয়াঙ্কি স্ল্যাং আছে। হ্যারলড রবিনস, হেডলি চেজ। এ সব করার উদ্দেশ্য, ভ্রূণের চারপাশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম তৈরি করা। মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারি এক্সপার্ট। আমার বউয়ের মত গাঁইয়া নয়। বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে। শ্যাম্পু করে করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর। ম্যারিলিন মনরোর মত। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটে চকোলেট কলারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস। আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাক ফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি। অলওয়েজ স্মার্ট। চোখে ব্ল্যাক প্যানথারের চোখের মত বিশাল এক গগলস। সেকসকে সোচ্চার করে রেখেছে। শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করেছে ! যেমন কোমর তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী। চীনে খাবার ছাড়া খায় না। মাঝে মধ্যে ফ্রাই খায়। স্যুপ দেখলে আমার বউয়ের মত মেগ্‌গে করে ওঠে না। শুনেছি মাঝে মধ্যে একটা দুটো বিড়ি ফোঁকাও করে থাকে। নাইটি পরে শুতে যায়।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ! শ্যালিকা বলে, সাজ, পোশাক, আহার বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে। বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে সি-বীচে ছুটতে থাকবে। শাড়ি পরলে, বলদ, গোয়াল, সাঁজালে, সিঁথির সিঁদুর, সন্ধ্যের শাঁখ, এই সবই মনে আসবে। মনে আসবে ঘুঁটে, গোবর, গুল, গঙ্গাজল। দোজ ডেজ আর গন পাঁচু !

এখন বাইকের পেছনে বয় ফ্রেণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে। জীবনের পেছনে লেখা থাকে—Look here. সাঁঝের বেলায় আর সাঁঝাল নয় পার্ক স্ট্রীটের

আলো আঁধারী, ঝকাঝকম, ঝকাঝম বারে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস।

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল? ছাপা শাড়ি পরে এতখানি একটা খোঁপা করে শ্বশুর, শাশুড়ির সেবা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলা। পেটে পুঁই শাক, লাউয়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি। সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না ত, কি করবে?

বউয়ের ত অনেক ধরন আছে। কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল। কেউ বধূ। যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল। কেউ শুধুই বউ, সাদামাটা, ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ। স্লিভলেস ব্লাউজ, অর্গান্ডির শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে। ইজ্জত বলে না ইন্নত বলে কে জানে। একই মায়ের দুই মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জন্যেই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা করা। সে ত আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজী সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘন্টা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলেন ব্র্যান্ডো।

মুখে সুপুরি ঠুসে কি যে ইংরিজী বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝো ঠ্যালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে ত?

ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোল্লার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরসোলার গন্ধ।

ফিস ফ্রাই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফয়সালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্। লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউমাকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি! যা হবার তা হবে। এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধরাধরির পর বেশ নামজাদা এক সায়েবী স্কুল থেকে একটা ভর্তির ফর্ম মিলল। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে?

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে। মুখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে আঁচড়ে কামড়ে

দেয়।

ওই আঁচড়ানো কামড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়। সারা জীবনের মত হয়ে গেল। নারসারি রাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দুলে দুলে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাঙলা স্কুলে ইস্তিরি চটকানো জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেরানিগিরি কর। পিত্তি-চটকান ভাত, ট্যাড়স ভাতে কচি কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাকি জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব তালিম দিতে থাকলুম মাসখানেক ধরে। পাখির ইংরেজী, বার্ড। সাহেবরা উচ্চারণ করে ব্যার্ড। টিকটিকির ইংরেজী গেকো। পাখিটি—দ্য বার্ড, স্ত্রী লোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ? মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল ? কি তাঁদের নাম ? সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আমি স্যাণ্ডউইচ খাই, আই ইট স্যাণ্ডউইচেস। স্যাণ্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনীরা। আগামী কাল, টুমরো ? হাড়ের ভেতর থাকে মারো। টুম্যারো। গতকাল ইয়েসটারডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো ! না, মানিক বড় সেকেলে, বাঙলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো। আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়।

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা বলে। রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোণ্ট বি ফাসসি জ্যাকি। রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, দ্যাটস নট দি ওয়ে।

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপিলে চলিবে না ! বি সফট, বি এ ফাদার, নট এ বুচার। কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারী কায়দায় কাছে টেনে নিতে চাইলেন।

কোন্ মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো দাওয়াই ছাড়ল। ঘ্যাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডাকলিং। আই নিড সাম অ্যাণ্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যাণ্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যাণ্টি র‍্যাবিজ দিয়েছিলেন কি ?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার ! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোণ্ট ডু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের ঝোলা বেল্ট ধরে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিরি হয়েছে। তখন অত করে বারণ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল পরাবার কোনও প্রয়োজন ছিল। সায়েবদের ছেলেরা কাজল পরে? সারা মুখে কাজল চটকেছে। ভ্যাগ্যিস, ভূতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না দেখাত।

স্কুল বাড়ির দিকে তাকিয়ে দু'জনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি। শালীর ছেলেটা কি স্মার্ট। এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে। আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে। ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই জন্যেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে। আমার বউটাকে দেখ। ঠিক যেন শাড়ি জড়ান প্যাকিং কেস। প্যাকিং কেস থেকে ভূতই বেরবে।

সারা স্কুল বাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম সুরে। ঠিক যেন শূয়োরের খোঁয়াড়ে আগুন লেগে গেছে। কি হল রে বাবা। সব অভিভাবকই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি। পরীক্ষক হয় ত প্রশ্ন করেছেন—হাউ টু ক্রাই। একটু পরে হয় ত হাসি শোনা যাবে। যাক বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্কস পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুড়ে চেল্লাচ্ছে দেখ। কানের পোকা বেরিয়ে আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। ত্রিসীমানা থেকে দূর হয়ে যান। নিজে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসেছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান।

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা।

মায়ের আদিখ্যেতা শুরু হল। আদর দিয়ে বাঁদর হয়েছে। দু চোখ বেয়ে কালো জল পড়ছে। ভূতের কান্না ত কালোই হবে।

ওটাকে নর্দমায় ফেলে দাও।

আহা, বাছা আমার। ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্লুম—চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার নেই। তুই বাঙালীই হবি চল।

ভূমিকা

আমরা ক্রমশই খুব সভ্য হয়ে উঠছি। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, চেতনার উন্নতি হয়েছে। সঙ্কীর্ণতা কমে এসেছে। সমাজ-সচেতনতা বেড়েছে। বিজ্ঞান বিস্ময়করভাবে প্রকৃতিতে জয় করতে শুরু করেছে। আমরা আর আগের মত নেই। দেবতার কাছাকাছি চলে এসেছি। সত্যই আমরা অমৃতের সন্তান। ভাল করে তাকালে আমাদের মাথার পেছনের দেয়ালে আলোর গোলাকার ছটা দেখা যাবে।

সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থান্বেষণ, লোভ যেটুকু চোখে পড়ছে, তা আমাদের পরিশীলিত আচার আচরণের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যদি আগের চেয়ে উদার না হয়ে থাকি, তাহলে এত মানুষ এক জায়গায় শান্তিতে বাস করছি কি করে! ষাঁড়ের দৃষ্টান্তই তুলে ধরা যাক। দুটো মাত্র ষাঁড় এক জায়গায় হলেই শিঙে শিঙে লাগিয়ে, ঠেলাঠেলি করে কিছুক্ষণের জন্যে যানবাহন বন্ধ করে দেয়। আমরা নিশ্চয়ই ষাঁড়ের চেয়ে উন্নত। হ্যারিসন রোডের কাছে কখনও কি দেখা গেছে দুটো বিশাল মানুষ মাথায় মাথা লাগিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলছে। ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। না, এ দৃশ্য দেখা যাবে না। অথচ সেই পরশ্রীকাতর ষাঁড় মহেশ্বরের বাহন! আর মানুষ হল শয়তানের আপেল-খেকো ইডেনভ্রষ্ট জীব।

বেদান্ত ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার একটা সহজ রাস্তা আছে। সেই রাস্তাটি হল নেতি, নেতি। এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয় করতে করতে আসল সত্যটিকে ল্যাম্পপোস্টের মত জাপটে ধরে চিৎকার করে ওঠা : সোহহং। সেই নীতিই প্রয়োগ করে নিজেকে এইভাবে চেনা যেতে পারে, যেমন আমি ষাঁড় নই, কারণ আমার শিং নেই, আমি গুঁতোই না। মাঝে মধ্যে হাঁটুর গুঁতো মারি, কনুই চালাই, অবশ্যই বিপাকে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'সরি' বলি? এক সময়কার দেবভাষা। ষাঁড় কি শিং দিয়ে গুঁতো মেরে 'সরি' বলে? বলে না। আমার গুঁতো অত্যন্ত উঁচুমানের গুঁতো। তার প্রয়োগ যানবাহনে আরোহণ, অবরোহণের সময়। ঈশ্বর লাভের জন্যে বহুপ্রকারের যোগ, মুদ্রা ও প্রাণায়াম বিধির প্রচলন আছে। সবই সিদ্ধসাধক নির্দিষ্ট পথ। এই জনভারাকান্ত দেবভূমিতে অফিস যাত্রী দেবতাদের জন্যে রথের সংখ্যা বড়ই কম। ওদিকে দপ্তরে দপ্তরে অপ্সরা-পরিবৃত ইন্দ্রের দেবসভায় ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে না পারলে খোদেশ্বর ক্ষিপ্ত হবেন। রথলাভকে ঈশ্বর লাভের তুল্য জ্ঞান করলে গুঁতো এবং কনুয়ের সুপ্রয়োগ এক ধরনের হটযোগ কিংবা মুষ্টিযোগের পর্যায়েই পড়বে। সেই যোগে কোনও দেবতা যদি ভূতলে পতিত হন অথবা রথচক্রে নিষ্পেষিত হন, তাহলে দেবভাষায় আমরা দেবোক্তিই করতে পারি : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

আমার আমিটাই যখন সব, তখন অন্যের আমি নিয়ে মাথা ঘামাবার কি বা প্রয়োজন! অন্যের আমি অন্যে সামলাক, আমার আমিকে আমি সামলাই। জীবনের পথ ত বড় সোজা নয়, দেবতার পথ আরও দুর্গম : ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া। সুতরাং একটু নড়েচড়ে, গ্যাঁট হয়ে খেলিয়ে বসি! শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের

বলেছিলেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ'। আমি ক্লিব নই। আমি ব্রহ্মা। আমার হাঁটুর ওপর ব্রিফকেস ফেলে, দুপাশে ডেঙ্গোডাঁটার মত ঠ্যাং ছড়িয়ে, সন্ধ্যের পর সামান্য সোমরস পান করে, তাম্বুল চিবোতে চিবোতে, লর্ডের মত বসে থাকব মিনি রথের জোড়া আসনে। অন্যের অসুবিধে। হচ্ছে হোক। তা বলে আমি অসভ্য নই। ন্যায় শাস্ত্র প্রমাণে বিশ্বাসী। আমি যে অসভ্য প্রমাণ কর। উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত কর। অসভ্যেরা উলঙ্গ হয়। আমি উলঙ্গ নই। ভারতের শ্রেষ্ঠ মিলের তৈরি জামা-কাপড় আমার পরিধানে। অসভ্যেরা সাবান, পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন ব্যবহার করে না। আমি করি। তাঁরা কাঁচা মাংস খায়। আমি চিকেন তন্দুরি খাই। কোনও অসভ্যের বাবাও অমন সুস্বাদু রান্না করতে পারবে না। অসভ্যরা নখ কাটে না, দাড়ি কামায় না। আমি সপ্তাহে একবার নখ কাটি, রোজই বিলিতি ব্লেডে দাড়ি কামাই। অসভ্যরা জঙ্গলে বাস করে, আমি কলকাতা নামক শহরের সুরম্য ফ্ল্যাটে বসবাস করি। রেডিও শুনি, টি. ভি. দেখি, রেকর্ড প্লেয়ার চালাই। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল বের করে খাই। হাজারটা উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমি যে অসভ্য নই, তা প্রমাণ করে দোব। ন্যায় শাস্ত্রে একে বলে খণ্ডন। আমি এখন চলন্ত গাড়ি থেকে থুঃ করে থুতু ফেলব। একবারও পথচারীদের কথা ভাবব না। এই জন্যে ভাবব না, আমি তো পথচারী নই এখন। শুধু তাই নয়, গতি আমাকে নিমেষে নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাবে। আমি এখন দাঁতখোঁচা দিয়ে দাঁত খুঁটে প্রাপ্ত খাদ্যাংশ সামনে ফুত করে ছুঁড়ব। কারুর গায়ে পড়বে। পড়ুক। এক আমি ভেঙে ভেঙে বহু আমি হয়েছে। যার গায়ে পড়ল সেও ত আমি। দৃষ্টিভঙ্গী পালটে ফেললে মানুষের দেবত্বের প্রমাণ দিকে দিকে।

আমি হৃদয়হীন নই। আবার সেই প্রমাণ। যারা খুন করে, তারাই হৃদয়হীন, আমি কাউকে খুন করিনি। খুন করলে জেলে যেতুম। যেহেতু জেলে যাইনি, সেইহেতু 'ল অফ দি ল্যাণ্ড' অনুসারে আমি সাধু। সাধুরা হৃদয়হীন হতে পারে না। যাঁরা বলেন কর্মস্থলে আমি চক্রান্ত করে উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি না ঘটিয়ে তৈল প্রদানকারীরই স্বার্থ দেখি, তাঁরা ভুল ব্যাখ্যা করেন। তেল দিতে না চাওয়াটা এক ধরনের অহঙ্কার। আমি কাউকে তেল দিই না। আমি কারুর পায়ে ধরে বড় হতে চাই না। সাধনমার্গে অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা অহমিকা। অহঙ্কারী মানুষ উচ্চমার্গে ওঠার অধিকারী নয়। আমি নিজে অহম্ বিসর্জন দিয়ে, নানাভাবে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ইন্দ্রের কাছাকাছি একটি আসন লাভ করেছি, সাধনার জোরে। আমি জানি রামকৃষ্ণ কত বড় সত্য কথা বলেছিলেন, অহঙ্কারের ফেঁসো উঠে থাকলে সুতো ছুঁচের গর্তে কিছুতেই ঢুকবে না।

মানুষকে দু শ্রেণীতে ভাগ করে নিলেই সব লেঠা চুকে যায় : কর্মী আর কর্মহীন। কর্মহীনদের জাগতিক আচরণ থেকে সহজেই বাদ দেওয়া চলে। তারা হল ভাগিদার। কিছুই না করে জায়গা দখল করে বসে আছে। পরান্ন ধ্বংস করে চলেছে। কোনও এক দেশে অত্যাচারী, ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ও জীবজন্তু মেরে ফেলার প্রকল্প চালু আছে, যেমন চড়াই পাখি, কাক, পঙ্গপাল ইত্যাদি। সেই প্রকল্প এদেশে চালু করার অনেক বাধা। কারন যারা কিছু করে না তারা ভোট দেয়। এরা অবশ্য দিনে দিনে ক্ষয় পাবে। প্রথমত রাজনৈতিক কামানের মানব গোলা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পেটের দায়ে চুরি,

ছিনতাই, ডাকাতি করতে গিয়ে মার খেয়ে মরবে। নেশা ভাঙ করতে করতে টেঁসে যাবে। ব্যাপারটা খুব ধীরে ধীরে হবে। তা হোক। তবু রাস্তা খোলা রইল। আর যারা যাবেই, তাদের অহমিকারও মূল্য নেই, বাতুলতাও কর্ণপাতের অপেক্ষা রাখে না। ওরা হল ক্ল্যামারিং মাস। একটা একটা করে না দেখে তাল হিসেবেই দেখা উচিত, দেখা হয়ও। সেই ভাবেই বস্তিতে, ঝুপড়িতে থাকে। এদের অপরাধপ্রবণতা, এদের যৌনতা, এদের পুষ্টিহীন বেঁচে থাকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট করা যায়। মাঝে মধ্যে সোয়াবিন, চাপ ছোলার ডাল, গুমো আটা আর ভেলি গুড় মিশিয়ে পাউরুটি তৈরি করে নিউট্রিশানাল ব্রেড নাম দিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করে সমাজসেবীর সম্মান পাওয়া যায়, খেতাব পাওয়া যায়। সমাজসেবী সংস্থা এদের দৌলতেই দেশী বিদেশী অর্থ সাহায্য পেতে পারে। বিদেশী স'হায্যের গুঁড়ো দুধ, বাটার অয়েল ব্ল্যাকে ঝেড়ে দিয়ে নিজেদের বিলিতির খরচ তুলে নিতে পারে। সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা বিদেশে সেমিনার করতে যেতে পারে। সুতরাং এরা একেবারে মরে হেজে গেলে বড় অসুবিধে হবে। এদের মেয়েদের শ্লীতলাহানি করা যায় বলে হোমস বেঁচে আছে। হোমস-এ নানারকম হাতের কাজ হয়। সেই সব কাজ দিয়ে অনেকে অল্প খরচে ঘর সাজাতে পারেন। এদের পাপে ওপরতলার অনেকে পাপের সুযোগ পান। সেই সব হোয়াইট কলার ক্রাইম মাঝে মধ্যে কাগজে হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেলে চায়ের দোকান সরগরম হয়। মধ্যবিত্তরা বেশ আনন্দ পান। সাহস আর সুযোগের অভাবে নিজে যে পাপ করতে পারিনি, সেই পাপ অন্যে করেছে দেখলে খাই খাই আত্মার আংশিক আহার হয়। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মত। আমরা য'রা কোনও না কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কিছু করি আর না করি মাসের শেষে মাইনে পাই, তারা ত আর তেমন গায়েগতরে হতে পারি না। তাদের মস্তিষ্কটাই বড় হয়। তারা বুদ্ধিজীবি। শ্রমজীবি নয়। তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম করার জন্যে এমনকি মুখের সামনে এক গেলাস জল এগিয়ে দেবার জন্যেও একজন লোক চাই। সে আবার কেমন হবে? বামুনের গরুর মত। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। এমন মানুষ কারা সাপ্লাই দেবে? কেন এই হ্যাভ নটসরা। দেশটা আমেরিকার মত উন্নত হয়ে গেলে মহাবিপদ হবে। ফোর্ড গাড়ি চেপে যদি রাঁধুনি আসে, কি সুইপার, কি ডিশ ওয়াশার আসে আর রোজ দশ ডলার পারিশ্রমিক চায়, তাহলে হোয়াইট কলারদের মুখ যে হোয়াইট হয়ে যাবে। তাই ওরা থাক। তেল দিক আর না দিক ফুটপাথে ঝুপড়িতে ওদের বংশ বৃদ্ধি হোক। আমাদের রোদে বড় কষ্ট হয়, জলে ভিজলে কপালে শ্লেষ্মা জমে, ভারী কিছু তুলতে গেলে ফিক ব্যথা লাগে, নীচু হতে গেলে কোমরে স্লিপ ডিস্ক। আমাদের মহিলাদের রান্নাবান্না একঘেঁয়ে লাগে। তারা ওম্যানস লিব্ বলে চেল্লাচিল্লি করছে। দাস-দাসী নিয়ে গায়ে ফুঁ লাগিয়ে মুখে মেক-আপ করে সংসার করতে গেলে আমাদের বড় দাস হতে হবে। তেল মেরে ঠাট রাখতে হবে। অহং নিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করতে গেলে হাতে হারিকেন হবে। আমাদের তাই গৃহে কালোয়াতি, কর্মস্থলে দাসত্ব। পাড়ার প্রিন্স সেরেস্তার কৃতদাস। এতে অগৌরবের ত কিছু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নিজেকে সমর্পণ কর।' শ্রীকৃষ্ণ কে? জীবনরথের সারথি তিনি। তার মানে জীবিকা।

বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। কিভাবে বেঁচে থাকব, সেটা বড় নয়। সভ্যজগতে অনেক

সভ্য জীবিকা আছে। সভ্য নামে সহনীয়। যেমন দালাল বললে রেগে যাব। মিডলম্যান বললে তেমন খারাপ শোনাবে না। চামচা বললে মুখ ভার হবে, ফলোয়ারস বা অ্যাসোসিয়েটস বললে বিগলিত হব। ষড়যন্ত্রকারী বললে প্রহার দিতে পারি। ম্যানিপুলেটারস বললে ক্ষমা করে দোব।

The llife is more than the meat

বসুধৈব কুটুম্বকম এ যুগের বিধান নয়।

যে মানুষ চাকরি করে। যে মানুষ বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে জীবন কাটায়। সুখী পরিবারের আধুনিক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে তারা পাশের খুপরির মানুষের সঙ্গেই কুটুম্বিতা করতে পারে না ত বসুধা। জীবনের ওপর জীবিকার বেশ বড় রকমের একটা প্রভাব আছে। দাস আমি, সে যত বড় দাসই হোক না কেন, সংকীর্ণ আমি! প্রচুর মাইনে, অনেক সুযোগ-সুবিধে। সাজানো ফ্ল্যাটে গাড়ি, ফোন, কুলার এয়ার ট্র্যাভেল পার্টি সুন্দরী স্ত্রী হাই কানেকসান। জীবন একেবারে জবজবে। হলে কি হবে? সেই ছেলেবেলার যাত্রার আসর! সামনে অসংখ্য মাথা। দর্শক উচ্চতায় খাটো। একটি মাত্র বেঞ্চি। উঠে দাঁড়ালে ভাল দেখা যায়। সবাই উঠতে চায়। এ ওঠে ত ও পড়ে। ও ওঠে ত এ পড়ে! জীবিকার উঁচু মাচান থেকে প্রতিযোগীর ধাক্কায় পড়ে যাবার আতঙ্কে কেরিয়ার শিকারী রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে। চেষ্টা করেছ কি মরেছ।

একটা জায়গায় মানুষ 'প্রটেকটিভ' হলে সাইকোলজিস্টদের ধারণা সে মানুষের পারসোনালিটি হবে 'ক্লোজড'। ক্রমশই উদারতার মৃত্যু হচ্ছে। ইংরেজের কায়দায় আমরা এখন পরস্পরের সঙ্গে 'নডিং টার্মসে' নেমে এসেছি। সম্পর্ক, কেমন আছেন, ভাল আছির। চালাক বলবেন, বেশি 'হবনবিং' ভাল নয়। প্রথমত মানুষের আর সে অফুরন্ত সময় নেই। আমার কাজ আছে। মুখে নির্লজ্জের মত বলতে না পারলেও, মনে অস্বস্তি। অ্যা, ঠিক কাজের সময় জ্বালাতে এল। কাজটা কি? কেরিয়ার পালিশ। চকচকে, আরও চকচকে। আরও ক্ষমতা। কি ক্ষমতা, কোথায় ক্ষমতা। সেরেস্তায়। পৃথিবী বিশাল। বিশালে স্থান পাওয়া কঠিন। সেখানে কে তুমি হরিদাস পাল। যাদের ওপর ডাণ্ডা ঘোরানো যায় তারা হল দাসের দাস। জীবিকা আমাদের 'স্যাডিস্ট' করে তুলেছে। এই 'স্যাডিজম' ওপর থেকে নিচের তলা পর্যন্ত চলে গেছে। রসায়নের ভাষায় যাকে বলা চলে 'পারকোলেশান'। চাকুরিজীবি মানুষ তুমি, 'মিলার অফ দি ডি'র মত, রাতে নিশ্চিন্ত আরামে নিচ্ছিদ্র ঘুমে তলিয়ে যাবে তা ত হয় না প্রতিদিন আউনস মেপে তোমার ঝুলি ভরা হবে। তোমার 'আমি'কে প্রতিদিন চটকে চটকে বিকলাঙ্গ করে তোলা হবে। এই সভ্যতাতেই সেই ঘটনা ঘটে। ডিকেনসের 'অলিভার টুইস্টে'র কাল থেকে সমাজ এক চুলও কি এগিয়েছে? চাইল্ড লিফটিং বেড়েছে বৈ কমেনি। শিশুকে হাঁড়ি কিংবা কলসির মধ্যে পুরে রেখে বিকৃত করে পথের পাশে বসিয়ে রাখা হয়। যে মানুষ এমন কাজ সহজে পারে, সেই মানুষই আবার পকেটে হাত ঢোকায় ভিক্ষে দেবার জন্যে। অনুকম্পায় হায় হায় করে ওঠে। এখানেই স্বর্গ, এখানেই নরক। দেবতা আর শয়তান একই আকাশের তলায় গুলতানি করছে। সিনডিকেট তৈরি করে বিকলাঙ্গ বানাবার ঘটনা অপরাধ জগতের ব্যাপার। আর যাঁরা প্রতিদিন সুস্থ মানুষের আমি চটকে ব্যক্তিত্বের নির্যাস বের

করে ক্রীতদাস তৈরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিচার করার কেউ নেই। আর একবার 'আংকল টমস কেবিন' লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গণতন্ত্র মার্চ করছে। সমাজতন্ত্র মানুষকে মানুষ করে দিয়েছে। আমরা সবাই রাজা, এই রাজার রাজত্বে। স্বর্গের জানালা খুলে অজস্র তারার চোখে ঈশ্বর তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে। মানুষের মাথা আকাশের চাঁদোয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সেই বিশ্বস্রষ্টার কানের কাছে বিপ্ বিপ্ করে চলেছে অষ্টপ্রহর।

তবু কেন ঘুম আসে না। ঘরের দেয়াল 'সাটিন সিল্ক'। হাল্কা রঙের খোশ মেজাজে দামী আলোর শেড বেয়ে নেমে আসা বিদ্যুতের আলোয় অবগাহন করছে। ক্যালেণ্ডারের নীল জলে রাজহাঁসের মত পাল তুলেছে ইয়ট। চির, চেনার মাথা তুলেছে, পেছনে পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। পা ডোবানো কার্পেটে ইরানী লতাপাতা। অকালেই সেই বৃদ্ধ শিল্পীর কথা মনে পড়ে। এক মাথা পাকা চুল। নাকের ওপর ঝুলছে দড়ি জড়ানো নিকেলের গোল চশমা। হাতে ছুঁচ আর পশম। সারা জীবন যে শুধু কার্পেটে নক্সা তুলে গেল। যার দুটো পা পাথরের মেঝের শীতল স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পেল না। যার স্যাঁতসেঁতে ঘরের বাগিচায় বুলবুলি ডেকে যায়। বৃদ্ধ শুনতে পায় না। অপুষ্টিতে কান গেছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জে আঙুর ঝোলে লাল হয়ে। আপেল গাছে ফুল আসে। এত বড় পৃথিবীতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের আয়োজন বড় সঙ্কীর্ণ। কম জোর ফুসফুস, ক্ষীণ দৃষ্টি, কয়েকটা বাজরার রুটি, ছেঁড়া, তালি মারা পশমের জামা, গোটা কতক মোটা কম্বল আর অপরিসীম শিল্পচেতনা, এই পথে তো জীবনের বৈভব। ভাগ্য পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই ত বাঁচতে শিখিয়েছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বরফ চুঁইয়ে শীত নেমে আসে। বৃদ্ধ তবু শান্তিতে ঘুমোয়। ঘুমোতে পারে না সে, নরোত্তম, যার অভ্রোত্তম দেয়াল থেকে দেয়ালে মেঝে ঠাসা গালচের ওপর লোমশ কুকুর হামা দিয়ে বসে থাকে। চকচকে ফ্রিজের কফিনে নরম আলোয় ওৎ পেতে থাকে বরফ শীতল দ্রাক্ষাসব। কৃত্রিম চামড়া বাঁধান সার সার সোফা সেট দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মাফিয়া নেতাদের মত সারা রাত ঐশ্বর্যের ষড়যন্ত্র করে। ডিজিট্যাল ঘড়ি আলোর অক্ষরে জানাতে থাকে, আমি তোমার সময়, অনবরতই চলেছি, চলেছি। কালের দিকে চলেছি। Which is today, tomorrow will be yesterday। চাঁদের আলোয় নিচের লনে সাদা মটোরের বনেটে শিশির জমছে মাঝ রাতে। বড় একা, বড় একা। প্রেম করো। তোমার এত আয়োজন। সুকোমল শয্যা বড় উদ্বেল করা সুগন্ধ। ভারি, ভারি পর্দা। খাবার টেবিলে মুর্গমসল্লম। একটু হাসো। দিলখোলা হাসি। হাসি আসছে না। অন্তরে গুমরে ফিরছে কান্না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড় ঠুনকো। সব জোড় খুলে যাচ্ছে। শিল্পের জগতে অনেক শক্তিশালী 'অ্যাডহেসিভ' বেরিয়েছে। কি না জোড়া যায় তাতে। সম্পর্ক কিন্তু জোড়ে না। মনের ফাটল বেড়েই চলেছে। স্ত্রী অসংলগ্ন। পুত্র কন্যারা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দূর থেকে দূরে চলেছে। আয়োজন সাজানো শ্মশান। শয্যাসঙ্গী ঘিনঘিনে দুশ্চিন্তা। জীবন শেক্সপীয়রের সেই কৃষক, Who hanged himself in expectation of plenty। ট্যানটেলেসের সেই কাপ। ঠোঁটের এক ইঞ্চি দূরে ঝুলে থাকে। চুমুক দেওয়া যায় না। এ যেন সেই ক্যাবারে নর্তকী। খুব সেজে পাদপ্রদীপের সামনে এসেছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। মনে মনে প্রস্তুত।

রোমশ হাত এগিয়ে আসবে। শুরু হবে বস্ত্রহরণের পালা। শেষ দৃশ্যে সম্পূর্ণ উদম। এ নিয়তি কেউ ফেরাতে পারবে না। এ খেলা চলে আসছে সেই মহাভারতের কাল থেকে। কৃষ্ণ কোথায়?

অনিশ্চয়তার রাজারা বসে আছেন সর্বত্র। ফৌজ তৈরি। অসংখ্য পেরেকে ক্রুশ আর কাঁটার মুকুটের আয়োজন। হাজার যীশু প্রস্তুত হচ্ছেন হাজার সিজার অশ্রুত কোরাসে বলছেন, এত তু ব্রুটাস। সিজারে আর ব্রুটাসে খেলা চলেছে। খেলাটা হল, খেয়ে পরে বেঁচে থাক, তবে মানুষের মন নিয়ে নয়, পশুর মন নিয়ে। বাবুর বাড়ির কুকুর খুব সুখে থাকে। সকালে বিস্কুট, দুপুরে মাংস ভাত, রাতে দুধ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, নিয়মমত চান, লোমে বুরুশ ; কিন্তু ভীষণ বাধ্য হতে হবে। প্রভুকে দেখে ন্যাজ নাড়তে হবে। সামনের দুটো পা দিয়ে বুকে উঠে দাঁড়িয়ে চুকচুক করে মুখটা একটু চেটে দিতে হবে। ন্যাজ নেড়ে, মাথা নেড়ে, পাগলামি করে বোঝাতে হবে, বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। প্রভু বলবেন, হ্যাঁ এই তো আমার কুকুর, ওয়েল ব্রেড ওয়েল ট্রেনড। পেডিগ্রিড কুকুর কি ট্রেনিং নেয় মশাই। একেবারে মানুষের মত। শুধু ভাষাটাই যা আলাদা। এ ডগ হ্যাজ এভরিথিং একসেপ্ট স্পিচ। ওর পেছনে, মাসে আমার কত খরচ জানেন? ডেলি মাংস দধ, ওষুধ। তবে হ্যাঁ খরচে সুখ। বেইমানী করে না।

মাসে মাইনে চার কি পাঁচ হাজার টাকা। সাজানো ফ্ল্যাট। গাড়ির আশপাশ খরচের জন্যে অ্যালাউনস। পেডিগ্রি বাজিয়ে চেয়ারে বসান হয়েছে। সব ঠাটই বজায় থাকবে, তবে ম্যানেজমেন্টের কথা শুনে চলতে হবে। যাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করতে হবে তাদেরই ঘেউ ঘেউ করবে, যাদের দেখে ন্যাজ নাড়তে হবে, তাদের দেখে যেন ঘেউ ঘেউ করে ফেলে না। বুলডগ আর নেড়ি ডগের ক্লেভার কম্বিনেশনই হল ঠাটবাট বজায় রাখার, ওপরে ওঠার চাবিকাঠি। চাপে থাক, চাপে রাখ। অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না। বিপ্লব টিপ্লবের কথা বলতে পার, তবে বিশ্বাস করো না। রুসো, ভলটেয়ার, লেনিন, গুয়েভার, ক্যাস্ট্রো, ও সব হল সাইক্লোনের মত। নিম্নচাপ, উর্ধ্বচাপের খেলা। প্রভাব বেশিদিন থাকে না। ন্যাজ আবার বেঁকে যাবেই। ন্যাজের স্বভাব যাবে কোথায়? সিনেমার পোস্টার দেখনি? ভাই হোতো অ্যায়সা। সেই রকম ন্যাজ হোতো অ্যায়সা। কথাটা হল 'কনট্রোল'। নিয়ন্ত্রণ। সামলে রাখ, কান ধরে টান মার, বেশ করে মোচড় মার। রাসকিনের কথায় মহাত্মাজীর মত চোগা চাপকান ছেড়ে নাটালে চলে যেও না যেন। সব মহাত্মারই শেষ পাওনা একটি বুলেট। প্রমাণিত সত্য, কলমের চেয়ে টেলিস্কোপিক রাইফেল অনেক শক্তিশালী। গান্ধী রাজঘাটে, কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং আমেরিকায়। পড়তে পার, তবে বিশ্বাস করো না।

The life is more than the meat

The rich not only refused food to the poor, they refuse wisdom, they refuse virtue, they refuse salvation. Ye sheep without shepherd, it is not the pasture that has been shut from you, but the presence. Meat! perhaps your right to that may be pleadable; but other rights have to be pleaded first. Claim your crumbs from the table, if you will; but claim them as children, not as dogs; claim your right

to be bed, but claim more loudly your right to be holy, perfect and pure.

তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদ্‌গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। ঘুম আসে না, চারিদিকে বলাৎকারের চিৎকার। চলবে না, চলবে না। চলছে ত ? এই ভাবেই চলছে, চলবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। মডার্ন মেডিসিন চেতনায় প্রলেপ লাগাবার স্মিত ঝটিকা বের করেছে। ব্যক্তিত্বকে চুরমার করে দেবার দাওয়াইও বিজ্ঞানের হাতে।

Where, Where in Heaven am I ?

But don't tell me !

প্রেমে আর রণে যে কোনও কৌশল অবলম্বন করা চলে। শাস্ত্রের সমর্থন আছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও অশ্বত্থামা হত জোরে, বলে, ফিসফিস করে যোগ করেছিলেন ইতি গজ। রাজনীতিতে চাণক্য আছেন। নীতি একটাই, কূটনীতি। মানুষের পৃথিবী মানুষের নিয়মেই চলবে। আদর্শ এক জিনিস, আচরণ আর এক জিনিস। একটা থিয়োরী, আর একটা প্র্যাকটিস।

মর্ত্যে স্বর্গ কোথায় ! কল্পনায়। মর্ত্যে হল বিকিকিনির হাট। এখানে যৌবন বিকোয়, অভিজ্ঞতা নিলামে চড়ে। শিক্ষা সোনার চাবিকাঠি দিয়ে সাফল্যের দরজা খোলে। অতীতে কিছু কল্পনাপ্রবণ মানুষ ধর্ম নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, জীবন নিয়ে, পাতার পর পাতা বড় বড় কথা লিখে গেছেন ! তখন কলকারখানা ছিল না, কোর্ট কাছারি ছিল না, নির্বাচন ছিল না, ইউনিয়ন ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ছিল না। পৃথিবীতে পোকার মত মানুষ গিজগিজ করত না। যে মানুষের মগজ থেকে বৈদিক সূক্ত বেরিয়েছিল, যে মগজে জন্মেছিল উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সেই মানুষেরই মগজ সৃষ্টি করেছে, পর্নোগ্রাফি, সেকস্‌ শপ, টর্চার মেশিন। যে মাটিতে যীশু, সেই মাটিতেই মোবুতু। মন্দিরের দশ হাত দূরেই বেশ্যালয়। একদল যখন মা মা করছেন, আর একদল তখন মাগ মাগ। যে নারীতে মা, সেই নারীতেই মায়া। একজনের পায়ের ধূলো নিয়ে আর একজনের ঘাড়ে লম্ফ মারি। মূর্তি তৈরি করে সোনার সিংহাসনে বসাই, আবার সোনালি ব্রা পরিয়ে উলঙ্গ করে ক্যাবারে নাচাই। যে নারীতে আমার জন্ম, সেই নারীতেই আমার জারজ সন্তান। যে মাটিতে রাজা, সেই মাটিতেই চেনে বাঁধা কৃতদাস। মানুষ কারুর প্রভু, কারুর দাস।

জীবনের বিচিত্র ভূমিকা।

বিভাসবাবু বড় চাকরি করেন। চাকরি যে করে তাকেই ত চাকর বলে। বিভাসবাবুকে চাকর বললে অনেকেরই চাকরি যাবে। তিনিও যে চাকর এই বোধ তাঁর সাবকনসাসে ছড়িয়ে আছে। চাকর বললেই তিনি রেগে যান। বলতে হবে অফিসার। ফার্স্টক্লাস, গেজেটেড অফিসার। বলতে হবে বড় সায়েব। আগে পরে স্যার জুড়তে হবে। ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হবে, মে আই কাম ইন স্যার। অধস্তনের দিকে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলবেন, ইয়েস। সামনে সারি সারি চেয়ার ; কিন্তু বসা চলবে না। বসলেই একটা কর্কশ দৃষ্টি লেহন করবে সর্বাঙ্গ। অপরাধ বুঝে ওঠার আগেই সেই বড় সাহেবের অন্তরীক্ষে সর্বনাশের পরোয়ানা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি তো তোমায় বসতে বলিনি হে কৃতদাস। যে জানে, সে কখনও বিনা অনুমতিতে

বসার দুঃসাহস দেখায় না। বড় সাহেবের কামরায় হাত কচলানই বিধেয়। মাঝে মাঝে মাথা চুলকানো এক ধরনের অধস্তন ভঙ্গী। বাদামী সাহেবরা এই ভঙ্গীটি বড় পছন্দ করেন। সাহেব আড়চোখে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন, এই তো আমার হোয়াইট কলার কৃতদাস। এই সময়টায় যিনি জানেন, তিনি সঠিক তৈল প্রদান করে ভবিষ্যতের পথ তৈলাক্ত করেন, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ত লিখেই গেছেন, তৈল এক প্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। তুমি আমাকে স্নেহ কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। সায়েব যদি অন্যায় বলেন, হে অধস্তন, তুমি প্রতিবাদ করো না। শুধু মাঝে মাঝে, ইয়েস স্যার বলে যাও। ইয়েস স্যারের সুপ্রয়োগে, পঙ্গুও কেরিয়ারের সুউচ্চ পর্বত লঙ্ঘন করতে পারেন। কত নজির চাই। তিনি বললেন, ইউ আর এ ফুল। তুমি বল ইয়েস স্যার। তিনি বললেন, আপনি একটি অপদার্থ গাধা। তুমি বল, ইয়েস স্যার। এবম্বিধ আচরণে কত অপদার্থ গর্দভ সুউচ্চ পদে আরোহণ করে স্বাধীনচেতা, আদর্শবাদী পদার্থের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। নিজেকে পদার্থ প্রমাণ করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা মূর্খের বিলাসিতা। বুদ্ধিমান গাড়ি বাড়ি করে। ফুটবলের মত স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করে। একটু ছোট হলে যদি বিরাট হওয়া যায়, তা হলে অত মর্মবেদনা কেন ? ক্ষমতাশালী মানুষ যদি শূয়োরের বাচ্চা বলেন, তাহলেই কি তুমি জেনুইন শূয়োরের বাচ্চা হয়ে গেলে। তোমারও তো একটা এলাকা আছে, যেখানে তুমি মানুষ, অন্য শূকরশাবক। আলো আর ছায়ার মত এই তুমি মানুষ, এই তুমি শূকর তনয়। থিয়েটারের স্টেজ। চরিত্রের ওপর আলোর ফোকাস পড়ছে। কখনও নীল, কখনও লাল।

ভাদুড়ী চক্রবর্তীকে বললেন, কি বড় সায়েবের কাছে খুব ঝাড় খেয়ে এলে ?

চক্রবর্তী বললেন, আরে ভাই আণ্ডার সেক্রেটারী ডেপুটির কাছে সকালে খুব ঝাড় খেয়েছে। ডেপুটি খেয়েছে জয়েণ্টের কাছে। জয়েন্ট খেয়েছে সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী খেয়েছে মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী খেয়েছে গিন্নীর কাছে।

গিন্নীর কাছে ?

হ্যাঁরে ভাই। সকালে খুব ঝাড় দিয়েছে।

চার্লির ছবির মত। হেড বাটলার, অ্যাসিসটেণ্টকে লাথি ঝাড়ল, সেই লাথি রিলে হতে হতে চলে গেল ডোরকিপারের পাছায়। ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

কোন মানুষই স্বাধীন নয়। সংসারী মানুষ ত আদপেই নয়। যিনি সন্ন্যাসী তিনি কোনও সঙ্ঘ বা সংগঠনের দাস। কোন রাষ্ট্রও পুরোপুরি স্বাধীন নয়। স্মল পাওয়ার বিগ পাওয়ারের ধামা ধরে থাকতে বাধ্য হয়। তা না হলে কোনও সময়ে অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

উপার্জনের জন্যে জীবিকার বাজারে মানুষ নিজেকে নিলামে চাপায়। আর তখনই সে হয়ে যায় দাস আমি। যত বড় চাকরিই হোক ! একবার লিডেন সায়েব ক্ষুণ্ণ হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ক্ষোভের কারণ, নতুন রাজধানীতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে উপার্জন অনুসারে। যাঁদের বেশি আয়, তাঁরা থাকবেন এ সেক্টারে, এই ভাবে ধাপে ধাপে বি সি ডি। জাতিভেদ, বর্ণভেদ কাগজে কলমে উঠে গেলেও আর এক ধরনের

বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, যার মূলে আছে উপার্জনভেদ।

যে কোনও শিল্প শহরেই এই নতুন বর্ণভেদ তৈরি হয়েছে। পদমর্যাদা অনুসারে মানুষের কোয়ারেন্টাইন। মেলামেশার ব্যাপারেও পদমর্যাদার বাধা। অফিসারস ক্লাব, অফিসারস ক্যান্টিন। সেখানে ইতর জনের প্রবেশ নিষেধ। এ কি জ্বালা! ছিলাম উচ্চবর্ণের মানুষ। লেখাপড়াতেও তেমন খারাপ ছিলাম না। বংশমর্যাদাও ছিল। তেমন করিৎকর্মা হতে পারিনি বলে ইস্পাত কারখানায় ফোরম্যান। কোয়ার্টার জুটেছে সি সেক্টারে। কাজকর্মেও চৌখোস। তবু আমি সি ক্লাস। এ ক্লাসের ব্রাহ্মণদের ব্রাত্য ওঁদের ক্যান্টিনে গ্রিলড চিকেন হলে আমাদের ক্যান্টিনে ঘুগনি, আলুর দম।

কোনও কোনও অফিসে ল্যাভেটরির মাথায় লেখা আছে, গেজেটেড অফিসারস। সেখানে জনৈক হোমরাচোমরা পুঁই পুঁই করে শিস দিতে দিতে জলবিয়োগ শুরু করলেন। ঝুল পাঁচিলের পাশে উঁচিয়ে আছে বকের মত গলা। হঠাৎ পাশের দিকে নজর চলে গেল। অচেনা কে একজন পাশের আড়ালে একই কর্মে ব্যস্ত। নিজের ত্যাগ বন্ধ রেখে তিনি একধাপ পিছিয়ে এলেন। ব্যাটা যদি ননগেজেটেড হয়। গেজেটেড মলমূত্র, আর ননগেজেটেড মলমূত্রের জাত আলাদা। তিনি যেই শেষ করলেন, ইনি প্রশ্ন করলেন, আর ইউ গেজেটেড?

পা ফাঁক করে নেচে নেচে প্যান্টের ফাস্টনার আঁটতে আঁটতে তিনি বললেন, অ, সিওর। কান্ট ইউ রেকগনাইজ মি ফ্রম দি স্মেল অফ মাই ইউরিন।

বড়সায়েব ট্যুরে চলেছেন। সঙ্গে চলেছেন কয়েকজন কুঁচো সায়েব। সার্কিট হাউসে পদার্পণ করেই তিনি গরম জল, চা, চিকেনের ফরমায়েশ পেশ করে কুঁচোদের বললেন, যান, আপনারা আপনাদের মত একটা হোটেলটোটেল দেখে নিন। এতক্ষণ একই জিপে এঁরা এসেছেন। গল্প গুজবও হয়েছে। মাঝে মধ্যে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা, সিঙাড়া, কৃষ্ণনগর হলে সরপুরিয়া, শক্তিগড় হলে ল্যাংচা, গোবরডাঙা হলে কাঁচাগোল্লা, মুর্শিদাবাদ হলে ছানা বড়া সেবন হয়েছে। সার্কিট হাউসে অনেক ঘর কিন্তু চাকরিতে যারা নীচ জাতীয় তাদের সঙ্গে সহবাস চলে না। নীচ জাতীয়া মহিলার সঙ্গে সহবাস কিন্তু শাস্ত্র সম্মত। আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিদেশী শাস্ত্রেও সেই এক বিধি। সাদা সায়েবরা এদেশে সেই প্রজাতি রেখে গেছেন।

মাঝরাতে বিনা নোটিসে সপার্ষদ মন্ত্রী এসে হাজির হলেন। সবকটা ঘরই তাঁর লাগবে। সায়েব তাঁর লটবহর, গেলাসে হাবুডুবু নকল দাঁত সহ, সার্কিট হাউসের হাতায় অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। রাত কেটে গেল তারা গুণে।

ছোট করে দাও, চেপে দাও, দুমড়ে মুচড়ে দাও। ক্ষুদ্র মানুষ কল্পনায় বিশাল হতে চায়। মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় একে বলে বিপরীত ইচ্ছা। ক্ষুদ্র করে রাখার চেষ্টা হলেই প্রতিরোধ তৈরি হবে। বিশালের কল্পনা আসবে। গাছের ফল ন্যাকড়া বেঁধে রাখলে বড় হয়। মানুষ সহসা বড় হতে পারে না। জগতাতীতে সে পূর্ণতা খোঁজে। অরণ্যদেবকে ভালবেসে ফেলে। আসলে যা হয়, সব মানুষের ক্ষেত্রেই যা সত্য, সে স্যাডিস্ট হয়ে যায়। পরকে মারার ইচ্ছে পূর্ণ হলে, নিজে মার খাবার ইচ্ছে অবচেতন লুকিয়ে বসে থাকে। যুদ্ধের নিয়ম হল, কিল অর বি কিল্ড। পরের দাসত্বে মানুষ মাধুর্য খুঁজে পায়

একই কারণে। নিপীড়নের ইচ্ছা নিপীড়িতে তৃপ্তি খুঁজে পায়। খুব ঝেড়েছির মত খুব ঝাড় খেয়েছিতেও একই আনন্দ। প্রেম, প্রীতি ভালবাসা এক ধরনের ক্লান্তির আকাঙ্ক্ষা। বৃদ্ধ মাস্তান যেমন হৃতবল হয়ে, কপালে তিলক সেবা করে, ভাগবত পাঠের আসরে বসে, দুলে দুলে কীর্তন শোনে। লোকে ভাবে এত প্রেম ছিল কোথায়। দাঁত পড়ে গেছে তাই নিরামিষাশী। চোখে ভাল দেখতে পাই না তাই জগৎ সুন্দর। ঘাড় মটকাবার শক্তি নেই তাই :

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কী হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু-মন-জড়ো॥
রাতিদিন পোড়ে মন সোয়াৎ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও॥

প্রেম আবার কি? একপক্ষে অধিকার বোধ আর একপক্ষে আত্ম বিসর্জন। আমাতে আত্মসমর্পণ কর আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। স্বামী স্ত্রীকে বললেন, যা বলব তাই শুনবে, প্রতিবাদ করবে না, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। তুমি আমার পেট ডগ। বিছানা পাবে, বালিশ পাবে, সিল্ক পাবে, সোনা পাবে। পিতা পুত্রকে বললেন, অবাধ্য হবে না। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। মালিক শ্রমিককে বললেন, নতজানু হও বোনাস পাবে। চেলারা নেতাকে বললেন, আমাদের কালটিভেট কর গুরু তবেই গদি থাকবে। আইনের প্রভুরা বললেন, সন্তুষ্ট রাখুন, বেআইনী চালাতে দোব। স্বর্গ কোথায়? পলাতকের দুর্বলতায়। এরিক ফ্রমকে টেনে আনি, The power of the one to whom one submits is inflated, may he be a person or a god, he is everything. I am nothing except inasmuch as I am part of him

তাসের ঘর

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্যদিন এই সময়টায় শশাঙ্কবাবু সান্ধ্যভ্রমণে বেড়াতে যান। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বড় রাস্তা পেরিয়ে আবার গলি। গলির মধ্যে ঘুগনি খেতে খেতে সন্ধ্যের মুখেই ফিরে আসেন বাড়ির দরজায়। বৃদ্ধ মানুষ। সকাল-বিকেল না বেড়ালে ভাল হজম হয় না। এই বয়েসে লোভটাও বাড়ে। মাঝে মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা সেটা খেয়ে ফেলেন। তারপর পেট যখন হাঁসফাঁস করে তখন প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনও অখাদ্য-কুখাদ্য খাব না। আজ সেই রকম একটা দিন। সকালে মেঘলা দেখে দুটো চপ খেয়েছিলেন। দুপুরে খেয়েছেন খিচুড়ি আর সেঁকা পাঁপড়। একটু আগে খেয়েছেন চা আর নিমকি। এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যদিন এক মাইল বেড়ালে আজ তিন মাইল বেড়ান উচিত।

ঘরের একটা জানালা খুলে শশাঙ্কবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কালো হয়ে এসেছে আকাশ। চারপাশ যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছাতা নিয়ে বেরোন যেত যদি দমকা হাওয়া না থাকত। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন। সন্ধ্যের আগেই ঘরে অন্ধকার নেমেছে। আলোটা জ্বালালেও হয়, না জ্বালালেও হয়। সারা দুপুর অনেক পড়েছেন। ঝাপসা আলোয় পায়চারি ভাল। ঘরে ঘুরে ঘুরেই তিন মাইল বেড়িয়ে নিতে হবে।

একটা ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায় শশাঙ্কবাবু থাকেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে জামসেদপুরে। ছেলের বিয়ে হয় নি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বেশি দেরি করতে চান না। বৃদ্ধ বয়েসে একা থাকতেও ভাল লাগে না। সারাদিন নিঃসঙ্গ। বই, কাগজ, ছবি, আকাশ, ফুলগাছের টব, বারান্দা, রাস্তা, আশপাশের বাড়ি—এই তো তার জগৎ। এর বাইরে তো যাবার উপায় নেই। কাঁহাতক ভাল লাগে। ঠিকে একজন কাজের লোক আছে। ফুড়ুক করে আসে, ফুড়ুক করে পালিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে একটা ছোঁচা বেড়াল আসে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে দুধ রুটি মাছ খাইয়ে তোয়াজ করেন। যদি পোষ মেনে যায়। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ গোল হয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটু মজা করার ইচ্ছে হল। ঘুরে ঘুরে ইংরিজী অক্ষর লিখতে শুরু করলেন —এ বি সি ওয়াই এম ডবলু। রাত আটটা কি নটার সময় সুধী আসবে। ছেলের নাম সুধী। তার আগে অবশ্য রান্নাবান্না কবার মহিলাটি এসে যাবে। মুখে পান। খোঁপাটা মাথার পেছন দিকে উঁচু করে তুলে বাঁধা। মহিলাটির চালাচলন কেমন কেমন হলেও রাঁধে ভাল। কামাই করে না।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। এমন সময় কারুর তো আসার কথা নয়। আজকাল পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নড়লে, কি বেল বাজলে ভয় করে। একা থাকেন। শরীরে তেমন শক্তিও নেই। অস্ত্রও রাখেন না। ইদানীং ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো নানারকম খুনখারাপি হচ্ছে। দরজার ম্যাজিক আইও নেই যে আগন্তুককে দেখে নেবেন।

শশাঙ্কবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে ?

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে জবাব এল—আমি।

—কে সন্ধ্যা ?

—না আমি।

—তবে কি রমা ?

রমা হল নিচের ফ্ল্যাটের পরেশবাবুর মেয়ে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তবে ছেলের বউ করা চলে কিনা ভাবতে হবে।

—না আমি।

শশাঙ্কবাবু খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। মহিলা কণ্ঠ, অথচ সন্ধ্যা নয়, রমা নয়। তাহলে কে ? কোন পুরুষ মহিলার গলা নকল করছে বলে মনে হয় না। ওপাশে নির্ভেজাল কোন মহিলাই দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মহিলারাই কে জিজ্ঞেস করলে আমি আমি করেন। তাছাড়া শাড়ির খসখস শুনতে পাচ্ছেন।

—দয়া করে নামটা বলবেন। শশাঙ্কবাবু সরাসরি নাম জিজ্ঞেস করলেন।

—দরজাটা খুলুন। নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—না, না আজকাল দিনকাল ভাল নয়। পরিচয় না দিলে দরজা খুলব না।

—আ গেল যা। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েছেলের মত ভয়ে মরছে দ্যাখো!

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন, চোর ডাকাত নয়, আদি অকৃত্রিম গেরস্থ মহিলা। সাহস করে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার সামনে মোটাসোটা মাঝবয়সী এক মহিলা। পাকা পেয়ারার মত রঙ! হাতে ঝুলছে পেটমোটা চটের লেডিজ ব্যাগ। মহিলা সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার ঠুকেই বললেন, —বিপদে পড়ে এসেছি। চিনতে পারছেন কিনা জানি না। পেছনের ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকি। দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে। একদিন বাসে ওঠার সময় আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরেছিলুম বলে মাথাটা পেছনের চাকায় যায়নি। মনে পড়ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন। কি বিপদ বলুন?

মহিলা ভেতরে এসে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলেন, —এখন কারুর আসার সম্ভাবনা আছে?

—আজ্ঞে না।

—বেশ—খুব ভাল কথা। আপনার শোবার ঘরে একবার চলুন তো।

শশাঙ্কবাবু মহিলার অসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এইবার একেবারে অভিভূত হয়ে বললেন, —না না শোবার ঘরে কেন? বসার ঘরে বসাই তো ভাল।

—বসতে আমি আসিনি। এসেছি কাজে। সে কাজটা শোবার ঘরে না গেলে হবে না।

কথা বলতে বলতেই মহিলা শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। শশাঙ্কবাবু খুব অবাক হলেন। কোনটা শোবার ঘর মহিলার জানা। হাত ধরে টেনে আনতেও পারছেন না। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। শোবার ঘরেই সংসারের যথাসর্বস্ব। দুপাশে দুটো খাট। একটা নিজের অন্যটা ছেলের। দুজনে একই ঘরে শোন। শশাঙ্কবাবু একা শুতে পারেন না। ঘুম আসে না, ভয় ভয় করে। দরজার পাশে আলোর সুইচ। জ্বালাতে যাচ্ছিলেন! মহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—

—খবরদার না। আলো জ্বালাতেই সব মাটি হয়ে যাবে।

শশাঙ্কবাবু হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, —কি করতে চাইছেন আপনি? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা শশাঙ্কবাবুর বালিশ থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, —ওয়াচ। ওয়াচ করতে চাইছি।

—তার মানে? কাকে ওয়াচ করবেন?

—ওই যে ও বাড়ির বুড়োটাকে। আমার স্বামী।

শশাঙ্কবাবুকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উত্তর দিকের জানালার খড়খড়িটা

ফাঁক করে দেখতে দেখতে বললেন, —হুঁ, আলো জ্বালা হয়নি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। কতক্ষণ তুমি আলো না জ্বেলে থাকবে। এই আমি বসলুম খাটের কিনারায়।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, মহিলা তার খাটের পাশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন! একটা পা তুলে দিয়েছেন মাথার বালিশে। কিছু বলতেও পারছেন না চক্ষুলজ্জায়। অথচ প্রায় অপরিচিতা এক মহিলা একেবারে বিছানায় গিয়ে বসবেন এটাও বরদাস্ত করা যায় না।

ছেলের খাটে বসে ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, —ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার? বুড়োকে ঘোড়া-রোগে ধরেছে।

—বুড়ো কাকে বলছেন, আমাকে?

—ছিঃ, আপনাকে কোন সাহসে বলব? বলছি আমার কত্তাকে। সেই কচিখেকো দেবতাটিকে।

—তার মানে?

—তাহলে একটু ভেঙেই বলি। তার আগে জিজ্ঞেস করি, চায়ের ব্যবস্থা-টেবস্থা আছে।

—ব্যবস্থা আছে, করার লোক নেই।

—একটু চা না খেলে ঠাণ্ডায় যে মরে যাচ্ছি। আমি করলে আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই, তবে সেটা কি ভাল দেখাবে!

—ওঃ বাবা। আজকাল আবার ভাল-মন্দর অত বিচার আছে নাকি! চলুন কোথায় কি আছে দেখে নি।

চা তৈরি হল। শশাঙ্কবাবু বিস্কুট বের করলেন। বসার ঘরেই চা-পর্ব শুরু হল। মহিলা চা খেতে খেতে নিজেকেই নিজে তারিফ করলেন, —চা-টা বেশ করেছি কি বলেন?

—হ্যাঁ বেশ হয়েছে।

—তাও তো মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

চা খেতে খেতে মহিলা যা বললেন, স্বামী ঠিকেদারী করেন। পয়সা কড়ি আছে। মহিলা বড় একটি হাসপাতালের নার্স। ছেলেপুলে হয়নি। বছরখানেক হল ভদ্রলোক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। মেয়েটি কলেজে পড়ে। সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি। খালি কাপটা টেবিলে রেখে মহিলা বললেন, —চারদিকে ছি ছি পড়ে গেছে। কান পাতা যাচ্ছে না। নিচের ফ্ল্যাটের নন্দা অনেক কিছু দেখেছে। সেদিন আমার খোঁজে দুপুরবেলা ওপরে উঠেছিল। ওপরে উঠে দেখে, আরে ছি ছি, বুড়োর মুখে আগুন।

শশাঙ্কবাবুর অন্যের পারিবারিক কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। এসব নোংরা ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়তে একদম ইচ্ছে করছিল না। মহিলাকে কোনরকমে বিদায় করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। একি উটকো ঝামেলা। শশাঙ্কবাবু চাইলেই তো আর হবে না, মহিলা নিজের মনে বলছেন, —অ্যাঁ যে বয়েসে লোক বনে যেত, সেই বয়েসে তুই ভর দুপুরে একটা ছুঁড়ীকে কোলে বসিয়ে মুখে রসগোল্লা গুঁজে দিচ্ছিস? তাহলে

আমার যখন নাইট ডিউটি থাকে তখন তুই কি করিস? কি শয়তান, কি শয়তান!

মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। শশাঙ্কবাবু হাঁ করে দেখছেন তাঁর গতিবিধি। আবার শোবার ঘরের দিকে চলেছেন। উত্তরের জানালা দিয়ে তাকালে একটা বারান্দায় কিছু অংশ একটা ঘরের পুরোটাই চোখে পড়ে। খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার আলনা। বারান্দার রেলিং-এ লাল টকটকে একটা সায়ার তলার দিক হাওয়ায় অসভ্যের মত ফুলে ফুলে উড়ছে। খড়খড়ি জানালার পাখি ঈষৎ ফাঁক করে মহিলা নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, —মহারাণীর চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা যেন অভিসারে যাবেন। মরণ আর কি? বুড়োটা গেল কোথায় দেখছি না তো।

শশাঙ্কবাবুর খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনার নায়িকাকে একবার চোখের দেখা দেখেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলেন।

মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, —শয়তানী আমার মাথা খাবার জন্যে এসেছেন। মানুষের উবগার করতে নেই।

—আপনার স্বামীকে বারণ করুন না। বোঝাতে পারছেন না।

—বোঝানো? ঝ্যাটাপেটা পর্যন্ত হয়ে গেছে। পুরুষ হল পতঙ্গ। আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, আর ওটাকেও একবার এখানে এসে দেখে যান। তারপর বলুন তো, আমার কোন জিনিসটা কমতি আছে। আসুন, আসুন।

শশাঙ্কবাবু পায়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে ক্যাটারাক্ট ফর্ম করছে। ভাল দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর মনে হল, এই মহিলার তুলনায় ওই মেয়েটির সব কিছুই কম কম—বয়েস কম, মেদ কম। বেশির মধ্যে চুল, শরীরের খাঁজ। সরে এলেন শশাঙ্কবাবু। এইবার তাঁকে বিচারকের রায় দিতে হবে।

—না আপনার চে' সব কিছুই ওনার কম কম। কেবল চুলটাই যা বড়।

—আরে মশাই, ওই বয়েসে আমার চুলও পাছা ছাড়িয়ে নামত। এখনই না হয় টিকটিকির ন্যাজ হয়ে গেছে। সব পুরুষেরই এক রা, সব শেয়ালের মত। চুল আর বুক দেখেই গলে গেল।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সত্যিই তো মেয়েদের ওই দুটি বস্তুর প্রতি যৌবনে তিনিও ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। মনটা কেমন হু হু করে উঠত। সেই আকর্ষণের ছিটেফোঁটা বুড়ো শরীরে এখনও পড়ে আছে। হিংসে হলে কি হবে, মেয়েটির চুলের ঢল সত্যই চোখে পড়ার মত। মাথাটা একপাশে কাৎ করে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা আলো ঝলমলে ঘরে দীর্ঘকায় স্লিম এক মহিলা, সংসারে এর চে' সুখের দৃশ্য আর কি আছে। অথচ এই মহিলাটি রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।

চটের হাত ব্যাগ থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহিলা চ্যাপ্টা একটি কৌটো বের করে মুখে কিছু পুরলেন। পাশের ঘরের আলোর আভা এ ঘরে এলেও শশাঙ্কবাবু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শব্দ শুনে মনে হল পান চিবোচ্ছেন।

—পান খাবেন? মিষ্টি মশলা দিয়ে সাজা।

—সন্ধ্যেবেলা পান আর খাবো না। আগে খুব খেতুম। এখন সকালে খাবার পর

সুপুরি ছাড়া এক খিলি খাই।

—আমি খুব খাই। ঘুম থেকে উঠে শুরু করি যতক্ষণ না শুতে যাচ্ছি। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ছেলে নেই পুলে নেই। সংসারটাও পরের হাতে চলে যেতে বসেছে। ফ্রাসট্রেশন, ফ্রাসট্রেশন।

মহিলা চৌকির ওপর বেশ ভাল করে নড়েচড়ে বসতে বসতে খুব ঘরোয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, —ওই খাটে কে শোয় ?

—আমার ছেলে।

—আমি যেটায় বসে আছি ?

—ওটা আমার।

—একই ঘরে বাপ ছেলে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে তো ?

—হ্যাঁ মেয়ে দেখছি।

—তখন তো ঘর আলাদা করতে হবে।

—বসার ঘরের একপাশে সরে যাবো। অসুবিধের কিছু নেই।

—ছেলের বউ একটু দেখেশুনে করবেন। আজকালকার মেয়েদের ছিরি দেখছেন তো। নিজের বউটিকে তো খেয়ে বসে আছেন। যে বয়সে নিজের বউকে সব চে' বেশি দরকার হয় সেই বয়সেই তো ঘর খালি। এখন লাগছে কেমন একলা একলা।

—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সকলকেই তো যেতে হবে। আগে আর পরে।

শশাঙ্কবাবু শব্দ করে হাসলেন। হেসে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাওয়া নিঃসঙ্গতাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মহিলা শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। জানালার পাখি খুলে চোখ রেখেছেন। পুরো মনোযোগটাই ওখানে। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল, —আহাহা হা, পটের বিবি। মরা মানুষেরও লজ্জা থাকে, উনি শুধু সায়া পরে ঘরময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। সায়ার রঙ দেখো—লাল, নীল, হলদে, সবুজ। যে জিনিস চাপা থাকবে তার আবার অত রঙের বাহার কি জন্যে ? আমাদের আমলে সব সাদা ছিল। এখন আবার লুঙ্গি উঠেছে। বুড়োটা নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে বসে উর্বশীর নৃত্য দেখছে। বাড়ি নয় তো বেশ্যালয় ?

জানলার পাখি ফেলে দিয়ে মহিলা সোজা হয়ে বসে শশাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করলেন, —আজকাল মেয়েগুলোর কি হয়েছে বলতে পারেন ? পুরুষদের না হয় ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ানোই চিরকালের স্বভাব ! ছুঁড়িগুলোর এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে কেন ?

শশাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রশ্নের কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এক সময় বললেন, —কালের হাওয়া।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধানে, হিসেব করে করে বললেন, —এক এক বয়সের মেয়েকে এক এক রকম দেখতে। কম বয়েসে এক রূপ, বেশি বয়েসে আর একরকম রূপ। দুটো রূপই ভাল।

মহিলা খাটের ওপর বেশ করে নড়েচড়ে বসলেন। সাবেক আমলের অমন শক্ত খাটও শব্দ করে উঠল। মুখে আর একটু মশলা ফেলতে ফেলতে বললেন, —রূপসী অ-রূপসীর কথা হচ্ছে না, আমার কথা হল তোয়াজ। ক'টা স্বামী মশাই স্ত্রীকে তোয়াজে রাখতে

পারে ? সারা জীবন বাবুরা ধামসে যাবেন বুড়ো বয়েসে চাইবেন স্ত্রীর যৌবন, পাছা ভর্তি চুল, সরু কোমর, টান টান তেল তেল চামড়া, হাত ভর্তি...।

শশাঙ্কবাবু আতঙ্কে কেশে উঠলেন। এঁর মুখে তো কোন কথাই আটকায় না।

—কাশি হয়েছে দেখছি। আর হবে না। বর্ষায় চারদিক ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে আছে। রক্তের জোরও তো কমছে। বুকে বসেছে ?

—না শুকনো কাশি।

—একটু মালিসটালিস, কেই বা করবে ? এই বয়সের বিধবাদের বড় কষ্ট। ওই মড়া কিন্তু বুঝল না, বউ কি জিনিস ? এই তো সেবার, অস্থানে বিষফোঁড়া হল। সারারাত ঘুমোতে পারে না। কে সেবা করল ? ফুর্তির মেয়ে জুটবে অনেক। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না। কিন্তু সেবার মেয়ে ওই একটাই— বউ। কিল মার, চড় মার, ঝাঁটা মার, শেষ পর্যন্ত বউই ভরসা। বয়েস তো হল, অনেকের অনেক নেত্তাই তো দেখলুম, ঘাড়ে পাউডার, চুনট করা ধুতি, বার্নিস করা জুতো, শালীর সঙ্গে রপটারপটি, ভাদ্দর বউয়ের সঙ্গে গা—ঘষাঘষি, বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে নুকোচুরির পিরিত, মাসকাবারি মেয়েমানুষ, শেষকালে বুড়ো এসে মরল বউয়ের কোলে —ওগো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই গো। ঘেন্না ধরে গেল জীবনে।

মহিলা জানালার পাখি ফাঁক করে আর একবার দেখলেন। শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন কোনও রকম মন্তব্য হবে। না হল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে নিজেকে এইবার একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তা হলেও সন্ধ্যেটা বেশ কাটল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। একটা হাই উঠল। দু হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘরে আলো না জ্বললেও বারান্দা থেকে আলোর একটা আভা ঘরে এসেছে। একটা আবছা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, হালকা রঙের ব্লাউজ। শরীরটা সামান্য ভেঙেচুরে খুব পরিচিত একটা ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেও ত এইভাবে শরীর ভাঙত। বয়েস যখন কম ছিল শশাঙ্কবাবু ঠিক এই রকম মুহূর্তে লোভ সামলাতে না পেরে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে খাটে উল্টে ফেলে দিতেন। না, না, অতীত অতীতই, প্রাচীন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মনকে দুর্বল করে তোলা ঠিক নয়।

বিছানা থেকে চটের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা বললেন, —যাই। গিয়ে সংসারের চুলোয় আগুন ধরাই। মেয়েদের এই জ্বালা, যখন আদর জোটে, তখন ফুটকলাই নিয়ে ফোটে। যখন আদর টুটে তখন মুগুর দিয়ে ঠোকে।

শশাঙ্কবাবু পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন। বেঁটে মহিলা, দরজার ছিটকানিতে হাত পাবেন না। ঘাড়ের কাছে সরু সোনার হার চিকচিক করছে আলো পড়ে। গোল-গোল হাতে সাদা শাঁখা। শশাঙ্কবাবু গড়ন-পেটন মানেন। তন্ত্রে এই ধরনের চেহারার যে উল্লেখ আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই মহিলা লক্ষ্মীমন্ত। ছিটকিনি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন, —আপনাকে বিয়ে করার পরই কত্তার ভাগ্য ফিরেছে, তাই না ?

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন, —ঠিক ধরেছেন তো। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন নাকি ?

—তেমন ভাবে করি না, তবে বেকার মানুষ একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

—তাহলে এবার যেদিন আসব কোষ্ঠীটা আনব।

মহিলা বেরোচ্ছেন শশাঙ্কবাবুর কাজের মহিলাটিও ঢুকছে। অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। এ আবার কে! মেয়েটির আজ টান করে চুলবাঁধা। ফেতা দিয়ে শাড়ি পড়েছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন সাজের ঘটা একটু বেশি। বেশ গুছিয়ে নিজের মত করে কাজ করে, তাই সব বেচাল সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গায়। একটু ফিচলেও আছে। এই তো সেদিন, শশাঙ্কবাবুর সামনেই ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাতার পিছন ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। কোন সংকোচ নেই। উলটে জিজ্ঞেস করল, 'ঘামাচির পাউডার আছে আপনার কাছে।' পাশ দিয়ে চলে গেলে কেমন একটা যৌনতার আঁচ গায়ে লাগে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তাও মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে শশাঙ্কবাবু নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, —মানু, একটু চা করবে নাকি?

রান্নাঘরের পাশের কলে অনেকখানি কাপড় তুলে মানু পায়ের গোড়ালি ধুচ্ছিল। ভাল দেখতে পান না তবু ক্ষণিকের জন্যে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল শ্যামলা দুটি পায়ের গোছে। সায়ার ঝোলা অংশ, শাড়ির পাড়, নির্জন বারান্দা, ঝিমঝিম বৃষ্টির শব্দ, ভিজে ভিজে গাছের পাতা দোলান বাতাস, প্রতিবেশীর রেডিও থেকে ভেসে আসা সংগীত, নাঃ জীবন একটা মধুর অনুভূতি। ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়ল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা।

—মানু আর পা ঘষো না, এবার ক্ষয়ে যাবে।

—রাস্তার যা অবস্থা, ঘেন্না করে, ম্যাগো।

—জান ত দাদাবাবু আজ ফিরবে না, কলকাতার বাইরে গেছে।

—জানি, সকালে বলে গেছেন আমাকে। তার থেকে ওই গামছাটা দিন তো। ওটা নয়, ওটা নয়, ওই পাশের লালটা।

—আরে বাবা লাল, নীল বোঝার মত কি আর চোখ আছে আমার। এই নাও ধর।

—বাদাম দিয়ে চিঁড়ে ভাজব, খাবেন।

শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। মানুর খাবার ইচ্ছে হয়েছে। না বললে নৃশংসতা হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কেন খাবো না? ভাজ ভাজ, বর্ষায় জমবে ভাল। মানুকে শোনাতে ইচ্ছে করল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা। এসব কথা হঠাৎ বলা যায় না। নিজেকে সংযত করে রাখলেন। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। মন বড় মাতাল হয়েছে। বিবাহিত জীবনের কত অভ্যাস স্ত্রী বিয়োগের পর জোর করে ভুলতে হয়েছে। বাবা। অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোর। শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

বিছানায় কাৎ মেরে শুয়ে পড়লেন শশাঙ্কবাবু। বেডকভারটা একটু কুঁচকে মুচকে গেছে। বালিশের ঢাকাটা একটু ভিজে ভিজে। চুলের আর তেলের গন্ধ। নাকের কাছে কি একটা সুড়সুড় করছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললেন। গোটাকতক লম্বা চুল আটকে আছে তোয়ালের রোঁয়ায়। বেডকভারের যে জায়গাটায় মহিলা বসেছিলেন সেই

জায়গাটাও সামান্য ভিজেছে। শাড়িটা বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজেছিল। আলোটা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধাও মাথায় গন্ধ তেল মাখত। সারা ঘরে এইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াত। অনেকদিনের স্মৃতি আবার ভেসে এল। মহিলাশূন্য নীরস সংসারে কিছুক্ষণের জন্যে যেন রসের ধারা বয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু চাদরের ভিজে জায়গাটায় বারকয়েক হাত বুলোলেন। বালিশের ঢাকায় মুখ জুবড়ে নিজের স্ত্রীকে মনে করবার চেষ্টা করলেন। যৌবন, সংসার, ভালবাসা, ঝগড়া, ভাব। শরীরটা মাঝে মাঝেই একটু সঙ্গ চাইত। সুধা সাবধান করত, একটু বুঝেসুঝে খরচ কর তাহলে দেরিতে ফতুর হবে। নিজেই কেটে পড়লে, পড়ে রইল শশাঙ্ক। কার কখন তেল ফুরোয়, কে বলতে পারে রে বাবা!

একটু বোধহয় তন্দ্রামত এসেছিল। মানু ঘরে এসে বলছে, —একি চিঁড়ে খাননি কাকাবাবু! আমি যে চা নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্কবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, —আলোটা জ্বাল ত মানু।

ঘরের ওপর আলো লাফিয়ে পড়ল। শশাঙ্কবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন চোখে ঘুম রয়েছে! সংসারটাকে বেশ ভরাট ভরাট লাগছে। সব যেন ফিরে এসেছে। এ কে? মানু, না সুধা?

মানু বললে, —অবাক হয়ে কি দেখছেন? শরীর খারাপ?

না শরীর খারাপ নয়। বিকেলে বেরোতে পারিনি তো সন্ধ্যের দিকে গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—সব কটা জানালা বন্ধ করে রেখেছেন, গরম লাগছে না?

চায়ের কাপটা খাটের পাশের ছোট টেবিলে রাখার জন্যে মানু নিচু হল। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপার দিকে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল। কুচকুচে কালো চুল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মানু বললে, —যা বর্ষা নেমেছে, কি করে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি?

—বাড়ি ফিরতেই হবে?

—না ফিরলে আর একজন ত হেদিয়ে মরে যাবে।

—না, তেমন হলে এখানেও তো শোবার ব্যবস্থা আছে

—দেখি।

মানু চলে গেল। একবার শশাঙ্কবাবুর খুব জ্বর হয়েছিল, মানু একদিন সারারাত জেগে সেবা করেছিল। সন্ধ্যে থেকেই মনটা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে নরখাদক হয়ে যায়। শশাঙ্ক কি সেই বাঘ? ভাজা মুচমুচে চিঁড়েও এখন পাগলে পাগলে খেতে হয়! দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেললে কেমন হয়। মুখের চেহারাটা আবার যুবকদের মত হয়ে যাবে! চুলে একটু কলপ। আরও যুবক। মন পাখি কি বুড়িয়ে গেছে? ভেতরটা আজ বড় শিরশির করছে। মানু যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন কেমন মনে হল! না মনটাকে বাঁধতে হবে।

নারী সংসৃতিমূলিকা, অর্গল সুরপুরকের।
চিত্রতমপি নহি দেখহিঁ বুদ্ধিমন্ত ঘনের।

এই সংসারে নারীই হল সংসারের মূল ও মোক্ষপথের বাধা! ছবির মেয়েছেলেও

চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়! জ্ঞানী ব্যক্তি তাই ছবির মেয়েছেলের দিকেও ফিরে তাকান না।

শশাঙ্কবাবু আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিদ্রোহী শরীরটাকে বিছানায় চেপে রাখার ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখি। সেই সায়া, ফুলে ফুলে উড়ছে। সেই মহিলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব হাত নেড়ে অদৃশ্য কাউকে শাসন করছেন। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। সেই মেয়েটি কোথায়। অনেকটা মানুর মতই দেখতে। মানুর চেহারার বাঁধনটা এখনও ঠিক আছে। একটু যত্নে থাকলে কত লাগদাঁই হত!

॥ দুই ॥

দুপুরের দিকে মহিলা এলেন। এখনও বেশ চুল আছে। কপালটা তাই ছোট। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। নাকের ডগাতেও পুঁতির মত ঘামের দানা। নাকের ডগা ঘামলে প্রেমিক হয়। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মহিলা বললেন, —যত বর্ষা হচ্ছে তত গরম বাড়ছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে শাড়ির পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বললেন, —চটি পরে বর্ষায় হাঁটা যায় না। কাদা ছিটকেছে?

শশাঙ্কবাবু দেখলেন। সাদা শাড়ি ভারী শরীরে মোলায়েম হয়ে জড়িয়ে আছে। এখানে-ওখানে সামান্য কাদার ছিটে। একটা দুটো ছিটে লেগেছে। একেবারে স্প্রে পেন্টিং হয়ে যায়নি।

—কাদার দাগ ওঠে না, বুঝলেন, মনের দাগের মত।

—ছেলে কোথায়?

—ছেলে বেরিয়েছে।

—আজ আমার অফ ডে। বুড়ো জানে না। প্রথম প্রথম বলত আজ আর বেরিও না সুধা, নাইবা গেলে আজ।

—আপনার নামও সুধা?

—কেন?

—আমার স্ত্রীর নামও সুধা ছিল।

—ও। এখন কি বলে জানেন, তুমি বেরোবে না? না না কামাই করা ঠিক হবে না, দেশের মানুষ সাফার করবে। ওরে আমার দেশ হিতৈষীর বাচ্চারে। চলুন, ঘরে চলুন।

মহিলার এই আদেশের ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগে। তেমন তেমন মেয়ের কৃতদাস হয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, দিগ্বিজয়ী যো শূর হোয়, বহুগুণসাগর তাহিঁ। ভ্রূকটাক্ষ নো করত হোয়, তাকো পদতলমাহি। দিগ্বিজয়ী, মহাবলশালী পুরুষ। মেয়েছেলের কটাক্ষপাতে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মহিষাসুরের বুকে দুর্গার শ্রীচরণ।

—এই নিন। ভুলিনি। কাশিটাকে ত কমাতে হবে। দু আঙুলে নিয়ে শোবার আগে বুকে লাগাবেন। মালিশ নয় শুধু ওপর ওপর লাগিয়ে দেবেন। আর এই নিন খাবার ওষুধ। শোবার আগে এক চামচে চেটে চেটে। ভাল মানুষের জন্যে করতে ইচ্ছে করে। মিচকে শয়তানটার জন্যে অনেক করেছি, দাম দিলে না।

—আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। হয়ত শুধু শুধু সন্দেহ করছেন। ভদ্রলোক হয়ত মেয়ের মতই ভালবাসেন।

—কিই ?

মহিলা খাটের ওপর ধপাস করে বসে, একটা পা বিছানায় রাখলেন, —মেয়ের মত ? না মেয়েমানুষের মত ? শুনুন তবে, ছেলেপুলে হচ্ছে না দেখে দুজনেই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম। ডাক্তার বললেন, গোলমাল আপনার নয়, আপনার স্বামীর। বুঝলেন ব্যাপারটা ! ও তো এখন বেপরোয়া। ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, ছোবলালেও মরবে না ! এইবার দেখুন।

উত্তেজিত মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইণ্ডার বের করলেন, —নিন, চোখে লাগিয়ে দেখুন।

চোখ লাগিয়েই শশাঙ্কবাবু চমকে উঠলেন। উরে বাপ। একি ! সাপ দেখছেন যেন। জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলেন।

—এইসব জিনিস বাড়িতে আসছে কিসের জন্যে ? বলতে পারেন কিসের জন্যে ? সন্দেহ ! সাধে সন্দেহ আসে ? মেয়েছেলে হতে পারি, মুখ্যু হতে পারি, তা বলে তো গাধা নই। প্রথম বয়েসে এসবের মানে বোঝা যায়, শেষ বয়সে মরার কালে এত চুলবুলুনি কিসের ? সব ওই ছুঁড়ির জন্যে। বুড়ো মড়ার যৌবন ফিরে এসেছে। আমার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ভাল কথা বললেও খিঁচিয়ে ওঠে। ওই ছুঁড়ি কিছু বললেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইলেন, —আজ একেবারে শরতের আকাশ।

—ওসব আকাশ-টাকাশ কবিরা দেখবে আপনি কি কবি ? একটা পান খাবেন নাকি, জর্দা দিয়ে ?

চৌকো মত একটা পানের ডিবে খুলে পর পর দুটো খিলি মুখে পুরলেন। ফর্সা গাল দুটো ঠেলে উঠল। শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। না, বললেই মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত নেই, ফোগলা দিগম্বর ?

—দিন একটা খাই, অনেকদিন ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। সুধা গেছে, পানের পাটও উঠে গেছে।

—আর এক সুধা এসে আবার চালু করে দিচ্ছে। নিন। হাত পাতুন, একটু জর্দা দি।

—না না জর্দা থাক। মাথাটাতা ঘুরে পড়ে যাব।

—আহা, কচি খোকা। ঘুরে যায় যাবে, জল থাবড়ে দোব। জর্দার জন্যেই তো পান।

পান, পানের পিক, জর্দা সব ভেদ করে কথা আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পিক ফেলবেন। শশাঙ্কবাবু বুঝতে পেরে বললেন, —আসুন কোথায় ফেলবেন দেখিয়ে দি। নর্দমার কাছে এসে ডান হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা পুরুষ্টু দুই উরুর মধ্যে ঠেসে ধরে, মুখটা ছুঁচ মত করে পেল্লায় পিক ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, —বাড়িটা নতুন, তবে জায়গা বড় কম। আর কি হবে, এরপর আর দাঁড়াবার জায়গাও মিলবে না। ঘরে ঢুকে নিজেই রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার

চলন বাড়িয়ে দিলেন। খাটের ওপর বসতে বসতে বললেন,—

—বেশ শান্তির জায়গা। এক ছুতোর মিস্ত্রীর হাতে পড়ে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—কে ছুতোর মিস্ত্রী ?

—ওই হল, কনট্র্যাকটারও যা মিস্ত্রীও তাই। আপনার বউটি এত কম বয়সে খসে গেল কি করে ? এমন সুখের সংসার সহ্য হল না বুঝি ?

—লিভার। লিভারটা নষ্ট করে ফেললে। খালি পেটে কাপ কাপ চা, ঘুরতে ফিরতে মুঠো মুঠো চানাচুর। মেয়েদের স্বভাব জানেন ত, একগুঁয়ে, অবুঝ, ভাল কথা কানে ঢোকে না।

—খবরদার বউ নেই বলে যা খুশি তার নামে বলে যাবেন, সেটি হতে দেব না। কিপটেমি করেছিলেন। ভাল করে চিকিৎসা করান নি। বিছানায় শুধু শুলেই হয় না, মাঝে মাঝে রোদেও দিতে হয়।

—চিকিৎসা করাইনি মানে ? অ্যালো, হোমিও কোবরেজি, টোটকা কোনটা বাদ গেছে। নিজে ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে ফটিক ঠাকুরের দৈব ওষুধও এনেছি। থাকবে না, যে যাবে তাকে আটকে রাখবে কে ?

শশাঙ্কবাবুর গলাটা ধরে এল। চোখ ছলছল করছে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন।

—সেকি চোখে জল এসে গেল। ভীষণ দুর্বল মানুষ তো ? ওই পাষণ্ডটাকে দেখে শিখুন। একচোখে কান্না আর এক চোখে হাসি।

—বয়েস হচ্ছে তো ? পুরনো কথা মনে পড়লেই চোখে জল এসে যায়। দুঃখের দিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে গেল, সুখের দিনে রইল না। সুধাকে আজকাল বড্ড মনে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ী কাশীতে গিয়ে থাকব। তা আর হল না। একলাই যেতে হবে। কত সব ছোট ছোট সাধ আহ্লাদ ছিল, যখন মেটাবার মত অবস্থা এল, সব ফাঁকা। ছেলের রোজগার, ভাল জামাই, কিছুই সহ্য হল না। হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আসছ তো ?

টেবিলে মাথা রেখে সুধার শোকে শশাঙ্ক ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহিলার চোখেও জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শশাঙ্কের মাথার পেছন দিকের কাঁচাপাকা চুলে হাত রাখলেন। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল শশাঙ্কর ঘাড়ে পড়ল। আর এক সুধা শান্ত করার জন্য কিছু বলতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম। পানের কুচি, জর্দার টুকরো শ্বাসনালীতে ; দমকা কাশি। মাথার পেছনে রাখা হাত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

শশাঙ্ক মাথা তুললেন, মহিলার হাত মাথা থেকে খসে, কাঁধ ছুঁয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে গেল। জোর বিষম। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। একে ফর্সা মানুষ। শশাঙ্ক হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধার বিষম লাগলে মাথার তালুতে চাঁটা মারতেন। ভাল দাওয়াই। এই সুধার মাথায় কি থাপ্পড় মারা যাবে। যা থাকে বরাতে শশাঙ্ক ব্রহ্মতালুতে থাবড়া মারতে লাগলেন, দু চারবার ফুঁও লাগালেন। সিঁথির কাছে সিঁদুরের রেখা বয়েসে চওড়া হয়েছে চুলের গোড়ায় সাদার ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের মাথা দেখলেই বোঝা যায় কটা ঝড় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। ভীষণ মায়া হল শশাঙ্কর। জীবনে জীবনে

ঠোকাঠুকি কবে যে শেষ হবে!

—দাঁড়ান এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

শুধু জল নয়, একটা তোয়ালেও ভিজিয়ে আনলেন।

—নিন, মুখটা বেশ করে মুছে ফেলুন। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উঁহু ওভাবে নয়, জলটা ধীরে ধীরে খান, তা না হলে আবার বিষম লেগে যাবে।

বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল ভিজে তোয়ালে দিয়ে নিজে হাতে মুছিয়ে দেন।

—একটু না হয় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ুন। না না, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি পাশের বসার ঘরে চলে যাচ্ছি।

—কেন, আপনিও ছেলের খাটে শুয়ে পড়ুন। এই বয়েসে খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—অবাক করলেন মশাই। আপনার বাড়িতে আমি তো একটা উৎপাত। আমার জন্যে কষ্ট করে সারা দুপুরে ঠায় বসে থাকবেন?

—না বসে থাকব কেন? ও ঘরে গিয়ে কাৎ হয়ে থাকব।

—কেন এ ঘরে থাকলে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?

এঃ ছি ছি, এই বয়েসে চরিত্র বলে কিছু থাকে নাকি? সবই ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তাহলে জানালার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখুন ত।

মহিলা আবার কেশে উঠলেন। বিষমের রেশ এখনও লেগে আছে।

—দেখছি দেখছি, আপনি পাশ ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। আর এক গেলাস জল?

—না আর জল লাগবে না।

শশাঙ্ক পাখি ফাঁক করে ও বাড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। বারান্দার রেলিং-এ দুহাতের কনুইয়ে ভর রেখে কত্তা দাঁড়িয়ে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, ছাপা লুঙ্গি। মাথার সামনে ওলটান ফুলকো চুল। কপালের দুপাশ টাকে খেয়ে গেছে। হাতের আর কাঁধের গুল দেখলেই মনে হয় শরীরে এখনও বেশ শক্তি। এক ঘুঁষিতে শশাঙ্ক কাৎ। পাশেই সেই মেয়েটি। নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। এলো চুল মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে ঝুলছে। চুড়িপরা একটা হাত কত্তার পিঠে। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে পাখিটা বন্ধ করে দিলেন। এই দিকেই যেন চেয়ে আছেন। যদি দেখে ফেলেন।

—কি দেখলেন?

শশাঙ্ক তোতলাতে তোতলাতে বললেন, —বারান্দাতেই দুজনে দাঁড়িয়ে। বাপ মেয়েও বলা যায়, স্বামী স্ত্রীও বলা যায়, বয়েসের ডিফারেন্সটা না ধরলে!

—বাপ মেয়ে। কই দেখি।

শুয়ে শুয়েই শরীরটাকে ঘুরিয়ে জানলার পাখিতে চোখ রাখলেন, —বাঃ, বাঃ বা ভাই। বেড়ে হচ্ছে! প্রকৃতি দেখে শরীরে প্রেম আনা হচ্ছে। যাচিলে জামাই রুটি না খায়। রাত্রি হৈলে জামাই ঢেকশেল চাটিতে যায়। মুখে আগুন তোমার। এইবার আমি যদি এই মানুষটাকে জড়িয়ে ধরি। কেমন হয়।

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি সরে গেলেন ছেলের খাটের দিকে।

—এত প্রেম ছিল কোথায় ? নিজের বউয়ের বেলায় সব শুকিয়ে যায়, অন্যের বেলায় উথলে ওঠে। অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল করেন কেন বলতে পারেন ?

শশাঙ্ক শুয়ে শুয়ে বললেন, —সবাই কি আর করে ? এক এক জনের এক এক স্বভাব ? কেউ কেউ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। পাগলা হয়ে যায়।

—পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। হুট করে বাড়িতে ঢুকে দুজনের পিরিত চট্‌কে দোব সে উপায় রাখেনি। দরজায় কড়া নাড়লেই কত্তা অমনি লুঙ্গি সামলে জপে বসে যাবেন। ছুঁড়ি গিয়ে ঢুকবেন বাথরুমে। আমি এই জানলাটা খুলে এখান থেকেই চিৎকার করব এই যে দাদু কেমন হচ্ছে, তোমাদের যম সব দেখছে।

—এই না।

শশাঙ্ক ধড়মড় করে উঠে জানলার ছিটকিনির দিকে মহিলার বাড়ান হাত চেপে ধরলেন। দুজনে চোখাচোখি হল।

—আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এই সব নোংরা ব্যাপারে একবার জড়িয়ে গেলে, লোক হাসাহাসি হবে।

শশাঙ্ক হাত ধরে টেনে মহিলাকে চিৎ করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—উত্তেজনায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। যা করতে হবে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। ভগবানই রাস্তা বাৎলে দেবেন।

শশাঙ্ক ছেলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলেন। বেশ লাগল। পুরনো একটা অনুভূতি ফিরে এল। স্ত্রীকে বেশ লাগত। পরস্ত্রীকে যেন আরও ভাল লাগল। না না, এ ভাল লাগা ঠিক নয়। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। শশাঙ্ক সামালকে।

শশাঙ্ক বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ভাতঘুম। ঘড়িতে চারটে বাজছে। চোখ মেলে তাকালেন। বাইরে মেঘ ভাঙা রোদ। একখণ্ড নীল আকাশে শরতের টুকরো মেঘ। উঠে বসলেন। সেই সুধা থাকলে এখন চায়ের জল বসত। এই সুধা খুব ঘুমোচ্ছে। শরীরটা শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখটা প্রশান্ত। কোন রাগ বিরক্তি অশান্তির চিহ্ন নেই। ঘুমে সব মোলায়েম। অল্প বয়সে বেশ ধারাল মুখই ছিল। বয়েসে তীক্ষ্ণতা একটু কমেছে। তা হলেও বেশ ভালই দেখাচেছ। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। লিপষ্টিকের মত পানের লাল দাগ। ধবধবে একটা পা আর একটা পায়ের ওপর আড় হয়ে আছেভ। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। চিকন চিকন দুগাছা সোনার চুড়ি চিকচিক করছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে শাড়ি। গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। বুকের ভার শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে।

হেই মাঝি। জোয়ার আসছে।

বিলেতে মেমসাহেবেরা মুখ-চুম্বন করে। যৌবনে একটা বই হাতে এসেছিল, আর্ট অফ কিসিং।

এই বুড়ো বি কেয়ারফুল। মক্ষীবয়টি সাহদ পরো পংখা গয়ে লপটাই। মক্ষী ঝটপটায়

শিরধুনে, লালচ বুরি দালাই। লোভই এই সংসারে পতনের কারণ। দেখ শশাঙ্ক মৌমাছির হাল। মধুতে বসলেই পাখা দুটো আটকে যায়। মৃত্যু। যা করবে ভেবে চিন্তে করবে।

শশাঙ্ক রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপালেন। অন্যদিন এক কাপ, আজ দুকাপ। শূন্য বাড়িটা বেশ ভরাট ভরাট লাগছে আজ। দুকাপ চা হাতে নিয়ে শশাঙ্ক আবার শোবার ঘরে এলেন। মহিলা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। শান্তি আর ঘুম হাত মিলিয়ে চলে।

—এই যে শুনছেন, উঠুন, চা এসেছে। এই যে। সুধা সুধা। কতদিন এই নাম ধরে ডেকেছেন। উঠতে বসতে, ঘুরতে ফিরতে। কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

সুধা, সুধা চা।

সুধা চোখ মেলে তাকাল।

—উঠুন উঠুন, চা এসেছে।

—অ্যাঁ সকাল হয়ে গেছে।

—না সকাল নয় বিকেল। খুব ঘুমিয়েছেন। কেমন লাগছে আপনার?

চায়ের কাপটা সুধার হাতে দিলেন। কাপড়চোপড় সব এলোমেলো, আলুথালু চেহারা। এই অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে কি যে ভাববে।

—আপনি একবারও দেখেছেন।

—কি দেখেছি।

—হা ভগবান। ও বাড়ির সেই চরিত্রহীন বুড়োটা?

—না তো?

—একটা কাজের ভার দিলুম। ব্যাটাছেলেদের মত অকর্মা পৃথিবীতে খুব কমই দেখেছি।

শশাঙ্কর সেই কথামৃতের গল্পটা মনে পড়ল। এক জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি। হঠাৎ জিভ আটকে সমাধি হয়ে গেল। সবাই ভাবলে যা ভাগ্যবানের মোক্ষলাভ হল। ওমা যেই জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি, মহিলারও সেই এক অ···। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, মহিলা পাখি ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

—এই যে দেখে যান, দেখে যান, আপনাদের কাণ্ড দেখে যান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশাঙ্ক এগিয়ে গেলেন। মাথাটা নীচু করছেন মহিলাও মাথা তুলছেন। কপালে আর মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—লাগল তো?

শশাঙ্ক বললেন, —না না, এত সামান্য লাগাকে লাগা বলে না।

চশমাটা নাকের ডগায় হেলে গেছে। চুলের তেলে কাঁচ ঝাপসা শশাঙ্ক অস্পষ্ট হলেও ওই বাড়ির শোবার ঘরে পুরুষজাতির কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হলেন। কত্তা মেঝেতে থেবড়ে বসে আছেন, মেয়েটি পেছন দিক হতে গলা জড়িয়ে আছে। কত্তা পিঠে ফেলে দোল দোল করছেন। ছেলেবেলায় মার পিঠে চেপে শশাঙ্ক এইভাবে দোল খেতেন। মা বলতেন দোল দোল দোল দোল, খোকা দোলে খোকা দোলে, দোল দোল দোল দোল।

—মনে হয় ব্যায়াম করছেন। এই বয়েসে শিরফির টেনে থাকে। বারবেলের বদলে

ওই মেয়েটিকেই ওজন হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফিজিওথেরাপি। অনেকে মোটা বই মাথার ওপর তুলে কাঁধের একসারসাইজ করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়ামই হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি নয় সেই থেরাপি হচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে চুলের মুঠি ধরে শয়তানীটাকে রাস্তায় বের করে দি। হাতের তেমন জোর থাকলে এখান থেকে ঢিল ছুঁড়তুম। কিছু তো একটা করতে হয়। বলুন না মশাই কি করা যায়? একটা বুদ্ধি দিতে পারছেন না?

—আমেরিকা হলে ডিভোর্স করার পরামর্শ দিতুম। অ্যাডালটারির চার্জ এনে ঠুকে দাও মামলা।

—সাক্ষী দেবেন?

—আমি নির্বিবাদী মানুষ। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

—সে কি, আপনার কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই। চোখের সামনে অনাচার। একটা মেয়েছেলে সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলবে না? আগেকার দিন হলে গ্রামের মোড়ল মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দিত। কাজির আমল হলে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে ডালকুকুর দিয়ে খাওয়াত।

—আপনি স্বাবলম্বী মহিলা, আপনার অত ভয় কিসের? কেন পড়ে পড়ে মার খাবেন?

—বাঃ খুব বললেন যা হোক। আমি ডিভোর্স করলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?

—আমি? শশাঙ্ক হাসলেন, আমার বিয়ের বয়েস আছে আর?

—বিলেতে বুড়োবুড়ির বিয়ে হয় না?

—তা হয়, তবে এটা তো বিলেত নয়।

—তা হলে ডিভোর্সও হয় না, হয় ঝ্যাঁটা পেটা। ঝেঁটিয়ে আমি আপদ বিদেয় করব। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

শশাঙ্ক জল এনে দিলেন। ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেলেন।

—প্রেসারটা আবার বেড়েছে। আজ আপনি আমার যা করলেন, জীবনে ভুলব না। আপনারও কেউ নেই আমারও কেউ নেই। মিলেছে ভাল। মেয়েরাও একটু আদর চায় যত্ন চায়। শুধুই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিয়োবে তা হয় না। এই নিন কিছু ওষুধ রাখুন, এটা অম্বলের, এটা মাথাধরার, এটা আমাশার। আরও আরও এনে দোব। যাই, নরকে ফিরে যাই। সতীন নিয়ে সোনার সংসার। এই বাড়িটা কি শান্তির। সেই চটের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলেন। যাবার ইচ্ছে নেই তবু ত যেতেই হবে।

॥ তিন ॥

কিছু কেনাকাটার ছিল। বিসকুট ফুরিয়েছে, টুথপেস্ট গেল গেল হয়েছে, সাবানের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার ব্লেড। চিঠি লেখার প্যাড! স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন। মালপত্তর ওজন হচ্ছে। নজর চলে গেল একটা প্যাকেটের ওপর হেয়ার ডাই, ব্ল্যাক। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এক শিশি কিনে দেখলে হয়।

সুধা মাঝে মাঝে বলত, কি বুড়োটে হয়ে যাচ্ছ, চুলে একটু কলপ লাগাও না। চুল কাল করে দেখতে ইচ্ছে হয়, দাদু থেকে দাদা হওয়া যায় কিনা?

পাগল। পাগল। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

একশো গ্রাম লজেনসও কিনলেন। একটা মুখে ফেলে পার্কে বার কতক পাক মেরে বাড়িমুখো হলেন। পার্কে আজকাল বুড়োদের বেড়ান চলে না। ছেলেমেয়েরা বড় সাহসী হয়ে উঠেছে। তাকালে আবার সিটি মারে। বইয়ে পড়েছেন লন্ডনের হাইড পার্কে সকালবেলা ঝুড়ি ঝুড়ি সেই সব পড়ে থাকে। নাঃ, পৃথিবীটা চিরকালই যুবক যুবতীদের। তারা যা করবে সেইটাকেই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। ওই যে রাধাচূড়া গাছের তলায় যে জোড়াটি বসে আছে তাদের যদি বলেন, অ্যায় কি হচ্ছে, সব কটা জোড়া তেড়ে এসে তার জিওগ্রাফি পালটে দেবে।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের আলমারিটা খুললেন। সবে সন্ধ্যে নেমেছে। দিন শেষের তরল অন্ধকারে জনপদের বাতি সারি সারি ভাসছে। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে শাঁখ বাজে। শশাঙ্ক তাঁর স্ত্রীর একটি শাড়ি বের করলেন ডুরে শাড়ি। রংটি বেশ গাঢ়। শাড়িটাকে পাশ বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সুধা যেন শুয়ে আছে। একটা সায়া বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। অর্গান্ডির ব্লাউজ হাতে ধরে স্পর্শ নিলেন। পুরনো জিনিসগুলো দিয়ে জোড়াতালি লাগিয়ে হারান অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা। যে শরীরের এই সব আচ্ছাদন সেই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। কালে এগুলো কীটদষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে। তাঁকেও যেতে হবে। বিছানার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, —সুধা, ওঠো, সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থাকতে নেই, ওঠো, উঠে বসো।

নিজের পাগলামিতে নিজেই হেসে উঠলেন। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সব পাট করে তুলে রাখলেন। ইডিয়েট, ইডিয়েট। একটা টিনের কৌটোর মধ্যে কাঁচা সিদ্ধির পাতা ছিল। দু চিমটে মুখে ফেলে চিবোলেন। তেতো, তেতো। আজ একটু নেশা চাই, নেশা। স্বপ্ন চাই। সেই স্বপ্ন। সুধার হাত ধরে নৌকো থেকে পাড়ে নামাচ্ছেন। সাবধান, দেখো পড় না যেন।

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি।

মাঝে মধ্যে সুধাকে চিঠি লেখেন শশাঙ্ক। পৃথিবীর কোন পোস্টম্যান সে চিঠি বিলি করতে পারবে না। লিখে তাই ছিঁড়ে ফেলেন। ছোট ছোট সাংসারিক কথা। মান অভিমান।

সুধা, বহুদিন হয়ে গেল, জানি না তুমি আগের ঠিকানাতেই আছ, না অন্য কারুর মেয়ে হয়ে নেমে এসেছ। ভেবেছিলুম অন্তত একদিনও তুমি আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াবে, রাত তখন গভীর নিস্তব্ধ। আমার জ্বর হল, মানু এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, তুমি কিন্তু এলে না। ওখানে তুমি হয়ত আমার চেয়ে প্রিয় কোন সঙ্গী পেয়ে গেছ। যে সব দায়িত্ব তুমি দিয়ে গেছ সবই আমি একে একে গুছিয়ে এনেছি, কেবল সুধীর বিয়েটাই বাকি। ওই কাজটা শেষ হলেই, কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বাড়ি। তীরে আমার নৌকো বাঁধা। জোয়ার এলেই ভেসে যাব। আর কটা দিন। রাত প্রায় কাটিয়েই এনেছি, আর প্রহরখানেক মাত্র বাকি, একটুর জন্যে তাল আর ছাড়ছি না। বড় ক্লান্ত তবু মুজরো

শেষ করেই যাব। ততদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে। আর এক সুধা এসে কদিন খুব হামলা করছে। তোমার বিছানা দখলের তালে আছে কিনা কে জানে ? মন না মতিভ্রম।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

কে এল ? সুধী। আজ বেশ একটু সকাল। কোনদিন কখন আসে।

—যাক আজ বেশ সকাল সকাল এসেছিস।

—হুঁ।

—শরীর ভাল ত।

—হুঁ।

শশাঙ্ক এ৺টু ঘাবড়ে গেলেন। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব। সুধীর ত এমন কাটাকাটা স্বভাব নয়।

—কি খাবি এখন ? একটু চা বসাই।

—কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আজ মনের ওপর বড় ধাক্কা মারছে ত। কি হল। অসহায়, বুড়ো মানুষ। বড় ভয় করছে।

—আজ তোর কি হয়েছে সুধী ?

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এমন কাটাকাটা উত্তর কেন ?

পোর্টফোলিও ব্যাগটা বিছানার ওপর ঝপাং করে ফেলে দিয়ে সুধী রিস্টওয়াচ খুলতে খুলতে বলল, —তুমি আমাদের ফ্যামিলির মুখে চুনকালি মাখিয়েছ।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর চশমা। চশমার কাঁচে আলোর ছটা। চোখ দেখা যাচ্ছে না।

—আমি ?

—হ্যাঁ তুমি। তুমি এই বয়েসে বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে সারাদিন যা তা কর।

—সে কি ? কে বললে ?

—যাদের মধ্যে বাস করছ তারাই বললে। সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় না বাবা।

—ভুল শুনেছিস। এ সব অপপ্রচার।

—তুমি অস্বীকার করতে পার, এ বাড়িতে কোন মহিলা আসে না ?

—হ্যাঁ আসে, কিন্তু কেন আসে তুই জানিস, আসল রহস্য জানিস ?

—আমি জানতে চাই না। শুধু এইটুকু জানি, আমার দুর্ভাগ্য তোমার ছেলে হিসেবে আমাকে পরিচয় দিতে হয়।

—এত বড় কথা।

—হ্যাঁ এত বড় কথা। বৃদ্ধ বয়েসে পদস্খলন। তোমার ওপর আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাও আর নেই।

—তুই আমার কাছে ঘটনাটা শুনবি না?

—না, যা শোনার আমি প্রতিবাসীর কাছ থেকেই শুনেছি। চরিত্রহীন এক মহিলা, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দু নম্বর একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধে তিন নম্বরের কাছে নাচতে আসেন। ছি ছি।

॥ চার ॥

সকালে শশাঙ্ককে কিঞ্চিৎ উদভ্রান্তের মত মনে হল। শুকনো মুখ। রাতজাগা লাল চোখ। বিছানা সারারাত শূন্য পড়ে রইল। বসার ঘরেই রাত কাটালেন। সুধীর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। দুজনেই দুজনের কাছে ঘৃণিত। সুধী শোবার আগে ভেবেছিল বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিছানায় এনে শোয়াবে। রোজ যেমন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করাতে পারল না কিছুতেই। ফেরার পথে রাজেনবাবু তাকে যা তা বললেন, —তোমার বাবার আবার বিয়ে দাও হে। তোমার বিয়ে না হয় পরেই হবে।

কথাটা শূলের মত মনে বিঁধে আছে। চরিত্রহীন পিতার পুত্র এই পরিচয়ে সে পরিচিত হতে চায় না। সে নিজেকে বোঝাল, বেশ করেছি বলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই কর৷ উচিত। হলেনই ন বাবা। যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, নিজের স্বভাবের জন্যেই পেলেন। যেখানে খুশি যে ভাবে খুশি রাত কাটান। বাড়িতে মেয়েছেলে এনে ফূর্তির সময় তোমার মনে ছিল না বিপত্নীক বৃদ্ধ। সমাজের হাজারটা চোখ।

দুপুরের দিক নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক উন্মাদের মত বার কতক হাসলেন।

—তোমার সংসার আজ ভেঙে গেল সুধা। চারদিকে সাজান সব তাসের ঘর। জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কিছু কর ততি। জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি। স্বপ্নের ভোগৈশ্চর্য স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। আমি এখন সজাগ মায়ামুক্ত, সুখের স্বপ্ন আমার কাছে ঘোর বিষাদ। তোমার স্মৃতি রইল, তোমার ছেলে রইল। আলমারি ভর্তি তোমার জামা-কাপড়, গয়না রইল। তোমার ছেলের বউ এসে পরবে। তোমারও দেখা হল না, আমারও দেখা হল না। রাত যায়, স্বপ্ন যায়, আবার রাত আসে, নতুন স্বপ্নও আসে। আমি শুধু আমাদের বিয়েব আংটিটা তোমার কাছে চেয়ে নিলাম সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে। জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি। তুমি যেন ঘৃণা কর না।

সাদা টেনিস সার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে কিটব্যাগ। একমাথা উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। শশাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শেষবারের মত তালাবন্ধ দরজার দিকে তাকালেন। মায়া কাছা ধরে টানছে। না, আর না। জয় শিবশম্ভু, উখাড় দে মকান লাগা দে তম্বু।

নিচের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কাছে চাবি রাখলেন। বলা যায় না—এই চাবিই হয়ত আঁচলে বেঁধে তুমি একদিন ওপরে উঠবে। মা। তোমার এই কলমটা তোমার খুব ভাল লাগত। এই কলমটা তোমাকে দিয়ে গেলুম মা। তুমি বলেছিলে বেশ লেখে।

—আপনি কোথায় চললেন, এই দুপুরবেলা।

—মনটা বড় উতলা হয়েছে মা, যাই মেয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি কয়েকদিন।

তোমরা সব সাবধানে থেকো।

—কলমটা দিয়ে দিলেন?

—আর কি হবে মা। চিঠিও লিখি না, চোখেও দেখি না। তোমার কাছে আমার একটা স্মৃতি থাক, কে বলতে পারে, আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।

শশাঙ্ক রাস্তায় নেমে এলেন। মোড়ের মাথায় সেই বুড়ো রিকশঅলা। পাদানিতে বসে বসে গাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। শশাঙ্ক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, —তুমি গত শীতে আমার কাছে একটা সোয়েটার চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ বাবু।

—এই নাও।

—শীতের ত এখনও দেরী আছে।

—দূর বোকা। দেরি আছে তো কি হয়েছে। একদিন তো আসবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না।

পাড়ার সকলেই শশাঙ্ককে চলে যেতে দেখেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো সেই সব কথা থেকে কিছুতেই পরিষ্কার হল না, তিনি কোথায় গেছেন। সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললেন, —আমাকে ওয়েলসের ডায়েরিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রি বইটা দিয়ে বললেন, রাখ তোমার কাজে লাগবে। এক পুরিয়া অর্শের ওষুধ খেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, এমন সময় কোথায় চললেন কাকাবাবু। হাসতে হাসতে গান গেয়ে উঠলেন, জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।

দগ্ধ দরজা

॥ এক ॥

শুকনো পাতার উপর পা রাখলেন অপরেশ। মচমচ করে একটু শব্দ হল। সরসর করে কি একটা সরে গেল। দিনান্তের শেষ আলোয় ঠিক বোঝা গেল না। অপরেশ একটু ভয় পেলেন। সরীসৃপ জাতীয় একটা কিছু হবে। টিকটিকি কিংবা গিরগিটি হলে তেমন ভয় নেই। অন্য কিছু না হলেই হল। প্রায় দু বছরের পাতার স্তূপ জমেছে দরজার সামনে। ফলসা গাছের বড় বড় পাতা। দরজার সামনে সবুজ ছাতার মত শাখা প্রশাখা মেলেছে গাছটা। এই দু বছরে মাথায় বেশ কিছুটা বড়ও হয়েছে। গাছটা কেউ পরিচর্যা করে বসায়নি। যত্নও করেনি, নজরও দেয়নি। আপনিই বড় হয়েছে। প্রাণরস সংগ্রহ করেছে মাটি থেকে।

অপরেশ পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে ঘাড় উঁচু করে বাড়িটা একবার দেখে নিলেন। উপরের সমস্ত ঘরের জানালা বন্ধ। কেবল একটা একটু খোলা। জোর বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছে। অপরেশ ঘাড় নামিয়ে নিলেন। বয়স বাড়ছে ঘাড় পেছনে বাঁকালে শিরে টান ধরে।

এক গাদা চাবি পকেটে। অপরেশ মনে মনে একটু হাসলেন। অনেক চাবি অনেক দরজা কিন্তু একটাও খুলল না। যে দরজাতেই ঢোকার চেষ্টা করলেন সেই দরজাই নাকের উপর বন্ধ হয়ে যায়। হাতের তালুতে চাবি রেখে অপরেশ চিনতে চাইলেন কোন চাবিটা এই তালার। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তালার গর্তটা আর ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

তালাটা পেতলের। তবুও দু বছরের জলে, রোদে কর্কশ হাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। চাবি ঢুকলেও সহজে খুলতে চাইল না। কায়দার তালা। আড়াই প্যাঁচে খোলে। অপরেশ একটা পাকই ঘোরাতে পারলেন না। চাবিটা তালায় আটকে পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। পকেটের চাপে সিগারেট চেপ্টে গেছে। হাতের তালুতে ফেলে সযত্নে আঙুলের আলতো চাপে গোল করলেন। অর্ধেক পাতা বেরিয়ে গেল। সেই আলগা সিগারেটই অনেকক্ষণের শুকনো ঠোঁটে লাগালেন। পকেট হাতড়ে বের করলেন দেশলাই। কয়েকটা মাত্র কাঠি আছে। হাওয়া বইছে জোরে। হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে দরজার কোণে হাতের আড়াল করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কের মত কাঠিটা ফেলে দিলেন পায়ের কাছে।

শুকনো গলায় একরাশ ধোঁয়া নিয়ে একটু কেশে উঠলেন। বুকের খাঁচাটা এখনো বিশাল। ফুসফুসটা কিন্তু বেশ কমজোর হয়ে গেছে। অপরেশ বুঝতে পারেন শরীরটা ক্রমশই ক্ষয়ে যাচ্ছে। সময়ের কাল কাগজ অনবরতই কর্কশ ঘর্ষণে জীবনীশক্তি গুঁড়োগুঁড়ো করে উড়িয়ে দিচ্ছে। সিগারেট ঠোঁটে ধরে অপরেশ আবার তালায় হাত রাখলেন। আকাশে আলো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অন্ধকারেই অপরেশ সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবি ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। অসম্ভব ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এ ধোঁয়াতো সিগারেটের নয়। আজ তেত্রিশ বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছেন। ধোঁয়ার স্বাদ আর গন্ধ তাঁর জানা।

হঠাৎ পায়ের কাছে আগুনের জিভ লাফিয়ে উঠল। ফেলে দেওয়া কাঠির আগুনে স্তূপাকার শুকনো পাতা জ্বলে উঠেছে। আগুনের আক্রোশ, অপরেশ লাফিয়ে সরে যাবার আগেই কোমর পর্যন্ত তেড়ে উঠেছে। জ্বলন্ত পাতা হাওয়ায় ছুটছে। অপরেশের লুটোনো কোঁচা, পাঞ্জাবির ঝুলে আগুনের সাপ খেলা করছে। লকলকে আগুনের শিখায় অপরেশ যেন মুগ্ধ হলেন। রূপের আগুনে যেমন মানুষ পতঙ্গ পুড়ে যায়। অপরেশ যেন প্রকৃত আগুনে নিজেকে ঝলসে নিতে চাইলেন।

শুনেছিলেন মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু মাটি কোথায় সবই তো আগুন। সেই আগুনে মাটিতেই অপরেশ একটা প্রফুল্ল জন্তুর মত গড়াগড়ি দিলেন। দেহের চাপে আগুন হয়তো নিভল, অপরেশ কিন্তু ভীষণভাবে দগ্ধ হলেন। অদৃশ্য আগুনে ভেতরটা অনেকদিনই পুড়ে ছিল, দৃশ্য আগুনে এবার বাইরেটা পুড়ে গেল। জ্ঞান হারাননি অপরেশ। কিন্তু পোড়া পাতার ছাই থেকে উঠে বসার শক্তি যেন তাঁর রইল না।

অতি কষ্টে হাত উঠিয়ে অপরেশ মাথার চুলে হাত রাখলেন। পোড়া হাতের সঙ্গে জড়িয়ে এল একরাশ পোড়া চুলের ছাই। ভয়ে অপরেশ হাত সরিয়ে নিলেন। হাতটা সরাতে গিয়ে অপরেশ প্রথমে লক্ষ্য করলেন, পাঞ্জাবির হাতাটা নেই। জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন তিনি। চিতা থেকে উঠে আসা শব তিনি দেখেন নি, কিন্তু নিজেকে দেখে

তাঁর তাই মনে হল।

আশে পাশে মাইল খানেকের মধ্যে কোনো বাড়ি নেই। এই বাড়িটাও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষীও কেউ নেই, সাহায্য নিয়ে ছুটেও আসবে না কেউ। অপরেশ অসম্ভব মনের জোর নিয়ে উঠে বসলেন। ঝোড়ো হাওয়ায় গা থেকে ছাই উড়ছে! শরীরের কোথাও আর একছিটে সুতো নেই। বসতে গিয়ে অপরেশের মনে হল, তিনি যেন অসম্ভব মোটা আর ভারি হয়ে গেছেন। সমস্ত শরীরটা যেন একধরনের আটায় চটচট করছে। একটা মৃদু মাংস পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন নাকে। এই গন্ধটাও অপরেশের খুব পরিচিত। জীবনে বহুবার শ্মশানে গেছেন।

অতি কষ্টে পোড়া পাতার ছাই থেকে অপরেশ নিজেকে ওঠালেন। ঘাড় নিচু করে নিজেকে আর দেখতে ইচ্ছা করল না। বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন কত ব্যায়াম করেছেন। মুগ্ধ হয়ে নিজের শরীরে পেশীর ঢেউ গুণছেন। আজ সেই সুন্দর দেহ—অপরেশ আর ভাবতে পারলেন না। দরজায় পিঠ রেখে একটু বসতে গেলেন। পিঠের চাপে দরজাটা আপনি খুলে হাট হয়ে গেল। অপরেশ চিৎ হয়ে চৌকাঠের উপর পড়ে গেলেন। পড়ার সময় মনে হল অসংখ্য তন্তু যেন ছিঁড়ে গেল।

॥ দুই ॥

শরীরটা এখন যেন বেশ হালকা লাগছে। অল্প আঁচে বাদ্যযন্ত্র সেঁকে নিলে যেমন সুরে বলে অপরেশের মনে হল তেমনি সুরে বাজছেন। চারিদিকে থকথকে ঘন অন্ধকার তবুও কেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই তো বসার ঘর। সেই সবুজ ঘন কার্পেট। রেক্সিন মোড়া সোফা। পালিশ করা বুক সেলফ। অমূল্য বইয়ে ঠাসা। পড়তে ভালবাসতেন অপরেশ। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বইয়ের পেছনে খরচ করেছেন। পাউডারের মত ধুলো জমেছে চারিদিকে। ধুলো ঝাড়েনি কেন কেউ। ইস্ এত ধুলো! অপরেশ ফুঁ দিলেন। বাতাস বেরোলো না মুখ দিয়ে। আঙুল দিয়ে দাগ কাটার চেষ্টা করলেন। কোনো দাগ পড়ল না। অপরেশ খুব বিব্রত বোধ করলেন।

অপরেশ খুব আস্তে সাবধানে সোফার উপর বসলেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন স্প্রিং-এর গদির উপর কোনো চাপ পড়ল না। কোথাও কোনো আলো নেই অথচ সব কিছু কি ভীষণ স্পষ্ট দেখছেন। চোখের সমস্ত পাতা পুড়ে ঝরে গেছে। কপালের চামড়া পুড়ে গেছে। বলা চলে অন্ধই হয়ে গেছেন তবুও কি অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি তাঁর।

দু বছর আগে যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন সেদিন ছিল তাঁর ছেলের জন্মদিন। সারা ঘর সাজানো হয়েছিল রঙিন কাগজের স্ট্রিমার দিয়ে। সেই কাগজের শিকল এখনো সিলিং থেকে চারিদিকে ঝুলছে। ঘরের কোণে টিপয়ের উপর বড় ফুলদানিতে নিজে হাতে দু ডজন রজনীগন্ধার স্টিক রেখেছিলেন, সেই ফুল ঝরা শুকনো স্টিক এখনো কঙ্কালের আঙুলের ইশারার মত সেই কোণেই রয়ে গেছে। অপরেশ উঠলেন ফুলদানীর কাছে গিয়ে শুকনো রজনীগন্ধার ডাঁটি হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য! কিছুতেই ধরতে পারলেন না। কেন এমন হচ্ছে! কি কারণে হচ্ছে! অপরেশের মাথায় এল না!

বসার ঘরের বাইরে এলেন অপরেশ। সোজা করিডর দু'দিকে দু'সার ঘর রেখে চলে গেছে পশ্চিমের বাথরুমের দিকে। দু'বছর আগের ঘটনা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। বেলা তখন কত হবে, দুটো কি তিনটে। সারা বাড়িতে রান্নার সুগন্ধ ঘুরছে। কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে অপরেশ সবে বাথরুমের বাইরে বেরিয়েছেন। চটি দু'পাটি খুলে রেখেছেন পাপোসের উপর আর ঠিক সেই সময় বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল জোরে জোরে। কড়া নাড়ার ধরন দেখেই অপরেশ বুঝেছিলেন এ হাত বন্ধুর নয়, শত্রুর।

দরজাটা কে খুলে দিয়েছিল। বোধ হয় কাঞ্চন। সেদিন সে ধুতি, পাঞ্জাবি পরেছিল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। কাঞ্চন বোধহয় ভেবেছিল তার বন্ধুরা এসেছে। বাথরুমের দরজার পাশে চটি দুপাটি যে ভাবে খুলে রেখেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। অপরেশ অবাক হলেন। চলে যাবার পর বাড়িতে কি সমস্ত কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। না তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় বাড়িটাকে মিউজিয়াম করে রাখার চেষ্টা হয়েছে! চটি দু'পাটি পায়ে গলিয়ে টানার চেষ্টা করলেন এক ইঞ্চিও সরাতে পারলেন না। আবার চেষ্টা করলেন, সেই একই ব্যাপার। আশ্চর্য। এ কি কোনো যাদুর প্রভাব।

অপরেশ ফিরে চললেন। করিডোর এসে মিশেছে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে। ধাপে ধাপে অপরেশ উপরে উঠতে শুরু করলেন। সিঁড়ির বাঁকে বিদেশী শিল্পীর আঁকা এক মহিলার প্রতিকৃতি। ছবির মহিলা অসামান্য সুন্দরী। কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা অপরেশ জানেন না। শিল্পীর কোনো আপনজনও হতে পারে। ধুলোর আবরণে ছবিটি ধূসর। অপরেশ ছবিটার মুখোমুখি হতেই, মহিলার ঠোঁট দুটো যেন মৃদু হাসিতে বিভক্ত হল। অপরেশ অবাক হলেন প্রতিকৃতি কি হাসতে পারে। অপরেশ ঘন অন্ধকারেও অক্লেশে উপরে উঠে গেলেন।

সিঁড়ির সামনের ঘরটাই ছিল তাঁর বাবার। অপরেশ যেদিন চলে গেলেন, বন্ধু সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী ছিলেন। দেখা করে বিদায় নেবার সময় পর্যন্ত অপরেশ পাননি। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন জেলে বসে। অপরেশ অবাক হলেন, ঘরের দরজা হাট খোলা। ঘরে ফিকে একটা চুরুটের গন্ধ। সেই চুরুট যে চুরুট বাবা রোজ খেতেন। কি করে এমন হয়। বছরের পর বছর ঘরে বৃদ্ধের শেষ খাওয়া চুরুটের গন্ধ কিভাবে ভেসে বেড়ায়।

অপরেশ ঘরে ঢুকলেন। খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা বালিশ। খাটের পাশে শুঁড় তোলা চটি, যে চটি তাঁর বাবা রোজ পরতেন। বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর নিকেলের ফ্রেমের চশমা এমনভাবে রাখা যেন এইমাত্র চোখ থেকে খুলে রাখা হয়েছে। পাশেই একটা বই উপুড় করা রয়েছে। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মেঝে ভিজে শাওয়ার থেকে টিপটিপ করে জল পড়ছে। সিসটার্নের চেনটা যেন অল্প অল্প দুলছে। তবে কি অপরেশের বাবা জীবিত! মৃত্যুর যে সংবাদ জেলে গিয়েছিল সে সংবাদ মিথ্যা!

অপরেশ দোতলার ঘর থেকে ঘরে ঘুরলেন। কোথাও কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। বারান্দার দেয়ালের এক প্রান্তে কাঞ্চনের হাতের লেখা আবিষ্কার করলেন—'বাবা তুমি এস, আমাকে বাঁচাও'। অপরেশ চিন্তিত হলেন, কেন কাঞ্চন এমন কথা লিখল! কাঞ্চন এখন কোথায়? কাঞ্চন কি তাঁর মামার বাড়িতে নেই? কাঞ্চনের মা-ই বা কোথায়!

সে যে জেলে বসে শুনেছিল সকলেই তার শ্বশুর বাড়িতে।

বাড়ির কোথাও একটা কিছু পড়ে যাবার শব্দ হল। অপরেশ চমকে উঠলেন। এ বাড়িতে দোতলা তিনতলার ছাদের মাঝে রহস্যময় একটা চোরকুঠরীর অস্তিত্বের কথা অপরেশের হঠাৎ মনে পড়ল। দোতলার বারান্দার শেষ কোণ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেই চোরকুঠরীতে উঠতে হয়। মেঝেতে কাঠের পাটাতন পাতা। এক গাদা অব্যবহৃত ভাঙা ফার্নিচার, বাগানে কাজ করার ছোটখাটো যন্ত্রপাতি স্তূপাকার করা।

বর্ষার জলে ভেজা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে অপরেশ সেই কুঠরীতে উঠলেন। ঘরের মেঝের চারিদিকে অজস্র মুরগী আর পাখির পালক ছড়ানো। হলদে হলদে পাখিব পা একটা কোণে জমে আছে অজস্র। চারিদিকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। চাপ চাপ শুকনো রক্ত। একটা শ্বাস প্রশ্বাস নেবার শব্দ আসছে ঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে। অপরেশ ঘরের গভীরে ঢুকলেন। দুটো প্রায় ভেঙে-পড়া সোফার উপর চকচকে চেন বাঁধা দুটো কঙ্কাল একটা বড় একটা শিশুর। বড় কঙ্কালটির হাতে একসার চুড়ি। এ চুড়ি তো তাঁর চেনা। এই তো তাঁর স্ত্রী। এই তো কাঞ্চন।

সারা ঘরে অপরেশ একবার ভাল করে দৃষ্টিপাত করলেন। দূরে একটা ভারি চেয়ার পেছনে ফেরানো। চেয়ারে হেলান দেবার জায়গার দিকে তাকিয়ে অপরেশ একটু চমকে উঠলেন। এক গোছা সাদা চুল শনের মত বেরিয়ে আছে। একটা মাথার কিছুটা অংশ। কাঞ্চনের ছেলেবেলার কোনো পরিত্যক্ত পুতুল নয় তো। অপরেশ এগিয়ে গেলেন। চেয়ারের পেছন থেকে মুখ বের করে অপরেশ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরোলো না। চেয়ারে বসে আছেন তাঁর পিতা। শীর্ণ হাত। আঙুলে বড় বড় বাঁকা নখ। মুখের দুকস বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কোলের ওপর ছেঁড়া একটা মুরগী পড়ে রয়েছে। পায়ের কাছে বসে আছে তাদের পরিবারের বিশ্বস্ত কুকুর। কিন্তু কুকুরটার একি অদ্ভুত চেহারা। মাথা আর ল্যাজটায় খালি লোম আর মাংস আছে। বাকিটা শুধু হাড়ের খাঁচা। এই অবস্থায় কোনো পশু বাঁচতে পারে। অপরেশ আশ্চর্য হলেন। আরো আশ্চর্য হলেন তাঁর বাবাকে জীবিত দেখে। কিন্তু একি ভয়ঙ্কর রূপান্তর। এ তো মৃত্যুরই সামিল।

অপরেশের পিতা মৃত্যুর কিছু আগে থেকে, মৃত্যু মানে, জেলে পাওয়া মৃত্যু সংবাদের আগে থেকেই তন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা, এইসব নিয়েই মেতে উঠেছিলেন। গভীর রাতে ঘরে মৃদু আলো জ্বেলে নানা সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যেত। অপরেশ সারা রাত জেগে বসে থাকতেন।

'তুমি আসবে জানতুম', বৃদ্ধ হাওয়ার শব্দে কথা বললেন। শরীরী কেউ এ বাড়িতে আসবে, কি থাকবে আমি তা চাই না। তাই শরীর নিয়ে তুমি আসতে পারলে না। তুমি যাদের রেখে গেলে, তাদের ব্যবস্থাও আমি সেই ভাবেই করেছি ! একটু কষ্ট পেয়েছে, তা পাক, জীবনে কষ্টের চেয়ে জীবন্মুক্তির আনন্দ অনেক বেশি। তুমি নিজেই এখন তা বুঝতে পারছ। পারছ না ? প্রশ্ন করে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। শরীরের মাংস শিথিল হয়ে চারিদিকে ঝুলছে। অপরেশ সেই গলিত রক্তামাখা বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠতে চাইলেন ; কিন্তু অনুভূতির শারীরিক অংশগুলো না থাকায় তা

সম্ভব হল না।

'তোমাকে নিয়ে আসি, তুমিও তো এই পরিবারের সভ্য হলে, তোমার অস্থি অবয়ব ওই খালি আসনে ওদের পাশে বসবে, তিনে মিলে এতদিনে তোমরা সম্পূর্ণ হলে।' বৃদ্ধ খলখল করে হেসে উঠলেন। মনে হল অনেকগুলো ছিদ্রপথ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে এল। বৃদ্ধের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল কুকুরটা।

অপরেশ চাইলেন সেই গুপ্ত কক্ষ থেকে মুক্ত হতে। কিন্তু আধারে আবদ্ধ হাওয়ার মত, জলের মত তিনি আর বেরোতে পারলেন না। ঘরে বৃদ্ধ নেই তিনি অপরেশের দগ্ধ মৃতদেহ আনতে গেছেন কিন্তু অদৃশ্য কোনো বেতার তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল : 'পারবে না, পারবে না তুমি পালাতে, বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের নাইট্রোজেন যেভাবে মাটিতে আটক হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই তুমি তোমা অতীত অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে রইলে। ধীরে ধীরে তোমার দেহ পচে যাবে, শুভ্র একটি কঙ্কাল আর তুমি মুখোমুখি বসে থাকবে অনন্তকাল'। সেই হাসি বাতাসের আবর্তের মত হাসি সারা ঘরে।

গগনের মাছ

গগন পরশুদিন নাটাগড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার অন্য কোনো নেশা নেই। বন্ধু-বান্ধব নেই। আড্ডা নেই। তাস পাশা নেই। যা আছে তা হল মাছ ধরার ঝোঁক। পুকুর কিংবা বিল দেখলেই তার প্রাণটা নেচে ওঠে। যত তাড়াতাড়ি থাক, যত কাজই থাক, সে জলের ধারে থমকে দাঁড়ায়। জলের রং দেখলেই সে বুঝতে পারে, সেই পুকুর কিংবা বিলে কি কি মাছ আছে। কত বড় মাছ আছে। মাছগুলোর স্বভাব কি? সহজে ধরা দেবে, না বঁড়শির মুখে গাঁথা টোপটি ঠুকরে ফাতনাটি দুবার নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়বে। জলের তলায় ঝাঁজি আছে কিনা, ছোটো কাঁকড়া কিংবা * ছিম আছে কিনা, জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সে জলের মত বুঝতে পারে। তার এই স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে মেছো গগন বলে। অনেকের ধারণা গগন পূর্বজন্মে মাছরাঙা ছিল। আগামী জন্মে ভোঁদোড় হয়ে জন্মাবে।

এই মাছের নেশাটি আছে বলেই গগনের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। সদাশিব মানুষ। লম্বা চওড়া চেহারা। সহজ সরল মানুষ। একটা বড় কারখানায় হাতের কাজ করে যা উপার্জন করে, মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার সুখেই চলে যায়। শৈশবেই বাবা মারা যান। লেখাপড়া সেই কারণে খুব বেশিদূর এগোয়নি। বিধবা মা, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কোনো রকমে ছেলেকে মানুষ করেছেন। পৈতৃক বাড়িটা ছিল তাই রক্ষে। ছোট একতলা বাড়ি। খান চারেক ঘর। দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে গগনের মা সংসার চালাতেন। ভাড়াটে ভাল। ভাড়া নিয়ে কোনো অসুবিধা কোনো কালে হয়নি। সেই ভাড়াটে এখনও আছেন। অনেকটা বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছেন তাঁরা। দুটো পরিবারকে এখন আলাদা করাই শক্ত। বাইশ বছর আগে যা ভাড়া ছিল এখনও তাই আছে। এক পয়সা ভাড়া বাড়াবার

কথা কেউ কখনো বলেননি। এখন গগন রোজগার করছে। ভাড়ার টাকার উপর তাদের আর নির্ভর করতে হয় না। যা আসে সেইটুকুই বাড়তি।

গগনের বাহন হল সাইকেল। পৈতৃক সাইকেল। সেকালের জিনিস। গগনের যত্নে ঠিক সারভিস দিয়ে যাচ্ছে। একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাইকেলটা গগনের সেবায় এতই সন্তুষ্ট যে আবার ফিরে এসেছিল দিন কতক পরে। থানার দারোগা বলেছিলেন, 'গগনবাবু এ রকম বরাত লাখে একটা মেলে।' গগন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সের আড়াই ওজনের একটা কালবোস দারোগাবাবুকে প্রেজেন্ট করে এসেছিল। গগনের মাছ-ধরা এই জন্যেই। নিজে আর কতটা খাবে। গগন ধরে মাছ, পাড়ার লোকে খায় সেই মাছ। প্রতিবেশীরাই ভাল পুকুরের সন্ধান এনে দেয়। গগন সাইকেলে নানা মাপের ছিপ, হুইল বেঁধে, চার, টোপ নিয়ে টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে সাত-সকালেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্ম আর বর্ষার দিনে ছাতা থাকে। ইদানিং এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিডও সঙ্গে রাখে। বার কতক কেউটে সাপে তাড়া করেছিল।

নাটাগড়ের পুকুরটার খবর দিয়েছিল তারই এক সহকর্মী। সেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বলেছিল বিশাল পুকুর। পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে। বারোয়ারী পুকুর নয়। মাছগুলো সেই কারণে ছ্যাঁচড়া নয়। ছিপ ফেললেই ধরা দেবে। সব মাছই বড়। বৈষ্ণবের পুকুর। কালে ভদ্রে জাল পড়ে। খুব জানাশোনা লোক ন-মাসে ছ-মাসে সখ করে ছিপ ফেলে।

গগন অবশ্য ঠিক এই রকম পুকুরে মাছ ধরতে চায় না। সে হল পাকা মাছ ধরিয়ে। খেলোয়াড়, ত্যাঁদোড়, তেএঁটে মাছ না হলে সে মাছ ধরে আনন্দ পায় না। অনেকদিন তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না বলে এ সুযোগটা সে হাতছাড়া করল না। দেখাই যাক না কি হয়। গগন বেরিয়ে পড়ল। বাহন সাইকেল। সঙ্গে একটা টর্চও নিল। দূরের পথ। পথে আলো থাকবে কিনা কে জানে। সাবধানের মার নেই।

বিশাল পুকুর। সরোবর বলাই ভাল। যাঁদের পুকুর তাঁরা এককালে জমিদার ছিলেন। একপাশে তাঁদের বিশাল বাড়ি। সংস্কারের অভাবে একটু জীর্ণ। একপাশে পুরোনো মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটা মনে হয় চলে। সামনেই ঢালা ছাদ। ছাদের কার্নিসে একটা পরী ডানা মেলে আছে। যেন এখুনি উড়ে যাবে। দেউড়িতে এখনো দারোয়ান বসে। গগনের সাইকেলের মত। পুরোনো মনিবের মায়া ছাডতে পারছে না বলেই বোধহয় বহাল আছে।

বাগানের গেট পেরিয়ে ইঁট বাঁধানো পথে এগোতে এগোতে গগন যেন পুরোনো কালের গন্ধ পেল। বহু স্মৃতি যেন ভিড় করে এল। প্রাচীন গাছের কালো গুঁড়িতে সবুজ শ্যাওলা। বছরের পর বছর পাতা পড়ে গাছের তলায় তলায় আর মাটি দেখা যায় না। রোদ খুব কমই পড়ে। পাতা পচার জৈবগন্ধ। জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ব্যাঙের ছাতা। এক একটা গাছের গায়ে পরগাছা উঠেছে লতিয়ে লতিয়ে। এক সময়কার সযত্ন পরিচর্যার বাগান দীর্ঘ অবহেলায় না বাগান, না জঙ্গল অদ্ভুত এক ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের নানা ঢঙের মূর্তি চলে যাওয়া একটা কালকে পাথরের অবয়বে ধরে রেখেছে। গগনের মনে হল মানুষের সমৃদ্ধি কত ক্ষণস্থায়ী। গরীব আছি

বেশ আছি বাবা। উত্থানও নেই পতনও নেই। ছেলেবেলায় কথায় কথায় মা বলতেন না, 'অতি বাড় বেড়ো-না ঝড়ে পড়ে যাবে ; অতি নিচু হয়ো না গরুতে মুড়িয়ে খাবে।'

বাগানের পথ দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকতে বেঁকতে গগন সেই পুকুরের পাড়ে এল। যেখানে তার সারাটা দিন কাটবে জলের ওপর বাতাসের হালকা তরঙ্গ দেখে, ফাতনা দেখে, মাছের বুড়বুড়ি আর ঘাই মারা লক্ষ্য করে। পুকুরটা এক সময় খুব যত্নের পুকুর ছিল দেখলেই বোঝা যায়। চারপাশ ইঁট দিয়ে বাঁধানো। চার দিক থেকে চারটে ঘাট জলের অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। পাথর বসানো ঘাটের পৈঠের জোড় জায়গায় জায়গায় ছেড়ে গেছে। সেই সব ফাঁকে ছোটে ছোটো আগাছা জন্মেছে। কতকালের পুরোনো জল যেন আলকাতরা গোলা। চারিদিক শান্ত নির্জন। কোথায় একটা পাখি ডাকছে টুই-টুই—।

গগন জল চেনে। পুকুরটা দেখে তার ছিপ ফেলতে ইচ্ছে হল না। তার মনে হল চারিদিকে যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। জলে, ভাঙা ঘাটে পুরনো দিনের অনেক গোপন কথা যেন শ্যাওলার মত জড়িয়ে আছে। বড়লোকের পুকুর দেখলেই গগনের আত্মহত্যার কথা মনে হয়। মনে হয় জলের তলায় চেন বাঁধা কঙ্কাল আছে! মনে হয় পুকুরের মাঝখানে গভীর একটা কুয়ো আছে, যেখান থেকে মাঝরাতে চেন [illegible] আর লোহার কড়া নাড়াবার ঠনঠন শব্দ ওঠে। কেউ যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে, আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। মাঝে মাঝে সোনার বালা পরা একটা হাত মাঝ পুকুরে জলের ওপর ভেসে উঠে কিছু একটা ধরার নিস্ফল চেষ্টা করে আবার তলিয়ে যায়। গগন এসব কখনও দেখেনি, তার মনে হয়।

ঘাটের বাঁধানো বেদীতে বসে, পাশে তার ঝোলাঝুলি সাজ-সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে গগন চারপাশটা একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে বড় বড় রাই ঘাস গজিয়েছে, সাপের আত্মগোপনের জায়গা। গগন খুব হতাশ হল। এই পুকুর নিয়ে গল্প লেখা চলে। মাছ ধরা চলে না। হঠাৎ পুকুরের মাঝখানের জল উৎলে উঠল। ঘাই দেখে মনে হয় সের তিরিশ ওজনের একটা মাছ। এতবড় মাছ [illegible]প পড়লেও ছেড়ে দিতে হবে। এ মাছ কেউ খায় না।

এতদূর এসে গগনের ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ বসে থাকতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। জল থেকে রোদের তাতে গরম ঠাণ্ডা মেশানো একটা ভাপ উঠেছে। গাছের পাতায় ছায়া কাঁপছে। ঘাসের ডগা সিরসির করে হাওয়ায় দুলছে। অনেক সব পুরোনো দিনের কথা গগনের মনে আসছিল। পুরোনো কথা যত মনে পড়ছিল মনটাও তত বিষণ্ণ হচ্ছিল! একবার মনে হল ফিরে যায়। তারপর মনে হল অনেকে আশা করে থাকবে! গগন কখনও ফেলিওর হয়নি!

টিনের কৌটো খুলে গগন চার, টোপ সব একবার দেখে নিল! মনে মনে বলল, এসেছি যখন এক হাত ফেলেই দেখি, কি হয়। পুকুরের দিকে তাকিয়ে গগনের মনে হল, মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মত অজানা সম্ভাবনা নিয়ে স্থির অচঞ্চল। ঘাটে বসে কি মাছ ধরা যায়, গগন হেসে উঠল। একটু আঘাটায় বসতে হয়। বসবে কি করে! বাঁধানো পাড় ঢালু নেমে গেছে। অগত্যা ঘাটের শেষ পৈঠেতে বসে গগন ছিপ ফেললে।

বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। খুব প্রাচীন মাছও সাঁ সাঁ করে শব্দ করে, গগন শুনেছে। অবশ্য নিজের কানে কখনও শোনেনি।

ফাতনার উপর বারে বারে একটা ফড়িং এসে বসছে। ঠিক বসছে না, কেঁপে কেঁপে উড়ছে। জলের উপর ছোট্ট একটা মাথা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে সরে যাচ্ছে। জোলো হাওয়ার গরম ঠাণ্ডায় গগনের চোখে যেন ঘুমের আমেজ আসছে। প্রচুর নেশা করলে মানুষের এই অবস্থা হয়। তবু গগন জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এক সময় তার মনে হল বঁড়শিটা কিছুতে ঠোকরাচ্ছে। গগন ফাতনাটা কায়দা করে সোজা করে নিল, হেলে গিয়েছিল।

ফাতনাটা হঠাৎ ডুবে গেল। গগত প্রস্তুত ছিল। সুতোটা একটু টান করেই আলগা করে দিল। বড় মাছ বলেই মনে হচ্ছে। এ পুকুরে ছোট মাছ নেই। গগন জল দেখেই বুঝেছে। এও বুঝেছে ; চালাক মাছ একটাও নেই, সব কটা বোকা গাধা। খাদ্য আব টোপের পার্থক্য বোঝে না। তা না হলে বঁড়শি ফেলতেই ধরত না। গগনের মনে হল মাছটা না খেলেই ভাল হত। অনর্থক এখন খেলাতে হবে। শেষে উঠে আসবে শ্যাওলা ধরা পাঁক গন্ধ এক মাছ। যাকে মাছ না বলে মৎস্যাবতার বললেই ভাল হয়। যার বয়স হয়তো পঞ্চাশ বছর।

মাছটা অবশেষে উঠল। যা ভেবেছিলে তাই। মাছটা ইচ্ছে করলে ন্যাজেব ঝাপটা মেরে গগনকে কাবু করে ফেলতে পারে। ইচ্ছে করলে খেয়েও ফেলতে পারে। সারা গায়ে কালো আঁশের উপর এক ধরণের সাদা সাদা লালা জড়িয়ে আছে। গগনের হাত ঠেকাতেই ইচ্ছে করছিল না। কোনো রকমে ঘাটের পৈঠেতে ফেলল। গগন আশ্চর্য হয়ে দেখল মাছটার নাকে একটা সোনার নথ লাগানো। অবাক কাণ্ড। মাছটা খাবি খাচ্ছে। চিঁ চিঁ করে একটা শব্দ করছে।

গগন কি করবে ভাবছে। এমন সময় তার পেছনে হালকা চুড়ির কিন-কিন শব্দ হল। গগন চমকে ফিরে তাকাল। তার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ন-দশ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। এক রাশ ঘন কালো চুল। আকাশের মত নীল বড় বড় দুটো চোখ গোল গোল দুটো হাতে সরু সরু মিছরি কাটা সোনার চুড়ি।

গগন তাকাতেই মেয়েটি বললে—

ওমা, তুমি আমার ভোলাকে ধরেছ। তুমি কি গো। ওকে ছেড়ে দাও।

গগন বললে, এর নাম বুঝি ভোলা ?

—হ্যাঁ গো, দেখছো না ওর নাকে নোলোক। আমার মা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার নাম কি মা ?

—আমার নাম তো চুমকি। তুমি ওকে আগে ছেড়ে দাও। জানো না বুঝি, জলের বাইরে মাছ বেশিক্ষণ বাঁচে না।

দিচ্ছি মা, ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম তো।

—আমার সঙ্গে পরে কথা বলবে। আগে ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। জলের মাছকে কেউ ডাঙ্গায় তোলে।

গগন তাড়াতাড়ি মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল। মুখ না ঘুরিয়েই বললে, এই নাও

তোমার ভোলা আবার জলে চলে গেল। আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে? বল মা আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে?

ভোলা তখন ন্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে। গগন কোনো উত্তর না পেয়ে ফিরে তাকালো। কোথায় কি? কেউ কোথাও নেই। গগন জোরে জোরে ডাকল,—চুমকি, চুমকি। বাতাসের শব্দ, সেই পাখিটা ডাকছে টুই—টুই।

নির্জন দুপুর। বড় বড় গাছের তলায় আলো ছায়ার খেলা।

গগনের কেমন ভয় ভয় করল। মনে হল দুপুর নয়, চারিদিকে নিশুতি রাত নেমে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে সে কি পাখি না মানুষ? ছমছমে মন নিয়ে গগন বাগানের গেটের কাছে ফিরে এল। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো', চুমকি বলে এ বাড়িতে কোনো মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে দারোয়ানের মুখটা কি রকম হয়ে গেল। কেন বাবু? গগন বললে,—না বেশ মেয়েটি। এই মাত্র আমার সঙ্গে কথা হল, তারপর কোথায় যে চলে গেল হঠাৎ। দারোয়ান হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল।—সে বাবু অনেক কাল আগের কথা। এই বাড়ির মেজোবাবুর ছোট মেয়ে ছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে ওই পুকুরে ডুবে মারা যায়। মেজবাবুও বেঁচে নেই। মাইজী এখন বালিগঞ্জে থাকেন। ওই ছিল একমাত্র মেয়ে। কি করে যে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এই বাড়ির একটা ঘরে এখনো তার খাট বিছানা পাতা আছে। সব খেলনা বই সাজানো আছে। মাইজী মাঝে মাঝে আসেন। আজও এসেছিলেন। এই একটু আগে চলে গেলেন।

গগন তাকিয়ে দেখল, সেই অষ্টিন গাড়িটা নেই।

গগনের নাটাগড়ের গল্প কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না। গগন কিন্তু মাছ আর ধরে না। সব মাছই এখন তার কাছে ভোলা। চুমকি তাকে নিষ্ঠুর বলেছিল। সেই কথাটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে।

'মাছ কি ডাঙ্গায় বাঁচে। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো।'

নীল চোখ, কোঁকড়া চুল, চুড়ির মিঠে কিনি কিনি

মাছের নেশা আর গগনের নেই।

তোয়াজ

শচিন আর শচিনের মেয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ছুটির দিন বাপ আর মেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসে। শচিন চল্লিশ পেরিয়ে সামনের কার্তিকে একচল্লিশে পড়বে। শচিনের মেয়ে শুভার বারো চলছে। মেয়েটার বেশ কথা ফুটেছে। সব সময় কথার খই ফুটছে মুখে। আজকাল মায়ের কাজকর্মের সমালোচনা করারও সাহস হয়েছে। মাঝে মধ্যে চড়-চাপড়ও খায় এর জন্যে। তবু বলতে ছাড়ে না। শচিন অবশ্য মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। করলে কি হবে, শুভার মার আবার রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না।

শুভা ডালের বাটিটা দেখিয়ে বাবাকে বললে, 'চেহারাটা দেখেচো?'
শচিন আগেই দেখেছে। একবাটি কালচে জল। মনে মনে সে যা ভাবছিল, মেয়ের মুখে সেই ভাবনাটাই কথা হল।
শচিন বললে, 'মালটা কি বল তো?' শচিন এই ভাবেই কথা বলে।
'মালটা হল মার হাতের বিখ্যাত মুগের ডাল।'
'কি দিয়ে এরকম চেহারা করে বল ত?'
'জিজ্ঞেস কর না।'
শচিন একটু থমকে গেল। অলকাকে ডেকে ডাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই ব্যাপারটাকে অনেকদূর গড়াতে দেওয়া। কেঁচো খুঁড়তে বড বড় সাপ বেরোন। খেতে বসে অশান্তি শ চিন ভালবাসে না। মাসখানেক আগে অম্বলের অসুখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। শ'পাঁচেক টাকা ওষুধে পথ্যে বিধু ডাক্তারকে ধরে দেবার পরও অম্বল যখন কিছুতেই সারল না, জল খেলেও অম্বল, তখন সুনীলবাবু শচিনকে ধরে নিয়ে গেলেন এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। সুনীলবাবু শচিনেব সহকর্মী। সে ভদ্রলোকের অম্বলও কিছুতেই সারছিল না। মনস্তাত্ত্বিক ডক্টর এইচ এস ঘোষ তিনটে সিটিং-এই সুনীলবাবুর সব অম্বলরস মধুররস করে দিয়েছেন।
সেই ডক্টর ঘোষ শচিনকে বারবার বলেছেন, 'অম্বল, পেটেব অসুখ, বুক ধড়ফড প্রভৃতি সমস্ত অসুখের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্টই সাইকো-সোম্যাটিক ডিজিজ। মন চাইছে অসুস্থ হতে তাই দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মনটাকে কনট্রোলে রাখুন। রোজ সকালে পট্টবস্ত্র পরে গীতাপাঠ করবেন, স্পেশ্যালি দ্বিতীয় অধ্যায়। মনের দাঁড়ে সব সময় একটি খুশি খুশি পাখিকে বসিয়ে রাখবেন, মনের আকাশ যে সব সময় গানে গানে ভরে রেখে দেবে। আর বাড়িতে একটা ফতোয়া জারি করে দেবেন, খাবার সময় স্রেফ স্ফূর্তি, কোনওরকম চেঁচামেচি, হই হই, ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি কিচ্ছু চলবে না। প্রশান্ত মনে, তন্ময় হয়ে খাদ্য-বস্তুকে আক্রমণ করবেন। খাবার সময় যাদের আপনি অপছন্দ করেন তাদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, তাদের কথা চিন্তাতে পর্যন্ত আনবেন না। পারলে, খাবার সময় রেকর্ডপ্লেয়ারে কি টেপ-রেকর্ডারে হালকা কোন গান চালিয়ে দেবেন। মিউজিক। খাবার ঘরের দেয়ালটা উজ্জ্বল রঙে রাঙ্গিয়ে দেবেন। জানালায় ঝুলিয়ে দেবেন বাহারি পর্দা। ফুল রাখবেন, কিছু ফুল। আসল ফুল খরচে সামলাতে না পারলে প্ল্যাস্টিকের ফুল। দূরে কোথাও বেশ ভাল একটা ধূপ জ্বেলে রাখবেন। হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসবে ফুরফুর করে। খেতে বসবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে। কেলে লুঙ্গি কিংবা খেঁটে গামছা পরে খেতে বসা চলবে না। যুযুৎসু অথবা ক্যারাটে শেখার পোশাক দেখেছেন? লুজ ঢলঢলে, ধবধবে সাদা। পরিবেশন যিনি করবেন, যদি স্ত্রী হন বলবেন ঝলমলে উজ্জ্বল শাড়ি পরে, গায়ে সেন্ট মেখে পরিবেশন করতে। যদি কাজের লোক রেখে থাকেন এবং সে যদি পরিবেশন করে, তা হলে কৃপণতা না করে তার কাপড় জামার পেছনে নিজের অম্বলের স্বার্থে বাড়তি কিছু খরচ করবেন। কথায় বলে পেটপুজো। সেই পুজোর আয়োজনের কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না। "আহার কর মনে কর আহূতি দি শ্যামা মাকে।"

শচিন মেয়েকে বললে, 'চেপে যা। যা পাবি চোখকান বুজিয়ে খেয়ে যাবি। খুঁত-খুঁতে স্বভাব ভাল নয়, বুঝলি ? পেট ভরানো নিয়ে কথা।'

'তুমি কখন কি যে বল বাবা ? এই সেদিন বললে ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, খাবারের রঙ, গন্ধ, এমন হবে, দেখলেই যেন ভেতরটা খাব-খাব করে ওঠে। তুমি বললে, মাসকাবার হলে ভাল ভাল সব প্লেট ডিশ কিনে আনবে। ঝকঝকে, চকচকে খাবার টেবিল তৈরি করাবে, চারখানা চেয়ার।'

'তোর জন্যেই ত কেনা গেল না।'

'আমার জন্যে ?'

শচিন ঠোঁটে আঙুল রেখে স স শব্দ করে মেয়েকে সাবধান করে দিল। পাশের রান্নাঘর থেকে অলকা আসছে। দু'বাটি ডাল দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এইবার বাকি মালেরা একে একে আসছে। শচিনের মনে হল, প্রথম স্যামপেলটি যা ছেড়েছে তাইতেই আমরা কাত। তোমার বাকি কেরামতি যা যা বেরোবে, বোঝাই গেছে। হায় অলকা, যৌবনে মনোযোগ দিয়ে রান্নাটা যদি একটু শিখতে। একেবারে গোয়ানিজ কুক হতে হবে একথা কেউ বলছে না ; কিন্তু নিতান্তই মুখে দেবার মত একটা কিছু দাঁড় করবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত। আমি নিজেই যে তোমার চেয়ে ভাল রাঁধার ক্ষমতা রাখি। শচিন ভাবনাটাকে মাঝারি রকমের একটা গলাখাঁকারি দিয়ে মন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল। ডাক্তার ঘোষ বলেছেন 'বি চিয়ারফুল, বি চিয়ারফুল'।

'হুঁউউ গীত গাতা চল, উঁউঁউঁ গীত গাতা চল', শচিন নখের টুসকি দিয়ে ডালের বাটির গায়ে একটু মিউজিকের মত কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা করল। কোথায় সুর ! বেসুরো ডাল থেকে কি আর কাফী ঠুমরি বেরোয়। কেলে মত একটু ডালের জল মেঝেতে ছলকে পড়ল।

অলকা ভাতের থালাটা দক্ষিণী-নাচের মুদ্রার কায়দায় মেঝেতে রাখতে রাখতে বললে, 'পাঁচ টাকা কিলো. ফুর্তিটা ডালের বাটির ওপর না দেখিয়ে নিজের মনেই চেপে রাখার চেষ্টা কর। পাশেই কলাগাছ বড় হচ্ছে। বিয়ের খরচা তোমার ঘোষ ডাক্তার যোগাবে না। তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

শুভা জিজ্ঞেস করল, 'বাটিতে এটা কি মা ?'

অলকা মেয়ের দিকে কটমট করে তাকিযে বলল, 'খেয়ে দেখ। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।'

'এটা খাবার জিনিস কিনা সেটা ত আগে জানা দরকার।'

'চুউপ।'

অলকার 'চুপ' যেন বোমার মত ফাটল। শচিন চমকে উঠেছিল। শুভারও চোখ পিট পিট করে উঠেছে।

'বাপের আশকারায় একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। যা দোব মুখ বুজে খেতে পার খাও, না পার উঠে যাও। আমার কাছে অত খাতিরখুতির নেই।'

মায়ের চিৎকার আর আসন থেকে স্প্রিঙের মত মেয়ের লাফিয়ে ওঠাটা এমন-ভাবে মিলে গেল শচিনের মনে হল, অলকার পায়ের চাপে স্প্রিং লাগান একটা বাক্সের ডালা

খুলে গেল। শুভা শচিনের পেছন দিক দিয়ে গুম গুম করে পা ঠুকে ঠুকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা, মেয়ে দুজনেই সমান রাগপ্রধান।

শচিন ডাকল, 'শুভা, শুভা রাগ করিসনি মা, যাসনি, আয়।'

অলকা বললে, 'মা বলে আদর দিয়ে মাথাটা আর খেও না দয়া করে। পেটের জ্বালা ধরলে ঠিক এসে খাবে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তুমি খেয়ে দেয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়। আজ বিকেলে কল্যাণী আসবে না। তোমাদের খাওয়া হলে সৃষ্টি বাসন নিয়ে বসতে হবে আমাকে।'

'তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। খেতে বসিয়ে শত্রুর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে নেই। মেজাজটা সব সময় এমন চড়াপর্দায় বেঁধে রেখেছ, সাপের মেজাজও হার মানে ! কথায় কথায় ফোঁস !

'হ্যাঁ কথায় কথায় ফোঁস ! আমার মেজাজ ওই রকমই, জানই ত ! আমি সব সময় তুমি মশাই, তোমার ন্যাজ মশাই করে চলতে পারব না। আমার হল ধর তক্তা মার পেরেক। সংসার আমাকে কি দিয়েছে, কি দিয়েছে শুনি। সংসারে বলির পাঁঠা হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'পাঁঠা নয় বল পাঁঠী। রেগে যাও ক্ষতি নেই গ্রামারে ভুল কর না।'

শচিন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়েছে, শেষ ঠেলায় এইবার নিজেকে সোজা করলেই হয়, অলকা এক ধমক লাগাল, 'উঠছ কোথায়, উঠছ কোথায়, শুনি !'

'যাই মেয়েটাকে ধরে আনি। ও না খেলে আমি খাই কি করে ?'

'আহা মেয়ে সোহাগীরে ! তোমার ভাবনা তুমি ভাব। মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার মেয়ে আমি বুঝব। অয়েল ইওয়র ওন মেশিন।'

ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে ও পরে নিজেকে কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন না। কাম, অ্যাবসলিউট কাম, ভরা নদীর মত শান্ত তরঙ্গহীন। উত্তেজনা মানেই ভেগাস নার্ভের ছটফটানি, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড।

অ্যাসিড পেটের মধ্যে ছাড়া থাকতে থাকতে উদরের মিউকাস মেমব্রেন খেয়ে ফেলবে দেখতে দেখতে জবরদস্ত আলসার, তারপর ফ্যাস করে একদিন পেটটা ফুটো করে দেবে। বাঁচতে যদি চান, জেনে রাখুন দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার !

ঠিক আছে বাবা, বাপ ঠাকুরর্দার আমলে বলত কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এ যুগে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। শচিন আবার ফোলডিং টেবিল ল্যাম্পের মত ভেঙে পড়ল। মাথাটা থালার ওপর হেঁট। পাশে মেয়ের আসনটা খালি। তার বয়সের মাপের ছোট্ট থালায় এক মুঠো ভাত, কয়েক টুকরো আলু ভাজা। গুলি গুলি কয়েকটা বড়ি ভাজা একপাশে গড়াগড়ি পড়ে আছে। শুভা রেগে আসন থেকে উঠে যাবার সময় আসনটা একটু গুটিয়ে গেছে। শচিন আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট একটা মাছি থালার ওপর ভনভন করছে। এর নাম খাওয়া। সুখের আহার। ইংরেজের জেলখানায় স্বদেশীরা অনশন করত। পুলিস হাতে ব্যাটন নিয়ে সামনে এসে বসত, গলায় বাঁশ পুরে জোর করে খাওয়াত। এ যেন ছেলে পুলিশের বদলে মেয়ে পুলিশ। হাতে ব্যাটনের বদলে হাতা।

সংসার কারাগারে স্ত্রীর হাতে স্বামী নির্যাতন। এভাবে কি খাওয়া যায়? গলায় গাদা যায়। মেয়েটার মুখের ভাত পড়ে রইল, সে বাপ হয়ে কেমন করে খায়? তবু অশান্তির চেয়ে শান্তি ভাল। ডক্টর ঘোষ বলেছেন....।

খাবার আসনে শচিনকে দাবড়ানির আঠা দিয়ে আটকে রেখে অলকা রান্নাঘরে গেছে পরের কেরামতিগুলো আনতে। যেমন ভাতের ছিরি, তেমনি ডালের ছিরি। ভাজা। ভাজায় আর কি কেরামতি থাকতে পারে। কম তেলে আধপোড়া। আহা! কোথায় গেল মায়ের হাতের আলু ভাজা। কোথাও এতটুকু বেশি কি কম ভাজা নেই। হালকা বাদামী রঙ। মুখে দিলেই মুচমুচ শব্দ। তেলের কালচে খাঁকরি লেগে নেই। অলকার ভাজা আলু যেন ভুতের খোকা। কাজল চটকান খোকার মুখ। কৃপণরা কি আলু ভাজতে পারে। ভাজাভুজিতে দিল চাই।

অলকা আবার এসেছে। উনুন থেকে সাঁড়াশি দিয়ে সরাসরি তুলে এনেছে কেলে একটা কড়া। তেল তখনও পিটপিট করে ফুটছে। এই দৃশ্যটা শচিনের কাছে ভীষণ ভীতিপ্রদ। তেল সুদ্ধ গরম কড়া সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কোনদিন যদি ধপাস করে সামনে পড়ে শচিনের নির্ঘাত মৃত্যু। গরম তেল ছিটকে চোখে মুখে সর্বশরীরে। চোখ দুটোত যাবেই সেই সঙ্গে মুখের চেহারা হবে চল্লিশ স্ক্রীনে ছাপা ব্লকের মত কালো কালো বিন্দু বিন্দু। বিয়ে করে বিল্বমঙ্গল। শচিন বহুবার স্ত্রীকে সাবধান করেছে, ওহে ভালমানুষের মেয়ে, তোমার এই বিপজ্জনক প্রথাটি দয়া করে ছাড়। কে কার কথা শোনে। চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। কথাই যদি শুনবে তা হলে স্ত্রী হবে কেন? প্রতিবারই অলকার এক উত্তর 'কড়া আমার হাতে। ভবিষ্যতও আমার হাতে। ভাগ্যকে যেভাবে নিয়তি ধরে থাকে, আমার হাতের সাঁড়াশিও সেই ভাবে কড়ার কানা ধরে আছে। কারুর বাপের সাধ্য নেই এখন কি হয় বলে।' ঠিকই ত? ভয়ে মরলেই সেক্সপিয়ার, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস, আর একটু এগোলেই রবীন্দ্রনাথ, মরতে মরতে মরণটারে। শচিন অবশ্য ভেবেই রেখেছে, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, নিয়তির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া যদি দড়াম করে মুখের সামনে পড়ে এবং চোখ দুটো যায়, তাহলে ওই মোড়ের মাথায় চেটাই পেতে সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে সামনে একটা কানা উঁচু থালা রেখে সারাদিন গান গাইবে, ভাল-বাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যাও। অলকা পাশে বসে এক হাতে মাথায় ধরে থাকবে রঙ চটা ছাতা আর এক হাতে মাঝে মাঝে হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে। এই রকম একটি হতভাগ্য দম্পতিকে সে রোজই পথে দেখে। মাথায় ছাতা ধরবে। হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে। এমন দিন কি হবে মা তারা।

অলকা বাঁ হাতে ধরা সেই ভয়ঙ্কর তপ্তকটাহের ফুটন্ত শব্দায়মান তেল থেকে খুন্তি দিয়ে একটি ভাজা মাছের দাগা তুলে শচিনের ভাতের ওপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে বললে, 'সঙের মত বসে না থেকে দয়া করে খেয়ে উঠে যাও না। সংসারের পাটত আমাকে চুকোতে হবে, না সারাদিন বসে থাকলেই চলবে।'

শুভার পাতেও অনুরূপভাবে একটি মাছের খণ্ড পড়ল।

শচিন না বলে পারল না, ওর পাতে শুধু শুধু দিচ্ছ কেন, ওত খাবে না।'

'খাবে না মানে, ওর বাবা খাবে।'

শচিন ভাবলে ওর বাবা ত খাচ্ছেই, আর কি ভাবে খাবে। পেঁকো ভাতের ওপর কেলে ডাল ঢেলেছে, ডাল আবার গলেনি। বাটির তলায় আঙুল চালিয়ে গোটা কিছু মুগের দানা তুলে এনে পিণ্ডের ওপর যেভাবে তিন ছিটোয় সেই ভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছে, সতিল পিণ্ডোদকং সকালতা মৎস্যং। এক টুকরো লেবু হলে মন্দ হত না। অলকাকে বলার সাহস নেই। শুভা থাকলে বলা যেত। সে ত এখন গোঁসা ঘরে।

শোবার ঘরের রেডিওটা হঠাৎ বেজে উঠল। আহা নজরুলের সেই গানটা, 'জনম জনম গেল আশাপথ চাহি।' শুভা খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে মনের দুঃখে রেডিও খুলেছে। ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাবার সময় একটু গান, একটু কনসার্ট।

হঠাৎ কনসার্ট থেমে গেল। অন্য কনসার্ট কানে আসছে।

'শিগগির চল, শিগগির চল, এক থেকে তিন গুনব, তার মধ্যে সুড়সুড় করে উঠে আসবি। এক, দুই তিন। উঠলি ! কি হল উঠলি ? ভাল কথায় উঠবি, না যাব ? কি রে ?'

'আমি খাব না, যাও।'

'বাপের পয়সা সস্তা দেখেছ, না ? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। ওঠ শুভা ওঠ, শুভা ওঠ বলছি। আমার মেজাজ কিন্তু আস্তে আস্তে চড়ছে। এবার বলতে গেলে আর মুখে নয় হাতে বলব।'

শচিন মুখটাকে বিকৃত করল। মেজাজ চড়ছে। আর কোথায় চড়বে বাবা। তিনি ত সব সময় সপ্তমেই চড়ে আছেন। না, ডক্টর ঘোষ বলেছেন মনটাকে পারিপার্শ্বিক ব্যাপার থেকে তুলে রাখবেন। নিজেকে অনেকটা নিরোর মত করতে হবে। রোম পুড়ছে পুড়ুক, আপনি ছাদের আলসেতে বসে ব্যায়লা বাজাচ্ছেন। তা না হলেই পরিপাকে বিপাক এবং অম্বল।

শয়নকক্ষে মা মেয়ের খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মায়েরই ত মেয়ে। দু'জনেই এক রোখা বুলডগ। বুলডগ কামড়ালে তার চোয়াল আটকে যায়। মাংস না খাবলে সে কামড় খোলে না। এদেরও তাই। এর গোঁ ওকে, ওর গোঁ একে কামড়ে ধরে আছে। মেয়ে খাবে না মাও ঘাড় ধরে খাওয়াবেই। দরকার হলে ল্যাং মেরে চিৎ করে ফেলে বাঁশ গেদে খাওয়াবে। অনশন ভঙের দৈহিক ব্যবস্থা। ওরে আমার বুলু ডগুয়ারে। শচিনের শান্ত স্বভাবের ছিটে-ফোঁটাও যদি শুভার চরিত্রে লাগত। কি করে লাগবে। মেয়েদের শরীরে মায়ের রক্তই যে বেশি, তা না হলে মেয়ের বদলে ছেলে হত।

ঘাড় ধরে বেড়ালছানাকে যেভাবে তুলে আনে অলকা সেইভাবে শুভাবে ধরে এনে ধপাস করে আসনে বসিয়ে দিল।

'আর যেন একটা কথাও আমাকে না বলতে হয় শুভা। সেই সকাল থেকে রান্না ঘরে। এর মধ্যে ছ'কার চা হয়েছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার। তোমাদের আর কি, খাবেদাবে ঘরে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি একটা মানুষ, ধোপার গাধা নই !' দাঁতে দাঁত চেপে গাধা শব্দটা অলকা এমন ভাবে উচ্চারণ করল। অ্যাঃ মহিলার সমস্ত স্নায়ু ড্যামেজ হয়ে গেছে। কামড়ে না দেয় ? দাঁতাল, মাতাল আর পাগল ! বিশ্বাস নেই ! খুব সাবধান।

শুভা হাত গুটিয়ে মুখ গোঁজ করে বেঁকে বসে আছে। খুবই স্বাভাবিক। শচিনদের ছেলেবেলায় মাঝে মধ্যে এইরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটত। সেই সময়কার ভিকটোরিয়ান 'গোল্ডেন টাইমে' মায়েরা এই রকম পুলিসী প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বলতেন, চ বাবা; ওঠ মা ; রাগ করিসনি। রাগী ছেলে কি মেয়ে বলত, না যাব না, না খাব না। মা মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন, চল বাবা, চল মা। যাবি না ত। ঠিক আছে কাল সকালে আমাকে আর দেখতে পাবি না। কোথায় যাবে তুমি ? দেখতেই পাবি, যমে নিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। ব্যাস, হাউ হাউ কান্না। না মা যেও না তুমি।

মায়ের ফর্সা সাদা কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ। ঘামে আঁচলের ঘষায় একটু ছড়িয়ে গেছে। হাতে মিছরি-দানা চুড়ি। লাল পলা, সাদা শাঁখা পাশাপাশি। মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মা অমনি বলতেন, দূর পাগল, তোদের ফেলে যাব কোথায়। কার কাছে ভরসা করে রেখে যাব। কত কাজ বাকি। অসম্ভব তেতো নিমঝোলও তখন চুমুক দিয়ে খেতে আপত্তি নেই।

আর এখন ? অ্যাঁ, কি যুগ পড়লরে বাবা ? মিলিটারি ক্যাম্পে মহিলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে সংসার। সবসময় কুচকাওয়াজ চলেছে। শচিন মনে মনে বললে, 'এবার থেকে তুমি ইউনিফর্ম পরে হাতে বেটন নিয়ে খাবার তদারকি কোরো। সেইটাই মানাবে ভাল।'

শচিন বললে, 'শুভা খেয়ে নে মা। কেন অশান্তি করছিস। দুপুর থেকেই মেঘ জমে জমে সন্ধ্যের কালবোশেখী।'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমি খাব না। ওকে আমি দেখে নোব।'

'কাকে দেখে নিবি ?'

'তোমার বউকে ?'

'হোয়াট। কি বললি ?'

শচিনের 'হোয়াট' অলকার 'চুপ'-এর চেয়ে জোরে বেরল। রাগটাকে এতক্ষণ অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিল। এইবার বোমা ফাটল।

অলকা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। হাতে একটা হাতা।

শচিন চিৎকার করে বললে, 'গেট আউট। তোমাকে খেতে হবে না। বড্ড বাড় বেড়েছ শুভা। মেয়েছেলে বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দোব না রাসকেল। কানটাকে টানতে টানতে ছাগলের কানের মত লম্বা করে ছেড়ে দোব স্কাউনড্রেল।'

মায়ের বকুনি শুভার তেমন গায়ে লাগে না। খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত। বাপের ধমকধামকে ঠোঁট ফুলে যায়। অনেকদিন পরে শচিন খেপেছে। শুভার চোখে অভিমানের জল। শচিন সে সব তেমন গ্রাহ্য করল না।

হাতা উঁচিয়ে দরজার গোড়া থেকে অলকা বললে, 'শুধু শুধু মেয়েটাকে বকছ কেন। হঠাৎ আবার কি হল। এই ত দেখে গেলুম মেয়ের সোহাগে উলটে পড়েছ।'

'তোমার ট্রেনিংএ এই বয়সেই ইনি গোল্লায় গেছেন। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে।'

'যা বলবে মুখ সামলে বলবে। মেয়েকে হচ্ছে হোক, মাকে ধরে টানাটানি করবে

না।'

'ওই ত, ওই ত তোমার বচনের ছিরি। সাইকোলজিস্টরা কি বলেন জান, ছোটরা সব সময় বড়দের চালচলন নকল করে, বিশেষত মায়েদের। শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের মত মা হতে হয়। ত্যাগ, তিতিক্ষা, লজ্জা, মাত্রাবোধ, তাল লয় সব শিখতে হয়।'

জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না। রাখ তোমার সাইকোলজিস্ট। অতি আদর, আশকারা, রিরংসা এসব সংযত করে বাপের মত বাপ হতে হয়।'

'রিরংসা জিনিসটা কি?'

'ডিকসেনারি দেখে নিও। শুভা থালাটা নিয়ে তুই এ ঘরে উঠে আয়। আর কাঁদতে হবে না। আয় আমার পাশে বসে খাবি আয়। আর একটু মাছ-ঝাল দোব। আয় উঠে আয়।'

'ওকে উঠতে হবে কেন? আমিই উঠে যাচ্ছি। আনওয়ান্টেড এলিমেন্ট আমি।'

শচিন তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। চালতাব অম্বলটা একটু চেখে দেখার লোভ ছিল। না খেয়েছে ভালই হয়েছে। অ্যাসিডে অ্যাসিড বাড়ে।

॥ দুই ॥

সোমবারটা এমনিই ভারি বিশ্রী। ব্ল্যাক মানডে। সকালে গা ম্যাজম্যাজ করে। বেরোতেও গড়িমসি হয়ে যায়। ট্রাম, বাস কেমন ঢিমে-তালে চলে। সংখ্যাতেও কম মনে হয়। ক্যাটকেটে রোদ, ভিড় ঠেলাঠেলি। তার ওপর কাল থেকেই অলকার সঙ্গে ব্যাক্যালাপ বন্ধ। কথাবার্তা সব তৃতীয় পুরুষে দেওয়াল কিংবা আলমারিকে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে—'খেতে দিলে হয়, আভাবওয্যাবটা আবার কোন চুলোয় ফেলেছে, মানিব্যাগটার পাখা গজাল না কি।' চুড়ির রিনিঝিনি মেশান অলকার সরোষ উত্তর, 'বল, যে চুলোয় থাকে সেই চুলোতেই আছে, একটু চোখ মেলে দেখতে।'

'রুমালটা আবার দয়া করে কে হাওয়া করে দিলে?'

'কেউ হাওযা করেনি নিজের প্যান্টের পকেটটা ভাল করে দেখলেই পাওয়া যায়।'

'যাব্বাবা একপাটি জুতো আবার কোথায় গেল?'

'কোথাও যায়নি, র‍্যাকের পাশে পড়ে গেছে। যেমন রাখার ছিরি।'

'ও পড়ে গেলে তুলে রাখতে নেই? হাতে পক্ষাঘাত?'

'হ্যাঁ পক্ষাঘাত। যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে হবে। আর্সির মুখ দেখা।'

শচিন ঝুলতে ঝুলতে অফিসের টেবিলে এসে বসেছে। ঘেমে নেয়ে, আধকপালে হয়ে, আধমরা অবস্থা।

ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেল। কাজ দেখলেই রাগ ধরছে। পেটটাও ভুট-ভাট করছে। ঢেঁড়সের ঢেঁকুর উঠছে। অন্যদিন ড্রয়ারে একটা দুটো অ্যান্টাসিড থাকে, আজ তাও নেই। ভোগাবে। ঢেউ ঢেউ করে আরো গোটাকতক ঢেঁকুর তুলল। মাথাটা বেশ জম্পেশ ধরেছে। ধরবেই। মাথার আর দোষ কি। কথায় বলে মুড়ি আর ভুঁড়ি। অম্বল হলেই মাথা ধরবে। শচিন নাকের উপর কপালের কাছটা দু আঙুলে টিপে চুপ

করে বসে রইল। রাসকেল পেট, রাসকেল ডাক্তার। কোন অসুখই সারাবার ক্ষমতা নেই, কেবল ফি গুনে দিয়ে যাও।

সুনীলবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'হল কি ? এত করে বললুম খাবার পর একটা করে পান খাবেন, চুনে ক্যালসিয়াম, ভাল অ্যাণ্টাসিড, পানের রসে ক্লোরোফিল....।

'ধ্যার মশাই ক্লোরোফিল, ক্যালসিয়াম, ভেতরটা চুনকাম করে দিলেও কিছু হবে না। সংসারটাই অম্বলে অম্বলে অ্যাসিড হয়ে গেছে।'

'চলুন আজ ডক্টর ঘোষের কাছে। আমিও যাব, একটা কেস আছে। আপনার চেয়েও জটিল। সেও ওই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা।'

'হ্যাঁ যাব। আজই শেষ। হয় এসপার না হয় ওসপার।'

'আরে মশাই, অত সহজে হাল ছাড়েন কেন ? কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নিন একটা পান খান। আজ আর চা খাবেন না। স্রেফ জল চালিয়ে যান। হাইড্রোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। এই সুরেন, শচিনবাবুর গেলাসটা ভরে দাও।'

টিফিনে সুনীলবাবু শচিনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাস্তা কচুরি খেলেন। হজম করায় মন ? মনই লিভারকে নাচায়।

সুনীলবাবু বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ড, জল পর্যন্ত যার পেটে তলাতনা, সে আজ প্লেন কচুরি নয়, একেবারে খাস্তা কচুরি খাচ্ছে।'

শচিন ফাইল দেখতে দেখতে বললে, 'আমার বউটাকে বোবা আর কালা করে দিতে পারলে আমিও হেসে হেসে খাস্তা কেন কবিরাজী কাটলেট খেতুম।'

॥ তিন ॥

ডক্টর ঘোষের চেম্বার ফাঁকাই ছিল। থাকেও তাই। কার দায় পড়েছে পয়সা খরচ করে ছত্রিশ গণ্ডা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে সাধ করে আসতে। একটাই সুবিধে, বেশ আরাম করে বসার জন্যে পুরু পুরু গদি-আঁটা ভাল ভাল চেয়ার আছে গ অন্য ডাক্তারখানায় থাকে না।

ডক্টর ঘোষ সব শুনলেন। শুনেটুনে বললেন, 'পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে : দাম্পত্য জীবনের কয়েকটা বেসিক ডিসিপ্লিন আছে। সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলার ওপর শান্তি নির্ভর করছে। এই ত হালফিল একটা কেস। ভাল করে দিলুম।'

শচিন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেসটা শোনার কোন উৎসাহই নেই তার। পয়সা খরচ করে যত বাজে গালগল্প শুনতে আসা। সুনীলবাবুর খুব উৎসাহ, প্রশ্ন করলেন, 'কি কেস ?'

'জানলা খোলা। মাথার দিকের জানালা খোলা নিয়ে চোদ্দ বছরের ঝামেলা, বদহজম, নার্ভাস ব্রেকডাউন। স্ত্রী জানলা খুলে শোবেন, স্বামী বন্ধ করবেন। ইনি খোলেন ত উনি বন্ধ করেন। সারারাত ওই চলে। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি ধরে দুজনের সারারাত হাত কাড়াকাড়ি। ঘুমের বারোটা। প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

প্রথম প্রথম মজা, বিরক্তি, প্রতিবাদ। ভদ্রলোক কোথায় পড়েছেন মাথায় সরাসরি হাওয়া লাগলে সাইনাস হয়। সিটিং-এর পর সিটিং। কিছুই করতে পারি না। দুপক্ষই সমান। গোঁ জেতে কি সাইকলজি জেতে! শেষে...।'

'শেষে কি হল?' সুনীলবাবু যেন রহস্য-গল্প শুনছেন।

'শেষে সাইকলজির বাইরে যেতে হল।'

'কি রকম?'

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।' 'ভদ্রলোককে বললুম, একদিন আপনি সারারাত জানালাটা খোলা রাখতে দিন। প্রয়োজন হলে নিজে মাঙ্কিক্যাপ পরে অলীক সাইনাস থেকে বাঁচুন। একটা দিন। ভদ্রলোক রাজি হলেন। ব্যাস হয়ে গেল।'

'কি হয়ে গেল?'

'চোদ্দ বছরের ঝামেলা মিটে গেল। এখন স্ত্রী সবার আগে জানলা বন্ধ করে দেন।'

'কেন?'

'সেদিন রাত দুটো নাগাদ অ্যাপ্রন পরে নিজেই গেলুম। রাস্তার ধারে একতলার ঘর। রকে উঠলুম। জানালা দিয়ে আমার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরেই দে দৌড়।'

সুনীলবাবু হি হি করে হাসলেন। শচিনের হাসি পেল না। শচিনের ত জানলা-কেস নয়। আরও ঘোরাল, জোরাল ব্যাপার।

সুনীলবাবুই শচিনের মুখপাত্র। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁর ব্যাপারটা তাহলে কি হবে? এইভাবেই চলবে?'

'এঁর ব্যাপারটার একমাত্র সমাধান প্রেম। প্রেম করতে হবে। প্রেম দিতে হবে।'

'এই বয়েসে প্রেম? মেয়ে পাবে কোথায়? এখন মার্কেটে যে সব ছেলে ঘুরছে তাদের হাত থেকে মেয়ে বের করা শক্ত হবে না?'

'প্রেম, মানেই কি পরকীয়া! নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই প্রেম।'

শচিন এইবার লাফিয়ে উঠল, 'ওই বউয়ের সঙ্গে প্রেম? কারুর বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না। সবসময় বাঘিনীর মত গর্জন করছে।

'বাঘিনীকেও পোষ মানাবার কায়দা আছে। সার্কাসের রিংমাস্টার দেখেছেন ত। বউকে একটু তোয়াজ করবেন। রোজ গীতগোবিন্দ পড়বেন। মোলায়েম করে বলবেন, দেহি পদপল্লবমুদারম। আদর করে কখনও পিঠে, কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন, সুড়সুড়ি দিয়ে দেবেন। গালে দু চারটে ঠোনা মারবেন। ট্যাবলেট নয়, নিয়ম করে রোজ একটা দুটো চুমু খাবেন!'

'চুমু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চুমু, চুম্বন। ওর চেয়ে ভাল অ্যান্টাসিড আর কিছু নেই। না জানা থাকলে গোটাকতক ইংরেজী সিনেমা দেখে শিখে নেবেন। আমাদের দেশের দোষই হল, মেয়েদের শরীরের নীচের দিকেই আমাদের নজর। কিন্তু উর্ধ্বাংশটাই হল আসল। শুরু হবে ওপর থেকে। ডিভাইন লাভ, ডিভাইন লাইট ওপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। প্রেম কি মশাই ধর তক্তা মার পেরেক! সব কিছুর একটা মেথড আছে, অ্যাপ্রোচ আছে।

স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমই হল বেস্ট প্রেম, সিকিওর্ড প্রেম, খোঁটায় বেঁধে প্রেম। প্রেমের অবজেকট সহজে পালাতে পারবে না। ইঁদুর-কলে পড়ে গেছে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হলে পরস্ত্রী ভেবে নেবেন। নিজেকে মনে করবেন কৃষ্ণ, চলেছেন রাধার কাছে অভিসারে।'

'ইমপসিবল।'

'ওই ত দোষ ? অহংটাকে খাটো করা যায় না ? আত্মসমর্পণ, সারেণ্ডার। বিল্ব-মঙ্গল যদি পেরে থাকে, হোয়াই নট ইউ। সিকির সিকি প্রেমই হল আমার প্রেসক্রিপসান। মাঝেমাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে বউয়ের মুখে একটু মিষ্টি গুঁজে দেবেন। ভাল শাড়ি পরিয়ে পার্কে পাশাপাশি বসে কোলের ওপর হাত নিয়ে খেলা করবেন। আঙুলের আংটি ঘোরাবেন। চীনেবাদাম ঝালমুড়ি কিনে দেবেন। ফুচকা খাওয়াবেন। আড়ালে ঝোপঝাপ দেখে পাশাপাশি বসে মাথাটা কাঁধে হেলিয়ে দেবেন। ইডেনে গেলেই এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম প্রথম কপি করবেন। কপি করতে করতেই অরিজিন্যালিটি এসে যাবে। দিন কতক এই ভাবে তোয়াজ করে দেখুন, শান্তি ফিরে আসবে। মুখের ওই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুড়োটে ভাব কেটে যাবে। যান, বি চিয়ারফুল। মনে রাখুন অম্বল আর বদহজমের দাওয়াই অ্যাণ্টাসিড নয়, প্রেম।'

দু জনে চেম্বার ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

মুনি মানু বললেন, 'তাহলে একটা গীতগোবিন্দ আর বিল্বমঙ্গল কিনে ফেলুন। নতুন জীবন আজই শুরু করুন। একটা কামসূত্রও সঙ্গে কিনে ফেলতে পারেন। ডাক্তারে, ওষুধে ত বহুপয়সা দিলেন আরও কিছু না হয় এদিকে যাবে। দেখতে দোষ কি ? আচ্ছা আমি চলি। কাল দেখা হবে। গুডবাই।'

শচিন গুটি গুটি হাঁটা ধরল। আবার বাড়ি। আবার সেই দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করে ঠারেঠোরে ছিটে গুলির মত কথা ছুঁড়ে মারা। মেয়ের সঙ্গেও কথা বন্ধ। এভাবে আর কতদিন চলবে প্রভু। শচিন সেই অদৃশ্য প্রভুর কাছে পরামর্শ চাইল। কোথায় প্রভু। উর্ধ্বশ্বাসে মানুষ ছুটছে। ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে গাড়ি দৌড়োচ্ছে। দুঃখী শচিনের দিকে কারুর নজর নেই। অসার সংসার, নাহি পারাপার। আচ্ছা দেখাই যাক না ডক্টর ঘোষের নতুন দাওয়াই কাজে লাগিয়ে। অহং-এর ভাগটাকে একটু নীচু করে স্ত্রীর উদাসীনতার অগাধ জলে স্পর্শ করিয়ে স্নেহের কণা কিছু তুলে আনা যায় কিনা। আমার বউ। আহা, আমার প্রেমের বউ। আহা, আমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। বউকে স্নেহ করার জন্যে শচিন নিজেকেই তোয়াজ করতে লাগল। স্নেহকে, প্রেমকে এখন দৃশ্যমান করতে হবে। তেমন রেস্ত থাকলে একটা হীরের আঙটি কেনা যেত। তেমন রেস্ত থাকলে একটা শাড়ি। পকেট ত গড়ের মাঠ। মধ্যমাসে কেরানীর পকেটের আর কত জোর থাকবে। অলকা একসময় লড়াইয়ের চপ খেতে খুব ভালবাসত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন বউকে সে কত খাইয়েছে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে হুহা করে ঝালঝাল চপ খাবার সেই দৃশ্য হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। নাকের ডগায় শিশিরের দানার মত ঘাম। আয় পুরনো দিন ফিরে আয়।

॥ চার ॥

লড়াইয়ের চপ নিয়ে শচিন বাড়ি ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতেই শোবার ঘর দেখতে পাচ্ছে। জানালা খোলা। ফন ফন করে পাখা ঘুরছে। পায়ের ওপর পা জড়িয়ে অলকা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ওরে আমার মহারানীরে ? বাস ঠেঙিয়ে ধস্তাধস্তি করে সারা দিনের পর একটা লোক বাড়ি ফিরছে, কোথায় জানালার সামনে বিরহিনীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, হাসিমুখে এগিয়ে আসবে, বলবে, আহা তুমি এলে, বাছারে ? তা না উনি শুয়ে শুয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছেন। ফায়ার। না না আজ আর ফায়ার নয় দাঁতে দাঁত চেপে সিজফায়ার।

শচিন একটু কাশল। অলকা বই থেকে চোখ না সরিয়ে শুয়ে শুয়েই বললে, 'শুভা দরজাটা খুলে দে।' ও ! শুভা দরজা খুলবে, আপনার হাতে কি পক্ষাঘাত। এ যেন শচিন আসেনি, এসেছে কাজের লোক। না, নো রাগারাগি। শচিন ঢুকে পড়ল, 'একবার দয়া করে উঠে এসে এটা ধর না।'

দয়া করে শব্দটা না বললেই হত। সোজাসুজি বলা যেত, ওগো একবার উঠে এস ত। যাক মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গেছে তা বেরিয়েই গেছে।

'শুভা, কি ধরতে বলছে ধরত !'

ও, তবু নিজের ওঠা হয় না।

'কি এমন ব্যস্ত, নিজে উঠতে পারছে না।' অতিকষ্টে শচিন পরের শব্দ কটা ধরে রাখল—গতরে কি শুঁয়াপোকা ধরেছে।

ধপাস করে বইটা পাশে ফেলে বেজার বেজার মুখে অলকা উঠে এল, 'কি হল কি ?'

শচিন হাসির রেখা টেনে পরম উৎসাহে বললে, 'গরম গরম, একেবারে গরম গরম লড়াইয়ের চপ।'

'কি হবে ?'

'কি হবে মানে ?'

'তুমি খাবে ? তোমার ত অম্বলের ব্যামো !'

'আমি কেন ? তুমি খাবে ?'

'আদিখ্যেতা।'

'তার মানে ?'

'রোজই ত শুধু-হাতে ঢোক, হঠাৎ আজ পিরিত উথলে উঠল কেন ?'

'ও পিরিত ? কোনদিন কিছু আনি না না ?'

'মনে ত পড়ে না। তোমার চপ তুমি খাও।'

এইসময় শচিনের উচিত ছিল বউকে একটু সোহাগ করা, তার বদলে সে ঠোঙাটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'রাবিশ ! নৃশংস রাবিশ !'

'হ্যাঁ রাবিশ।'

'অফকোর্স রাবিশ, হৃদয়হীন রাবিশ।'

'জানই ত। জেনে শুনে ঘাঁটাতে আস কেন ? কেঁচো খুঁড়তে গেলেই সাপ বেরোবে।'

'বেরোক। তাই বেরোক।' শচিন চপের ঠোঙায় মারল লাথি। ঠোঙা ছিঁড়ে সব চপ

ছত্রাকার।

'পয়সা তোমার অনেক, মারো, মারো লাথি, কার কি?'

'সংসারের মুখে লাথি।'

'নতুন কি, সে ত দুবেলাই চলছে।'

'দু বেলাই চলছে?'

'হ্যাঁ চলছে। বেরোতে লাথি আসতে লাথি।'

'যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে।'

'কি তোমাকে দেখানো হয়েছে।'

'আদর করে চপ নিয়ে এলুম, দিলে ফেলে।'

'আমি ফেলে দিলুম, না তুমি ফেলে দিলে?'

'ওই হল।'

'বিষাক্ত তেলেভাজা আজকাল কেউ খায় না। পারতে শ্যামাদির স্বামীর মত ইলিশ নিয়ে, সিনেমার টিকিট কি থিয়েটারের টিকিট, কি কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার টিকিট নিয়ে বাড়ি ঢুকতে, বুঝতুম মুরোদ। আজ চোদ্দ বছরে একবার চিড়িয়াখানা দেখাতে পারলে না। মেয়েটাকে প্রত্যেক বছর আশা দিয়ে দিয়ে রাখা। এ বছর হল না মা, আসছে বছর [illegible] সেই আসছে সেই আসছে বছর চোদ্দ বছরেও এল না। এই ত মুরোদ।'

লড়াইয়ের চপের লড়াই গড়াতে গড়াতে অনেক দূর গড়িয়ে গেল। শচিন পা থেকে জুতো দুপাটি খুলে র‍্যাকের দিকে ছুঁড়ে দিল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হিড়হিড় করে টেনে টুনে পা থেকে নাইলনের মোজা খুলল। গা থেকে জামাটা খুলে চেয়ারে ছুঁড়ে মারল। বুক পকেট থেকে এক গাদা টুকরোটাকরা কাগজ খানকতক ময়লা ময়লা নোট ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। থাক পড়ে। শ্যামাদির স্বামীর মত মুরোদ দেখাতে পারলে, অলকা সব তুলে গুছিয়ে গাছিয়ে রাখত।

অনেক রাতে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে শচিন নিজেকে শ্যামাদির স্বামীর সঙ্গে মেলাতে বসল। প্রতিবেশী। দু'বেলাই শচিনের সঙ্গে দেখা হয়। লুঙ্গিটাকে উঁচু করে পরে সকালে ঘোঁত ঘোঁত করে বাজারে ছোটেন। শচিন মাঝে মাঝে বাজারে যায়। রোজ সকালে বাজার যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। নটা নাগাদ আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ঘাড়ে একগাদা পাউডার মেখে মুর্গীহাটায় ব্যবসা করতে যাওয়া। হবে না, শচিনের দ্বারা হবে না। ও সাজে সাজা যাবে না মা। মোড়ের মাথায় পানবিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে শ্যামাদির স্বামী বেরোবার সময় এতখানি একটা হাঁ করে দু খিলি পান এক-সঙ্গে মুখে পোরেন। তারপর রিকশায় ওঠার আগে কোনও দিকে না তাকিয়ে পচাৎ করে এক খাবড়া পিক ফেলেন। হবে না, শচিনের দ্বারা ও কাজ হবে না। ছুটির দিন মেয়ের ঘাড়ে সংসার ফেলে দিয়ে বউ বগলে শ্যামাদির স্বামীর যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে যাওয়া চাই। যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটার শচিনের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। হিন্দী ছবির ননসেন্স বাঙলা থিয়েটারের ক্যাবারে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের সহ্য শক্তির ওপর অত্যাচার। শালীদের বাড়িতে এনে ছত্রিশবার বাজারে ছোটা হই হই করে হাসি মস্করা, টাকার শ্রাদ্ধ, শচিনের সে ক্ষমতাও নেই, রুচিও নেই। বোকা বোকা কথা বলে

হ্যা হ্যা করে হেসে মেয়েদের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা শচিনের নেই। শান্ত মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। বউ পেয়েছে তাইতেই খুশি, শালাশালী নিয়ে ঢলাঢলির ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। এক মেয়েছেলেতেই কাহিল-কাহিল অবস্থা, আর মেয়েছেলেতে কাজ নেই। শ্যামাদির স্বামী ভাল শাড়ি দেখলেই বউয়ের জন্যে কিনে আনেন, কথায় কথায় গহনা গড়িয়ে দেন, দিতেই পারেন। ব্যবসার পয়সা। টাটা আরও দেন, বিড়লা গোয়েঙ্কা দিতে পারেন। শচিনকে দিতে হলে চুরি করতে হবে।

অলকার দিকে পেছন ফিরে শচিন চিৎ থেকে কাত হল। গায়ে হাত দিলেই খ্যাঁক করে উঠবে। শ্যামাদির স্বামী না হতে পারলে অলকার সোহাগ শচিনের বরাতে জুটবে না। যা হয়ে গেছে বিয়ের প্রথম চার বছরেই খতম। বাকি দশটা বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধ। চলছে ত চলছেই। কবে যে শেষ হবে। সেই সাহেব শিকারীর কথা মনে পড়ছে। দূর থেকে বাঘের গায়ে পিন ছুঁড়ে মারেন। বাঘ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর বাঘের মত হিংস্র জন্তুকে বেড়ালের মত ন্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। ওই রকম একটা অস্ত্র যদি শচিনের থাকত। রোজ বাড়ি ঢোকার আগে জানলার বাইরে থেকে অলকাকে টিপ করে মারত। ব্যাস বাঘিনী ঘুমে ন্যাতা। সংসার শান্ত। ডক্টর ঘোষ। ডক্টর ঘোষ কি করবেন ? প্রেম ! প্রেম নয়, শচিনকে হতে হবে শ্যামাদির স্বামীর মত।

অনেক ভেবে শচিনের মনে হল, একটা কাজ সে করতে পারে—চিড়িয়াখানা। অগতির গতি চিড়িয়াখানা। শীত আসতে অনেক দেরি, তবু চিড়িয়াখানা। চলো চিড়িয়াখানা। বাঘিনীকে বাঘ দেখাও, সিংহ দেখাও, আইসক্রিম খাওয়াও, ট্যাকসি চাপাও। সেই রেশে যদি কিছুদিন শান্তি পাওয়া যায়। আর দেরি নয় তাহলে। কালই। শুভস্য শীঘ্রং। কাল অফিস না গিয়ে চিড়িয়াখানা। অনেক ছুটি পাওনা। ছুটি ত সে নেয়ই না। ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকলেই ত অশান্তি।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে শচিন শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

ঝনঝন করে বাসন পড়ার শব্দে শচিনের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ বেলা হয়েছে। অলকা মেয়েকে বলছে, 'থাক ডাকতে হবে না, আক্কেলটা দেখাই যাক না। কখন ওঠে, কখন বাজার হয়, কখন খাওয়া হয়, কখন অপিস যাওয়া হয়। আমার কি ? আমি ভাত নামিয়ে বসে থাকি।'

শুভা বলছে, 'না মা বাবাকে ডেকে দি। তা না হলে এমন তাড়াহুড়ো করবে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কোন দরকার নেই। আমি বাথরুমে ঢুকছি, তুই একটু পরে ভাতের হাঁড়িতে কেবল এক ঘটি জল ঢেলে দিস্।' শচিন বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। মরেছে, অলকা বাথরুমে ঢুকলে পাক্কা এক ঘণ্টা। তার আগেই মুখটা ধুতে হবে। শচিন ঘর থেকেই চিৎকার করে বলল, 'শুভা আমি উঠেছি।'

'উঠেছ বাবা !'

'হ্যাঁ মা উঠেছি।' শচিন বাইরে এল। আহা কি সুন্দর প্রভাত ! চট করে মুখটা ধুয়ে

আসি। 'অলকা, অলকা তুমি চা চাপাও।'

উঃ কতদিন পরে বউকে নাম ধরে ডাকা হল। দাঁতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে শচিন ভাবল, অলকা নামটা ভারি সুন্দর। অলকানন্দা। চেহারাতেও একসময় বিউটি ছিল। মনটা যদি একটু বিউটিফুল হত। কাদের বাড়ির রেডিও থেকে অতুলপ্রসাদের গান ভেসে আসছে, প্রভাতে যারে নন্দে পাখি।

হাত মুছতে মুছতে শচিন বেরিয়ে এল, 'কই চা হয়েছে অলকা?' কোনও দিকে না তাকিয়ে শচিন বসার ঘরের দিকে এগোল। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। অলকা, অলকা, একটু যেন ভোয়াজের গলা। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে মা মেয়েকে ফিস ফিস করে বললে, 'কি ব্যাপার।' মেয়ে ঠোঁট উলটে বোঝাতে চাইল, তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান, আমি ত সবে এসেছি। জ্ঞান হয়েছে মাত্র কয়েক বছর।

শুভা চা নিয়ে এল। শচিন কাগজ দেখছিল।

'তোর মাকে ডাক ত।'

অলকা নববধূর মত পায়ে পায়ে বসার ঘরে এল। শাড়ির সামনেটা ভিজে। হাত মুছেচে। রাতের বাসী চুল, শরীর উস্কখুস্ক। অনেকদিন পরে শচিন অলকাকে ভাল করে দেখছে। আগের অমন সুন্দর মুখটা সংসারের আঁচে যেন পোড়াপোড়া হয়ে গেছে।

'[illegible] আজ আর বেরোব না।'

অলকা উদাস গলায় বললে, 'বেরিও না।'

'কেন বেরোব না বল ত?'

'কি জানি?'

'আজ আমরা চিড়িয়াখানায় যাব। ডিম নিয়ে আসছি। ভাতে ভাত, ডিম সেদ্ধ, মাখন।'

'হঠাৎ চিড়িয়াখানায়?'

'অনেক ছুটি পাওনা, মাঝে মাঝে একটু আউটিং ভাল।'

'তোমার ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসান বুঝি।'

'আরে না না। জীবনটা বড় একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। সংসার অফিস, অফিস সংসার।'

'তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও।'

'আর তুমি!'

'আমার রোজ যা তাই। হাঁড়ি ঠেলা কাজ, সেই হাঁড়িই ঠেলে যাই সারাজীবন।'

'এদিকে সরে এস।'

'বল না।'

শচিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। অলকার চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে শুভা নেই।

শচিন অলকার গলাটা জড়িয়ে ধরে চুক করে গালে একটা চুমু খেল।

অলকা চমকে উঠেছে। 'সাত সকালে এ কি অসভ্যতা।'

শচিনের নিজেকে মনে হল ইংরেজি ছবির হিরো। ডক্টর ঘোষ বলেছেন অ্যান্টাসিড নয়, চুমু। বেশ লাগল। অনেকদিন পরে, যদিও ভয়ে ভয়ে আলগোছে।

'যাও রেডি হয়ে নাও। তোমার চুল বড় তেলচিটে হয়েছে। একটু সাম্পু করো।' অলকা চলে গেল।

শচিন শুনতে পাচ্ছে, মা মেয়েকে, বলছে, 'কি রে ভাতের তলা ধরে যায় নি তো মা।'

ওষুধ ধরেছে। মা বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। ডক্টর ঘোষ কি বলবেন ? তার নিজের লেখাপড়াও কম না কি। নিজেই একটা মেণ্টাল হর্সপিটাল খুলতে পারে। এই ত সেদিন এরিক ফ্রমের 'দি আর্ট অফ লাভিং'-এ পড়ছিল, লাভ ইজ অ্যান অ্যাকটিভ পাওয়ার ইন ম্যান, এ পাওয়ার হুইচ ব্রেকস-থ্রু দি ওয়ালস...।

॥ ছয় ॥

সেই বলে না, সোনার মোহর মাটি চাপা থাকলে পেতলের মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। একটু ঘষলেই আবার চকচকে। অলকার রূপটা আজ ক্যায়সা খোলতাই হয়েছে। কোথায় গেলেন শ্যামাদির স্বামী। আসুন একবার দেখে যান।

শুভা মায়ের হাত ধরে, শচিনের কাঁধে জলের বোতল। বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। না পেলে ট্যাকসি। আজ আর কৃপণতা নয়। অলকা বললে 'কিছু লজেনস কিনে নিলে হত।'

'ঠিক বলেছ।'

রাস্তার ওপরেই স্টেসেনারি দোকান। শচিন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। লক্ষ্যই করেনি বেগে একটা গাড়ি আসছে। রাস্তা পার হবার জন্যে একেবারে গাড়ির মুখোমুখি। অলকা একটান মেরে শচিনকে সরিয়ে আনল। গাড়িটা থামে নি। একটা গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল। অলকার হ্যাঁচকা টানে শচিন প্রায় তার বুকের ওপর এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের বোতল ছিটকে রাস্তায়। শুভা মা বলে চিৎকার করে উঠেছে। একটুর জন্যে শচিন বেঁচে গেল। অলকা হাঁফাচ্ছে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। অলকা কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'রাস্তা পার হবার সময় দেখবে ত। এখুনি একটা কাণ্ড হয়ে যেত।' অলকা কেঁপে উঠল। শুভা এসে শচিনের হাত ধরেছে, যেন হাত ধরে থাকলেই বাবা চিরকাল থাকবে।

অলকা বললে 'চল ফিরে যাই। বাধা পড়ে গেছে। তোমার শরীর কাঁপছে।'

'ধূর ফিরব কেন ? ফাঁড়া কেটে গেল।'

'তাহলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে কাজ নেই। চল কালীঘাটে যাই। অনেকদিন ধরে মা টানছেন।'

কালীঘাট ! শচিন একটু ঘাবড়ে গেল। ভিড় ঠেলাঠেলি, পাণ্ডা, মায়ের কথা উঠলে না বলা যায় না। হিন্দুর ছেলে।

'বেশ তাই চল। বাসের চেষ্টা করে লাভ নেই। ট্যাকসি ধরি।'

'অনেক নিয়ে নেবে।'

'তা নিক, রোজগার ত খরচের জন্যেই।'

দুদিকের দু জানলার ধারে মা আর মেয়ে মাঝখানে শচিন। বেশ লাগছে। সত্যিই

বেশ লাগছে। হু হু করে গাড়ি ছুটছে। শুভার নানা প্রশ্ন। এটা কি, ওটা কি ? অলকা বললে, 'একদিন আমাকে নিউ মার্কেটটা দেখাবে ?'

'একটা জিনিস কিনে দেবে ?'

'কি ?'

অলকা শচিনের কানে ফিসফিস করে সাধের জিনিসের নাম বললে, অন্য পাশ থেকে শুভা বললে, 'কি বাবা ? মা কি বললে ?' অলকা শচিনের উরুতে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলে।

শচিন বললে 'তোর জন্য কাঁচের চুড়ি।'

শুভা খুব খুশি. 'তাহলে মাকেও কিছু কিনে দিও, তোমার জন্যেও কিছু কিনো।'

শচিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অখুশি মুখগুলো কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠেছে।

॥ সাত ॥

তেমন ভিড় নেই মন্দিরে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মায়ের দিকে মুখ করে। পূজারী পূজা নিচ্ছেন, প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁর কি মনে হল অলকার কপালে গোল একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। মুখে ঘামতেল কপালে লাল টিপ। শচিনের মনে হল কুসুমডিঙ্গার দিন হোমের আগুনে অলকার মুখটা এইরকম দেখতে হয়েছিল। তখন শচিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল গাঁটছড়া। অতীত যেন ফিরে এসেছে বর্তমানে। কান পাতলে কি সানাইয়ের সুর শোনা যাবে ?

অলকার চোখে জল। শচিনের মনে হল পাথরে জল ঝরছে।

'তুমি কাঁদছ কেন ?'

'আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে, আমি মরতে বড় ভয় পাই।'

'মরার কথা আসছে কেন ?'

'আসছে। তোমাকে আমি বলি নি। আমার ভীষণ একটা অসুখ করেছে।'

'কি অসুখ ?'

'টিউমার।'

'টিউমার ? কোথায় টিউমার ?'

'এই যে মাথার মাঝখানে।'

অলকা মাথাটা নীচু করল। কপালের সামনে থেকে চুল দু ভাগ করে সিঁথি চলে গেছে মাথার মাঝখান পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে খোঁপা টলবল করছে। শচিন মাথার মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল গোল মত একটা কি উঁচু হয়ে উঠেছে। গুলির মত হাতে চাপ দিলে পিছলে এপাশ ওপাশ করছে।

'তুমি বল নি ত ?'

কি বলব, বলে কি হবে ? তোমাকে না বলে একদিন ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছিলাম। বললেন, 'জায়গাটা খারাপ। ভাল করে দেখতে হবে।'

অন্য দর্শনার্থীদের ঠেলা খেয়ে তিনজনকে সরে আসতে হল। একপাশের চাতালে বসে শচিন জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয় ?'

'যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে মাথাটা মনে হয় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চোখেও যেন কম দেখছি আজকাল। কান দুটোও কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশি দিন বাঁচব না গো। তোমাকে অনেকদিন জ্বালিয়েছি, এইবার তোমার ছুটি। আবার যদি বিয়ে কর একটু দেখে শুনে কোর, শুভাটাকে যেন যত্ন করে।'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুভা ফ্যাঁস ফোঁস করে উঠল। শচিন চুপ। ভেতরটা বড় নাড়া খেয়েছে।

রাত নিঝুম। শচিন মেটিরিয়া মেডিকা খুলে বসেছে। টিউমার, টিউমার। কত পাতায়। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার সারে। বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরোল। অনেকদিন আগে খবরের কাগজে দেবে বলে রাগ করে একটা বিজ্ঞাপন লিখেছিল,

স্বামী চাই

মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলার জন্য পার্টটাইম স্বামী চাই।

দুপুরে বিকেলে প্রেম করতে হবে, তোয়াজ করতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সব খরচ আসল স্বামীর। এমন কি অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব। লিখুন। বকস নং...

শচিন কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল। অন্ধকারে সাদা সাদা কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ছে। আলো পড়ে কোনওটা চিকচিক করছে। যেন অজস্র বাদুলে পোকা।

দেওয়ালের ব্র্যাকেটে মা কালীর সিঁদুর মাখা ছবি। মায়ের পায়ের তলায় কালীঘাট থেকে আনা প্রসাদী জবা ফুল জিভের মত লকলক করছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। শচিন একা জেগে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তোমার সংহারের রূপ আমি আর দেখতে চাই না।

অনেক অনেক দিন আগে শচিন একটা গল্প পড়েছিল, 'স্রোতের ফুল।' সেই গল্পের সঙ্গে একটা ছবিও ছিল। নির্জন নদীর ঘাটে একটি বালিকা একের পর এক জলে ফুল ভাসিয়ে চলেছে। গল্পটা তার এখনও মনে আছে। অনেকে বলেন, ঈশ্বর এক মহান শিশু, বসে আছেন বিরাট সিন্ধুর তীরে আপন মনে। একটি একটি করে জীবনের ফুল ভাসিয়ে চলেছেন। ভাসতে ভাসতে সুদূরে চলেছে, কখনও একটি, কখনও পাশাপাশি দুটি তিনটি। এইভাবে চলতে চলতে স্রোতের টানে আবার একা। মিলন, বিচ্ছেদ, সঙ্গ, নিঃসঙ্গ সবই স্রোতের খেলা। অলকার জন্যে অসম্ভব করুণায় শচিনের মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। একটা জীবন এসেছিল আর একটা জীবনের সঙ্গে মিলতে। একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা, একটু নির্ভরতা, এ আর এমন কি ধন-দৌলত যা দেওয়া যায় না। কি তুচ্ছ, ভাত, ডাল, তরকারির স্বাদ বিস্বাদ নিয়ে কলহ! কিসেরই বা অহঙ্কার!

বই বন্ধ করে শচিন বিছানায় গেল। অলকার ব্রহ্মতালুর ফুলো জায়গায় একটা আঙুল রাখল। অলকা খুব ঘুমোচ্ছে। বাইরে ত বেরোয় না, ঘোরাঘুরিতে খুবই ক্লান্ত। অলকা ঘুমোলেও টিউমারটা ঠিকই জেগে আছে। দেওয়াল ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে সমান তালে দপ দপ করে চলেছে। আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি। কি বলতে চায়? তেয়াজে সারতেও পারি আবার মরতেও পারি।

ফিরে আয়

অ্যালবাম থেকে পোট্রেট সাইজের একটা ছবি খুলে মাধবী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'এই ছবিটাই শেষ তোলা হয়েছিল, এই বছর খানেক আগে। ওর এক বন্ধু তুলেছিল।' অনিল হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল। পরিষ্কার স্পষ্ট ছবি। রাগ রাগ চেহারার এক যুবক। কান চাপা, ঝাঁকড়া চুল। নাকটা খাড়া। গাল দুটো অল্প ভাঙা। কপালের ডানপাশে একটা কাটা দাগ। ছেলেবেলার দুর্ঘটনার স্মৃতি।

অনিল বললে, 'হ্যাঁ এই ছবিটাতেই হবে।'

অ্যালবামে আরও অনেক ছবি রয়েছে। বিভিন্ন বয়েসের রঞ্জন। অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে, স্কুলে যাবার বয়েসে, স্কুল থেকে কলেজে। কোথাও মা-বাবার সঙ্গে, কোথাও বন্ধুদের সঙ্গে। মাধবী একে একে পাতা উলটে দেখতে লাগল। সতের বছরের সঞ্চিত স্মৃতি।

মাসখানেক আগে অনিলের এক বন্ধু অনিলের একটা ছবি তুলেছিল। অনিল যখন অফিসের টেবিলে বসে কাজ করছে সেই সময়। ছবিটার ফুলসাইজ প্রিন্ট এখন অনিলের চোখের সামনে। টেবিলের কাঁচের তলায়। অনিল রাখেনি। রেখেছে মাধবী। বাঁধাবার খরচ অনেক। তবু কাঁচের তলায় থাকলে ভাল থাকবে।

অ্যালবাম মুড়ে রেখে মাধবী উঠে গেল। সতের বছরের ছেলের জন্যে গত তিন দিন অনেক কেঁদেছে। আর কত কাঁদবে। সংসারে সবই সহ্য করতে হয়। সবই সয়ে যায়। বিচ্ছেদ, সে ত টিকটিকির ন্যাজ খসে যাওয়ার মত। দেখতে দেখতে আবার গজিয়ে ওঠে। শূন্যতা ভরে যায়। একটু বেদনা, একটু স্মৃতি। চাকা ঘুরতেই থাকে। অভ্যাসের চাকা।

রঞ্জনের ছবিটা অনিলের ছবির পাশেই পড়ে আছে। একটা বড় মুখ, একটা ছোট মুখ। একটা ঝলসে গেছে, আর একটা এখনও তাজা। একটা প্রায় শেষের সীমানাচিহ্নে আর একটা শুরুর মাইল পোস্টে। পথ সেই এক। দু'টো মুখের দিকে অনিলের হঠাৎ নজর পড়ে গেল। কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

আজ তিন দিন হয়ে গেল, রঞ্জন নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানের কোনও ত্রুটি হয়নি। সর্বত্র দেখা হয়েছে। পুলিসে ডায়েরিও করা হয়েছে। কোথায় রঞ্জন। বাষ্পের মত যেন মিলিয়ে গেছে। সঙ্গে কিছু নিয়েও যায় নি। পড়ার টেবিলে স্তূপাকার বই। ড্রয়ারে কলম। শূন্য একটা মানিব্যাগ। আলনায় জামাপ্যান্ট। যেখানে যা ছিল সবই পড়ে আছে এলোমেলো ছত্রাকার। রঞ্জন উড়ছিল ঠিকই, দাঁড়ে ফিরে আসত। দানাপানি খেত। পড়ুয়া কাকাতুয়ার মত রাধেকৃষ্ণ না বললেও, আবোলতাবোল কপচাত। সুখশ্রাব্য না হলেও সকলকে শুনতে হত। এবার পাখি শিকলি কেটে সত্যিই উড়ে গেছে।

রঞ্জন আমাদের বকে যাওয়া ছেলে। সিগারেট ত ছোট নেশা। তার চেয়েও বড় নেশার অভিজ্ঞতা রঞ্জনের হয়েছিল। অনিল জানে, সব জানে। মুখ দেখলে বোঝা যায় মানুষ কতটা পবিত্রতা হারিয়েছে। চোখ দেখলে মনের খবর জানা যায়। এই ত অনিলের

মুখ, ওই ত রঞ্জনের মুখ। এই মুখই ত বলতে পারে ওই মুখের কথা। সব ব্যাঙের গায়েই ত ধীরে ধীরে দেখা দেবে গরলে ভরা বিষাক্ত গুটিকা। ভেকের সন্তান ত ভেকই হবে। সাপের সন্তান সাপ। তবে কি অধিকার ছিল অনিলের রঞ্জনকে শাসনের।

অনিলকে কে শাসন করবে। অনিলের বিবেক। সে বিবেক বহুকাল নিদ্রিত, অনন্ত-শয়ানে পাপের সমুদ্রে ভাসছে। প্রবৃত্তির কৃতদাস অনিল আর একজনের প্রবৃত্তিকে কি করে সংযত করবে। উত্তরাধিকার বলে একটা কিছু অবশ্যই আছে। সেটা কি? সে আর ভেবে লাভ নেই। যা হয় তা হয়। রক্তের ধারা নদীর মতই চলে। কাকের পালক দেখতে দেখতেই কালো হয়ে ওঠে। রঞ্জনের ছবিটা একটা খামে ভরে রেখে অনিল উঠে দাঁড়াল। জীবনে এত জট পাকিয়ে রেখেছে, সব জট কি আর খোলা যাবে? কে খুলবে?

ঘরের দেয়ালে অনিলের বাবার ছবি কাত হয়ে ঝুলে আছে। বহুকাল কেউ ধুলোটুলো ঝাড়ে না। ফুলের মালার বদলে চারপাশে ঝুলের ঝালর ঝুলছে। অনিলের মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যায়। জীবন আর ছবি, দু'টোকেই পোকায় কাটে। একটাকে দেখা যায় না, আর একটাকে দেখা যায়। কীটদষ্ট পূর্বপুরুষকে দেখে অনিলের তেমন কিছু ভাবান্তর হয় না। কে, কাকে, ক'দিন মনে রাখে। ভোগে দুর্ভোগে নিজেকে নিয়ে মানুষ বড় ব্যস্ত। আজ কিন্তু ছবির সেই বিবর্ণ মানুষটির দিকে তাকিয়ে অনিলের মন বলে উঠল, ঠিক তুমিও যেমন, আমিও তেমন। এখনও তোমার কত কুকীর্তি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। শেষ বয়েসে একটু ধার্মিক হয়েছিলে। তাতে তুমি মোক্ষলাভ করেছ কি না জানি না। তবে তোমার নামের কলঙ্ক ধুয়ে যায়নি। আজও শোনা যায়, বকধার্মিক আশু কেমন একে একে সব কটা ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়সম্পত্তি সব গ্রাস করে নিলে? কেউ কেউ আমার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে, মোষের মত শরীর ছিল, যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হল, রুগ্ণ বড় ভাইয়ের স্বাস্থ্যবান স্ত্রীটিকে বেশ মনে ধরল। তারপর কি হল? মধু ডাক্তারের ইণ্টারভেনাস ইনজেকসান। তারপর কি হল? তিনি গেলেন। আপনি রইলেন। কে কাকে কতদিন মনে রাখে। কত মাছই ত বঁড়শি গেলে তবু সব মাছই ত মুখিয়ে থাকে টোপের আশায়। মাছের ত শিক্ষা হয় না। আপনার বউদি কি ঠিক থাকতে পেরেছিলেন? দেহের মধ্যে যারা থাকে তারা কুরে কুরে খায়। সুখ আগে, না ত্যাগ আগে? যে যায় সে কি আর দেখতে আসে কে কি করছে? আসে না। মৃতের জগৎ আর জীবিতের জগৎ আলাদা। আমি জানি মা, লোকে বলে, ওই যে তোমার বাবা মাঝে মাঝেই বউদিকে নিয়ে তীর্থে যেতেন, ধর্মের টানেই যেতেন, তবে সে হল মানবধর্ম। মনে নেই, শেষ বয়েসে তোমার জ্যাঠাইমার কি রকম ছুঁচিবাই হয়েছিল। তোমার বাবার বুলডগের মত মুখ একজিমায় কালো হয়ে গিয়েছিল। মানুষ কিসের সঙ্গে কি যে সব জুড়ে দেয়। কিন্তু।

অনিল ভয়ে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। যখনই সে এসব ভাবে তখনই ধাক্কা খায় এই 'কিন্তু'তে এসে। পাপ করলে একজিমা কি কুষ্ঠ হয় কিনা, সেকথা শাস্ত্রে লেখা নেই। মনে পড়ে, জ্যাঠাইমার শেষ বয়েসে বাবা যখন প্রায় না খেতে দিয়ে মৃত্যুকে আরও কাছিয়ে আনলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝেই চিৎকার করে বলতেন, তোমার কুষ্ঠ হোক। আর তার বাবা কিছু দূরে বসে মৃদু মৃদু হেসে বলতেন, পাগলে কি না বলে? তোমরা

বুঝলে, পাগলে কিনা বলে। পাগলে যাই বলুক, দগদগে একজিমার ঘায়ে সারা শরীর ঢেকে গেল। পাপ হয় ত রক্তে ঢোকে না কিন্তু কিছু অসুখ রক্ত থেকেই রক্তে ছড়ায়। একজিমা সেই রকম একটি অসুখ। তার মানে আমারও ওই এক পরিণতি। বীজের আকারে প্রবাহে ঢেলে দিয়ে গেছে। আসছে, তারা আসছে। পায়ের চেটো বেয়ে ধীরে ধীরে মুখে উঠে আসবে। তোমার কিছু না পাই ওটা পাবই। কিছুই যে পাইনি তাও ত নয়। এত বড় একটা বাড়ি পেয়েছি, তোমার রক্তে যারা কাঁদত তারা আমার রক্তেও কাঁদছে, তোমার সন্দেহ সঙ্কীর্ণতা, কৃপণতা, লোভ, ভোগের ইচ্ছে সবই ত পেয়েছি। শেষ বয়েসে তোমাকে ছুঁতে যেমন ভয় পেতুম এখন তোমার ছবিটাকেও তেমনি ছুঁতে ভয় করে। তবে আমিও আসছি। তুমি ডান দিকে হেলে আছ আমি বাঁ দিকে হেলে থাকব।

অনিল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মাথার ওপর বিরাট এক মামলার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কেসটার একটু তদবির করা দরকার। চাকরি ত যাবেই উলটে জেলও হয়ে যেতে পারে। এ সব কথা মাধবী জানে না। এক সময় মাধবী শয্যাসঙ্গিনী ছিল। তখন একটুও প্রেমট্রেম হত। ভালোবাসার কথা হত। সুখ দুঃখের কথা হত। জীবন-পরামর্শ হত। এখন মাধবী অ্যাপেনডিক্সের মত। আছে থাক। মাঝে মধ্যে যখন সাইটিস হয়ে ওঠে তখন কেটে ফেলার চিন্তাই আসে। ফেটে বসলে পেরিটোনাইটিস হয়ে জীবন বিপন্ন করে দেবে। মাধবীকে এমন কিছু দেওয়া হয়নি যাতে বলা চলে ও হে আমি রত্নাকর, তুমি কি আমার পাপের ভাগ নেবে ? যেমন রঞ্জনকে বলা সম্ভব হয়নি, আমি তোর আদর্শ পিতা আমার ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমের কাছে নতি স্বীকার কর। যাকে বলা যায়, সে হেসে বলবে, ভোগের মাসুল দেবে না মধুকর ?

ভবেশবাবুর চেহারা বাঘা উকিলের মতই। কথা কম। ফি বেশি। যা বলার তা এজলাসেই ত বলব। মক্কেলের সঙ্গে বৃথা বাক্য ব্যয়ে পরমায়ু ক্ষয় করে লাভ কি ? এখনও অনেক বছর কোর্টে দাঁড়িয়ে চোরকে সাধু, সাধুকে চোর করতে হবে। অনিলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'স্টক থেকে অতগুলো টাকার মাল সরালেন, কাজটা একটু আটঘাট বেঁধে করলেন না। চুরিতে এত ফাঁক থাকলে উকিলকে পয়সা ঢাললে কি হবে ? আমার কি এত ক্ষমতা যে রাতকে দিন করে দোব। আগেই বলে রাখি আপনার কেসের অবস্থা তেমন বুঝছি না।'

অনিল আমতা আমতা করে বললে, 'আজকাল মানুষ খুন করে বেঁচে যাচ্ছে, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই সামান্য ব্যাপারে ফেঁসে যাব ?'

'ওই ত হয় মশাই। ডাকাতি করে কিছু হল না, ছিঁচকে চুরি করে জেলে চলে গেল। আপনার এখন একমাত্র বাঁচার রাস্তা, দপ্তরের ওই নতুন নিরীহ ছেলেটিকে জড়িয়ে দেওয়া। কি যেন নাম বলেছিলেন ?'

'নীহার বোস।'

'হ্যাঁ, ওই নীহারকে বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচতে হবে। সে রাস্তা কি খোলা রেখে এসেছেন ?'

'আপনি কি আমাকে অত বোকা ভাবেন ? চাকরিতে চুল পাকিয়ে ফেললুম আর

বলির পাঁঠা তৈরি রেখে আসব না।'

'কেসটা আমি ওই ভাবেই তা হলে সাজাই। তারপর দেখা যাক, জজে মানে কি না। ও-পক্ষের উকিলও ত কিছু কম যায় না।'

'তা ঠিক। তবে ওটা ত চুরিরই জায়গা। ও-চেয়ারে যেই বসে সেই চুরি করে। ওপরঅলা মিত্তিরের সঙ্গে ভাগের গোলমাল না হলে আমার ফেঁসে যাবার কোনও কারণ ছিল না।'

'ওই ত হয়, সেই চোরই ধরা পড়ে দারোগার সঙ্গে যার অবনিবনা।'

অনিল ভবেশবাবুর হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নেমে মনে হল, কাজটা কি ঠিক হবে নীহার ছেলেটাকে জড়িয়ে ফেলা। সবে বিয়ে করে চাকরিতে ঢুকেছে। অনিলদা, অনিলদা করে। করুক। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি মারবে কি ? এই দেখ বিশ্বরূপ, আমিই ত মেরে রেখে দিয়েছি। তুমি ত উপলক্ষ মাত্র। জীবই ত জীবের আহার। নীহারকে ফাঁসাতে পারলে তার নিজের পোজিসান ভাল হয়ে যাবে। চোরের জায়গায় সাধু, সাধুর জায়গায় চোর। বড়কত্তারা বলবে, বাবা, অনিল হল দুঁদে লোক। ঘাঁতঘোঁত সব জানে। ওর সঙ্গে চালাকি। সঙ্গে সঙ্গে অনিলের আরও প্রমোশন। নীহারের সাসপেনসান। জেল। আর তখন ?

ভবেশবাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে অনিল কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় ব্যস্ত জগতের প্রবাহ বইছে হু হু করে। যত দিন যায় জীবন ততই দ্রুত হতে থাকে। আবার নীহারের চিন্তা মাথায় এল। সাসপেনসান। হাজার হাজার টাকার ডিফালকেসান কেস। বছর পাঁচেকের জেল ত হবেই। আর তখন ? অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংসানে নীহারের সদ্য বিয়ে করা বউকে দেখেছি। বেশ ভাল। অভিনয়-টভিনয় করে। ভাল করে। ভাল নাচে। হাতকাটা ব্লাউজ পরে। ভুরু কামিয়ে আবার আঁকে। ও জিনিস নীহারের একার জন্যে নয়। সকলের জন্যে। নিশ্চয়ই অ্যামবিশান আছে। প্রেম করে নীহারের মত ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে। ও প্রেম চটকে যাবেই। কেরিয়ারের লোভ দেখালেই বেরিয়ে আসবে। বিলাস বাঁড়ুজ্যের হাতে একবার কোনও রকমে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারলে ও ঠিক লাইনে নিয়ে আসবেই। ধর্মতলার সেই জমাটি দোকানে বার কতক আসা যাওয়া। দু-চারটে ডিরেকটার আর ক্যামেরাম্যানের হাতে লোফালুফি হতে হতে নৈবেদ্যর থালায় চলে আসবে। সারা জীবনে ওরকম মেয়ে কত দেখা হয়ে গেল। নাঃ বয়স যত বাড়ছে খিদে ততই বাড়ছে। নতুন কি আছে কে জানে। সবই ত সেই এক। তবু রক্তে যেন কিসের জীবাণু ছটফট করিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছে না। আরো লোভ আরো ভোগ। যত রাত বাড়তে থাকে, ততই মনটা নাচতে থাকে।

অনিল হাত তুলে একটা ট্যাকসি থামাল। ড্রাইভার মনে হয় লোক চেনে। থেমে পড়ল। নীহারের বউয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মুখে একটা লম্পট লম্পট ভাব এসেছে। এরা লম্পটদের বেশ খাতির করে। তা না হলে মাতালরা বাড়ি ফেরে কি করে। অনিল বহুদিন লাল আলোর এলাকা থেকে সহজেই ট্যাকসি ধরে মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছে। কখনো কোনো অসুবিধে হয়নি।

বউবাজার স্ট্রীটে একটা গয়নার দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে অনিল একটা লকেট কিনে ফেলল। এতকাল লোকে তাকে তদবির করেছে। ঘুষ-ঘাস দিয়েছে। হোটেলে ঘর বুক করে ফুর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জীবনে ঝাড়বাতি জ্বেলে দিয়েছে। আজ তাকে তদবির করতে হবে। চাকা ত এইভাবেই ঘুরে যায়। আবার যেদিন মওকা মিলবে সেদিন দেখে নেওয়া যাবে। লকেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অনিলের মনে হল, সেই বর্ষার রাতে, নাটু ঘোষের সঙ্গে রোশন বাঈয়ের ঘরে বসে বসে মাইফেল শুনছে ঃ দেখকুর রঙ্গ-এ-চমন হো ন পরেশাঁ মালী। কৌকবে গুঁচ ঃ সে শাখেঁ হেঁ চমকতে বালী।

নরেন হালদার-এর বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। অনিল বড় রাস্তাতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। দু'পাশে নোনাধরা দেওয়াল উঠে গেছে। মাঝখানে পড়ে আছে সরু গলি। দু' হাত অন্তর অন্তর আঁস্তাকুড়। ভ্যাপসা গন্ধ। রাস্তায় আলো নেই। মাঝে মাঝে খোলা জানালা গলে একটু আধটু আলোর রেখা এসে পড়েছে। ড্যাম্প ঘরে সংসারের খেলা কিছু কম জমেনি। খোলা জানালা দেখলেই অনিলের চোখ চলে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস। খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে, ডুবে শাড়ি পরে সদ্য বিবাহিতা বই পড়ছে। পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে ওপর দিকে উঠে রেলের সিগন্যালের মত হয়ে আছে। কোনও জানালায় চুল বাঁধার দৃশ্য। রাত ঘন হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই হাঁসফাঁস শহর ঘুমোতে যাবে। নরেন হালদার আচ্ছা জায়গায় থাকে।

নরেন হালদারের বাড়িতে বাচ্চাদের কান্নার মাইফেল বসেছে। অন্ধকার ঘুপচি নিচের তলায় খান 'তনেক ঘরে নরেন চোখ-কান বজিয়ে তার বংশ বিস্তার করে চলেছে। মাঝখানে শ্যাওলা ধরা উঠোন। চারপাশে তলার ওপর তলা খাড়া মাথা তুলেছে। ভেতরে দোতলা তিনতলার বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ি নিথর ঝুলছে। বাতাস ঢুকতে ভয় পায় এ বাড়িতে। নিচের জানালায়-জানালায় এক সময় তারের জাল পড়েছিল। ধুলোয়, ধোঁয়ায়, ঝুলে এমন চেহারা হয়েছে। সংসারটাকেই অস্পষ্ট করে তুলেছে।

অনিল ঢুকেই দেখল নরেনের বউ একটা বাচ্চাকে বেধড়ক ঠাঙাচ্ছে। আর একটা মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে টানছে। অনিলের হাসি পেল, এর জন্য সোনার লকেট। এক নজরে মেয়েদের শরীর দেখে নেবার অভ্যাস অনিলের আজকের নয়, অনেক দিনের। গুরু ধরে শিক্ষা। মহিলার ছিল সব। নরেনের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিকমত ব্যবহার হয় নি, তদবির হয় নি, সার্ভিসিং হয় নি। করপোরেশানের লরির মত ইঞ্জিন শব্দ ছাড়ছে। এগজস্টে ডিজেলের ময়লা জমেছে। মুখটা ধারালো। অনিলের হাতে থাকলে বীয়ার খাইয়ে মাসখানেকই মাংস ধরিয়ে দিত। রঙ খুবই ফর্সা। একটু রক্ত ঢোকাতে পারলে গোলাপী আভা ছাড়ত। এক সময় যথেষ্ট চুল ছিল। শ্যাম্পু করে এলো খোঁপা বেঁধে দিলে মন্দ হবে না। দু একটা ভাল শাড়ি আর ব্লাউজ। তারপর পাশে এসে বোসো। বুকের ওপর লকেটটা কেমন মানায় দেখি।

অনিল পেছন দিক থেকে মহিলাকে দেখছিল। শাড়িতে আটার গুঁড়ো লেগে আছে। জল-হাত মুছেছিল। এখনও খামচা হয়ে আছে। মায়া লাগছিল। সম্ভাবনাময় মেয়েরা অন্যের হাতে থাকলে বড় কষ্ট হয়। মানে, কি হতে পারত, কি হয়ে আছে। পরে অবশ্য

মায়াটায়া আর তেমন থাকে না। তা হলেও পার্কের গাছের মত প্রথমটায় যত্ন করে ছেড়ে দাও. তারপর সে ত' আপনিই ফুলে ফলে শোভা হয়ে থাকবে। পাড়ো, খাও। ছায়ায় গিয়ে বস। ভাল জিনিসের কদর বুঝতে হয়। মাধবী যখন এসেছিল, কি ছিল ? এখন কি রকম হয়েছে ? তবে একটু বেশি হয়ে গেছে। সবই বেশি বেশি। এখন আর মানুষের নোলায় জল পড়বে না। বাঘ জিভ ঢোকাবে।

অনিল গলা উঁচু করে বললে, 'নরেন কোথায় ?'

মহিলা চমকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে মাথায় আঁচল টেনে বলল, 'ডেকে দিচ্ছি।'

ডেকে দিতে হবে। ডাকলে শুনতে পাবে না। বাচ্চাটা যা চেল্লাচ্ছে। সত্যি কথাই। শব্দ ব্রহ্ম। নরে ন কোণের দিকের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু' হাতে আটা। রুবির আটা মাখছিল। বউকে সাহায্য করছিল।

'আরে দাদা আপনি ? কি মনে করে ?'

অনিল মধুর হেসে বললে, 'তোমাকে মনে করে। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।'

'না, না, ব্যস্ত না। এই রুবিকে একটু সাহায্য করছিলুম। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দাঁড়ান হাতটা পরিষ্কার করে আসি।'

নরেন অদ্ভুত কায়দায় শ্যাওলা ধরা উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার কলঘরের দিকে চলে গেল। আর তখনই অনিল বুঝতে পারল রুবির আবার ছেলেপুলে হবে। ভাল, এই ত' বয়েস। ধর্ম, সংযম বৈরাগ্য সবই অর্থহীন। চারপেয়ে জীবের মত সুখী হতে পারলে জীবনের চেহারাই পালটে যায়। যোগ আর ভোগ নিয়ে আজকের লাঠালাঠি। অনন্তকাল ধরে দুটো মনের তুমুল লড়াই চলেছে।

নরেন অনিলকে শোবার ঘরেই নিয়ে বসাল। তাছাড়া আর বসাবে কোথায়। ঘর জোড়া খাট। বেডকভারটা বেশ চটকদার. একপাশে আলনা। মেয়েলি জিনিসপত্র ঝুলছে। দেহের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘরে দেবদেবীর ছবি ঝুললেও খুব একটা পবিত্র স্থান বলে মনে হচ্ছে না। দেওয়ালের দিকে খাটের বাজুতে রুবির অন্তর্বাস শুকোচ্ছে পাখার হাওয়ায়। রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ কষার গন্ধ আসছে। রাস্তার দিকের নর্দমা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সময় নষ্ট করা অনিলের স্বভাব নয়। স্বার্থের কথা তাড়াতাড়ি বলে ফেলাই ভাল।

'নরেন, তুমি ত' জান, আমি সাসপেন্ড হয়ে আছি। যাই করুক কোর্টে আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর তাহলে আমি আরও কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। এই নাও। এটা তোমার স্ত্রীকে দিও।'

অনিল ভেলভেটের বাক্সটা নরেনের হাতে দিল। নরেন খুলে দেখল। নীল ভেলভেটের ওপর সোনার লকেট সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। নরেন মনে মনে চমকে উঠল। জীবনের প্রথম ঘুষ। টাকার অঙ্কে নেহাত কম হবে না। সৎ পথে নিজের উপার্জনের পয়সায় রুবিকে এমন একটা উপহার কিনে দেবার ক্ষমতা তার নেই। আলো নেবানো ঘরে অন্ধকার বিছানায় দু' চারটে প্রেমের কথা ছাড়া আর কিছু দেবার মুরোদ তার নেই। দুটি সন্তান দিয়েছে আর একটি আনছে।

অনিল বললে, 'খুব সুন্দর মানাবে। তোমার বিয়ের সময় আমার সঙ্গে ত' তোমার পরিচয় ছিল না। তোমরা দু'জনে সুখী হও। হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম। সমস্ত খাতাপত্তর এখন তোমার হাতে। স্টক, ইসু রেজিস্টার, কোটেসান, চালান, পারচেজ ভাউচার। তুমি সামান্য এদিক ওদিক করে দিলেই স্টোরকিপার নীহার জড়িয়ে পড়বে। নীহারের বয়স কম, চাকরি গেলে আবার পাবে। জেলে গেলে তেমন কষ্ট হবে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি নরেন। চুলে কলপ দিয়ে আর কতকাল বয়েস চেপে রাখব। চুরি সবাই করে। আমি ত' কারুব বাড়িতে সিঁধ কাটতে যাইনি। যার অঢেল আছে, সেই সরকারের ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু সরিয়েছি, এতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। ওই ব্যাটা ডিসপেপটিক ডিরেকটার প্রোমোশানেব ফিকিরে আমার পেছনে লেগেছে। ব্যাটা দশবথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র? নাও, তোমার স্ত্রীকে একেবার ডাকো, রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমাদেব বিশ্রামের সময়।'

নরেন গম্ভীর মুখে লকেট কেসটা অনিলের টেবিলের পাশে রেখে দিল।

'অনিলদা, আমার স্ত্রী তেমন মডার্ণ নয়। বাইরের লোকের সামনে বেরোতে ভয় পায়। তাছাড়া, যে কারণে এটা আপনি দিতে চাইছেন, তার কিছুই করা যাবে না। সমস্ত খাতাপত্তর সিল করে গভর্নমেন্ট প্লিডারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, উপায় থা... ও আমি আপনার মত একজন নোংরা লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করতুম না। আমার তেমন অ্যামবিশান নেই অনিলদা। নেহাতই ছা-পোষা মানুষ।'

অনিল গালাগাল তেমন গায়ে মাখল না। ওসব অনেক শুনে শুনে চামড়া পুরু হয়ে গেছে। শুধু জিজ্ঞেস করলে 'সব রেকর্ডই এখন তা হলে হাত ছাড়া?'

'হ্যাঁ, হাত ছাড়া, আমাদের আর কিছুই করার নেই। যা হবার তা কোর্টেই হবে। ওখানেই আপনাকে লড়তে হবে।'

'আচ্ছা আমি তা হলে চলি। তুমি এই রকমই সৎ থাকো। সারা জীবন। চরিত্রই সব চেয়ে বড় জিনিস। সোনার চেয়েও দামী।'

বাকসটা তুলে নিয়ে অনিল আবার গলিতে নামল। সেই অন্ধকার, আবর্জনাময় পথ। এবার অবশ্য আরও অন্ধকারের দিকে প্রসারিত নয়। চলে গেছে আলোকিত বড় রাস্তার দিকে। নাঃ, জীবনের চালে এবার হারের সময় এসেছে। সব খেলাতেই কি আর জেতা যায়। এতক্ষণে রঞ্জনের কথা বড় মনে হচ্ছে। শরীর ভেঙে আসছে। প্রস্টেটে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। হয় ত' ক্যানসার। মামা ত' প্রস্টেট ক্যানসারেই গত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের কিছু পরেই। চাকরিটা ত যাবেই বোঝা যাচ্ছে। জেলের হাত থেকে বাঁচতে হলে সর্বস্বান্ত হতে হবে। একমাত্র ভরসা রঞ্জন। ছেলে যদি শেষের সময় বাপকে না দেখে, কে দেখবে? কোথায় গেল ছেলেটা।

শালা নরেন কোনদিন যদি সুযোগ আসে, তোমার বারোটা আমি বাজাবই। যে হারে বংশ বিস্তার করছ, ছানাপোনা নিয়ে একদিন তোমাকে ন্যাজে গোবরে হতেই হবে। তখন মারব তোমাকে কোপ। হাঁড়ি শিকেয় তুলে ছেড়ে দেব। লুচি দিয়ে ডিমের কারি খেয়ে, বউ জড়িয়ে শুয়ে পড়া বেরিয়ে যাবে। তখন আর নারী-শরীর জরিপ করতে হবে না।

জরিপ করবে অভাব। সে সুযোগ কি আসবে অনিল ? কত লোককেই ত' দেখে নেবার ইচ্ছে ছিল ? পারছি কই। প্রতিহিংসার শেষ নেই, শক্তি বড় কম। নাঃ রঞ্জনটার কি হল ? একটিমাত্র ছেলে ?

রঞ্জনের একটা ঘাঁটি ছিল। স্যাঙাত ছিল অনেক। তারা বলেছিল, আপনি খোঁজ করুন, আমরাও দেখছি। আজকাল খুব মার্ডার হচ্ছে। কেউ ঝেড়ে দিলে কি না, কে জানে ? ঝেড়ে দিলে ত' হয়েই গেল। আর সে বয়েসও নেই, শক্তিও নেই, যে নতুন করে সন্তান লাভ করে আবার নব ধারাপাত থেকে শুরু করবে। এখন যা পারা যায়, একটা ট্যাকসি ধরে মায়ার কাছে যাওয়া। রাত বেশ হালকা ফুরফুরে, মনে বেশ অন্ধকার, মায়া বেশ পুরনো মদের মত সোনালি বুজবুজে। পাপের শরীর আর সাপের শরীর একই রকম। দেখলে গা শিউরে ওঠে, ছোবলে বেশ নেশার মৌতাত আসে। গ্যাঁড়া মিত্তির বেশ ভালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। গ্যাঁড়া নিজে সেবিব্র্যাল থ্রম্বোসিসে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। তা থাক। আমি ত' এখনও খাড়া আছি। মায়া অনেক ঝেড়েছে। না হয় আর একটা লকেট ঝাড়বে। ক্ষতি কি ? কত জাহাজই ত' সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

থাক, মায়া এখন মায়াতেই থাক। রঞ্জনের সন্ধ্যের ঘাঁটিতে একবার যাওয়া যাক। নেতার নাম বুল। কিসের নেতা কে জানে ? ওয়াগন ভাঙাব, কি চোরা চালানের, কি চোলাই মদের, বুলই জানে। তবে পাড়ায় বেশ দাপট আছে। 'এই শোন' বলে ডাকলে সকলেই থমকে দাঁড়ায়। মাঝে মধ্যে জিপে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। সাবেক কালের বাড়ির নিচের ড্রইংরুমে রোজই চক্র বসে। লোকজনের আসা-যাওয়া। দেয়ালে কাত হয়ে থাকা সাইকেল। দু' চারটে মোটর বাইক, স্কুটার। গভীর রাত পর্যন্ত কিসের যে ষড়যন্ত্র চলে। মাঝে মাঝে ফোন বেজে ওঠে। রঞ্জন এই আড্ডায় কি করে এসে পড়েছিল কেনই বা এসেছিল ?

বুলের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সারা দিনই চড়িয়ে থাকে। ছেলেটাকে দেখতে ভারি সুন্দর। অপঘাতেই মরবে। কোনো সন্দেহ নেই। এসব ছেলে বেশিদিন বাঁচে না। অনিলকে দেখে বুল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে সিগারেট। অনামিকায় হীরের আঙটি চকচক করছে। ফর্সা কপালে এলোমেলো ঘন কালো চুল। অনিল জিজ্ঞেস করলে, 'কোনো সন্ধান পেলে ?'

'হ্যাঁ, একটা উড়ো খবর পেয়েছি। রেন্টুর বউয়ের সঙ্গে দীঘা যাবার কথা ছিল। হয়ত তাই গেছে।'

'রেন্টুটা কে ? নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না ত'।'

'রেন্টু ছিল রেসের বুকি। দীঘায় একটা হোটেল করেছিল। বছর চারেক আগে দীঘাতেই জলে ডুবে মারা যায়। লোকে বলে মার্ডার। ওর বউই না কি খুনটা করায়, মহিলার অনেক টপ ছিল। এখনও আছে। ওপরতলার জিনিস। কেস-ফেস দাঁড়ায়নি। সেই মালের খপ্পরে আপনার ছেলে পড়েছে। আমরা বারণ করেছিলুম। শোনেনি। চুষে শেষ করে ছিবড়ে ফেলে দেবে। একবার খবর নিয়ে দেখতে পারেন।'

'কোথায় নিতে হবে ?'

'ডিকসন লেনে চলে যান। মঞ্জুলা চ্যাটার্জিকে সবাই চেনে। একটা নীল রঙের ওপেল

গাড়ি আছে। নিজেই চালায়। বিলিতি স্টাইলের বাড়ি। বাগান আছে। কুকুর আছে।'

ঘরে ফোন বেজে উঠল। বুল চলে গেল। সামনের বাড়িতে রেকর্ডে ঠুংরি বেজে উঠল। শরৎকাল। আকাশে মানচিত্রের মত সাদা মেঘ উঠেছে। কোন্ বাড়িতে রেডিও খুলেছে। কাঁপা কাঁপা গলা শোনা যাচ্ছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় বত্রিশ জনের জীবনাবসান। ধবধবে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে রোগা চিমসে মত একটা লোক কুকুর নিয়ে ফুটপাথে বেড়াতে বেরিয়েছেন। চোখে রিমলেস চশমা। কুকুরটার পেটে ক্রশ বেল্ট, প্রভুর হাতে লিড। ভদ্রলোকের মুখে সিগারেট। সামনে টাক পড়ে এসেছে। রাতের আহার শেষ করে সারমেয় নিয়ে হজমে বেরিয়েছেন। কুকুরটা একটা ল্যাম্প পোস্টে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে, ফোঁস ফোঁস করে শুঁকে, খুড়খুড় করে উত্তর দিকে চলল। অনিলও চলল পেছন পেছন। রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরতে হবে। খবর হচ্ছে রেডিওয়। মাঝে রেকর্ডের রাগপ্রধান মিশে যাচ্ছে, কোয়েলিয়া গান থামা এবার। রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তোর ওই কুহু তান, ভাল লাগে না আর।

অনিল রিকশা চেপে, শরতের হাওয়া খেতে খেতে, মেঘ-ভাসা আকাশের তলা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। অন্যদিন এলিয়ে পড়ে। আজ খাড়া আছে। শহর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রিকশার পা তেমন চলছে না। পাশ দিয়ে শেষ বাস চলেছে ধুঁকতে ধুঁকতে। সাদা একটা মোটর গাড়ি পেছনে লাল চোখ মেলে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলেছে। দু' পাশের ফুটপাথে খাটিয়া পড়েছে। সারি সারি চাদর ঢাকা মানুষ লাশের মত পড়ে আছে। একটা মরদের কোমরের ওপর একজন জোয়ান ছুকরি দাঁড়িয়ে উঠে খুব দাবাচ্ছে। পায়ের মল বাজছে ছিনিক ছিনিক শব্দে।

বাড়ির সামনে রিকশার ঠুনুর ঠুনুর শব্দ শুনে মাধবী তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছিল। অন্য দিন অনিলকে দরজার সামনে থেকেই ধরে নিয়ে চৌকাঠ পার করাতে হয়। আজ আর তার প্রয়োজন তার প্রয়োজন হল না। কত বছর পরে অনিল সোজা হয়ে, শক্ত পায়ে বাড়ি ফিরল। অনিল বুঝতে পারল, মাধবী অবাক হয়েছে। দরজা বন্ধ করতে করতে মাধবী জিজ্ঞেস করল, 'কোনও খবর পেলে ?'

'না' তেমন কিছু নয়, তবে দীঘায় যাবার সম্ভাবনা আছে। কাল আবার দেখব। আমার কিছু খাবার আছে ?' অন্যদিন অনিল খাবার মত অবস্থায় থাকে না। আজ খুব খিদে। মাধবী বললে, 'হাত মুখ ধোও, দিচ্ছি।' ঢাকা বারান্দায় মৃদু আলো জ্বলছে। উপরি টাকায় অনিল বাড়িতে অনেক রকম কায়দা করেছে। আলোর আবরণ দুধের মত সাদা। চার পাশ মায়াবী। দেয়ালে বিদেশী পেন্টিং, গিল্টির কাজ করা ফ্রেমে। বাঁ পাশে জাফরির কাজ।

মাধবী আগে আগে চলেছে। পেছনে অনিল। পায়ের কাছে শান্তিপুরী ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে। গ্রিসিয়ান নিউকাটের হালকা মচ মচ শব্দ দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। কোথা থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে। বেশ লাগছে মাধবীর পেছন পেছন যেতে। এতদিন ত' অনেকের পেছনেই ঘুরেছে ! নিজের স্ত্রীকে ত' তেমন খারাপ লাগছে না। মায়ার সঙ্গে এর তফাৎ কোথায় ! কেমন পবিত্র শরীর। ঘটের মত নিতম্ব। পুরুষ্টু বাহু। চওড়া পিঠ।

অনিল বললে, 'দাঁড়াও।'

মাধবী অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আদেশ, অনুরোধ, স্নেহ, অত্যাচার কোনটা। শেষেরটাই ত' এতকাল জুটে এসেছে। মাধবী দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিল আরও দুপা এগিয়ে এসেছে। দু' হাতে ধরে আছে সেই লকেটটা। এর চেয়ে অবাক কান্ড আর কি হতে পারে? গলায় পরিয়ে দিতে দিতে অনিল বললে, 'তোমার আমি, আর আমার তুমি ছাড়া সংসারে কে আছে?'

মাধবী গলায় হাত দিয়ে জিনিসটার স্পর্শ নিতে নিতে বললে, 'হঠাৎ এই দুঃখের দিনে?'

জীবনটাই ত' হঠাৎ গো। এই আছে এই নেই। হঠাৎই ত' সব পালটে যায়।'

'ছেলেটা কোথায় চলে গেল?'

'আসার হলে আসবে, যাবার হলে যাবে। আমিও ত' রোজ এসেছি। আজকের মত কোনদিন এসেছি কি?'

অনেক দিন পরে অনিল মাধবীর পায়ে পা জড়িয়ে বুকের ওপর আদরের হাত ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কারুরই কিন্তু ঘুম এল না। আকাশে আজ অনেক তারা। বাতাস বড় এলোমেলো। প্রকৃতিতে যেন কিসের মাতন লেগেছে আজ। এমনও ত' হতে পারে, বুল যা বললে, রঞ্জনকে হয় ত' খুন করে কচুরিপানা ভরা কোনো এঁদো পুকুরে ফেলে দিয়েছে। আলকাতরার মত কালো জলে রঞ্জন তলিয়ে আছে। কেউ জানে না। শকুনরাই শুধু অপেক্ষায় বসে আছে।

পরের দিন দুপুরে অনিল বেরোল ডিকসন লেনের মঞ্জুলার সন্ধানে। মঞ্জুলা প্রকৃতই খুব পরিচিতা মহিলা। সকলেই তাকে চেনেন। নাম শুনে এক ধরনের মুচকি হাসি খেলে যায় মুখে। বুল যেমন বলেছিল বাড়িটা ঠিক সেই রকমই। তবে বড় বেশি নির্জন। চার পাশে বাগান। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মত বিশাল একটা গেট। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। ঢুকেই ডান পাশে কোনো কালে বোধ হয় একটা কারখানা ছিল, টিনের ঘরে। মরচে ধরা কিছু খালি ড্রাম পড়ে আছে। যেন নেশাখোরদের আড্ডা। কোনোটা খাড়া, কোনোটা গড়াগড়ি।

কোনও একটা ঝোপে বসে দুটো হাঁড়িচাচা পাখি থেমে থেমে ডাকছে। দুপুরের ইস্পাত চাদরে যেন হাতুড়ি পিটছে। গাড়ি বারান্দার একপাশে ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করা। রেন্টু চট্টোপাধ্যায় কত বড় লোক ছিলেন রে বাবা। কে জানে ঐশ্বর্যের গোপন কথা। কেউ কি প্রকাশ করতে চায়। বর্মাকাঠের ঝকঝকে বিশাল দরজা। সোনার মত পেতলের কারুকাজ করা, বিচিত্র কড়া। দুধ-সাদা কলিংবেলের বোতাম। বোতাম টিপতেই ভেতরে একটা কুকুর মিহি গলায় ঘেঁউ ঘেঁউ করে উঠল। দরজা খুলল আয়া শ্রেণীর এক মহিলা।

অনিল ইতস্তত করে বললে, 'মঞ্জুলাদেবী আছেন।'

'হ্যাঁ আছেন ভেতরে এসে বসুন।'

অনিল ভেতরে ঢুকতেই গাঢ় বাদামী রঙের একটা কুকুর এসে ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে ফিরে শুঁকতে লাগল। সোফায় বসেও নিস্তার নেই। লাফিয়ে পাশে উঠে বার কতক নাক মুখ চেটে দিল। লোমে পাউডারের গন্ধ। বসার ঘরটা বিশাল।

কাঠের ওপর ফুল তোলা সব সোফা সেট। নিখুঁত করে সাজানো। দেয়াল ঘেঁসে

এখানে ওখানে পেতলের কাজ করা, নানা মাপের সাইড টেবিল। বড় বড় জানালায় ফিনফিনে নীল পর্দা। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা অর্গান। এক পাশের দেয়ালে একটা মুখোস ঝুলছে। তিনটে ঝাড় লণ্ঠন। কার্পেট। বেলজিয়াম কাঁচের বিশাল আয়না। সব মিলিয়ে রাজকীয়।

মঞ্জুলা ঘরে ঢুকতে অনিল ভীষণ অবাক হয়ে গেল। প্রায় মাধবীর বয়সী। তাছাড়া এ মুখ কোথাও যেন দেখেছে দেখেছে। নিশ্চয়ই কোনও পাপের আস্তানায়। পাপের পথই ঐশ্বর্যের পথ। মঞ্জুলা খসখসে গলায় বলল, 'কে আপনি ?'

অনিল চমকে উঠল। মনোযোগ দিয়ে মঞ্জুলাকেই দেখছিল। দেখার মতই জিনিস। শাড়ি এত ফিনফিনে হয়। পারসীদের অবশ্য এমন শাড়ি পরতে দেখেছে। সারা গায়ে মিষ্টি সুবাস। নির্জন দুপুর যেন সম্ভাবনায় ভরে উঠেছে। এক সময় মহিলা খুবই ফর্সা ছিলেন। এখন যেন গায়ে ধোঁয়া লেগেছে। বেশ প্যাক করা শরীর। অনিলের হঠাৎ সেই বাউল গানটা মনে পড়ে গেল : চারিদিকে পাপরে ভাই/নেই কোথাও কোনো আলো/এর চেয়ে অন্ধ হওয়া ছিল রে ভাই ভাল। অনিল বললে, 'আমি রঞ্জনের বাবা।'

'ও তাই না কি।'

মঞ্জুলা পায়ের ওপরে পা তুলে বসল। অনিলের গত রাতের আত্মোপলব্ধি ধীরে ধীরে স[illegible] যাচ্ছে। রক্তে আবার সেই চিৎকার। মশলার গন্ধ। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে মাংস কষার মোগলাই মেজাজ। মঞ্জুলার পায়ের অনেকটাই অনাবৃত হয়ে পড়েছে। লোমনাশক মেখে মেখে গোলাপী বর্ণ। সেই পা আবার মৃদু মৃদু দুলছে। চেতনাকে যেন টুকুস টুকুস ঠোকরাচ্ছে।

অনিল বললে, 'আমার ছেলের খবর আপনি কিছু জানেন ?'

মৃদু হেসে মঞ্জুলা বললে, 'হ্যাঁ ছেলেটি ভাল, বেশ কথা শোনে, তবে একটু খোয়ালি।'

'সে খবর নয়, আজ চারপাঁচ দিন সে নিরুদ্দেশ, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি তাকে দীঘায় পাঠিয়েছেন ?'

'নাঃ, তার ত' কাল আমার সঙ্গে যাবার কথা।'

'আপনার কাছে এর মধ্যে আসে নি ?'

'সাত আট দিন আগে রাতের দিকে এসেছিল। আমি একটু ইনটক্সিকেটেড ছিলুম। সেই সময় কি একটা ব্যাপারে, আমি টেম্পার চেক করতে পারি নি, ঠাস করে একটা চড় মেরেছিলুম। ইমিডিয়েটলি হি লেফ্‌ট। তবে সেটা কোনো কারণ নয়। আগেও আমাদের ও রকম হয়েছে। হি টেকস ইট ভেরি স্পোর্টিংলি।'

'এখানে কি জন্যে আসে ?'

'আমাকে ভালবাসে বলে। আই অলসো লাইক হিম। হোয়েন আই ফিল লোনলি, আই নিড কম্প্যানি। এতে ত' দোষের কছু নেই। উলফের মত মানুষও প্যাক অ্যানিম্যাল। সঙ্গ চায়।'

'তা বলে, ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে ত ?'

'ভবিষ্যৎ আবার কি ? পুওর ডাইজ পুওরার, রিচ ডাইজ রিচার, সিন ডাইজ উইথ দি সিনার। সো হোয়াট।'

'আমি ওর বাবা।'

'সো হোয়াট! সে ত' কেউ না কেউ কারুর বাবা হবেই। ল' অফ নেচার।'

'আমার একটা দুশ্চিন্তা আছে।'

'ডাই উইথ দ্যাট।'

'আপনার হচ্ছে না?'

'না, আমি আমার সব সেন্টিমেন্ট মেরে ফেলেছি। পৃথিবীটা আমার কাছে একটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওয়ার্লড। টুলস অ্যাণ্ড ইমপ্লিমেন্টসে ভরা। আই হ্যাভ লস্ট আ স্ক্রুড্রাইভার, আই উইল গেট অ্যানাদার স্ক্রুড্রাইভার।'

'ও'। অনিল কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাক হয়ে গেছে। এ আবার সম্পূর্ণ অন্য ধাতু। অন্য শব্দ।

মঞ্জুলা বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ কাটা গলায় বললে, 'ইউ লুক সিলি। ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম অ্যাণ্ড ইয়র টাইম।'

ঘাড়ধাক্কা খেয়ে অনিল খাঁ খাঁ ডিকসন লেনে এসে দাঁড়াল। ভাদুয়া রোদে পৃথিবী জ্বলছে। মেয়ে মাকড়সার গল্প শুনেছে। একটা বিশেষ সময়ের পরে পুরুষ মাকড়সাকে চুষে খেয়ে ফেলে। ভীমরুল দেখেছে। হলুদ বোলতাকে পায়ে চেপে ধরে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে। কড়কড় শব্দে। ঘিলু চুষে নিয়ে উড়ে যাবার পর, বোলতাটা পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ ছটফট করতে করতে মরে যায়। অনিল বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে একবার তাকাল। মনে হল চাবুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এবার তাহলে কি হবে? দীর্ঘ অপেক্ষা। তুই ফিরে আয়। শেষ আর একবার দেখতে হবে মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে। তারা কিছু তো একটা করবেই। অনিল একটা ট্রামে উঠে পড়ল। নিজেকে কেমন যেন অসংলগ্ন আর বিক্ষিপ্ত লাগছে। দড়ির বাঁধন খুলে মাঝ রাস্তায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে যেমন লাগে।

অনিল সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বললেন, 'এসেছেন ভাল করেছেন, এই ছবিগুলো দেখুন তো।'

অনিলের হাতে একগাদা ফটোগ্রাফ। ধুলোপড়া চায়ের দাগ লাগা টেবিল। টিনের চেয়ার। অল্প আলো। অনিল একের পর এক অসনাক্ত মৃত মুখের ছবি দেখে চলেছে। যেমন তোলার কায়দা তেমন প্রিন্ট। দায়সারা কাজ। তবু দেখলে চমকে উঠতে হয়। যন্ত্রণার মৃত্যু নিয়ে যাবার আগে পদাঘাত করে গেছে। ঠেলে আসা ভাষাহীন নিমীলিত চোখ। ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট। গভীর সব ক্ষতচিহ্ন। এদেরই হয়ত কত বোলচাল ছিল। কত অহঙ্কার ছিল, পাপ ছিল। আর কোনো দিন জেগে উঠবে না। অলিখিত ইতিহাস সরকারী ফাইলে চাপা পড়ে রইল। এসব ছবি দেখা যায় না। মনে ভূমিকম্প হয়। বিশ্বাস, অবিশ্বাস সব ভেঙে ভেঙে পড়ে যায়। একটা মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মুখের ভীষণ মিল; কিন্তু বয়েসটা বেশি। গলার কাছে গভীর ক্ষত। অনিল খুব ভাল করে দেখল। না রঞ্জন নয়।

ছবির প্যাকেট ফিরিয়ে দিয়ে সে আবার পথে এসে দাঁড়াল। চড়া আলোয় নিজের হাত পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বারে বারে। মানুষের ভেতরটা যত শক্ত, বাইরেটা তত

নয়। বড় নরম, বড় অপলকা। একটু ঘষা লাগলে ছড়ে যায়। এক কোপে কণ্ঠনালী দু ফাঁক হয়ে প্রাণবায়ু সরে পড়ে। অথচ ভেতরে কত দাপট, কত সব ইচ্ছা অনিচ্ছা। কত বদমায়েসি। ওই ত', শেষকালে ওই ছবির মত মরামাছের চোখ ঝুলে পড়া ঠোঁট। মুখ বিস্বাদ, মন ভারাক্রান্ত। উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দাম্ভিক সেনানায়ক দেখছে, যুদ্ধে হার হয়েছে। ছত্রাকার রণক্ষেত্র।

বিষ দিয়েই বিষ মারতে হবে।

মায়া। নামটা বেশ। সবই ত' মায়া। বর্ণমালায় আর কয়েকটা অক্ষর এগোলেই সায়া। অনিল মনে মনে হাসল। হয় না। কুকুরের বাঁকা ন্যাজ সোজা হয় না। দৈত্যেও পারবে না, দেবতাতেও পারবে না। রক্ত বেরোলেও উট সেই কাঁটা গাছ খাবেই। কাক যত চেষ্টাই করুক গলা দিয়ে কোকিলের সুর বেরোবে? ভেতর থেকে যাকে যেদিকে ঠেলবে তাকে সেদিকে যেতেই হবে। মঞ্জুলার কাছে রঞ্জন কেন? মঞ্জুলা ত' তারই বিষয়। রঞ্জন? সে ত' ছোট অনিল? ছোট হয়েও বড়। তাকে মেরে বেরিয়ে গেছে।

মায়া-বাঁধন কেটে অনিল ন'টা নাগাদ উঠে পড়ল। নখর দন্তহীন ব্যাঘ্র আর কত খাবে। থাকত রঞ্জনের মত একটা শরীর? ভেতরের কলকব্জার অর্ধেক অচল। ঘড়ির মত অবস্থা। ছোটোখাটো মেকানিকে আর হবে না। খোদ কম্পানিতে পাঠাতে হবে।

অনিল যখন রিক্শা থেকে বাড়ির সামনে নামছে, মাধবী তখন দেখেই বুঝল, আজকের অনিল কালকের অনিল নয়, চিরকালের অনিল। নাকটা লাল। চোখে সন্দেহের লাল নজর। বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ। তবে একটু কম। ভেতরটা বেরিয়ে পড়লেও সবটা বেরোয় নি। অনিল মাধবীর কাঁধে ভারি ডান হাতটা রাখল। হাতের বড় বড় লোম গলার কাছে লাগছে। সমুদ্রের ফেনার মত আলো ছড়ানো, চাপা বারান্দায় মাধবীর পাশে পাশে পা ঘষে ঘষে অনিল হেঁটে চলেছে। ডান পাশেই ঘরের দরজা। একটা পা তুলে ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে ঢুকল না, টাল খেয়ে পেছিয়ে এল। বাতাস লাগা গোলপাতার মত দুলতে দুলতে মাধবীর চিবুকের তলায় একটা আঙুল রেখে মুখটা সামান্য ওপর দিকে তুলে ধবে জড়ানো গলায় বলল, 'ভেবো না, [illegible]খলে, ভেবো না। আসার হলে সে ফিরে আসবে। আব যদি না আসে তা হলে আসবে না। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছি। কাল সকালে তোমার ছেলের ছবি কাগজে বেরোবে। রঞ্জন, ফিরে আয়।'

সকালের কাগজে দুয়ের পাতায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওপরে রঞ্জনের ছবি। তলায় লেখা, 'রঞ্জন, ফিরে আয়, তোর মা শয্যাশায়ী। টাকার দরকার থাকলে লিখে জানা। ফিরে এসে মাকে বাঁচা। তোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।'

মাংস

অরিন্দমের হঠাৎ মনে হলো শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। মাথাটার ভার ভার। রগের পাশের শিরা দুটো টিপটিপ করছে। অফিসে তেমন কোন কাজ ছিল না। অরিন্দম ভাবলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করবে। চা-টা খাবে। একটু গল্প-গুজব করবে, রেডিও শুনবে। বই পড়বে। বৌয়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করবে। অর্থাৎ বিকেল আর সন্ধ্যেটা একটু মজায় কাটাবে। শীতের সময়টায় অফিসের বড় কর্তারা সাধারণত ট্যুর কিংবা নানা ধরণের পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তিনটে নাগাদ অরিন্দম তার দপ্তর বন্ধ করে উঠে পড়লো।

অফিস পাড়ার বিশাল বিশাল বাড়ির আড়ালে বিদায়ী সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। রাস্তার ছায়া নামলেও বড় বড় গাছের মাথায় তখন সূর্য মাখামাখি হয়ে আছে। বেশ ভালো লাগছিল অরিন্দমের। পশ্চিম থেকে একটা হিমেল হাওয়ায় রাতে যে আরো শীত পড়বে তারই জানান দিচ্ছিল। অরিন্দম চাদরটাকে ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিল। বলা যায় না ঠাণ্ডা লেগে জ্বর টর হয়ে গেলেই মুশকিল।

বাসে বা ট্রামে তেমন ভিড় নেই। মিনি বাস একের পর এক লাইনে দাঁড়াচ্ছে গন্তব্যস্থল হেঁকে যাত্রী জড়ো করছে। অরিন্দম একটু আরামে এবং তাড়াতাড়ি যাবার জন্য একটাকা তিরিশ পয়সার একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেললো। মিনি বাসে উঠে একেবারে শেষের দিকে একটা কোণের আসনে বসে পড়লো। অরিন্দম একটু সৌখিন মানুষ। সাজে পোশাকে ছিমছাম পরিপাটি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ ভোজনবিলাসী।

বাড়ির কাছাকাছি বাস থেকে নেমে তার মনে হলো একটু মাংস কিনে নিলে মন্দ হয় না। সকালের খাওয়াটা তেমন জুতসই হয়নি। রাতের দিকে হিটারে প্রেসার কুকার চাপিয়ে সে নিজেই খাসা একটা স্টু বানাবে। গাজর থাকবে, লম্বা লম্বা আলু, বীনস, বাঁধাকপি আর নামাবার সময় ছোট এলাচ। গন্ধ আর স্বাদ দুটোই যেন মুহূর্তে অনুভব করতে পারলো। আজকের রাতটা আহারে, বিশ্রামে, গল্পেগানে একেবারে আরব্য রজনীর মতো হয়ে উঠবে।

অরিন্দমের মাংস কেনার একটা আলাদা ধরন আছে। বিশেষ কোন একটি অংশ থেকে সে একেবারে বেশ খানিকটা তুলে নেয়। তারপর নিজের সুবিধেমতো সহজ করে নিজস্ব ঢংয়ে রাঁধে। যে কোন দোকানে অরিন্দমের বেশ খাতির। দরদস্তুরের বালাই নেই। সেরা জিনিস চাই। পরিমাণে বেশি চাই।

ব্যাগ ছিল না। রুমালেই মাংসের টুকরোটা বেঁধে নিয়ে, একপাউণ্ড রুটি বগলদাবা করে অরিন্দম একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসলো। শরীরটা আর তেমন খারাপ লাগছে না। মাথায় নানা পরিকল্পনার ভিড়। প্রথমত অপর্ণাকে চমকে দেবে, দ্বিতীয়ত জমিয়ে রাঁধবে তারপর সকাস সকাল বিছানায় আরাম করে শুয়ে শুয়ে হেডলি চেজ পড়বে।

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি ঢুকে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। সদর দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে, কেউ কোথাও নেই। দোর, তালা সব বন্ধ। সামনের ফ্লাওয়ার

বেড়ে নিঃসঙ্গ কয়েকটা কসমস উত্তুরে শীতের হাওয়ায় কাঁপছে।

অপর্ণা কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে? না বলে বিনা অনুমতিতে তো সে কোথাও যায় না। আশে পাশে কোন বাড়িতে হয়তো সময় কাটছিল না বলে। নাকি কোন কেনাকাটায়... কিন্তু কেনার কি থাকতে পারে? বাড়িতে সব কিছুই তো মজুত। অরিন্দম তো কৃপণ নয়। সব কিছুই বেশি বেশি কিনে রাখে। আশ্চর্য ঘটনা। অবশ্য কোনদিনই এতো তাড়াতাড়ি ফেরে না। তাহলে রোজই কি অপর্ণা এইভাবে তালা ঝুলিয়ে দুপুরের অবসরের সদ্ব্যবহার করে? সিনেমায় যায়। না কি আইবুড়ো বেলার তার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি...

'তুমি ভীষণ সুড়সুড়ি দাও' অপর্ণার শরীরটা এঁকে বেঁকে গেল। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়লো।

কেন সুড়সুড়ি আমার ভালো লাগে না, তোমার কত্তা বুঝি সুড়সুড়ি দিতে জানে না পার্থ তার লোমশ বুকে অপর্ণার মুখটা চেপে ধরে তার শরীরের এখানে ওখানে যেখানে সেখানে খুশিমতো হাত বোলাচ্ছিল। মধ্য কলকাতার নির্জন একটা ফ্ল্যাট বাড়ির চারদিকে ভারি পর্দা ঝোলানো। বন্ধ দরজা, প্রায় অন্ধকার একটা ঘরে তখন পরকীয়া প্রেমের লীলা চলছে।

নায়ক পার্থ একটা বিলিতি ওষুধ কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। অপর্ণার এক সময়কার সহপাঠী, প্রেমিক। ছাত্রজীবনে বহুদিন তারা পাশাপাশি ইডেনে, আউটরামে, বোটানিকসে কাটিয়েছে। অপর্ণা আদর খেতে খেতে অনেকটা বেড়ালের মতো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কি করছো, কামড়াচ্ছো কেন? দাগ বসে যাচ্ছে না। আমার ভদ্রলোকটি দেখলে কি হবে বল তো।

—কি আবার হবে? তুমি বলে দিও অ্যালার্জি হয়েছে।

–ঠিক বলেছো। লোকটা একটু বুদ্ধু টাইপের। ঠিক বিশ্বাস করে নিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ কিনে আনবে।

—বিয়ের আগে কখনো মেয়েছেলে দেখেনি বোধ হয়। বলতে বলতে পার্থ হো হো করে হাসলো।

অপর্ণা একটু ভেবে বললো, 'যদি আমার মাতৃত্ব দেখা দেয়।'

পার্থ নিশ্চিন্ত মনে বললো, 'তাতে কি? তোমার কর্তার ঘাড়ে দোষ চাপাবে। যাকে বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।'

'এবার আমি যাই পার্থ। ওর আসার সময় হয়েছে। গুড হাউস ওয়াইফের কর্তব্য এবার করতে হবে।'

পার্থর ঘরের টাইমিং ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজলো।

অপর্ণা গেট খুলে দেখলো, একটা কালো কুকুর বড় একখণ্ড মাংসের টুকরো আয়েস করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিছু দূরে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা একটা রুমাল। ইস্ কার মাংস, কিসের মাংস? কুকুরটা ভীষণ আনসিভিলাইজড হয়ে গেছে তো। অপর্ণা

জোরে ধমক দিল, রেক্‌স, কি হচ্ছে কি? খেতে পাস না? কোথা থেকে মরা জন্তুর মাংস এনেছিস?

অপর্ণা একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে রেকসকে শাসন করতে গেল। কুকুর কিন্তু শুনলো না, রাগে একটা চাপা গর্জন করে তার অবাধ্যতা প্রকাশ করলো। অপর্ণা গাছের ডাল দিয়ে রক্তমাখা ছেঁড়া রুমালটা কায়দা করে পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে ফেলে দিল। একবারও দেখল না রুমালটার কোণে তারই হাতের কাজ করা সুতো দিয়ে লেখা আছে একটি ছোট্ট 'এ'।

গভীর রাত। অরিন্দম আর অপর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অপর্ণা ভাবছে রেকসটাকে কাল থেকে শাস্তি দিতে হবে। দুদিন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। রাস্তা থেকে মাংসের টুকরো মুখে করে এনে খেয়েছে। চাবুক টাবুক মারতে হবে। আর অরিন্দম ভাবছে কিছুতেই আজ আর অপর্ণাকে স্পর্শ করবে না। অপর্ণার গোড়ালি ফেটেছে। ল্যানোলিম ক্রীম এনেছিল, নিজ হাতে মাখিয়ে দেবে বলে। তারপর ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠবে। না সে সব কিছুই সে আজ করবে না।

আর একটি ফ্ল্যাটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে পার্থ। মুখে তার মৃদু হাসি। মেয়েরা কি বোকা, কি মূর্খ। আমি ডন জুয়ান, বিয়ের কি প্রয়োজন, মাংস তো সব দোকানেই ঝোলে, সব রকমের মাংস। আগলি রাং, পিছলি রাং, শিনা, গর্দান।

পয়সা

হঠাৎ আমার প্রচুর পয়সা হল। কি করে হল তা বলব না। তবে হল। পয়সা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারাও পাল্টে গেছে। সামনে চুল পাতলা হয়ে টাক বেরিয়েছে। সামনে ভুঁড়ি নেমেছে। দু' চোখের কোলে দুটো ব্যাগ তৈরি হয়েছে। মেজাজটাও ইদানীং বেশ চড়েছে। পয়সা হলে যা হয় আর কি।

বড়লোকদের চালচলন কেমন হয় আমার জানা নেই। বিনয়ী বড়লোক আমি দেখেছি। এঁরা হলেন সাতপুরুষে বড়লোক। ভিটেয় ঘুঘু চরলেও লোকে পুরনো আমলের বড়লোক বলে খাতির করে। তার মানে, কবে ঘি খেয়েছেন, সেই গন্ধ এখনও হাতে লেগে আছে। আমি একপুরুষে হঠাৎ বড়লোক। আমার কি হওয়া উচিত জানা নেই। তবে শুনেছি বড়লোকেরা বিকেলের দিকে গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। হাতে ছড়ি। সোজা পা ফেলে দ্রুত বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। হজম শক্তিও বাড়ে, তাছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কি বুঝতে পারে। খাবার জিনিস প্রচুর, হজম শক্তি একটু কম। হাঁটার ধরন দেখে বুঝতে পারবে, শরীরে শক্তি রাখে, দৃপ্ত ভঙ্গি। কারণ অপুষ্টিতে ভোগে না, কারণ পয়সাওলা। পয়সাই জগৎ। আমি তাই জগৎপিতা।

ড্রাইভার গাড়ি থামাও।

স্ট্যান্ডের বাঁ পাশে ময়দান ঘেঁসে গাড়ি দাঁড়াল। বাঃ, চমৎকার বিকেল। পশ্চিমে

সূর্য নেমে পড়েছে। আকাশ লালে লাল।

অজয়, চমৎকার বিকেল, কি বল ? অজয় আমার ড্রাইভার।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। কবে তোমার অভ্যাস হবে।

হয়ে যাবে স্যার। আগে যাঁদের ড্রাইভার ছিলুম তাঁদের তো স্যার বলতে হত না। লাস্ট যাঁর গাড়ি চালাতুম তাঁকে বলতুম দামুদা।

দামুদা। যাচ্ছেতাই নাম।

নামে কি আসে যায় স্যার। পয়সা তো আর নাম দেখে আসে না।

ছেলেটা যেন দার্শনিক। বয়েস কম হলে কি হবে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। সত্যিই তো নামে কি যায় আসে। এই তো আমার নাম পাঁচুসুন্দর। অজয়ের চেয়ে অনেক বিশ্রী নাম। অথচ গাড়ির মালিক আমি, চালায় অজয়।

আমার নিয়ম হল, প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে থাকা। চারপাশে তাকিয়ে দেখা। তারপর দরজা খুলে নেমে, গঙ্গার ধারের বাঁধানো রাস্তায় পায়চারি। যতক্ষণ গাড়ি থেকে না নামছি ততক্ষণ অজয়ের সঙ্গে বকর বকর করি। বড়লোকদের চালচলন অজয় জানে ভালো। আমি তো সদ্য বড়লোক। টাকাটাই হয়েছে, বড়লোকী চালচলন এখনও শেখার অনেক বাকি। অজয়ের সঙ্গে তাই মাঝে মধ্যে কথা হয়। এই কথার সময় অজয় আর আমার গাড়ির ড্রাইভার নয় আমারও ড্রাইভার। আমার শিক্ষক।

কাঁচা বয়েসের মেয়েরা কাঁচা বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আইসক্রিম চলছে, ফুচকা চলছে, ভেলপুরি চলছে, কোলড ড্রিংকস চলছে।

অজয়, কে যেন বলেছিল, কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়ছে ?

আজ্ঞে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা।

সে আবার কে ? অজয়কে কখনও ঠকানো যায় না। যা জিজ্ঞেস করব, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক বলা শক্ত। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে দিতে অজয় পৃথিবীর প্রায় সব কিছু জেনে ফেলেছে। বরাতে চাকরি অবশ্য জুটল না। শেষে ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারি।

মেয়ে দেখছিলুম, মিথ্যে বলব না, মেয়েই দেখছিলুম। পয়সা যখন ছিল না তখন হাঁ করে আকাশ, পাখি, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য অনেক দেখেছি। এখন পয়সার সঙ্গে সঙ্গে দুটো 'ম' যেন হামাগুড়ি দিয়ে মনে আসতে চাইছে। আহা, যেন দুটি বালগোপাল, হামা দিতে দিতে আসছে। হাতে নাড়ু।

বুঝলে অজয়, মাঝে মাঝে মনে হয় অ্যারিস্টটল ওনাসিস হয়ে যাই। জীবনটাকে একটু ভোগ করে দেখি।

দেখুন না স্যার। ক্ষতি কি।

ওনাসিসের নাম শুনেছ ?

খুব শুনেছি স্যার। জ্যাকলিন কেনেডি যাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

তুমি দেখছি সব জানো ? কি বল ?

কি বলব স্যার ?

আমার সেকেলে বৌটাকে বাতিল করতে হবে। ঠিক যেন বড়াই বুড়ি।

বাতিল করবেন কেন ? বউদি তো ঘরে থাকবেন। আপনি ফুর্তি করবেন বাইরে। টাকা দিয়ে তো আর স্নেহ ভালোবাসা কিনতে পারবেন না। স্নেহ ভালোবাসা সেকেলে জিনিস, ও সব সাবেককালের মহিলারাই দিতে জানেন।

ও কথা কেন বলছ ? ওই তো সব জোড়ায় জোড়ায় কেমন ঘুরছে লাল লাল ঠোঁটে আইসক্রিম চুষছে।

হ্যাঁ চুষছে। ওকে চোষাই বলে। এরপর কাঠিটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। আজ প্রশান্তদাকে, কাল অসীমদাকে। ওর মধ্যে ক'টা বউ হয়ে ঘরে ওঠে দেখুন। ঘুরতে ঘুরতে যৌবন একদিন চলে যাবে। মেক-আপের যৌবনে আরও কিছুদিন চলবে, তারপর ভোঁ ভোঁ।

মেয়েদের ওপর তোমার দেখছি ভীষণ রাগ। কারণটা কি ?

আজ্ঞে, এ বাজারে চাকরি আর বউ দুটোই পাওয়া যায় না।

যদ্দিন টাকা ওড়াতে পারবেন, তদ্দিন পরীরা উড়ে উড়ে আসবে। যেই আপনার ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে যায়ে অমনি সব হাওয়া।

নাঃ, এইবার একটু বাইরে বেরিয়ে হাওয়া খাওয়া যাক। অনেক জ্ঞানের কথা শোনা গেল।

আচ্ছা অজয়, তুমি কখনও রেস খেলেছ ?

আজ্ঞে না। তবে রেসের মাঠে গেছি। বাইরে থেকে দেখেছি, ঘোড়া ছুটছে। এই সময় রেস হয় ?

হ্যাঁ, এখন মনসুন রেস।

নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। একপাশে নরম ঘাস, অন্যপাশে পিচের রাস্তা। দূরে গঙ্গা, জাহাজ ভাসছে। মাস্তুলে দেশ বিদেশের পতাকা। পয়সা হবার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, মনটা মাঝে মাঝেই কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে যায়। এতকাল ছিল অন্ন চিন্তা চমৎকারা, সেই চিন্তা থেকে মন যেই সরে এসেছে, হয়ে গেছি উদাসীবাবা। ভোগের বয়েসে ভোগ হল না, এই বয়েসে আর কি হবে। এই তো মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, চুল ফিরিয়ে মেজাজে ঘুরছি, কেউ তাকাচ্ছে আমার দিকে ? কেউ না। ওই তো সিল্কের শাড়ি পরে নধর একটি মেয়ে চোয়াড়ে একটি ছেলের বগলদাবা হয়ে আসছে। নিজেদের ভাবেই মশগুল। যৌবন যৌবনকেই চায়, প্রৌঢ়ের আর কদর কি।

এখন মেয়েছেলে চাইলে মুখ নীচু করে সেই পাড়ায় যেতে হবে ! এখন চরিত্রহীন না হলে ভোগ হবে না। অজয় যত বাজে কথা বলে। কোনদিন বলে বসবে, পয়সা হলে টাকেও চুল গজায় ! আসলে ও ব্যাটা একটা চামচা। মন জোগানো কথা বলে।

বেড়াতে বেড়াতে একটা আইসক্রীম স্টলের কাছে এসে পড়েছি। যুবক হলে ঝট করে একটা খাওয়া যেত। এখন খেতে গেলে কেউ হয়তো গ্রাহ্যই করবে না, আমার নিজের মনটাই হেসে উঠবে, বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ ! ভয়ও আছে, গলা-খুসখুস কাশি।

আবার ফিরে এলুম নিজের গাড়িতে। অজয় বসে ছিল ঘাসের ওপর। মনটা যেন বিষণ্ণ। হবেই তো। ওই বয়সের ছেলে, জীবনে কত সাধ আহ্লাদ ! গাড়ি চালিয়ে সামান্য

ক'টাকাই বা পায়। আমাকে দেখে উঠতে যাচ্ছিল, বললুম, বস বস, আমিও তোমার পাশে একটু বসি। ওদিকটায় একা একা তেমন ভালো লাগলো না।

অজয়ের পাশে বসতেই, সামনের আকাশটা নীচে নেমে গেল। পিছন দিকে দুটি শিশু দৌড়াদৌড়ি করছে।

আচ্ছা অজয়, তোমাকে যদি এখন একলাখ টাকা কেউ দিয়ে দেয়, তুমি কি করবে ?

ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দিয়ে যেমন গাড়ি চালাচ্ছি তেমন চালাব।

সে কি ? আর কিছু করবে না। প্রেম, ভালবাসা, ফূর্তি ?

আজ্ঞে না, এক রাত কা আমির হয়ে পরের দিনই ফকির হয়ে রাস্তায় ঘুরতে চাই না। ওটা তো আমার রোজগার নয়। আমার রোজগারের ক্ষমতায় যেমন আছি তেমনই থাকব। ডাল ভাত, নুন ভাত, যেমন জোটে জুটবে।

টাকাটা তো ইনভেস্ট করতে পারো, ব্যবসায়, কি বাড়িতে, এক লাখ থেকে দু' লাখ, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার...।

আজ্ঞে না, সে মুরোদ আমার নেই। নিজেকে নিজে যত ভালো করে চিনি অত ভাল করে আর তো কেউ চিনবে না। নিজের দৌড় নিজে জেনে গেছি। বড়লোক হবার জন্যে আমি জন্মাইনি।

আমি তো হয়েছি। আমারও তো এক সময় দিন চলত না।

আপনি বরাতে হয়েছেন, কপালে ছিল।

এ সব মানো ?

খুব মানি।

॥ দুই ॥

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে শুনছি গানের সুর ভেসে আসছে। মেয়ের বায়নায় একটা স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার কিনে মহা বিপদ হয়েছে। আমার বিপদ পাড়ার আর পাঁচজনেরও বিপদ। কান ঝালাপালা। একে তো বিশাল এক বাড়ি হাঁকিয়ে অনেকের আলো বাতাস কেড়ে নিয়েছি।

কেড়ে না নিলে বড়লোক হওয়া যায় না। যতদিন চেয়েছি কিছুই পাইনি।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মনে হল, অজয়টা ভীষণ ভীতু, ম্যাদামারা বাঙালী। বরাত মেনে স্টিয়ারিং ধরতেই জীবনটা কাটাতে চায়। মনে মনে অদৃশ্য অজয়কে উপদেশ দিলুম, ওহে যুবক। জীবনে উচ্চাশা না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমার পায়ের জুতো জোড়া সমঝদারের মতো মচমচ শব্দ করছে। সিঁড়ির ঝকঝকে মসৃণ হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে উঠছি। চারদিক ঝলমল করছে। নতুন বাড়ি, নতুন মোজাইক, নতুন ফার্নিচার। পয়সার একটা আলাদা জেল্লা আছে। জেল্লা সহ্য হয়, শব্দটা সহ্য হয় না। যত ওপরে উঠছি গানের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। ওরে গান থামা। থামা বললেই কি থামবে। আমার পয়সা এদের স্ফূর্তিতে জোয়ার এনেছে।

বাপি। তুমি এসে গেছ।

সামনেই আমার মেয়ে। বেশ বড়সড় হয়েছে। কি একটা পরেছে, আরও যেন বড়

দেখাচ্ছে। নাঃ, এবার বিয়ে দিতেই হবে। আর ধরে রাখা যাবে না। এই বয়েসটা বড় ভীষণ। ওই গঙ্গার ধারে দেখে এলুম যে একটু আগে। গালে দুটো একটা ব্রণ বেরিয়েছে।

তোমার গাড়িটা নিয়ে আমরা একটু বেরোচ্ছি।

অ্যাঁ, এখন বেরোবি। অজয়কে এখন ছুটি দোব ভেবেছিলুম। ও-ও তো একটা মানুষ। কোথায় যাবি ?

আমরা তিন বন্ধু একটু মার্কেটের দিকে যাব।

অজয় রাগ করবে না ?

সে আমরা বুঝব।

সমান বয়েস, সমান চেহারার তিনটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মিষ্টি গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। ফুরফুরে চুল উড়ছে। পোশাকের খসখস শব্দ।

আমি উঠছি। ঘুরে ঘুরে ক্রমশই ওপরে উঠছি। ওরা নেমে যাচ্ছে নীচে। দু'পক্ষের দূরত্ব বাড়ছে। বাড়বেই তো। আরও বাড়বে। ওরা এক জগতের আমি আর এক জগতের।

ঘরে এসে দেখি আমার গৃহিণী জড়ভরতের মতো বসে আছে।

কি গো, এই ভাবে বসে ?

কি-ই করব ?

সত্যিই তো, কি আর করবে। কেন, টি ভি দেখ। গান, ফিল্ম।

দূর, ভালো লাগে না। ও সব আমি তেমন বুঝি না।

তা হলে কিছু খাও।

কত খাব। হজম হয় না।

তা হলে এসো দুজনে ঘুরে ঘুরে নাচি।

সে বয়স আর নেই।

বেশ, তাহলে এসো দুজনে ঝগড়া করি।

কি নিয়ে ঝগড়া করব ? কোন অভাবই তো আর নেই। তখন ঝগড়া হত এটা ওটা নিয়ে, এখন কি নিয়ে হবে ?

তাও তো বটে। তা হলে এসো কীর্তন করি, সাঁই ভজন।

ভক্তিও নেই তেমন, গলাও নেই।

তা হলে ঘুমোও, ওভাবে পুঁটলির মতো বসে থেক না।

কত ঘুমোব। ঘুম আর আসে না।

সে কি ! ঘুমও আসে না ?

না। তুমি এবার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা কর। ওর চালচলন তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

যাক, তাহলে ভাববার মতো একটা দুশ্চিন্তা পাওয়া গেছে। আমি অবশ্য সুখের মধ্যে একটা দুঃখ খুঁজে পেয়েছি।

দুঃখ !

হ্যাঁ দুঃখ। একটা ছেলে না থাকার দুঃখ।

আর কি হবে। সময় চলে গেছে।

হ্যাঁ, সময় চলে গেছে। সব চুকে-বুকে গেছে। আগুন নিভে গেছে, পড়ে আছে ছাই। চললে কোথায় ?

চা খাবে তো—

হ্যাঁ, চা—চা খেতে হবে। তার জন্যে যেতে হবে কেন ?

বলে আসি।

ঠিক ঠিক। বেশ, বলেই চলে এসো। আমি আবার একলা থাকতে পারি না। শেষের সময় তুমি কাছে থাকবে তো।

ও সব অলুক্ষণে কথা ভর সন্ধেবেলা নাই বা বললে।

মনে হল তাই বললুম।

মনে আর আসতে দিও না।

মনকে কে বাঁধবে ! বাঃ, বারান্দায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে। অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। অন্য সব বাড়ির ছাদের মাথা দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে। আলোর বিন্দু খইয়ের মতো ছড়িয়ে আছে। আমার একটাই মাত্র মেয়ে, নাম পদ্মা। অনেক ছেলে-মেয়ে আনা যেত। তখন তো উপায় ছিল। বেহিসাবী হলেই মরতে হত।

পদ্মা কি প্রেম করছে ? ছেলে-টেলে ধরছে নাকি ! কে বলতে পারে ? অজয় পারে। ওর সঙ্গেই তো ঘোরে। অজয় আজ আমাকে অবাক করে দিয়েছে। বয়স কম, কিন্তু মনের কি সাঙ্ঘাতিক জোর। এ রকম ছেলে লাখে একটা মেলে। একালের ছেলেদের কোন বদ খেয়ালই ওর মধ্যে নেই।

পদ্মা ফিরে এলো। গুন গুন করে গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে পা ঘষে উঠছে। নেশা করেছে নাকি ? টলছে মাতালের মতো। মাঝে মাঝে সিঁলির রেলিং ধরছে আঁকড়ে ধরছে দু'হাতে।

পদ্মা !

বাঅবা, তুমি আমার বাঅবা, তাই তো ! হ্যাঁগ, তুমিই আমার বাবা ?

পদ্মা আমার বুকে মুখ গুঁজে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তুমি জর্জকে কিছু বলতে পারো না বাবা !

জর্জ। সে অবাক কে ?

একটা ছেলে। আমাকে পেতনী বলেছে। আমি পেতনী।

আমার বুক থেকে মুখ তুলে পদ্মা দু'হাত পিছিয়ে গেল। মুখটা জবাফুলের মতো লাল টকটকে। চারপাশে চুল উড়ছে।

তুমি দেখ তো আমি কি পেতনী, সত্যিই আমি পেতনী ?

পদ্মা একে একে জামা খুলছে ! শার্ট খুলে ফেলেছে। জিন্‌স খোলার জন্য কাঁপা কাঁপা হাতে ফাস্টনারের মুখ খুঁজছে। একটানে সব খুলে ফেলল। শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একমাত্র মেয়ে পদ্মা। যখন ও এতটুকু শিশু, তখন কোলে করে কত নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। কাঁথা পাল্টে দিয়েছি। সেই পদ্মা আমার সামনে, আমাকে বিচারকের ভূমিকা নিতে হবে। এ শরীর আমার অচেনা, এর ভেতরে

যে মন বাসা বেঁধেছে সে আরও অচেনা। পদ্মা দু'হাত দু' কোমরে রেখে পা দুটোকে ফাঁক করে বললে, কি, কিছু বলছ না কেন বাবা ? আমি কি পেতনী ! আর ঝুমকি পেতনী নয় !

কে ঝুমকি, কে জর্জ ! আমার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে সে-ই বা কে ! আমার ভীষণ ভয় করছে। এই শরীরটাকে এখন ধরে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে। গায়ে হাত দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে ! তাকাতেই পারছি না ভালো করে।

পদ্মা ঘরে চল।

না-আ, আমায় অপমান করেছে। বিচার চাই, বিচার।

তুমি ঘরে চল।

পদ্মা টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে পিছোতে শুরু করেছি। এ আমার মেয়ে নয়, অপ্রকৃতিস্থা এক মহিলা !

তুমি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ কেন জর্জ ! পেতনী তোমাকে ধরবে ? অ্যাঁ, পেতনী পেতনী।

পদ্মা, আমি তোর বাবা, জর্জ নই, তোর বাবা !

পদ্মা ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মারল, মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী ! তারপর একেবারে কাটা কলাগাছের মতো পালিশ করা মেঝের উপর উল্টে পড়ল।

আর একটা চড় কষিয়ে গেল অজয়। আমি সেদিন সারারাত ভেবেছি। পদ্মার ভবিষ্যৎ কি হবে ? অজয়ের মতো সৎ, নির্লোভ, সহিষ্ণু স্বামীর হাতে পড়লে মেয়েটা বেঁচে যেতে পারে। শুধু পদ্মা বাঁচবে না, আমিও বেঁচে যাব। আমার ছেলে নেই, অজয়ই হবে আমার ছেলের মতো। যে বলতে পারে, লাখ টাকা পেলে ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দোব, তার হাতে আমার বিশাল এই ঐশ্বর্য ছেড়ে যেতেও সুখ। সব থাকবে, সব রাখবে, সব বাড়াবে আরো আরো বাড়াবে।

সন্ধ্যের দিকে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার তেড়ে আসছে চারপাশ থেকে। সকাল থেকেই অজয়কে মনে হচ্ছে, আমার ছেলে, আমার জামাই।

কাল তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে অজয় ?

অনেক জায়গায় স্যার।

স্যার বল না, কানে খট খট করে লাগে। আমি স্যার নই, সামান্য মানুষ, তোমার বন্ধুর মতো।

আপনিই বলেছিলেন।

আমিই বলছি, আর বল না। কাল কোথায় কোথায় গেলে ?

ময়দান, ফ্লুরি, ট্রিঙ্কাস, স্কাইরুম, হাজরা, ভিক্টোরিয়া, যখন যেখানে হুকুম হয়েছে।

তুমি বাধা দিলে না কেন ?

আমি সামান্য ড্রাইভার, হুকুমের চাকর।

তুমি যদি আর ড্রাইভার না থাক, আরো কাছে, একেবারে কাছে সরে আস ?

তার মানে ?

তোমাকে আমি চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে চাই আমার ছেলের মতো করে, জামাই করে। অজয়, তোমার হাতে আমি পদ্মাকে দিয়ে যেতে চাই। অজয়ের কব্জিতে আমার একটা হাত।

তা হয় না, হিন্দী ছবি হয়ে যাবে।

কেন হয় না! আমি যে ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। আমার ছেলে নেই, তাছাড়া সবই আছে। তুমি আমার সেই ছেলের মতো।

স্ট্যাটাসে মিলবে না, আপনি নিলেও আপনার মেয়ে আমাকে নিতে পারবে না, আমিও আপনার মেয়েকে সহজ করে স্ত্রী হিসাবে মানতে পারবো না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা বারে বারে বেরিয়ে আসবে।

কেন আসবে?

তাই আসে, বড়লোকের মেয়ে আর গরীবের ছেলেকে মিলিয়ে দিলে স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্ক আর থাকে না। রঙে রঙ মেলাতে হয়।

তুমি তো আর গরিব থাকছ না, বড়লোক হয়ে যাচ্ছ, আমার পার্টনার, আমার পি. এ, অ্যাসিস্টেণ্ট, সব কিছু।

আমি যে বড়লোক হতে চাই না।

তোমার লোভ নেই, উচ্চাশা নেই?

লোভ তো থাকে না, তৈরি করতে হয়, উচ্চাশা। এক একজনের এক একরকম আশা, তার পেছনেই সে দৌড়য়।

অজয় আমার বড় ইচ্ছে, তুমি বেঁকে থেকো না।

আমি যে স্বার্থপর হতে পারবো না।

স্বার্থপর।

হ্যাঁ, আমার মা-বাবা ভাই-বোন পড়ে থাকবে নীচে, আর আমি ফানুসের মতো উঠে যাব উপরে, তা হয় না।

তাঁরাও উঠবেন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে উঠবেন।

ক্রীতদাস কারোকে তোলার ক্ষমতা রাখে না। স্বাধীন মানুষই কিছু করতে পারে। আপনার পয়সা আছে, আপনি আমার চেয়ে অনেক অনেক ভালো ছেলে পাবেন।

এই তোমার শেষ কথা?

ঘাসের গালচে থেকে নিজেকে তুলে নিতে হল। মানুষ কেন মানুষের কাছে সহজে আসতে চায় না। অজয় গাড়িতে স্টার্ট দিল। কঠোর চরিত্রের ছেলে। কংক্রিটের বাঁধুনি। কিছুতেই নোয়ানো যায় না।

পরের দিন সকালে অজয় আর এলো না। একজন বয়স্ক মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে অজয়ের চিঠি। অজয় লিখছে, অসুবিধে হবে ভেবে এই বিশ্বাসী মানুষটিকে পাঠালুম। এঁর হাত ভারি ভালো। একদিন চালালেই বুঝতে পারবেন। আমাকে যা দিতেন তার চেয়ে কিছু বেশি দিলে ভালো হয়, এঁর সংসার অনেক বড়।

আমি দুর্গাপুরে ভালো একটা চাকরি পেয়েছি। আজই চলে যেতে হচ্ছে। সকালের ট্রেনে। ছুটিতে এসে দেখা করব। আপনি আমাকে যেমন ভালোবেসেছিলেন, আমিও

তেমনি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছিলুম।

অনেক দিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলুম, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য মানুষকে বড় নিঃসঙ্গ করে দেয়। আপনার বেদনা আমি বুঝি। উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে। ধনবান আর কুষ্ঠ রোগী প্রায় সমান। প্রণাম নেবেন। অজয়।

বামুনের গরু

শীতকাল। ভোর পাঁচটা মানে ভদ্রলোকের মাঝরাত। ছাত্রজীবন চলে গেছে, ঘুমও গেছে। সে জীবনে বই খুললেই চোখ জুড়ে আসত কালনিদ্রায়। মাথার ওপর পরীক্ষার খাঁড়া ঝুলছে। সামনে খোলা অর্থনীতির বই। মাথা লটকে আছে চেয়ারের পেছনে। ঠোঁট ফাঁক। ফুড়ুত ফুড়ুত নিঃশ্বাস পড়ছে। কিল, চড়, ঘুসি, কানমলা, নস্যি, অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি, কোন কিছুতেই ঘুম আর বাগ মানে না। সংসার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। চিৎ হলেই বুকের দুপাশে পা ঝুলিয়ে গেড়ে বসে দুশ্চিন্তা। রাতের এখন তিন পর্ব। প্রথম পর্বে সমভূমিতে পাশাপাশি শুয়ে শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া জ্যান্ত উপহারের সঙ্গে এটা ওটা সেটা নিয়ে ঠুসঠাস, ফোঁসফাঁস। অন্তে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদেশ ঠেকিয়ে দেয়ালমুখো হয়ে ক্ষতস্থান লেহন। তদন্তে উসখুস, উসখুস করে সন্ধিস্থাপন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর। উই আর অন দি সেম বোট ফাদার, উই আর অন দি সেট খাট মাদার বলে ভাবাশ্রু বিসর্জন। দেখতে দেখতে পার্শ্ববর্তিনীর নাসিকা গর্জন। তখন কারবালার সেই শূন্য প্রান্তরে রাত-জাগা ঘুরু হয়ে বিচরণ। মহাশূন্য হেঁকে বলে মনে করো। মনে করো, শেষের'অ সেদিনঅ কি ভয়ঙ্করঅ। অতঃপর, আয় ঘুম, ঘুম আয়। সাধ্য-সাধনা। ঘুম এল দুঃস্বপ্নের ভেজাল নিয়ে। শেষ পর্বে পরাজিত কুস্তিগির বেহুঁশ।

আর তখনই নড়ে উঠবে কড়া। এলেন। তিনি এলেন। ভি আই পি নাম্বার ওয়ান।

মাথার ওপর ধামা খোঁপা। পুরু ঠোঁটে বিগত রাত্রির তাম্বুল রাগ। কণ্ঠে সাত সাগরের গরল। চোখ ঘুরে কুঁচ ভাঁটা জিনি ইন্দিবর নাটা। পিলে কাঁপিয়ে কড়া নড়বে তিনবার। তারপর দৈববাণী, আমি তাহলে চললুম। শুয়ে শুয়ে মিঞাও শুনছেন, বিবিও শুনছেন। দু'জনেই পড়ে আছেন মটকা মেরে। যার গরজ বেশি তিনিই তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন। আমি তা হলে চললুম, শুনে মিঞাই ঠেলে ওঠেন, না, যেও না, রজনী এখনও বাকি, আমি রাত জাগা পাখি। একবার লাইন কেটে গেলে তুমি সাত বাড়ি সেরে আসতে আসতে, এ সংসারে আগুন জ্বলে যাবে। আমি গেলে সংসার অচল হবে না, ইনসিওরেনস্, প্রভিডেন্ড ফান্ড, ফিক্সড ডিপোজিট, ফ্যামিলি পেনসানে ভালই চলবে। তুমি গেলে দিনমণি, এ-পরান যাবে। খাবার ঘরে জগাই মাধাইয়ের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাসনের পাঁজা। গেলাস লাট খাচ্ছে। বেসিনে কাপ ডিস গণকবরের মৃতদেহের মত ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে আছে। ভুক্তাবশেষ নিয়ে ধেড়েরা সারা রাত দাবা খেলেছে। দুধের বাটিতে জল ঢেলেছিল, তার ওপর ওষুধের ফেলে দেওয়া ফয়েল ভাসছে। হেলে হেলে

দুলে দুলে। ভিটামিন, অম্লনাশক, মাথাধরা, অনিদ্রা। বাবুদের হেঁসেলে নয় তো আঁস্তাকুড়। এ জিনিস ওই প্রাতঃস্মরণীয়ার ভরসাতেই সৃষ্টি করা যায়। সকালে সাফ করার নাম শুনলেই স্বেদ, কম্প, পুলক জাগে। বিষাদযোগ তৈরি হয়। হাত ঠেকাতেই ঘেন্না হয়, মেগেঃ। কলকাতার ট্র্যাফিকজটের মত। ভয়ে পুলিস ভাগে। সৃষ্টির সামনে পা ছড়িয়ে বসে স্রষ্টারা হাপুস নয়নে কাঁদে। ওগো। কি হবে গো, তারার মা আসছে না। তারার মা না এলেই চোখে অন্ধকার। কনডিশান রিফ্লেকস বলে একটা ব্যাপার আছে যেমন খাবার দেখলেই নোলায় জল আসা। হাত তুললেই চমকে ওঠা। ভোরে কড়া নাড়বে ভেবে জেগে উঠে চোখ পিট পিট করা। এই এলো, এই এলো করে রাত ফর্সা হয়ে গেল। সামনের বাড়ির পুবের পাঁচিলে হলুদ রঙ ধরল। তারস্বরে কাক ডেকে উঠল। রাতে যে সব কল বন্ধ করা হয় তার মুখ দিয়ে দামাল ছেলের মত জল নামল লাফিয়ে লাফিয়ে। তবু মনে হতে লাগল বাড়ি যেন সার্জিক্যাল থিয়েটারের মত শান্ত। তারার মা ঠুকে ঠুকে বাসনে টোল ধরাচ্ছে না। কড়কড়ে ছাই ঘষে ঘষে দুধের ডেকচির বারোটা বাজাচ্ছে না। স্টিলের গেলাসে ফুটবলের শট হাঁকড়াচ্ছে না। বাবুদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে না। বেলা দেখে মনে হচ্ছে আজ লাইন কেটে গেছে। আসতেও পারে নাও পারে।

বিপদ দেখলে খরগোস কি করে? মাথাটা গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে পেছনের দিকটা উঁচু করে রাখে। ভাবে খুব লুকোনো হল। শত্রু পেছন দিক থেকে এসে পশ্চাদ্দেশটি ধরে গর্ত থেকে টেনে বের করে আনে। বালিশে মুখ গুঁজে পেছন উলটে শুয়েছিলুম। প্রথম চোট কেটে যাক, তারপর সংসারের চাতালে নেমে তাল ঠুকব সে আর হল না। পেছনে একটি মোলায়েম খোঁচা।

'দরজা খুলে দাওনি?'

'কাকে খুলব?'

'কেন রোজ যাকে খোলো।'

'তিনি না এলেও খুলে বসে থাকব। এসো হে, এসো হে, প্রাণসখা।'

'ঠিকই এসেছিল, তুমি মটকা মেরে পড়েছিলে, বদমাইশি করে। তোমাকে আমি চিনি না। হাড়ে হাড়ে চিনি। বাঁশ দেবার সুযোগ পেলে তোমাকে আর পায় কে?'

'বাজে কথা বোলো না। রোজ কে দরজা খোলে? মটকা মেরে যদি কেউ পড়ে থাকে, সে হলো তুমি। দরজা খুলে দিয়ে যেই বিছানায় ঢুকি, অমনি তুমি কুঁই কুঁই করে হেসে বল, আবার নতুন করে শুচ্ছ কেন, এখুনি তো বাজার যেতে হবে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।'

'যার যা ডিউটি।'

'আমি মারা গেলে? তখনও কি ভূত হয়ে এসে তোমার তারার মাকে দরজা খুলে দিতে হবে?'

'সাতসকালে একদম বাজে কথা বলবে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠলে তোমারই ভাল। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মন মেজাজ খুশি খুশি হবে। তাড়াহুড়ো হবে না, আয়েস করে অফিস যেতে পারবে।'

'থাক। আমার ভাল আর তোমাকে দেখতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'

'আহা! মামার বাড়ি! আলোয় আলোয় আমাদের হাতে হারিকেন ধরিয়ে চলে যাই! ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। নাও উঠে পড়।'

'উঠে কি করতে হবে! বাসন মাজতে হবে! ঘর ধুতে হবে?'

'আজ্ঞে না। জীবনে তো কুটোটি নেড়ে উপকার করনি। রেখাদির মত বরাত করে কি আর জন্মেছি যে সাতসকালে স্বামী এসে চায়ের কাপ সামনে ধরবে। বউকে সাজিয়ে রাখবে শোকেসে। আমার হামান দিস্তের বরাত। সারা জীবন থেঁতো হবার জন্যেই জন্মেছি। এখন দয়া করে উঠে পায়ে চটিটা গলিয়ে ওই সামনের বাড়িতে গিয়ে একবার খবর নিয়ে এসো, মুখপোড়া ওখানে আগে গিয়ে মরেছে কি না!'

যথা আজ্ঞা। মাঠ পেরোলেই বলাইদের বাড়ি। যতই করি না কেন রেখাদির স্বামী হতে হচ্ছে না। একবার শুকসারী দম্পতিকে যদি চর্মচক্ষে দেখতে পেতুম, স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতুম, আপনারা মশাই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমার বারোটা এভাবে বাজাচ্ছেন কেন?

বলাইদের বাড়ির সদর হাট খোলা। ভেতর উঠোন স্পষ্ট চোখে পড়েছে। পা তুলে সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। বলাইয়ের মা গামছা পরে তারে থান মেলছেন। দৃশ্যটি বড় অপূর্ব। উঁকিঝুঁকি মারাটা ঠিক হচ্ছে কি? হচ্ছে না। প্রাণের দায়ে এই প্রাতঃদর্শন। পাশের জানালা এক চিলতে ফাঁক করে আমার এই অপরাধের ওপর যে কেউ চোখ রাখতে পারেন, ধারণাই ছিল না। 'পিপিং টম' হবারও একটা আর্ট আছে। জানালা ফুঁড়ে কাংস্যকণ্ঠ বেরোল, 'কি চাই?'

বাপস্, বলাইয়ের সেই বিখ্যাত বউ। চেহারা দেখলে মনে হয় সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাত। ঢোক গিলে বললুম, 'আপনাদের বাড়িতে তারার মা কাজে এসেছে?'

'কেন ফুসলে নিয়ে যাবেন?'

আরে রাম কহো ভাই। ওই পাথর প্রতিমাকে ফুসলে নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায়? মুখে বললুম, 'আজ্ঞে না, আমাদের বাড়িতে আসেনি তো! ভাবলুম এখানে যদি এসে থাকে!'

'আসেনি। আমি তো ওকে আপনাদের বাড়িতেই পাঠালুম, উঁকি মেরে চুপি চুপি দেখে আসার জন্যে। আপনাদের আদরেই তো বাঁদর হয়ে বসে আছে। কি মুখ হয়েছে আজকাল।'

আমাদের বাড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বোকা বোকা চেহারার এক দৈত্য মিটার ঘরের পাশে ঘাপটি মেরে লম্পট জমিদার পুত্রের মত উঁকি ঝুঁকি মারছে। আরে ওই তো বলাই! চোখাচোখি হয়ে গেল। বলাই ফিরে এসে বলল—'আসেনি দাদা?'

'না রে ভাই। কি বিপদেই যে পড়া গেছে!'

বলাই জানলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলে, আসেনি। আমার কথা তোমার বিশ্বাসই হয় না।'

জানালা বললে, 'এলে আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম।'

'তোমরা লোকের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার কর, তাই কেউ টেঁকে না।'

'ওই তো যিনি ভাল ব্যবহারের বড়াই করেন তাঁরও তো একই অবস্থা। মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলেন। মান রেখেছে।'

'আমি তারার মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলুম ? কে বললে আপনাকে ? আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে।'

'তারার মা বলেছে। আমাদের বললে, আপনি চুড়ি দিচ্ছেন, জামাইয়ের আঙটিটা আমাদের দিতে হবে। আমি ধারধোর করে একশো টাকা দিয়েছিলুম।'

মহিলা গলা দিয়ে যে শব্দ বের করলেন, তাকে বলে, আর্তনাদ। 'কি সর্বনেশে মেয়েমানুষ গো ! ওই ব'লে এই বোকা লোকটার কাছ থেকে পাঁচ আনা সোনার একটা আঙটি ভোগা দিয়ে নিয়ে গেল ! কি পাল্লায় পড়েছি। আমার কি হবে গো !'

বলাই বললে, 'সাতসকালে আর চেঁচিয়ে না তো ! খুব হয়েছে ?'

'না চেঁচাবে না ! তোমার মত বোকা আর পৃথিবীতে দুটো আছে ! মেয়েছেলে দেখলেই বাবুর ন্যাজ একেবারে পটাস পটাস নড়ে উঠল। এমনি হাত দিয়ে পয়সা গলে না। আমার ভায়ের বিয়েতে একটা শাড়ি ঠেকিয়ে সরে পড়ল।'

'কাজের লোককে একটু তোয়াজে রাখতে হয় গবেট। তোমার ভাই এসে বাসন মাজবে ?'

উপরে, দমাস্ করে জানালার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। বলাই বললে, 'আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেছে তো মশাই ?'

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন, 'কি হল কি আপনাদের ? সাতসকালেই মড়াকান্না ! বলাই বউমাকে ধরে পেটালে না কি ?'

'পেটাব কেন ? ঝি আসেনি।'

'তাইতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। একদিন নিজেরাই না হয় করে নিলে ?'

বাড়ি ফিরতেই গরম হাওয়ার স্পর্শ। 'কি করছিলে কি এতক্ষণ ?'

'কি আর করব ? ওদের বাড়িতেও আসেনি।'

'মরে গেছে। কাল চিংড়ি মাছ খেয়েছিল, তোয়াজ করে খাইয়েছিলুম, কলেরা হয়ে মরেছে। ওই তো আমতলার বস্তি, যাও না একবার খবর নিয়ে এস।'

'ওখানে আমি যেতে পারব না, তোমার সব ছাঁটাই করা দশাসই মেয়েছেলেরা আমাকে চাঁদা করে ঠেঙাবে।'

'তুমি কিছুই পারবে না। আমিই যাই। আমার তো আর বসে থাকার বরাত নয়। সৃষ্টি পড়ে আছে। আসবে কি আসবে না ?'

'অত হাঙ্গামা না করে, এসো না, দু'হাতে ঝটাপট সেরে নি।'

'কালকে ঘিভাত খাওয়া হয়েছিল সব বাসনে তেল বেড় বেড় করছে। গেলাসে পার্সেমাছের আশটে গন্ধ। ও তোমার আর আমার কম্ম নয়।'

'একটু চা হলে হত না !'

'একদিন নিজের গতর নাড়িয়ে চা-টা কর না। যেখানে থাক, আমি ওর ঘাড়টা

ধরে টেনে আনি।'

গেল তো গেলই। ফেরার আর নাম নেই। না পারছি বাজার যেতে, না পারছি দুধ আনতে। সব স্ট্যান্ড স্টীল। অবশেষে তিনি ফিরলেন।

'কি রিপোর্ট ?'

মোড়ায় ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'আগে এক গেলাস জল।'

জল কোথায় ঢালবে ? মাথায় না গলায় ! জল খাওয়া হল। 'আঃ।'

'বলো, কি রিপোর্ট !'

'তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। জ্বর হয়েছে, সুখের জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলুম। বড় বড় নখ নিয়ে এমন খামচে দিলে ! দেখি একটু ওষুধ দাও তো। জলাতঙ্ক না হয়। এ টি এস নিতে হবে।'

'না না, এ টি এস নিতে হবে কেন। তুমিও যেমন।' প্রাণী জগতে দুজন মহিলার মুখোমুখি দেখা হলেই একটু আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি হবেই। দুটো বেড়াল। ফেস টু ফেস, ঠুসঠাস, ফোঁসফাঁস।

ওষুধ লাগাতে লাগাতে বললে, 'দিয়েছি আজ বারোটা বাজিয়ে।'

'কি ভাবে বাজালে ?'

'এত বড় পাজি মেয়েমানুষ, ছোট মেয়েটাকে কাজে বের করে দিয়েছে। আমাকে বললে, না তো, পাঠাইনি তো। কালীবাড়ির পাশে গুঁইদের ওখানে গিয়ে দেখি রক ধুচ্ছে। ফের ফিরে গেলুম। কি গো, তুমি যে বললে মেয়েকে কোথাও পাঠাওনি। এইত দেখে এলুম কাজ করছে। তখন বলে কি না এটা আমার বেশি টাকার বাড়ি। আমি বলে এসেছি তুমি আর তোমার মেয়ে যদি এ মুখো হও, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দোব। তুমি এখুনি একটা লোক দেখ।'

'সাধনা করলে ঈশ্বর প্যাওয়া যায়, কাজের লোক পাওয়া অত সহজ নয়। এ তুমি কি করলে ? ওদের ইউনিয়ন আছে। কেউ আর এ বাড়িতে আসতে চাইবে না।'

'ঝাঁটা মারি ইউনিয়নের মুখে। তুমি অন্য জায়গা থেকে লোক আনাও। থাকা, খাওয়া, পরা। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। ভাগলপুর, বিলাসপুর, কানপুর, যেখান থেকে পার। চেষ্টা করলে কি না হয় !'

'তা ঠিক। পিসীর গোঁফ গজিয়ে পিসে হয়, মাসী মেসো হয়।'

এদিকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড অবস্থা। মেজাজ সব ফাইভ ফর্টি ভোলট। বাসন কমাবার জন্য সব পাতে পাতে চলেছে। ভাত, ডাল, ঝাল, ঝোল, সুক্তো, চাটনি সব মিলেমিশে একাকার। যা উদরে মিশত, তা পাতেই মিশে মিকস্চার হয়ে গলকম্বল গলে ইঞ্জিনে পড়তে লাগল।

এভাবে তো চলে না। একটা কিছু করতেই হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, মুখে পান ঠুসে, গালগুলি করে, নেচে নেচে সব কাজে চলেছেন বাড়ি বাড়ি। কয়েকজন মনে ধরলেও মার খাবার ভয়ে সাহস করে বলতে পারি না, হ্যাঁগা আমাদের বাড়িতে কাজ করবে। দাদাঠাকুরের মত গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে হবে নাকি—বাসন মেজে দাও, মেজে দিলে শাড়ি দোব, বাটা ভরা পান দেবো, পুজো এলে ধনেখালি দোব, মেয়ে হলে নোলক

দোব, জামাই হলে জুতো দোব, মাংস হলে ভাগ দোব, পেটে এলে দুধ দোব।

হাতের কাছে যাকেই পাই দু'চার কথা হবার পর জিজ্ঞেস করি জানাশোনা কেউ আছে? দিন না ভাই, একটা লোক যোগাড় করে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক। বড় আদরে থাকবে। রিকশায় উঠে রিকশাঅলাকে বলি। টেকসিতে উঠে ড্রাইভারকে বলি। ডাক্তারখানায় বসে সহরোগীকে বলি। চোখ দেখাতে গিয়ে অন্ধকার ঘরে ডাক্তারবাবু নাকের কাছে ঝুঁকে পড়ে যখন আলো ফেলছেন তখনও আমি ফিস ফিস করে বলে ফেলি, কাজের লোক আছে? পরিচিতের বাড়ি গিয়ে সব ছেড়ে প্রশংসা করে উঠি, আহা মেয়েটি বেশ। কোত্থেকে পেলেন। গৃহস্বামীর ভুরু কুঁচকে ওঠে। ভাবেন চরিত্রে চিড় ধরেছে।

একটা সময় এল যখন কারুর সঙ্গে দেখা হলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলেন, কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু বলার থাকে বলুন। অনেকে আবার দেখামাত্রই দৌড়তে শুরু করলেন, ওই রে আসছে রে। এদিকে গৃহের গঞ্জনা দিনে দিনেই বাড়ছে। পরিস্থিতি চরমে উঠলে, যেদিন পাশের বাড়ির ব্যোমকেশবাবু সোনারপুর থেকে একটি ডাগর ডগুর ফুলটাইমার নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সে কি উল্লাস। উলুধ্বনি সহর্ষ আর্তনাদ। পেছনে পেছনে প্রবেশ করল ফুলশয্যার তত্ত্বের মত নতুন বিছানা, মশারি, বালিশ, জারুল কাঠের খাট। বেকড প্লেয়ার বেজে উঠল, আওনা পেয়ার করে, লাচ করে, ডিসকো দিওয়ানে, আহাঃ আহাঃ। ব্যোমকেশবাবু যেন বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বাড়ি ঢুকলেন।

ছাদে দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে দেখতে গৃহকর্ত্রীর বিদ্যুৎপরিবাহী নালিকায় হাই ভোলটেজের সঞ্চার হল। তিনি বজ্রের মত, অগ্নির মত কামানের গোলার মত ফেটে পড়লেন 'অপদার্থ, ওই দেখ, করিৎকর্মা পুরুষ কাকে বলে। চোখে চালসে, রক্তে শর্করা, তবু 'তিনি যা করলেন।' কি করলেন? যেন বিলেত থেকে আই. সি. এস হয়ে এলেন।

জগৎ সংসার সম্পর্কে যাদের অসম্ভব জ্ঞান, যাঁরা এ হাটে কিনে ও হাটে বেচেন, তাঁদেরই একজন বলেন, ওভাবে হবে না বন্ধু। লোক ভাঙাতে হবে এজেন্ট ফিট কর। ওই পুষ্পিতালতাকে বোজ লোভ দেখাতে হবে। আরও নরম গদি, নেটের মশারি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় টিভি, রবিবার সিনেমা। আরও, আরও দোব।

'সে তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি।'

'সেই যুগই তো পড়েছে ভাই। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। মলের চেয়ে চুটকি ভারি। বেকারে দেশ ছেয়ে গেলেও কাজের লোক তুমি সহজে পাবে না। সবচেয়ে সহজ হল আর একটি বিবাহ করা। পাত্রী তুমি সহজেই পাবে। বিনাপণে করতে চাইলে, পুলিশ ডেকে তোমাকে ফিলমস্টারের মত সামলাতে হবে। বড়র জন্যে, মেজ আন, মেজর জন্য সেজ, বামুনের গরু ভাই। খাবে কম দুধ দেবে বেশি।'

'মাখনবাবুর বাড়িতে একটা ভাল খেস আছে। গতবছর পাঞ্জাব থেকে কিনেছিলেন।'

'কে চাইতে যাবে?'

'কেন তুমি? তোমার সঙ্গে তো ওঁর স্ত্রীর ছাতে ছাতে প্রায়ই আলাপ হয়। প্রাণের কথায় এতই মশগুল থাক, নিচে থেকে ডেকে ডেকে গলা চিরে যায়, তবু উত্তর পাওয়া যায় না।'

'তোমার যা মিনমিনে মেয়েলি গলা, পাশের ঘর থেকেই শোনা যায় না তা ছাত থেকে।'

'সংস্কৃতিমান লোকের গলা একটু মোলায়েমই হয়। তোমার মত অমন পান দোক্তা খাওয়া লহরজান, গহরজান টাইপ হয় না। মেয়েদের গলা কেমন হবে? যেন ঝাড়লণ্ঠনে বসন্তের বাতাস লেগেছে। তোমার মেয়েকেও একটু সাবধান করে দিও। তোমারই তো কাউন্টার পার্ট। ছেলের বাবা কিছু জিজ্ঞেস করলেই ষণ্ড-কণ্ঠে, কি বললেন বলে, সব যেন ভুণ্ডুল করে না দেয়! বলবে বাতাসের সুরে, ঝিরি ঝিরি নিঃশ্বাসে যেন কথা বলে। তালে লয়ে মিলিয়ে।'

'আজ্ঞে না, সে যুগ আর নেই। মেয়েলি ন্যাকাপনা এখন অচল। একটু পুরুষালি গলাই ভাল। ছেলেরা পছন্দ করে বেশি।'

'তুমি সব জান। আমিও একটা ছেলে! আমি যা বলব, সেইটাই জানবে ঠিক।'

'তুমি ছেলে নও।'

'তার মানে?'

'তার মানে তুমি আর এখন ছেলে নও। আধবুড়ো।'

বিনয় বললে, 'আধবুড়ো হলেও ছেলে তো?'

'আধবুড়ো, না ছেলে, না মেয়ে, একটি ভ্যাবাগঙ্গারাম।'

'তাই না কি? তা হলে অত বড় একটা অফিস সামলাচ্ছি কি করে।'

'আজকালকার অফিস আর সামলাতে হয় না। চলছে চলবের যুগ।'

'এরপর তা হলে বলবে, মেয়েদের ঠোঁটে একটু গোঁফের রেখা থাকলে আকর্ষণ বাড়ে।'

'বাড়েই তো। আমি যা যা বলছি সব সত্যি। তার প্রমাণ আমি আর তুমি!'

'তার মানে?'

'মনে আছে বাহাত্ত্র সালের কথা? যখন তুমি আমার প্রেমে লাট খাচ্ছ।'

'প্রেমে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি বলতে, যত দেখছি তত চমকে উঠছি। তুমি আমাকে এক হাটে কিনে, এক হাটে বেচে দিতে পার।'

'বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ বুড়ো। মনে করে দেখ। তখনও আমার এই রকমই গলা, ঠোঁটের ওপর হালকা

গোঁফের রেখা। তখন আবার এও বলেছিলে, কটা-সুন্দরীর চেয়ে শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। সাধে আমি ম্যাড হয়ে তোমার পেছন পেছন ঘুরছি?'

'আমি তোমার পেছনে ঘুরেছি, না তুমি আমার পেছনে ঘুরেছ?'

'আহা, তাই না কি? কি বা শুনি আজ মন্থরার মুখে। কার্সিয়াঙএ মামার বাড়ি গেছি, তোমার জ্বালায় কলকাতায় টেঁকতে না পেরে। দ্বিতীয় দিন সকালে বাজারে গেছি। মাফলার জড়ানো এ মূর্তি কে। একগাল হ্যাঁস, হে হে এই মাত্র নামলুম শ্যামা। প্রাণ অমনি জল হয়ে গেল আমার। এত বড় নির্লজ্জ, আমাকেই আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কোথায় উঠবে শ্যামা? মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, তা একটু একটু পড়েছে বই কি!'

'তা হলে, কে ঘুরেছিল? তুমি না আমি?'

'তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

'খুব ঠিক ছিল। একেবারে শ্যাম পাগল। বুঁচকিটিকে ঠিকই চিনতে।'

'যাক গে, সে সব পুরোন কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো। খেসটা পারবে আনতে?'

'চেষ্টা করে দেখি। আমি পারব না এমন কাজ অবশ্য খুব কমই আছে।'

শ্যামার মেয়ে রেখাকে আজ দেখতে আসবেন পাত্রপক্ষ। মাসখানেক হল কথাবার্তা চলছে। চিঠি চাপাটি। ছবি দেখাদেখি প্রাথমিক নির্বাচন শেষ। এইবার মুখোমুখি। অনেকটা লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার মত। শ্যামার চেয়ে বিনয়ের দুর্ভাবনাই বেশি। ছবিতে কেরামতি চলে, চেহারায় তো চলে না। মেক আপে তো সব হয় না। তবে ভরসা এই, রেখাকে পুরোপুরি তার মায়ের মত দেখতে নয়। শ্যামাকে অনেকটা ডেকাথেলন চ্যাম্পিয়ানের মত দেখতে। আট আনা বারো আনা ছাঁটে চুল কেটে দিলে বোঝে কার সাধ্য পুরুষ কি মহিলা। ভাগ্য ভাল, রেখা অনেকটাই বাপের চেহারা পেয়েছে, গলাটাই যা ভয়ের! ভল্যুম কনট্রোল নেই। আর মেজাজটাও মায়ের দিকেই গেছে। এপাশ ওপাশ সহ্য করতে পারে না, মিলিটারি মেজাজ। শল্যোপচারের ডাক্তারও হতে পারত। ভাবটা এই রকম : ঝামেলা করছে কেটে ফেলে দাও। বোতাম ঘরে বোতাম আটকে গেছে! বুকের কাছে জামাটা ফাঁড়াস করে ছিঁড়ে পা গলিয়ে খুলে ফেল। ড্রয়ারের চাবি আটকে গেছে। মারো টান। হুড়মুড় করে সব পড়ে গেল। শ্যামার মতই চরিত্রে ধৈর্যের ধও নেই। এই তো সেদিন। পায়ের বুড়ো আঙুল চটির স্ট্র্যাপে কি ভাবে যেন আটকে গিয়েছিল। চটির বেয়াদপিতে এমনই অধৈর্য হয়ে পড়ল, মার ঝটকা, চটি ছিটকে গিয়ে দুধের ডেকচিতে। বুড়বুড়ি কেটে ডুবে গেল। আঙুলে একবার একটা চোঁচ ফুটেছিল। প্রথমে পাখি ছুঁচ দিয়ে একটু চেষ্টা হল, শেষে ধ্যাত তেরিকা, ব্লেড দিয়ে খানিকটা মাংস উপড়ে মাস খানেক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অচল হয়ে বসে রইল। রেখার জন্য বিনয়ের ঘুম গেছে। এ মেয়ে একমাত্র ডিকটেটারেরই স্ত্রী হতে পারে! পাত্র খুঁজতে হবে জাম্বিয়ায়, নাম্বিয়ায়, ঘানায় কিংবা লিবিয়ায়।

বিনয়দের ফ্যামিলির একটা ট্র্যাডিশান আছে। সেটা হল কেউ এলেই তাকে এমন খাওয়ানো, যেন তিন দিন হাঁ করতে না পারে। ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, পাশে চাকনা দেবার জন্যে একটি কাঁচা লঙ্কা। ঝুরো ঝুরো আলু ভাজা। দু'পিস পাকা রুইমাছ

ভাজা, অন্তত চার রকমের মিষ্টি, বিগ সাইজের। এক প্লেট রাবড়ি খাও এবং খেয়ে সামলাও। আজকে সেই ধরনের ব্যবস্থাই হবে। কিঞ্চিৎ বেশি। কারণ যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁরা অত্যন্ত বনেদী পরিবারের মানুষ। গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। বাড়ির মেঝে মার্বেল পাথরের। পেট্রলের দাম বাড়ায় গাড়ি অধিকাংশ সময়েই গ্যারেজে থাকে। কর্তার হুকুম, নেহাত প্রয়োজনে না পড়লে তেল পোড়ানো চলবে না। কর্তা রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কর্তা আর গিন্নি দু'জনেই বেশ গতরঅলা মানুষ। দু'ছেলে তিন মেয়ে। তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। তিন জামাই গাড়িধারী। একজন ডাক্তার। তিনি প্রোফেসান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শ্বশুরবাড়িতে কালেভদ্রে আসেন। আর একজন ইঞ্জিনিয়ার ! তিনি প্রায়ই আসেন। শ্বশুর শাশুড়িকে গাড়ি চাপিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যান। সংসারের প্রিয় জামাই। তৃতীয়টি প্রবাসী। হাওয়াই কোম্পানীতে চাকরি। এই মাদ্রাজে তো কাল বোম্বাইতে।

বিনয় এ সব খবর সংগ্রহ করেছে তার বন্ধুর কাছ থেকে, যিনি এই যোগাযোগের কর্মকর্তা। বিনয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেছে। কারণ শ্বশুর আর শাশুড়ি বস্তু দু'টিতে তার ভীষণ ভয়। মেয়েটিকে যদি নেয়ও, কেমন ব্যবহার করবে কে জানে ? আজ-কালকার ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না। বিয়ের পর নিজমূর্তি ধরতে মাস তিনেক সময় লাগে, বরাতের কথা ফেলা-রাখা যায় না ঠিকই, তবু যতটা পারা যায় দেখে শুনে, খোঁজ খবর নিয়েই এগোনো উচিত।

বাড়ি-ঘর বেশ মনের মতই সেজে গুজে উঠেছে। শ্যামা খেসটা শেষ পর্যন্ত জোগাড় করে এনেছে। কথায় আছে চিল পড়লে কুটোটা অন্তত নিয়ে যাবেই। শ্যামা হল সেই চিল। সোফাসেট, ডিভান সরে গেছে। মেঝেতেই সব আয়োজন পাকা। বসেও আরাম, দেখেও আরাম। জানলার পর্দা টর্দা, দরজার পেলমেট সব নতুন করে লাগানো হয়েছে। পুরো ঘরটাই যেন স্টীম লণ্ডী থেকে কেচে বেরিয়ে এসেছে। আয়োজন দেখে বিনয় নিজে নিজেই বাঃ বাঃ করে উঠল।

চারটে প্রায় বাজে। আসার সময় হয়ে এল। কথা আছে চার জন আসবেন। ছেলে, মা, বাবা। একজন পারিবারিক বন্ধু। ছেলের বড় মামা। তিনজন পুরুষ একজন মাত্র মহিলা। মহিলার সংখ্যা কম থাকাই ভাল। মেয়েরা বড় নাকতোলা হয়। শ্যামার সঙ্গে হয়ত শেষে ঝটাপটিই বেধে গেল ! কিস্যু বলা যায় না। মেয়ের মাকে যে প্রথমটায় কেঁচো হয়ে মেয়ে পার করতে হয়, তারপর ফোঁস ফোঁস চলতে পারে, এই কূটনৈতিক চালটা বিনয় এত করেও বউকে শিখিয়ে উঠতে পারল না। বললেই বলবে, মেয়ের মা হয়েছি বলে চোরের মত থাকব কেন। সব ফ্যামিলিতেই মেয়ে আছে। বউরাই পরে গিন্নি হয়, গিন্নিরাই শাশুড়ি হয়। আমার দাপট আমি ছাড়ব না। মেয়ে আমার কিছু কম যায় না। তুমিও এমন কিছু ফেলনা নও। শেষের কথায় বিনয়ের অহঙ্কারে বেশ সুড়সুড়ি লাগে। বিনা প্রতিবাদে শ্যামার যুক্তি মেনে নেয়।

দরজার সামনে রাস্তার ধারে বিনয় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন ব্লেডে দাড়ি চেঁচেছে। গালে মেখেছে আফটার শেভ লোশান। দিশি ধুতিতে যত্নের কোঁচ। আধুনিক বাপেদের জিওগ্রাফি বেশ পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টাবে না কেন ? বাজেট যেখানে প্রায় পঞ্চাশ

হাজার, মেয়ের বাপ জুতো মশমশিয়ে হবু বেয়াইয়ের জন্য মুখে সিগারেট গুঁজে, চোখে রিমলেস ঝুলিয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে পারে। মেয়ে শিক্ষিতা সুরূপা। দেঁতো হাতি নয়, ট্যারা পেঁছা নয়। বংশোচিত বিনয়ে আপ্যায়ন, আসুন, বসুন, দেখুন। পছন্দ হয় ভাল, না হয় ছেলের অভাব নেই। ম্যানম্যানের, প্যানপ্যানের যুগ চলে গেছে।

রাস্তার একটা ঘোড়ার গাড়ি ঢুকছে। বিনয় অবাক। শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন গাড়ি দেখা যেত। এখনো মাঝে মধ্যে দেখা যায়' চৌরঙ্গীর দিকে। গঙ্গার ধারে রাতের বাবুরা হাওয়া খেয়ে বেড়ান। মাঝে মধ্যে দুধের ক্যান নিয়ে এক-ঘোড়ার একটা গাড়ি এ দিক থেকে কোন দিকে যেন যায়? এ ঘোড়াটা তত মড়া-খেকো নয়। মাড়োয়ারীদের বিয়ের ঘোড়ার মত। পড়তি জমিদারের মতো। চেকনাই এখনো কিছুটা লেগে আছে। কচোয়ান হাঁকল, 'বিনয়বাবুকা কোঠি?'

'হাঁা, এ হি কোঠি।'

'নমস্তে সাহাব।' রাশ টেনে গাড়ি থামাল। জানলা দিয়ে বুলডগের মত লাল মুখ বেরিয়ে এল, 'মনে হয় আপনিই বিনয়বাবু?'

বিনয় হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'রোককে, রোককে।'

গাড়ি রুখেহ আছে। বাঙালীর স্বভাব, বাস থেমে থাকলেও যাত্রীরা রোককে বলে হুড়মুড় করে নামেন। কচোয়ান তিড়িং করে কোচবকস থেকে লাফিয়ে পড়েই, গাড়ির দরজা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। চার জোড়া হাঁটু দেখা গেল। লোকে সিটি মারবে। আশেপাশের বাড়ির জানলায় মুখ বেরোতে শুরু করেছে। পুলিশই বা এমন একটা গাড়ি ছেড়ে দিল কি করে'

বহুত কসরত করে বিশাল এক মোটা মানুষ গাড়ি থেকে প্রথমে নেমে এলেন। ভারমুক্ত হয়ে গাড়ি প্রায় এক হাত ওপর দিকে উঠে পড়ল। ঘোড়াটা ভোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু যেন সুস্থ হল। গাড়ি থেকে অন্যান্য সকলে নেমে পড়লেন। ক্যামেরা থাকলে বিনয় একটা ছবি তুলে রাখত। পর্বতের পাশে c ং তিন টুকরো টিলা। একজনকে ছাড়া বিনয় আর কাউকেই চেনে না। যাকে চেনে তার নাম হিমাংশু আচার্য। হিমাংশুর যোগাযোগেই এই দেখাশোনা। না চিনলেও স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, তিনিই পুত্রের পিতা। জেলা শহরে আসামী ঠেঙানো মানুষ। অবসর নিলেও সারা দুনিয়াটাকে এখনো যেন এজলাস থেকেই দেখছেন। যে মহিলাকে এরই মধ্যে বার দুয়েক ধমকধামক লাগানো হয়ে গেল, তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রী। স্ত্রী ছাড়া আর কার সঙ্গে অমন ব্যবহার করা যায়।

হিমাংশু হাসতে হাসতে বললে, 'কত্তা ঘোড়ায় চেপে তেল বাঁচাচ্ছেন।'

বিনয় বললে, 'এ জিনিস এখনো আছে?'

'যত্ন করে রাখলে সবই থাকে ভাই। এঁর বাবা সিভিল সার্জেন ছিলেন। তাঁর আমলের জিনিস। ঘোড়াকে বাতে না ধরলে যৌবন সিল্কের কাপড়ের মত দু তিন পুরুষ থেকে যায়।'

কথা বলতে বলতে সকলে ঘরে এসে পড়েছেন। মেঝেতে বসার আয়োজন হয়েছে

দেখে কর্তা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ও হিমাংশু, চিরটা কালই তো সিংহাসনে বসে এলাম, আজ আবার এ কি হল ? জানই তো আমার মধ্য-প্রদেশ সব প্রদেশের বড়।'

বিনয় বললে, 'ভাববেন না আমি সোফা প্লেস করে দিচ্ছি এখুনি।'

যতটা তটস্থ হলে ভাল দেখায় ঠিক ততটা তটস্থ হয়েই বললে। মন কিন্তু গজগজ করছে, সিংহাসনে বসে এসেছেন। কত বড় কাজি ছিলেন। জেলা সদরের ম্যাজিস্ট্রেট। রঙচটা কাঠের চেয়ার। সে চেয়ার আমি যেন দেখিনি। পেছন দিকের ঠেসান দেবার অংশটা সাধারণ চেয়ারের চেয়ে উঁচু হয়। মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। সিংহাসনে বসি। ওরে আমার চিফ জাস্টিস রে।

শোবার ঘর থেকে সোজা বেরোবে। সেই সকাল থেকে রাজেনের সঙ্গে সমানে লেগে থেকে থেকে বসার ঘরের দিশি অঙ্গসজ্জা হয়েছিল। নাও এবার বোঝো ঠ্যালা। নাইনটিনথ সোফার গতরটি তো নেহাত কম নয়। এ মাল একমাত্র পবননন্দনই একা বহন করতে পারে। তার মত ফিনফিনে বাবুর কম্ম নয়। আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখে ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। ছেলের বাপের এক কিকে পেনাল্টি সীমানার বাইরে গিয়ে পড়বে। দেহ ছোট হলে মনও ছোট হয়ে যায়। বড় খোলে বড় জিনিস থাকে, ছোট খোলে ছোট জিনিস। এই তো নিয়ম।

হিমাংশু, রাজেন আর বিনয়ের চেষ্টায় সেই গায়েগতরে সোফা মেঝের ওপর দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে যথাস্থানে রাজসিংহাসন হল। পাত্রের পিতা হারানিধি বসে ছাড়লেন। অতখানি ওজন দুটো পায়ের ওপর এতক্ষণ ধরে রাখার একটা ক্লান্তি আছে। বসে সুস্থ হয়ে ঘরের চারপাশ ভাল করে এক নজর দেখে নিয়ে বিনয়কে জিজ্ঞেস করলেন—'দরজা জানলা কি বার্মা টিকের ?'

'আজ্ঞে না, সত্তর সালের বাড়ি, এমনি সিপি টিকেই দশহাত জিভ বের করে ছেড়ে দিয়েছে, বার্মা পাব কোথায় ?'

'শুনলে শশাঙ্ক ?' শ্যালককে উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'বার্মা কোথায় পাব ? সন্ধান রাখতে হয় মশাই, সন্ধান রাখতে হয়। সন্ধান করলে ঈশ্বর মেলে, বার্মা টিক মিলবে না। আমরা কি করে পেলুম শশাঙ্ক ?'

ত্যারছা চোখে হারানিধি বিনয়ের দিকে তাকালেন। বিনয়ের মনে হল খুব বুড়ি, মোটা এক বাঈজী তাকে চোখের ভঙ্গি করছে তিরছি নজরিয়াকে বান।

'জলছাত করেছেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'সে এ কীই। দশ বছর বাড়ি হয়ে গেল জলছাত হয়নি ! কি বলে শশাঙ্ক। ঢালাইয়ের লোহা বেরিয়ে পড়বে। করেছেন কি !'

বিনয়ের ভীষণ অবাক লাগছিল। ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে এসেছেন না বাড়ি। মিউমিউ করে বললে, 'এই করব করব করে আর ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারিনি।'

'ওই হয়, করব না, করব না করে বুড়ো বয়েসে বিয়ের মত হবে আর কি ? সব কিছুরই বয়েস আছে মশাই। টাকে তেল ঢাললে কি আর চুল গজাবে। তেলের পয়সাটাই বরবাদ হবে। কি বল শশাঙ্ক ?'

শশাঙ্ক যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় বয়স্য গোপাল ভাঁড়। হয় হেসে, না হয় তাল দিয়ে ভগ্নীপতিকে ঠেকা দিয়ে চলেছে।

'টোট্যাল কস্ট কত পড়েছিল?' হারানিধি আরো গভীরে যেতে চান।

বিনয়ের এবার বিশ্রী লাগছে। এত কৌতূহল তো অভদ্রতারই সামিল। বিনয় তবু ভদ্রভাবেই বললে, 'ঠিক মনে নেই, সত্তর হাজারের মত হবে।'

'জমি ধরে?'

'না জমি আলাদা।'

'ক' কাঠা আছে?'

পাঁচ কাঠার মত।'

ভদ্রলোক শ্যালকের দিকে তাকিয়ে হাঁটুতে তাল ঠুকে বললেন, 'চলো, উঠি তা হলে?'

বিনয় অবাক হয়ে বললেন, 'কেন? সে কি কথা? উঠবেন কেন?'

শ্যালকও ধরতে পারেনি, 'মেয়ে দেখবেন না?'

'আর দেখে কি হবে?'

বিনয় হঠাৎ বলে ফেলল, 'কেন জলছাদ নেই বলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ধরেছেন ঠিক।'

বিনয় কি ধরেছে নিজেই জানে না। ধরাটা হঠাৎ মিলে গেছে দেখে অবাক হয়ে বললে, 'জলছাতের সঙ্গে মেয়ে পছন্দ-অপছন্দে কি সম্পর্ক?'

'ও, ধরেও ধরতে পারেননি দেখছি। আচ্ছা, ছাত কত বর্গ ফুট আছে?'

'মাপিনি, তবে মনে হয়, ছশো কি সাতশো স্কোয়ার ফুট, হবে।'

'জলছাতের খরচ কত হবে বলে মনে করেন?'

'আজ্ঞে ধারণা নেই।'

'পাঁচ সাত হাজার। কি বল শশাঙ্ক? পাঁচ সাতে হবে না?'

'বড় জোর আট।' শশাঙ্ক আর একহাজার ওপরে উঠে জ্ঞান জাহির করল।

'তাহলে একবার বুঝে দেখো, হিমাংশু আমাদের এমন জায়গায় এনেছে যিনি গত দশ বছরে আট হাজার টাকার মুখ দেখেননি। দেখলে জলছাত হয়ে যেত। বিনয়বাবু, আমার ছেলে সি ২, ছ' ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ। আপনার বাজেট কত টাকা?'

বিনয় আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল পঞ্চাশ হাজার। সামলে নিল। ভেতরটা ঘৃণায় কুঁকড়ে যাবার মত হচ্ছে। আর যাই হোক এমন মহামানবের পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্বপ্নেও সম্ভব নয়। সে বললে, 'আমার মত লোক আর কত খরচ করতে পারে? আপনি নিজেই অনুমান করে নিন।'

'সেই অনুমান করতে পেরেছি বলেই আর সময় নষ্ট করতে চাইছি না, আমাদের আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা সবই বড় বড় ঘরে। ছেলের বিয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকতে পারব না। আপনারও অস্বস্তি, আমারও অস্বস্তি, আপনার মেয়েও মাথা উঁচু করে চলতে পারবে না। আমাদের বংশে বউরা এসেছে বড় বড় বংশ থেকে।, সোনার কাজ করা জামদানী পরে। শরীরের এক ইঞ্চিও খালি থাকত না, সব সোনায় মোড়া। চল হে শশাঙ্ক।'

'একেবারে শুধু মুখে চলে যাবেন। একটু জলযোগ করে গেলে সুখী হতাম।'

'জলযোগ? যেখানে সেখানে যোগ করার বয়েস কি আর আছে মশাই? চলো হিমাংশু। আমার তিন কেজি ছোলাই লস হল তোমার জন্যে।'

হিমাংশু আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, 'আজ্ঞে পেট্রল হলে লোকসানের পরিমাণটা আরো বেশি হত।'

হ্যাঁ, তা অবশ্য হত। আমার গাড়ি আবার একটু বেশি তেল খায়।'

ঘোড়া ন্যাজ নেড়ে নেড়ে খড় খাচ্ছিল। কচোয়ান বাবুকে দেখে কোচবক্সের ঢাকনা খুলে খড় তুলে রাখল। হারানিধি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি আবার দেবে গেল এক হাত।

মাথার ওপর বাতাস কেটে ছপটি ঘুরল। ঘোড়া ছুটল কদম কদম তালে। হঠাৎ বিনয়ের ভীষণ হ'সি পেয়ে গেল। ঘরের একমাত্র সোফায় পা ছড়িয়ে বসে হো হো করে হেসে উঠল। সোফাটা তখনো দেবে আছে। বিনয় হাসছে আর বলছে, 'উরে বাপরে মানুষ, মানুষ।' শ্যামা ঘরে এসে অবাক। বিনয় কোন রকমে বললে, 'কি জিনিস এসেছিল গো। মেয়ের বিয়ের আগে জলছাদের ব্যবস্থা কর।'

ন্যাড়ার বেলতলা

আমি এক ন্যাড়া, একবারই বেতলায় গিয়েছিলুম। আমি তাও ইচ্ছে করে যাইনি, অন্তত আমার নিজের এই ধারণা। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ন্যাড়ারই উচিত আর এক ন্যাড়াকে সাবধান করা। উচিত নয়, কর্তব্য। ন্যাড়াদের উদ্দেশ্যে একটি রেকর্ড-সংগীত আছে :

ভ্রমরা আ আ, ফুলের বনে মধু নিতে
অনেক কাঁটার জ্বালা
ও তুই যাসনে সেখানে
ন্যাড়াআ, ন্যাড়ারে কি হবে তোর
বেলতলাতে
যেমন আছিস বেশ তো আছিস একলা
মহাসুখে।

'শোন বিভূতি, আমাকে দেখে তোর শিক্ষা হওয়া উচিত। পাগলে বিয়ে করে, জন্মায় ছাগল তারপর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, ও হো হো আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বেশ সুখে আছিস, সাধ করে কেন ভূতের কিল খেতে যাবার ইচ্ছে।'

বিভূতিকে আমার সেভ করা উচিত। জীবনে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যাওয়া উচিত। বিভূতি ব্যাটা একবারও বিয়ে করেনি। তাই ভাবছে বিয়েতে না জানি কত সুখ! ওগো, শুনছো, হ্যাঁগো! একমাস। টর্চের ব্যাটারি দেখছিস! ক্রমশ জোর আর জেল্লা

কমতে কমতে একসময়ে ফুস। এ ব্যাটারি এমন ব্যাটারি, ফেলতেও পারবি না। ওই ফতুর মালই সাজিয়ে রাখতে হবে। তোর জীবনের টর্চলাইটে ভরে রাখতে হবে।

বিভূতি গুনগুন করে গান গাইছে। হাঁটুর ওপর খবরের কাগজ। সিনেমার পাতাটা খোলা। সবে কায়দা করে চুল কেটেছে। শ্যাম্পু করেছে। এই গানটাই ও আজকাল অনবরত গুনগুন করে : পেয়ারকা বন্ধন, জনমকে বন্ধন, বন্ধন টুটে না আ আ।

'শোন বিভূতি ওসব বাজে প্রেমমার্কা ফিল্মের গান ছাড়। প্রেম একধরনের নেশা। রাতে আসে, সকালের খোয়াড়ি ভাঙতে জীবন বেরিয়ে যায়। যে জানে সে জানে, ভ্রমরা তুই যাসনে সেখানে।'

'আজ সিনেমায় যাব। কোনটায় যাই বল তো, দিলকা সংঘর্ষ' তেরা প্রেম মেরা প্রেম", "দিলকা চাককু" কোনটারই টিকিট পাব না। ইংরেজি কি হচ্ছে দেখি, লাভ সং, লাভার্স লেন, লাস্ট সামাব। ও ঐ তো ঘাপটি মেরে বসে আছে এক কোণে রঙ্গিলী রাত। প্রফুল্ল, তিনটে ছটা নটা। দিস ইজ মাই ফিলম। ছটার শো নটার কিছু আগেই ভাঙবে। তারপর লাহোরে ঢুকে মুর্গা মসল্লাম। আহা পেয়ারকা বন্ধন। জনমকা বন্ধন।

'কি তখন থেকে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করছিস।'

'আমাকে দ্যাখ, দেখে শেখ, প্রেম হল ঠুনকো কাঁচের গেলাস, আজ আছে কাল নেই। কেন সাধ করে মরবি। বেশ আছিস ব্যাচেলার আছিস, খাচ্ছিস দাচ্ছিস ভুঁড়ি বাগাচ্ছিস। হাজব্যাণ্ড শব্দটার মধ্যে একটা ব্যাণ্ড আছে খেয়াল করেছিস। সেই ব্যাণ্ডটাই কলার ব্যাণ্ড হয়ে গলায় চেপে বসবে তখন আর খুলতে পারবি না।'

'তুই তখন থেকে একনাগাড়ে ভাঙচি দিচ্ছিস কেন বল তো। তোর কি স্বার্থ। বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো।'

'আরে ছি ছি। ওটা তো কোন এক গোঁয়ার গোবিন্দ বখাটে মেয়ের গানের কলি। আমার আবার স্বার্থ কি। তোর নিজের স্বার্থেই বলা। আমার বিবাহযোগ্যা মেয়েও নেই যে তোকে জামাই ঠাউরে কথা বলব। আমার কথা হল পাখির মত বেশ কেমন সহজ স্বাধীন জীবনদাঁড়ে বসে, কেন ইচ্ছে করে পায়ে শিকলি জড়িয়ে মরবি।'

'বাহুবন্ধন কাকে বলে জানিস ? পেলব দুটি হাত যখন পেছন দিক থেকে এসে গলাটি জড়িয়ে ধরে, উঃ ফ্যানটাসটিক। দেখ দেখ শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। শুনেছি শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম করতে করতে এই রকম রোমাঞ্চ হত। পিঠ স্পর্শ করে আছে একটি উষ্ণ শরীর। ফুলের গন্ধ, নিশ্বাসে বুকের ওঠাপড়া। কানের পাশে ঠোঁটের সুড়সুড়ি। ও হো হো হু। গিরিফতারে উলফতে সইয়াদ।'

'শোন, শোন বিভূতি, প্রথম প্রথম পেলব বাহু মনে হবে, পরে ওই বাহুই জামার কলার চেপে ধরবে। বোতাম ছিঁড়ে পড়ে যাবে, পরে আর বসিয়েও দেবে না। ওই উষ্ণ স্পর্শ ক্রমে গরম স্টোভের ছ্যাঁকা হয়ে পিঠ পুড়িয়ে দেবে। ফুলের গন্ধ হবে বোদা চুলের গন্ধ। মেয়েদের সাজগোজ শ্যাম্পু ম্যাম্পু যা কিছু বিয়ের আগে পর্যন্ত। ওসব স্টেজ পেরিয়ে এসেছি বলেই তোকে সাবধান করতে আসা।'

'বস্ চুপ রহো, হমারেভী মুহমে জবান হ্যায়। তোর সাইকেলটা একবার দিবি, রঙ্গিলী রাতের দুটো টিকিট কিনে আনি। আগে ভাগে না কাটলে কোণের দিকে জোড়া সিট

পাব না। পেয়ারের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে!'

'না ভাই আত্মহত্যা করার জন্য আমি সাইকেল দিতে পারব না। তুই হিন্দু সৎকার সমিতির সাহায্য নে।'

'ও, তোর জেলাসি হচ্ছে? তা হলে তোকেই আমি কাজের ভারটা দি। তুই দুটো টিকিট কেটে মধুছন্দার হাতে দিয়ে আয়। বলবি, ঠিক ছটায় প্রফুল্লর সামনে।'

'আমি?'

'ইয়েস তুমি। মধুছন্দাকে দেখেছো দোস্ত? তা হলে শোন, নেহায়ত পাগয়া নাসহাসাস উনর ভরকি লিয়ে! কি বুঝলে?'

'নাথিং। ও ভাষা তোমার প্রেমের ভাষা।'

'আমার প্রেমের বিরুদ্ধবাদী শ্যালকটি, যে ব্যাটা গায়ে পড়ে বাগড়া দিতে আসত তার হাত থেকে সারা জীবনের মত ছুটি মিলছে। না, খুন না, গাড়ি চাপা নয়। তাহলে? উসিকো ভেজ দিয়া ইয়ারকো খবর কে লিয়ে। সেই ব্যাটাকেই পাঠিয়েছিলুম আমার প্রেমিকার খবর দিতে। সেই যে সে গেছে আর ফেরেনি।'

'নাঃ ইউ আর এ লস্ট চাইল্ড। ষড়যন্ত্র করে তোর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আহা আহা এমন একটা জোয়ান ছেলে মেয়েছেলের খপ্পরে গিয়ে পড়লি? শেম শেম।'

'শেম শেম কিরে? বল গেম গেম।'

॥ ২ ॥

সাধু বললে, 'কি হল রে, ফেরাতে পারলি।'

'না রে টোপ গিলে বসে আছে, মধুছন্দার হাতে সুতো। এখন খেলাবে, খেলাতে খেলাতে খলবলে করে হয় তুলবে না হয় ছেড়ে দেবে।'

'মধুছন্দার চারে ভিড়েছে। মরেছে! সে তো তিন চার হাত ফেরতা খেলিয়ে মেয়েছেলে! বিভূতির বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।'

'ছেড়ে দেয় দেবে। যে দেখে শিখবে না, সে ঠেকে শিখুক!'

'না না, হাল ছাড়লে চলবে না রে। বিভূতিই আমাদের একমাত্র ভরসা। ওর বাড়িটাই আমাদের ওয়েসিস। আমাদের শেষ মাসের মহাজন। ওখানে মধুছন্দা ঢুকে পড়লে আমাদের কি হাল হবে বুঝতে পারছিস না এখন। বিভূতি গেল, প্লাস আমরাও গেলুম।'

'মহা ফাঁপরে কড়া গেল। মধুছন্দা নিজে না ছেড়ে দিলে ওকে ছাড়ান শক্ত। কচ্ছপের কামড়, বুঝলি সাধু, কচ্ছপের কামড়!'

'মধুছন্দা সহজে ছাড়বে না রে। বারবার তিনবার। মধুছন্দার বয়েস হয়েছে, এই তার শেষ শিকার। মাছটাও তো খারাপ নয়।'

'কাল তাহলে আর একবার চেষ্টা করে দেখব। শেষ চেষ্টা। বাবু আজ সিনেমায় গেলেন। তার মানে প্রেম আরও দু-কদম এগিয়ে গেল। তোর সে বইটা আমাকে একবার দে তো।'

'কোন বইটা?'

'নামটা মনে নেই, তোর বই রাখার জায়গায় চল, দেখলেই চিনতে পারব।'

'আবার বাড়ি ঢোকাবি ? এইমাত্র এক পশলা হয়ে গেল। আকাশ এখন গুম মেরে আছে।'

'সামান্য একটা মেছেলেকে অত ভয় পাসনি তো। যত ভয় করবি তত পেয়ে বসবে। পুরুষ হ। পৌরুষ দেখা। তোর অমন গোঁফ, এমন চেহারা! মিনমিন করিস কেন? চল।'

পরের দিন সকালেই বই বগলে বিভূতির বাড়িতে হাজির। মেঝেতে আসন পেতে সামনে ছোট আয়না রেখে ভীষণ মনোযোগ সহকারে দাড়ি কামানো চলছে। আমি ঢুকেই দেখলুম মুখ ওপর দিকে তুলে হাতের তালু উল্টোদিকে ঘষে ঘষে বিভূতি গালের মসৃণতা পরীক্ষা করছে। ঠোঁটের ওপর গতকাল বিকেলেও যে গোঁফটা ছিল সেটা নেই।

'তোর গোঁফ?'

'বিসর্জন দিয়ে দিলুম। মধুছন্দা গোঁফ পছন্দ করে না। কাল যেই বললে আমার গুঁফো মুখটা ঠিক বিশ্বকর্মার মত দেখাচ্ছে, তখনই বুঝলুম প্রশংসা নয়, নিন্দেই করলে। যদি বলত কার্তিক, তাহলে এতদিনের জিনিসটা রেখেই দিতুম। বুঝলি না, বিশ্বকর্মা তেমন ইনটেলেকচুয়াল দেবতা নয়। ইন্দ্রের দেবসভায় তাকে বসতে দেয় না। উর্বশী, রম্ভা তার সামনে ক্যাবারে নাচে না।'

'তা বলে তুই মেয়েছেলের কথায় তোর অমন চাষ করা গোঁফটা ফেলে দিলি। এইভাবে তুই প্রেমের কাছে বিকিয়ে গেলি। স্যামসনের কথা মনে আছে তো। মেয়েছেলের কথায় বেচারা চুল ফেলে দিয়ে ভেড়া বনে গেল। এরপর তোকেও তো ন্যাড়া করে ছেড়ে দেবে।'

'দেয় দেবে, তবু প্রেম যুগে যুগে। প্রেমেরও সমাধিই তীরে রে এ এ, হেহে পরের লাইনটা কি রে। সুরটা মনে আছে বাণী মনে আসছে না। এই সময়ে মেমারিটাও বিট্রে করছে রে। যৌবনের সেই সব গানটান আবার ঝেড়ে ঝুড়ে বের করতে হবে। প্রেম সেই এলে, রেল কম্পানি গাড়ির মত কেন এলে লেটে?

না, একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ঝট করে বইটা খুলে ফেললুম। মার্কা দিয়েই রেখেছিলুম। বিভূতি আর কিছু বলার আগেই হুড়হুড় করে পড়তে শুরু করলুম যেন দমকল। হোস পাইপ দিয়ে আগুনে জল ঢালছি: শ্রীরাম বলিলেন—শিরা, কঙ্কালগ্রন্থি ও মাংসময় রমণীর প্রত্যঙ্গে যথার্থ শোভার জিনিস কি আছে? হে জীব! রমণীর খঞ্জননিন্দিত লোচন, চর্ম, মাংস রক্ত এই সব বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, যদি ঐ সব বস্তু রমণীয় হয় তো উহাতে আসক্ত হও, নতুবা অযথা উহাতে আসক্ত হও কেন। এখানে কেশ, ওখানে নখ, সেখানে রক্ত, এই সবের সমবায়েই তো রমণীর শরীর। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কদর্য নারীদেহ লইয়া কী করিবে? অহো। রমণীর যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বস্ত্র ও অনুলেপনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে। শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশী জীব সেই সকল অবয়ব ভক্ষণ করে, যে স্তনযুগলে মুক্তহারের কমনীয় শোভা নেত্রগোচর হইয়া থাকে, রমণীর সেই কমনীয় পয়োধর, কালে, শ্মশানের প্রান্তদেশে সারমেয়গণ কর্তৃক মাংসপিণ্ডের ন্যায়...

বিভূতি উঠে পড়ল, 'তোর পরীক্ষা-টরিক্ষা আছে বুঝি। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা!'

'তার মানে ?'

'না গড় গড় করে কি সব পড়ে যাচ্ছিস, আবোল তাবোল। পরীক্ষা মানেই তো যতসব ঝড়তি-পড়তি মাল পড়া আর সেই সব মাল উগরে দেওয়া।'

'এসব ঝড়তি-পড়তি নয় বৎস, জীবনের আসল জিনিস, উপলব্ধির কথা। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনির কাছে বলছেন—হোয়াট ইজ এ মেয়েছেলে ! মদ্যে ও মদির-নয়না রমণীতে কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। কেননা মত্ততা ও মদোন্মত্ততা দ্বারা চিত্তের বিকার উৎপন্ন করা উভয়েরই ধর্ম ! মানবরূপী সুষুপ্ত হস্তিগণ রমণীরূপ বন্ধনস্তম্ভে আবদ্ধ থাকিয়া শমরূপ দৃঢ় অঙ্কুশাঘাতেও প্রবুদ্ধ হয় না।'

'দাঁড়া দাঁড়া দুটো শব্দের মানে বল, শম মানে কি, প্রবুদ্ধ মানে কি। বড় কঠিন বাংলা রে, কোত্থেকে এ মাল আমদানি করলি। এখন বুঝছি সীতার বিবাহিত জীবনের বারোটা কেন বেজেছিল।'

'শম মানে সংযম, প্রবুদ্ধ মানে জাগা। সংযমের জুতো পেটালেও মানুষের ঘুম ভাঙে না। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। কজ্জল ও কুণ্ডলে শোভিতা, প্রিয়দর্শনী রমণী, দুষ্কৃতিরূপ অগ্নি শিখারূপিণী হইয়া পুরুষকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে। মনণীরূপ প্রমত্ত হস্তী রমরূপ বন্ধনস্তম্ভে রতিশৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থান করে।'

'রতিশৃঙ্খল মানে কি রে !'

'ওই আর কি। বলতে লজ্জা করছে, এই আদরটাদর, ইয়ে টিয়ে। রামচন্দ্র কি বলছেন শোন, রমণীর স্তন, চক্ষু ভ্রূ, নিতম্ব যাহাই করি না কেন, মাংসই তো সে সকলের সার পদার্থ। এইরূপ অপদার্থ বস্তু লইয়া আমি কি করিব ?'

'বা বা, তাহলে সীতাকে বিয়েই বা করলে কেন ? আর লব-কুশকেই বা আনলে কেন ? দাঁড়া আমিও একটা বই বার করছি।'

বিভূতি তাক থেকে খুঁজে খুঁজে একটা বই নিয়ে এল।

'কি বই রে !'

'চার্বাক। শোন, এইবার তুই কানখাড়া করে শোন যাবজ্জীবন সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যখন সমস্ত কিছুর উচ্ছেদ তখন ইট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। সুখই জীবের লক্ষ্য এবং সব সুখের সেরা সুখ অঙ্গনা-লিঙ্গনাদি-জন্যং সুখম এব পুরষার্থঃ। সুন্দরী রমণী দেখলেই জড়িয়ে ধর। তোর ওই রাবিশ বইটা বগলদাবা করে ফেটে পড়। গেট আউট। আমার এখন অনেক কাজ।'

'তুই তাহলে বিয়ে করবিই।'

'হ্যাঁ, করব। অবশ্যই করব। প্রেম একদিনই এসেছিল জীবনে আমার এ দুয়ার প্রান্তে...'

'গান রাখ। বিয়ের পরই অ্যাণ্ডাগ্যাণ্ডা রবারক্লথ, মুতো কাঁথা চ্যাঁ ভ্যাঁ। বাড়ির এই পরিবেশ থাকবে।'

'বুড়ো বয়েসে তুই দেখবি আমাকে ?'

'তোর বউ দেখবে। আজকালকার মেয়েরা সেবা জানে ?'

'জানুক না জানুক সুখম এব পুরুষার্থ। যা ভাগ। তোর সাধুর কাছে যা।'

॥ ৩ ॥

আজ বিভূতির বিয়ে।

দূর থেকে দেখছি বিভূতি একটা রিকশা চেপে আসছে। কোলের ওপর একটা টোপর। পায়ের কাছে একটা চটের ব্যাগে হরেক রকমের জিনিস। গোটা কতক তীরকাঠি উঁকি মারছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে। নিজের টোপর নিজেই কিনেছে, নিজের বিয়ের বাজার নিজেই করেছে। উপায় কি। কেউ তো নেই। পৃথিবীতে বিভূতি একা। কাকার তরফে অনেক ডালপালা, কিন্তু মুখ দেখাদেখি নেই। ছিরি, বরণডালা, জলসওয়া, নান্দিমুখ, গায়ে হলুদ, সাত সতের ঝামেলা কে সামলাবে।

'কি রে বিভূতি ? দাঁড়া দাঁড়া। কি রে, কেউ এসেছে ?'

'কে আর আসবে ? কে আছে আমার ?'

'রেজেস্ট্রি করলেই পারতিস।'

'না রে। মার খুব ইচ্ছে ছিল বউ দেখে যাবেন। তখন তো উপায় ছিল না। মা বলেছিলেন, আর যাই করিস নিকে করে আনিসনি। মাকে কথা দিয়েছি, রাখতেই হবে, চলি রে।'

'তুই জানিস তো।'

'কি ?'

মধুছন্দার টি বি হয়েছিল, তোর আগে তিনটে ছেলে ধরেছিল।'

'সব জানি। জানি বলেই তো বিয়ে করেছি। বিধবা ঠোকরান মেয়েকে আমি না বিয়ে করলে কে করবে। এই চালা চালা।'

আমার সামনে দিয়ে বিভূতি চলে গেল। ন্যাড়া বেলতলায় গেল। তাই কি ?

আজ আছি কাল নেই

'কে দীনবন্ধু নাকি ? এখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছো ?'

'আরে ভবেশ নাকি ? তুমি এ সময়ে। কোথায় চল্লে ? বাড়ি ঢুকলে না ? আমার পাশ দিয়েই তো দুরমুশ করতে করতে গেলে, বেরিয়ে এলে কেন ? অফিস থেকে ফিরলে, চা জলখাবার খাবে। কুশল বিনিময় করবে সারাদিনের পর। এমন আধলা ইট খাওয়া লেড়ি কুকুরের মত মুখ কেন গো ?'

'তোমার পাশে একটু স্থান হবে ভাই ?'

'হবে, বারোয়ারি রক্, ধুলো ঝেড়ে বোসো। বেশি ওপাশে যেও না। কেলো এইমাত্র বেপাড়ার এক মস্তান কুকুরের সঙ্গে চুলোচুলি করে এসে সবে ন্যাজ গুটিয়ে শুয়েছে। মেজাজ চড়ে আছে। ঘাঁক করলেই তলপেটে চোদ্দটা।' ফুঁ ফুঁ করে ধুলো উড়িয়ে ভবেশ বসে পড়ল। বসার সময় হাতের আঙুলে কি একটা ঠেকল। দীনবন্ধুর বাজারের ব্যাগ। কপি, মুলো, ভিজে ভিজে পালংশাক চারপাশে ছেদরে আছে। দীনবন্ধু অফিস থেকে

ফেরার পথে রোজই বাজারটা সেরে আসে। অভ্যাসটা মন্দ নয়। শীতের ছোট্ট সকালে খানিক সময় বেরোয়। একটু তারিয়ে তারিয়ে দাড়ি কামানো যায়। নয়ত তাড়াহুড়োয় ধরো আর মারো টান। ছাল চামড়া গুটিয়ে সাফ।

ভবেশ বলল, 'একি বাজার নিয়ে বসে আছো? দু'কদম এগোলেই তো বাড়ি। বাজারটা রেখে এলেই পারতে। এই নোঙরায় ফেলে রেখেছ? পালমে ইনফেকসান ঢুকবে।'

দীনবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজল তোমার ঘড়িতে?'

'আটটা বাজাতে দশ।'

'উঃ এখনো ঝাড়া দেড় ঘন্টা।'

'হ্যাঁরে ভাই ঝাড়া দেড় ঘন্টা।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছ কেন বসে আছি?'

'হ্যাঁরে ভাই পেরেছি। একটু চা হলে মন্দ হত না।'

'এখান থেকে হেঁকে বিভূতিকে বলো, ভাঁড়ে দুটো চা। দুটো লেড়ো বিস্কুটও দিতে বলো।'

দীনবন্ধু আর ভবেশ খান ছয় বাড়ি ব্যবধানে থাকে। দুজনেই ভাল চাকরি করে। নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলে পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম আছে। এ তল্লাটে সস্তায় জমি পেয়ে দুজনেই বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে। সেই কথায় আছে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির হেলে গরু কিনে। দুজনের বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে পাঁচটি করে অ্যালুমিনিয়ামের আঙুল আকাশের গায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজছে। চ্যাটালো তার বেয়ে সেই আশীর্বাদ ভেন্টিলেটার গলে কাঁচের পর্দায় কখনো নৃত্যে, কখনো কথকথায়, কখনো সঙ্গীতে গলে গলে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক দিন শনিবার। সেদিন হয় বাংলা, ন হয় হিন্দী ছায়াছবি। গেরস্থের আর্তনাদ, পাঁচু প্রাণ যায়।

অদ্য সেই শনিবার। বাংলা ছায়াছবির আসর, অশ্রুসিক্ত ছবি। খটখটে ছবি হলেও দর্শকের অভাব হয় না। পালে পালে পিলপিল করে আসতে থাকেন নেণ্ডিগেণ্ডি, পুঁচিপেঁটকি নিয়ে। দীনবন্ধু টিভি কিনেছিল এরিয়ালের টাকায় স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে। আহা। একা একা বাড়িতে থাক, সন্ধেটা তোমার ভালই কাটবে। স্ত্রীও খুব নেচেছিল। টিভি আসবে শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কচুরি ভেজে স্বামীকে খাইয়েছিল। জুট কার্পেট পাতা লবিতে টিভি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাদে ফোঁস করে ফুঁসে উঠল টিভিঙ্গুলি। সারা পাড়াকে জানান দিতে লাগল, আমি এসেছি, আমি এসেছি। তোমরা এস হে। একবার বুঝিয়ে দিয়ে যাও কত ধানে কত চাল।

ভবেশ টিভি কিনেছিল গৃহবন্দী, অবসরভোগী বৃদ্ধ পিতার সান্ধ্যসঙ্গী হিসেবে। দোতলায় পিতার সুবৃহৎ শয়নকক্ষে নীল পর্দা আঁটা সেই যন্ত্র এখন শক্তিশালী যন্ত্রণা। ডজনখানেক বিভিন্ন স্বভাবের বৃদ্ধের পীঠস্থান। তাঁদের হাঁচি, কাশি, নাসিকাঘর্ষণ, কলহ মতামত প্রকাশের ঘনঘটায় প্রতিটি সন্ধ্যা ভবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়, য পলায়তে স জীবতি।

দুই কৃতকর্মভোগী কৃতী পুরুষ পাঁচুবাবুর রকে বসে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। মশা তাড়াচ্ছেন। নর্দমার চাপা গন্ধ শুঁকছেন আর মনে মনে বলছেন, একেই বলে, বাঁশ কেন ঝাড়ে আয় মোর হিন্দিস্থানে। ভাঁড়টাকে সাবধানে পায়ের তলার বদ্ধ নর্দমায় বিসর্জন দিয়ে ভবেশ বললে, ভট করে চা খেয়ে ফেললুম, বড় বাইরে পেলে মরব।

মরবে কেন? বাড়িতে গিয়ে নামিয়ে আসবে।

বাথরুম খালি পেলে তো। বারোটা শর্করারোগী মিনিটে মিনিটে ছুটছেন, আর প্রতিবার হাতে জল নিয়ে সেইখানে আর গোড়ালিতে শাস্ত্রসম্মত ঝাপটা মারছেন। চোখ বুজিয়ে বাথরুমের অবস্থাটা একবার অবলোকন করার চেষ্টা কর ভাই। কর্পোরেশনও লজ্জা পাবে।

তোমার বাথরুম? আমি মানসচক্ষে আমার বসার ঘর দেখছি আর আঁতকে আঁতকে উঠছি।

দীনবন্ধুর বসার ঘর ঠেসে গেছে। অনাহূতরা সারি সারি বসে আছেন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মত। কাউকেই ফেরাবার উপায় নেই। শত্রুতা বেড়ে যাবে। বলে বেড়াবে বেটার অহঙ্কার হয়েছে। ভগবানের গুনছুঁচ যেদিন বেলুন ফুটো করে দেবে সেদিন চামচিকির মত চুপসে গাবগাছের তলায় পড়ে থাকবে। দীনবন্ধুর স্ত্রী শাপশাপান্তকে ভীষণ ভয় পায়। লাল আলোয়ান গায়ে ওই যে বসে আছেন মীনুর দিদিমা। দু হাঁটুতেই বাত। অন্য সবাই মেঝেতে কার্পেটের ওপর থেবড়ে আছেন, তিনি বসেছেন সোফায়। মুখপোড়া বাত আর জায়গা পেলে না, ধরল এসে হাঁটুতে। 'কত্তা যাবার সময় ওইটি দিয়ে গেলেন।' গোবিন্দের মা কোণের দিক থেকে বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন, কত্তা একটা বাড়ি রেখে গেছেন, তিনটি ছেলে দিয়ে গেছেন, চার মেয়ে। আর কি চাই?'

'আ মোলো কথার ছিরি দেখ। আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোমাদের মত। সারা জীবন পেটে একটা কিছু না থাকলে আমাদের কালে শরীরটা খালি খালি মনে হত। কত্তা গর্ব করে বলতেন, সুখদা আমার ইঁদুরকল, একটু ঠুকরেছ কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দুটো' অমনি ছুটলে। কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।

দীনবন্ধুর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি হচ্ছে দিদিমা? বাচ্চারা বসে আছে।'

'তুমি আর সাউকুড়ি করতে এস না। ওরা সব বাচ্চার বাবা। দেখলে না ঠুলির বিজ্ঞাপনের সময় কি রকম হাসাহাসি করছিল। তুমি মা এযুগের মেয়ে। তুমি ওসব বুঝবে না। তোমরা হলে মেয়েমানুষ। আমাদের কালে মুতের কাঁতা শুকোতে পেত না। দাও এক গেলাস জল দাও। আ মর, সিনেমা বন্ধ করে মাগী সেই থেকে বকেই মরছে। আহা কি রূপের ছিরি। চুলে বব করে বসে আছেন। বুকের দিকে না তাকালে ছেলে কি মেয়ে বোঝে কার বাপের সাধ্য।'

বুলডগের মত মুখ করে মীনুর দিদিমা পাগলে পাগলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একেবারে লাগোয়া বাড়ির চার বউ রেলের পিস্টনের মত আসা যাওয়া করছেন। স্থির হয়ে বসার উপায় আছে কি ? পাশে ছড়ানো সংসার। টিয়াপাখির ঠুকরে ঠুকরে পেয়ারা খাবার কায়দায় চার বউয়ের টিভি দেখা চলছে। ব্যোমে পায়রা বসার মত। বড় বউ। যেন দিশী গোলাপায়রা। বয়সের মাঝ সমুদ্রে বয়ার মত শরীর। তিনি একটি বেতের মোড়া দখল করেছেন।

তাঁর সন্তানসন্ততিতে চারপাশে গোল করে মাকে ঘিরে রেখেছে। বসতে না বসতেই তাঁর খেয়াল হল, আলমারির গায়ে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছেন। সৃষ্টি পড়ে আছে আলমারিতে। দিনকাল ভাল নয়। বড় মেয়েকে বললেন, 'চাবিটা নিয়ে আয় তো।' বড় মেয়ে ছবিতে মশগুল। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে গান ধরেছে, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত ? লাল্লা লালা লালা। বড় বললে, 'থাক না'। মা একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'টিভি দেখা ঘুচিয়ে দেব তোর।' মেয়ে অন্যমনস্কে উত্তর দিল, 'যাও যাও সব করবে।' মা হুহুঙ্কারে বললেন, 'দেখবি ?'

মীনুর দিদিমা বললেন, 'দুটোকেই বের করে দাও।'

বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে ভেঙচি কেটে বললেন, 'কত বড় সাহস। যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। আপনি বের করে দেবার কে ?'

মীনুর দিদিমা হুঙ্কার ছাড়লেন দীনবন্ধুর স্ত্রীকে, 'বউমা, বউমা।'

বড় বউ ততোধিক জোরে বললেন, 'বউমা কি করবে ? বউমা এসে আমার মাথা কেটে নেবে ?'

টিভির পর্দায় নায়ক নায়িকারা তখন কোরাসে চেল্লাচ্ছেন, লা লালা, লাল্লা, লাল্লা।

মেজ বউটি যেন সীরাজু পায়রা। লাট খেতে খেতে এলেন। এসেই বললেন, 'যাও, দেখগে যাও, তোমার নতুন সুজনিতে ছোটর ছেলে পেচ্ছাব করেছে।'

'তোশক ভিজেছে, তোশক ভিজেছে ?' বড় বউ মোড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ধাক্কায় মোড়া কাত হয়ে মহাদেবের ডম্বরুর মত গড়াতে গড়াতে গদায়ের মার কোলের ছেলেটার মাথায় গিয়ে খোঁচা মারল। আঁচলচাপা ছেলে চুকুর চুকুর দুধ খাচ্ছিল। অষ্টপ্রহর তিনি চুষতে না পেলে চিল্লে বাড়ি মাথায় করেন, মোড়ার খোঁচায় বোঁটা ছেড়ে তিনি 'হাইফাই' স্পিকারের মত ওঁয়া ওঁয়া, হোঁয়াও ওঁয়াও করে মিউজিক ছাড়লেন। প্রেমিক প্রেমিকার 'তুমি, তুমি' হুইসপার চাপা পড়ে গেল। মেজ পুতুল নাচের ধসেপড়া পুতুলের মত জমির হাতখানেক ওপর দিয়ে লাট খেয়ে ঝপাত করে বসে পড়ে বললেন, 'কার মিউজিক রে ?'

পম্পা, শম্পা, চম্পা তিন বোন। বাপ মা দু'জনেই চাকুরে। মাথায় মাথায় তিন বোন। পম্পা শরীরের চেয়েও ঘেরে বড় ম্যাকসি পরে, একবার করে আসছে, বসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। আসা আর যাওয়ার পথে পোশাকের ধাক্কায় সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উল্টে গেল দাঁড়া টেবিলল্যাম্প। শেডফেড ছিটকে চলে গেল। মীনুর দিদিমা বললেন, 'দীনুর কাণ্ড দেখ। মাথার ওপর এত আলো, তাতে হচ্ছে না। ব্যাঙের ছাতার মতো আলো গজিয়েছে মেজে থেকে।'

দ্বিতীয়বার ছিটকে পড়ল কাটগ্লাসের অ্যাশট্রে। সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই

কাঠি কার্পেটের ওপর ছত্রাকার। তার ওপর থেবড়ে বসলেন পাশের বাড়ির সেজবউ। বসতে বসতে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসবো না। ডাল চাপিয়ে এসেছি।' যেন সমবেত মহিলামণ্ডলী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি কতক্ষণ বসবেন ? কেন বসবেন না ?

হঠাৎ সামনের সারির এক বাচ্চা আর একটা বাচ্চার ঝুটি ধরে বেশ বারকতক ঝাঁকিয়ে দিল। লেগে গেল দুজনে ঝটাপটি। তারফার ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হবার আগেই দীনুর বউ দৌড়ে গিয়ে দু'জনকে দু'পাশে সরিয়ে দিল। এ বলে তুই বাপ তুললি কেন ও বলে তুই বাপ তুললি কেন ? দীনুর বাড়ি যে মহিলা কাজ করেন, এরা তার বংশপরম্পরা। কান ধরে বার করে দিলে কাল থেকে তিনি আর কাজে আসবেন না। দুজনকে দুকোণে বসাতে হল। সেখান থেকেই তারা মুখ ভ্যাঙাভেঙি করতে লাগল। একজনের বই ভাল লাগেনি, সে হাত পা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। ঠ্যাং ধরে টেনে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। এখুনি বাড়ি ঘেরাও হয়ে যাবে। দীনের বন্ধুরা এসে দীনুর মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে।

বড় বউ লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে মেয়েদের হুকুম করলেন, 'যা ছোটর বিছানায় করে আয়। ভাসিয়ে দিয়ে আয়।' মেজ হাতের তালুতে চিবুক রেখে দাঁত চাপা সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ করে আয়, যেমন, বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

সে মেয়ে চাবি আনতে রাজি হচ্ছিল না, ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সে তীর বেগে ছুটল। ছোট মেয়ে বোকা বোকা, সে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'দিদি কি করতে গেল মা ?' ওপাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'হিসি।'

দীনুর স্ত্রী থাকতে না পেরে রাগ রাগ গলায় বললে, 'টিভি বন্ধ করে দিই।'

মীনুর দিদিমা বললেন, 'বাড়িতে বায়স্কোপ বসালে অমন একটু হবেই মা। অধৈর্য হলে চলে ?'

নায়ক নায়িকাকে একটু আদর-টাদর করছিলেন। কোণের দিকে বাচ্চাবখা সিক করে সিটি মেরে উঠল। ওরই মধ্যে প্রবীণা একজন আপত্তি করলেন, 'এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ভদ্দরলোক ছোটলোক এক হয়ে গেলে যা হয়।'

ব্যাস লেগে গেল ধুন্ধুমার। 'ছোটলোক, কথার ছিরি দ্যাখো .নিজে ভারি ভদ্দরলোক। ছেলে তো ছমাস বাইরে ছমাস ভেতরে।'

মীনুর দিদিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাগা এই বুঝি তোমাদের উত্তমকুমার।'

পম্পা পাল তুলে ফড় ফড় করে চলে গেল। বাতাসে দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার খসে পড়ল। পম্পা হ্যাটট্রিক না করে ছাড়বে না জানা কথা। দৃকপাত নেই। বসেই একগাল হেসে বললে, 'কি সুন্দর !'

বড়র মেয়ে ফিরে এসে বললে, 'ওদের চাদরে হলুদের হাত মুছে দিয়ে এসেছি। গোদাপায়ের ছাপ মেরে এসেছি।'

সেজবউ বললে, 'কাজটা ভাল করনি।'

মেজ বললে, 'কেন করেনি ? বেশ করেছে। ওদের সঙ্গে ওই রকমই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। শাস্ত্রে আছে।'

সেজ বললে, 'বাচ্চা ছেলে শীতের সময় একটু করে ফেলেছে। তোমরা দুজনে

আদাজল খেয়ে মেয়েটার পেছনে লেগেছ।'

'তোমাকে যে উল দিয়ে হাত করেছে। তুমি তো বলবেই।'

দীনবন্ধু ভবেশকে বললে, 'আর তো পারা যায় না। সময় যে চলতে চায় না। বাজল কটা ?'

'প্রায় মেরে এনেছি।'

কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গাঝাড়া দিল। দীনু বললে, 'এ ব্যাটাও পেছনে লেগেছে। সেই থেকে খ্যাচর খ্যাচর গা চুলকাচ্ছে আর ভটাস ভটাস গাঝাড়া দিচ্ছে।'

ভবেশ ঘড়ি দেখে বললে, 'এবার ওঠা যেতে পারে। শেষ হয়েছে সিনেমা।'

বাড়ি ঢুকে দীনবন্ধু প্রথমে গেট বন্ধ করল। দুটো পাল্লাই হাট খোলা ছিল। সদরে ঢোকার মুখে খেড়ে পাপোস পায়ের ধাক্কায় মাতালের মত কাত হয়ে পড়েছিল। দীনু ধুলোসমেত টেনেটুনে সেটাকে যথাস্থানে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পটাকে সোজা করে দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'এটা কি হয়েছে ! হকি খেলেছিল নাকি ?'

দীনুর স্ত্রী বললে, 'ওই রকমই হবে।'

'এ কি দামী অ্যাশট্রে, এখানে উল্টে পড়ে আছে। তোমরা সত্যি ! মীনুর দিদিমা সিগারেট খাচ্ছিল ?'

দীনুর স্ত্রী বললে, 'একটা কথা নয়। ওইরকমই হবে।'

'একি এখানে কে চীনাবাদামের খোসা জড়ো করেছে। তুমি সত্যি একেবারে কাছাকোঁচা খোলা।'

'ওইরকমই হবে।'

'তার মানে ? সামনের শনিবার স্ট্রেট বলে দেবে, হবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি পারবো না, পারলে তুমি বোলো।'

দীনু চাপা গলায় বললে, 'আপদ।'

'তোমারই আমদানি।'

দীনু কার্পেটের ওপর ঝাড়ু চালাতে চালাতে বললে, 'ধূপ জ্বালো, ধূপ ! সারা ঘর ভেপসে উঠেছে।'

টিভির সামনে এসে মনে মনে সেই প্রার্থনা আবার জানাল, 'হে পিকচার টিউব দয়া করে বিকল হও।'

ওদিকে ভবেশ বৃদ্ধ সিধু জ্যাঠাকে বাড়ি পৌছে দিতে দিতে একই প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পেশ করল। বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বললেন, 'চোখে ছানি, দেখতে পাই না, তবু সময়টা বেশ কাটে। একটা হিসেবও পাওয়া যায়, কে রইল, কে গেল। আজ আছি কাল নেই।'

ট্রিটমেন্ট

জিভ বের করুন—হুঁ।

ব্যা করুন—হুম। চশমা খুলুন, দেখি, চোখ দেখি। হুম।

চোখটা বেশ লাল হয়েছে। চুলকোয়। করকর করে। ক্লোরোমাইসিটিন অ্যামিক্যাপ...'

আমার কাছে বলে লাভ নেই। চোখের ডাক্তার দেখান। দেখি জামাটা তুলুন। না না গেঞ্জি তোলার দরকার নেই।

নিশ্বাস। জোরে জোরে। পেছন।

হুম, ভেতরে চলুন।

সুইং দরজা ঠেলে ভেতরের ঘরে। ঢুকেই বাঁ দিকে জানালা ঘেঁষে উঁচু বেনচ। পলিথিনের চাদরে ঢাকা বিছানা। মাথার দিকে নিরেট বালিশ। উঠে শোবার জন্যে পাইন কাঠের দুটো স্টেপ। সামনের দেয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বড় ছবি। তলায় লেখা, জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার তলায় ব্যায়রাম — ব্যয় করলেই আরাম।

নি‹, ‹য়ে পড়ুন। দেখে, দেখে, জানলার পাললা। বাবা, কত কি পরে বসে আছেন মশাই। করেছেন কি?—পেট খালি করুন। খালি করুন। লাগে? লাগে?

এই লিভারের কাছটায় যেন.......

লিভার কি স্টম্যাক জানি না। যেখানটা টিপছি সেখানটায় লাগে কিনা?

একটু যেন লাগছে।

হুম। উঠে পড়ুন। সাবধান, জানলা।

আমাকে সাবধান করে, ডক্টর চৌধুরী পূবদিকের দেয়ালে ফিট করা ওয়াশ বেসিনে হাত ধুতে গেলেন। ডক্টর নিরঞ্জন চৌধুরী, এম আর সি পি লন্ডন, এম ডি ক্যাল, ডি টি এম, এফ আর এস, সি আই এফ, এফ ও বি ডক্টর জনার্দন চৌধুরীর ছেলে।

নামবো?

নামবেন না তো কি বসে থাকবেন।

ভয়ে ভয়ে নেমে পড়লুম। নামবার সময় পা লেগে কাঠের ধাপ দুটো সরে গিয়ে একটু টাল খেয়ে গেলুম। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, প্রেসার আছে? মুখটা কাঁচুমাচু করে বললুম, অ্যাবনর্ম্যালি লো, নাইনটি, ফিফটি।

হুঁ। কি করে বুঝলেন, অ্যাবনর্ম্যাল? প্রেসারের কি বোঝেন? সাবনর্ম্যাল বা নর্ম্যালও তো হতে পারে। কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে এসে বসেছি। নেপোলিয়ানের কত প্রেসার ছিল? রোমেলের, আইজেনহাওয়ারের, চার্চিলের? আমি বোকার মত উত্তর না জানা ছাত্রের মত তাকিয়ে রইলুম। ডাক্তার নিচু হয়ে প্রেসার মাপা যন্ত্র বের করতে করতে বললেন সকলেরই প্রেসার লো ছিল। ওটাই ছিল ওঁদের নর্ম্যাল। আপনি নর্ম্যাল অ্যাবনর্ম্যালের কি বোঝেন।। মাথা ঘোরে?

মাঝে মাঝে বোঁ করে ঘুরে যায়।

বোঁ করে কেন? বোঁ মানে কি? কথায় কথায় প্রত্যয় লাগানো অভ্যাস। ব্যাড হ্যাবিট। আপনার মাথা ঘোরে উইণ্ডে মশাই, উইণ্ডে। হাওয়ায় পৃথিবী ঘোরে। মোগলাই চলে? কাটলেট, ফিশ ফ্রাই। রক্তের চাপ মাপা যন্ত্রের ওঠানামা থেকে কি বুঝলেন তিনিই জানেন। ফ্যাস করে হাওয়া বের করে দিয়ে পটিটা খুলতে খুলতে বললেন, কে বলেছে নাইনটি ফিফটি।

ডক্টর সাহা বলেছেন, আমার অফিসের ডাক্তার।

যন্ত্রটা ফেলে দিতে বলুন। ক'জন ডাক্তার প্রেসার দেখতে জানে? ক'জন ডাক্তার ফুসফুস পড়তে পারে? হার্টের মার্মার ধরতে পারে? আপনার প্রেসার হান্ড্রেড এণ্ড সিকসটি। লটবহর লম্বা বাকসে পাটকরে গুছিয়ে রাখলেন। প্রেসার যন্ত্র আমিও লক্ষ করে দেখেছি। হাওয়ার চাপে পারার মাথাটা ঠেলে ওঠে। তারপর আবার হুস হুস করে নামতে থাকে। এই ওঠা নামার প্রেমের তুফানে কোথায় যে আমার প্রেসার বসে আছে কে জানে? ডাক্তারবাবু একটা শ্লিপ কাগজ টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বয়স কত? দুটো বছর গায়েব করে বললুম, আটত্রিশ। পেনসিল দিয়ে হিসেব করতে করতে বললেন, নাইনটি প্লাস থার্টি এইট ইজ ইকোয়ালটু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট। একশো আটাশের জায়গায় একশো। কি এমন কম? একটু কম। মাসখানেক মুরগী, দুশ্চিন্তাহীন গভীর নিদ্রা, প্রচুর বিশ্রাম আর দু চামচে করে দু বেলা টনিক, দেখি আটাশ কোথায় যায়। এখন বলুন ট্রাবল কি কি? ফরগেট ইয়োর প্রেসার। ইগনোর ইয়োর প্রেসার। মনে করুন, আপনি নেপোলিয়ান, রোমেল কাইজার, উইলহেলম, সক্রেটিস, সফোক্লিশ, বায়রন, নিটশে।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন। নাম্বার ওয়ান, শীত শীত করে জ্বর। জ্বর আসার আগে পায়ের পাতা বরফের মত ঠাণ্ডা। মর্নিং সিকনেস। টকাস করে পেনসিলটা ফেলে দিয়ে বললেন, তখন বলেননি কেন? তখন। যখন শুইয়ে ফেলে পেট টিপছিলুম। একটা কাজ একেবারে হবার উপায় নেই। রিপিটেড এফার্টস। একে কি বলে জানেন, নন কো-অপারেশন। এ শর্ট অফ ভায়োলেনস অন মাই কস্টলি টাইম। শুনুন, অসুখ যদি চেপে রাখতে চান রাখুন, আমি ওই ইনকমপ্লিট ডায়াগনসিসের উপরই চিকিৎসা করব আর যদি কিওর চান, বি ফ্রি অ্যাণ্ড ফ্র্যাঙ্ক। পড়েননি ডাক্তার রোগীর বন্ধু, রোগ নিবারণে, ধর্মই সবার বন্ধু জীবনে মরণে।

ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—ডাক্তারবাবু, গোপন করা বা নন কো-অপারেশন বা ভায়লেনস আমিও পছন্দ করি না।

আমি তখন পিনপয়েন্ট করে কুহনাড়ির সংকোচনের কথা বিশদ করলুম।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোগের সঙ্গে যোগের কি সম্পর্ক?

বাঃ সম্পর্ক নেই। হঠযোগ দীপিকা, পাতঞ্জল, এঁরা কি বলেছেন? এইবার আমার কোর্টে বল। বত্রিশ টাকার ডাক্তারকে এবার আমার গোল দেবার পালা। এঁরা বলেছেন শরীরম আদ্যম। সুশ্রুত বলেছেন বিসর্গদান বিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যা নিলো যথা। ধারয়ীন্ত জগদ্দেহ্য কফপিত্তানিলস্তথাঃ অর্থাৎ সোমসূর্য অনিল অর্থাৎ বরুণ, অগ্নি, ও বায়ু এই ত্রিদেবতা যেমন বিশ্বসৃষ্টি এবং বিশ্বের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন তেমনি আবার এই

ত্রিদেবতাই দেহবিশ্বকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। দেহস্থ এই ত্রিদেবতার নামই আয়ুর্বেদমতে—বায়ু, পিত্ত ও কফ। ডাক্তারবাবু পেনসিল নামিয়ে রেখে বেজার মুখে বললেন, তা হলে আপনার ট্রিটমেন্টটা সুশ্রুতকে দিয়েই করান। আমার ভ্যালুয়েবল টাইন আর নষ্ট করবেন না।

প্রথম শুরু তো হ্যানিম্যান সাহেবকে দিয়ে করেছিলুম। প্রথমে সালফার খেয়ে সিসটেমটাকে নিউট্রাল করে নিয়েই নাকসভোমিকা ঝেড়েছিলুম। মেথডটা বড় শ্লো। ধৈর্য রইল না। তখন সুইচওভার করলুম কবিরাজিতে। অণুপানেই মেরে দিলে। নিমগাছের ডাল থেকে ঝোলা গোলঞ্চ কুলে খাঁড়া, ক্ষেত পাঁপড়া, জটামাংসী, দারুহরিদ্রা, মহাজ্বালা তারপর মধু। সবেতেই মধু, ওঁ মধু। এর ওপর খলে মাড়া। সকালটা যদিও চলে, দুপুর আর সন্ধে। তখন তো অফিসে! তাছাড়া ওই অরিষ্ট ডিফেকটিভ প্রেপারেশন। শিশিতেই ফাংগাস হয়ে যায়। অরিষ্ট খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুক্রিম আর জুতো ঝাড়া বুরুশ দিয়ে শরীরের ত্বক পালিশ করতে হয়। তা না হলেই বর্ষায় ভেজা সাদাসাদা ছাতাধরা শালখুঁটির মত চেহারা হয়। তখন সুইচওভার করলুম যোগে।

এইবার সুইচ অফ করে কাজের কথায় আসুন, বুঝতেই পেরেছি অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। ডাক্তারবাবু পেনসিল তুলে নিলেন, বিবাহিত? প্রশ্ন শুনেই বুঝেছি চরিত্রের ওপর ডাক্তারের কটাক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলুম, না না সে সব নয়। তবে আমার দাদু বলেছিলেন ডায়াবিটিস কিনা একবার আপনাকে দিয়ে চেক-আপ করাতে।

বুঝেছি, যার যা অসুখ আছে সব আপনার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। শুনে রাখুন, অসুখের কথা একমাত্র ডাক্তারকে বলবেন, যেমন ইষ্টদর্শনের কথা একমাত্র গুরুকেই বলতে হয়।

ডাক্তারবাবু রোগের ফর্দ ফেলে চুরুট ধরালেন। মোটা ডাক্তার, মোটা চুরুট, লম্বা পাইপ, বড় কর্তার রিভলভিং চেয়ার, থানার দারোগা কোর্টের পেয়াদা, বাড়ির গৃহিণী, ধারদাতা মুদি, ইলেকট্রিক বিল, অফিস টাইমের বাস, বিয়ের চিঠি, শেষ মাসের আত্মীয়, বঙ্গোপাসাগরের নিম্নচাপ, ট্রানজিস্টার রেডিও, বাজারের দরদাম, কোনো কিছুকেই আমি আর ভয় পাই না, সব কিছুর ক্যামোফ্লেজ আমি ধরে ফেলেছি। সব মানুষের মধ্যেই জ্ঞান আছে, অজ্ঞানতা আছে, নীচতা আছে, উদারতা আছে, দয়া আছে ; নিষ্ঠুরতা আছে ছাঁকনি ছাঁকা মানুষ হয় কি? হয় না। অতএব ভরা মুখে মোটা চুরুটে আমার রোগের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেই কি আমি সুস্থ হয়ে যাব। গাড়ি নিয়ে গ্যারেজ সার্ভিস এলে সব ডিফেক্টের কথা যেমন বলতে হয়, তেমনি আমিও হার্ট, লাংস, কিডনি ব্রেন, লিভার, স্টম্যাক সব জায়গায় বাঁদরামি হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত করে ভাঙবো। ডাক্তারের চুরুট আমাকে দাবাতে পারবে না।

এক মুখ পোড়া-গন্ধ ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চালু করে দিলুম আমার কিডনি কাহিনী। কিডনিটা একটু নন কো-অপারেশন করছিল। প্রথম দিলুম ব্যাটাকে যোগের কবলে! স্বামী যোগানন্দ অর্ধচন্দ্রাসনে রেখে দিলেন মাসখানেক। তারপর ধনুরাসন করতে গিয়ে এমন পারমানেন্টলি পেছন দিকে অর্জুনের গাণ্ডীবের মত বেঁকে গেলুম যেন কুমড়োর ফালি বা নৌকা। সেই ধনুক থেকে আস্তে আস্তে সোজা হতে তিন মাস লাগল। তখন

ধরলেন ডাঃ ঘোষাল।

কোন ঘোষাল ? খালধারের ঘোষাল ? কে ডি ঘোষাল ! ডক্টর শার্ক ? ধরলে ছাড়ে না সেই ঘোষাল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডকটর শার্ক নয় কচ্ছপ। মেঘ না ডাকলে কামড় ছাড়ে না। ঘোষালের ওপর রাগ দেখে চৌধুরীকে উসকে দিলুম। আমার ওপর সিমপ্যাথি বাড়বে। সেই ঘোষাল চোখ কান বুজিয়ে একগাদা ডকসি সাইক্লিন খাইয়ে দিলেন। এক ধাক্কায় ফিফটি সিকস রুপিজ। নো জোক। রেজাল্ট ড্রাগ রিঅ্যাকসন। হবেই তো, হবেই তো, ডক্টরকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। আমার সর্বনাশে ওঁর যেন পৌষ মাস ! পা নাচাতে নাচাতে বললেন, কম রুগী মেরেছে ! নিজেকে মনে করে যেন ডাক্তার গুডিভ ! আমি ছাড়ি কেন ? একটু টিপ্পুনি যোগ করে দিলুম, যদিও আপনাদের শাস্ত্র বলে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। ডক্টর ঘোষাল যদি হাজার কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে এতদিন চিকিৎসক হতে পেরেছেন।

ডক্টর ঘোষালের ডায়গনিসিসটা একবার শুনি। ডক্টর চৌধুরী ঘোষালের কেরামতিটা জানতে চাইলেন।

ডক্টর ঘোষাল বললেন, তিনটে কারণ থাকতে পারে। এক স্টোন, দুই ক্যানসার, তিন টি বি।

বাঃবা বাঃবা। ডক্টর চৌধুরী আনন্দে আটখানা। জীবনে এত আনন্দ মনে হয় তিনি কখনো পাননি। সোজা হয়ে বসে বললেন, এই না হলে ডাক্তার ! মার্ডারার। আমাদের প্রোফেসানের কলঙ্ক। দেখি আর একবার এদিকে আসুন তো। উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। দুটো আঙুল দিয়ে গলা আর কানের পাশটা বেশ রগড়ে রগড়ে দেখলেন নাঃ কিছু নেই। টি বি অত সোজা নাকি। হলেই হল। আবার চেয়ারে ফিরে এলুম। ফের শুরু হল রোগের ফর্দ।

ভীষণ দুর্বলতা। বসতে পেলে শুতে চাই। ওজন ঝরঝর করে কমছে। বেলা তিনটের পর থেকে চোখ জ্বালা, জ্বর জ্বর, মাথা ধরা, শীত শীত, হাই ওঠা অ্যালার্জি। মাঝরাতে ব্রিদিংট্রাবল, জিয়ার্ডিয়া ছিল। অ্যামিবায়সিস যোগ হয়েছে। অম্বল। লিভারের ব্যথা। স্নায়ুবিক দুর্বলতা। হাতপা অবশ হয়ে আসে, কাঁপে। অকালে চুলে পাক ধরেছে। মেলাঙ্কোলিয়া। পা ঝুলিয়ে বসলে চেটো দুটো বিকেলের দিকে গোদা গোদা হয়ে ওঠে। এক সাইজ বড় জুতো কিনেছি, সকালে বাড়তি শুকতলা দিয়ে পরি। বিকেলে শুকতলা দুটোকে পকেটে পুরি। ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইটুকু শরীরে এত অসুখের ঐশ্বর্য খুব কম দেখেছি মাইরি, এ যেন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। ফর্দাফাঁই রুগী। পোস্টমর্টেমের টেবল থেকে খালাস পাওয়া মাল। মুচি ডেকে সেলাই করাতে হবে। পেনসিলের পেছন দিয়ে ভুরুর কাছে টোকা মারতে মারতে বললেন, কি দিয়ে শুরু করব ? বড় হোটেলের ফিফটি সিকস কোর্স লাঞ্চ শুরু করার আগের প্রশ্ন। দুর্বলতা দিয়ে স্টার্ট করুন। রোজ রিকশা আর মিনি বাসে দেউলে করে দেবার জোগাড় করেছে। একপা হাঁটলেই হার্ট। ও হ্যাঁ, হার্টটা একটু নোট করে নিন, মিনিটে একটা করে বিট মিস করছে।

নিভে যাওয়া চুরুটটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, আমি বলি কি আপনি হসপিটালাইজড হয়ে যান। আমি লিখে দিচ্ছি। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হসপিটাল ! পাগল হয়েছেন, হাসপাতালে কোন দুঃখে মরতে যাবো ? মরি যদি সেও ভাল, আমার নিজের খাটেই ভাল। কাকাবাবুর দুর্দশা দেখিনি। তিন তারিখে বেডপ্যান চেয়ে সাত তারিখে পেয়েছিলেন। তাও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সাত পাতার করুণ আবেদন জানিয়ে। আর পারছি না স্যার। একবার ছ নম্বর বেডের ইনজেকসান তাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই ওষুধ আবার মুরগি দিয়ে 'সাক' করিয়ে বের করে আনতে হয়েছিল। ইছাপুর থেকে রোজা আনিয়ে ঝাড় ফুঁক করে সেই সাপের বিষ নামাতে হল। রোজ রাতে পেল্লায় পেল্লায় ইঁদুরের পেছনে সারা ওয়ার্ডে দৌড়ে বেড়াতেন। এই বিস্কুটের প্যাকেট কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে, কখনো কড়াপাক সন্দেশের বাক্স, কখনো পাউণ্ড রুটি। একবার বালিশের তলা থেকে একশো টাকার দুটো নোট নিয়ে গুরুভোজন করেছিল। ছ জোড়া চটি চুরি হবার পর সপ্তম জোড়াটা রাতে বালিশের তলায় নিয়ে ঘুমোতেন। আর বেশ বড়দরের রুগী এলে রোজই তাঁকে ধরাধরি করে বাথরুমের দরজার সামনে ফেলে দিয়ে আসত যতক্ষণ না সেই ভি আই পি পেসেন্ট বেড থেকে কেবিনে উঠছেন। তিনবার ডেথলিস্টে নাম উঠেছিল। একবার আমরা মর্গ থেকে উদ্ধার করে এনে গরম চাটুতে সেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলুম। সেই হাসপাতালে আপনি আমাকে পাঠাতে চাইছেন ! ও আমার নিঠুর দরদী !

ডক্টর চৌধুরী বেশ বিপাকে পড়েছেন মনে হল। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। আমি কি করিতে পারি ! ডাক্তারের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না। সব খোলাখুলি। মহিলারা পর্যন্ত নিষ্কৃতি পান না। চাকরিতে ঢোকার আগে মেডিকেল টেস্টের কথা আজও ভুলতে পেরেছি কি ! পাঁচটা টাকা পকেটে ছিল না বলে বৃদ্ধ ডাক্তার লাইনে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে সেই তরুণ বয়সে পোস্টবক্স খুলে—

তাহলে একটা টনিক লিখে দি ! সপ্তাহ খানিক খেয়ে দেখুন। সঙ্গে একটা করে ভিটামিন ক্যাপসুল থাক। প্রেসক্রিপশানের প্যাড টেনে নিলেন ডাক্তারবাবু। টনিক আর ভিটামিন তো নিজেই নিজেকে করতে পারতুম। এর জন্যে বত্রিশ টাকা খরচের কি দরকার ছিল। এর সঙ্গে চার যোগ করলে এক সপ্তাহের রেশন। টনিক প্লাস ভিটামিন প্রেসক্রাইব এক মাসের পথ খরচ। আমার আপত্তিটা প্রকাশ করেই ফেললুম, রোগের কারণটা জিইয়ে রেখে ফুটো পাত্রে টনিক আর ভিটামিন ঢেলে লাভ কি ?

তাহলে ডু ওয়ান থিং, কাল সকালে খালি পেটে চলে আসুন, ব্লাডটা নি, আর ফার্স্ট ইউরিন একশিশি, এক ফোঁটা স্টুলও নিয়ে আসবেন, টেস্ট করে প্রেসক্রিপশান করব। তার আগে নয়। আদালতে যেন দিন পড়ল। উকিল আর ডাক্তার টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্লাড বের করে নিলেই বেরোবে আর ডাক্তাররা তো সাধারণত আমাদের মত পুওর পেশেন্টদের চোখে ড্রাকুলার মত। সমস্যা দ্বিতীয় আর তৃতীয় বস্তু নিয়ে। ও দুটি বস্তু তো আমার আজ্ঞাবহ নয়। একমাত্র উপায় পুলিশের রুলের তলপেটে গুঁতো। ডাক্তার বললেন টেস্ট ছাড়া নো ট্রিটমেন্ট। আমি ডক্টর চৌধুরী, নট ঘোষাল। ঘোষাল যা পারে আমি তা পারি না।

ডক্টর চৌধুরী ফি না নিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি প্রকৃত ডাক্তার নন। ডক্টর শার্ক নন। আপনি তো আবার আসছেন তখন দেবেন। বাসে দশ টাকা দিয়ে কুড়ি পয়সা টিকিট কাটতে চাইবার অভিজ্ঞতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ডক্টর চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়েছেন বোধহয় গলাধাক্কা দেবেন। পেছু হটতে হটতে বেরিয়ে যাব কিনা ভাবছি। চৌধুরী খুব বিনীতভাবে বললেন, আপনার তো যোগের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ আছে। যোগে ড্রাগ অ্যাডিকশনের কোন কিওর আছে?

হঠাৎ আমি রোগী থেকে ডাক্তার হয়ে গেলাম। যোগ, জ্যোতিষি, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান আমি ততটুকুই অধিকার করি, যতটুকু আমার নিজের জন্য প্রয়োজন। নিজে ড্রাগসের ডও জিভে ছুঁইয়ে দেখিনি। আমার কোডভাসই চা'য়। ডাক্তারকে ভরসা দিয়ে বললুম নিশ্চয় আছে। জেনে জানিয়ে যাবো ডাক্তার চৌধুরী বললেন, মিউচ্যুয়াল, কেমন? আমি ফ্রিতে আপনার চিকিৎসা করব। একটু দাঁড়ান। ড্রয়ার খুলে এক গাদা ফ্রি স্যাম্পল বের করলেন, ভিটামিন, অ্যান্টাসিড, ল্যাকজেটিভ এনজাইম টনিক। সব আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন ওষুধ আপনাকে খুব কমই কিনতে হবে। তবে ওই টেস্টের জন্য যা লাগবে দিতে হবে। দেখি আপনার জন্যে কি করতে পারি। রেশানের চাল থেকে কাঁকর বাছার ধৈর্যে আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে।

পকেট ভর্তি ওষুধ, অভঙ্গ একটি নোট, ইনট্যাক্ট সমস্ত অসুখ নিয়ে আমিও কি করতে পারি বলে সুইং দরজা দুলিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ব্যয়ও হল না আরামও জুটলো না। শরীরের সমস্ত অসুখ পোড়ো বাড়ির মত হো হো করে উঠল—ওই দেখ বেটা যাচ্ছে। যাকে ডাক্তারেও ছোঁয় না।

দিন আনি দিন খাই

জলটল খেয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি। আজকের কাগজটায় একবার চোখ বুলবো, তারপর দাঁত বের করা কাপে তিনের চার কাপ চা খেয়ে মুখটাকে টক করে দোকান খুলব। অফিসকে আমরা এক এক সময়, এক এক আদুরে নামে ডাকি। কখনও দোকান বলি, কখনও মামার বাড়ি বলি, কখনও ক্লাব বলি। সরকারি অফিসে মার্চেন্ট অফিসের মত বাঁধাবাঁধি অত থাকে না। একটু ঢিলেঢালা ভাব। কেউ কারুর দাস নই। আমরা সবাই দেশসেবক। দেশ জননীর সেবা করতে এসেছি। মাসের শেষে সামান্য দক্ষিণায় কায়ক্লেশে সংসার চলে। কাজের জবাবদিহি বড় কর্তার কাছে নয়, দেশের মানুষের কাছে। যাঁরা আমাদের নিন্দে করেন, অপদার্থ, ঘুষখোর বলেন, তাঁদের আমরা তেমন পাত্তাটাত্তা দিই না। জনসেবায় অমন দু'চার কথা সহ্য করতেই হয়। চামড়া একটু পুরু না করলে দেশসেবা করা যায় না। মনের আস্তরণে একটু গন্ডার ভাব আনতে হয়। রাইনোসেরার্স না হলে পাবলিক সারভেন্ট হওয়া যায় না। যে যাই বলুক, গুন গুন করে গেয়ে যাও

কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গান—

কুছ তো লোগো কহেঙ্গে
লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহ্না
ছোড়ো বেকার কি বাতোঁমে।

যে দাদাকে ধরে চাকরিটা পেয়েছিলুম, তিনি প্রায়ই বলতেন, দেশসেবা বড় 'থ্যাঙ্কলেস জব' হে। আমরা সবাই যীশুখ্রীস্ট ! কাঁটার মুকুট মাথায় চাপিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ত্যাগ, ত্যাগ। আমাকে অবশ্য মই ঘাড়ে করে পোস্টার ফোস্টার মারতে হয়নি। আমার কাজ ছিল লেখা। উনুনের যেমন কয়লা চাই, নেতাদের তেমনি অক্ষর চাই। রাশি রাশি অক্ষর। একের পেছনে আরেক, মাইলের পর মাইল। *নেচে নেচে* বেরোবে। গরম গরম, নরম নরম, আবেগে তুলতুলে, রাগে গমগমে, বিদ্রূপে কষকষে। পলিটিক্যাল বক্তৃতা আর বিয়ে বাড়ির ছ্যাঁচড়া এক জিনিস। নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অ্যানাটমি ভ্যাসেকটমি, সব এক কড়ায় ফেলে, লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রগরগে করে পাতে ফেলে দাও। গভীর জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। এ লাইনে জ্ঞান হল ডিসকোয়ালিফিকেসান। পিঠে সুড়সুড়ি দেবার জন্য সার্জেনকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাঁদরেও দিতে পারে। পারে না, ভালই দেয়। ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফুলঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দাও। নরুন দিয়ে ছানি অপারেশান।

ওই কর্মটি আমি ভালই পারি। বন্ধুগণ বলে একবার শুরু করলে আণবিক বোমা পর্যন্ত আমার পথ পরিষ্কার। কীর্তনীয়ার সখীগো-র মত। এক টানেই ভক্তদের হৃদয় ফর্দাফাই। তা দাদা খুশি হয়ে, প্রচার দপ্তরে এই চেয়ারটি আমার পাকা করে দিলেন। ঢুকেছিলুম তলায়, মুখের জোরে ধীরে ধীরে *ঠেলে* উঠছি ওপর দিকে। আমার দাদা কবে ডিগবাজি খেয়ে সরে পড়েছেন। এই খেলায় যা হয় আরকি। সাপ লুডোর মত। এক চালে জনপ্রিয়তার সাপের মুখ গলে একেবারে ন্যাজে। আবার কোন চালে মই পাবেন কে জানে। যীশু এখন শিশুর মত হামা টানছেন। সাবালক হতে সময় লাগবে। দলফল ভেঙে চুরমার। বাজারে অনেক আঠা বেরিয়েছে, মানুষের মাঙ' ভাঙা দল কিম্বা টুকরো দিল জোড়ার আঠা এখনও বেরোয়নি।

এই অফিসে ঢুকে একটা গূঢ় তথ্য আমি জেনে ফেলেছি যা বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে থাকলে জানা যেত না। এ দেশ থেকে সাহেব এখনও যায়নি। সাদা চামড়া চলে গেছে, সাহেব কিন্তু পড়ে আছে। লাহিড়ী সাহেব, দাস সাহেব, বোস সাহেব, মিত্তির সাহেব। সায়েবদের কি সব চেহারা। গেজেটেড হলেই সায়েব। আগে পাড়ার গিন্নিবান্নি মহিলাকে গেজেট বলা হত। তাঁর কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর জোগাড় করে দুপুরে মহিলামহলে পেশ করা। এ গেজেট অবশ্য সে গেজেট নয়। বিশাল একটা মোটা বই। সেই কেতাবে যাঁর নাম তিনিই সায়েব। সেখানেও স্তর আছে। ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু। অনেকটা সেই ট্যাঁস ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মত। মাইনে কারুরই খুব বেশি নয়। তবে দাপট আছে। দেশের সব কিছুই তো এঁদের হাতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিসংস্কার, কৃষিশিল্প। ফাইল নাড়ানো প্রভুর দল। মাথা নড়া বুড়োর মত অথবা বুড়ো শিবের মত। নাককাটা সেপাই নয়। গেজেটেড সেপাই। নিজেদের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন।

ঢলঢলে প্যান্ট। মাঝে মাঝেই টেনে তুলতে হয় কোমরের দিকে। হাওয়াই শার্ট। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। কুঁচকে মুচকে ব্যক্তিত্বশূন্য, লতপতে একটা ব্যাপার। অনেকে আবার নস্যি নেন। স্নাফ ইওর নোজ অ্যাণ্ড স্নিফ-এ ডিসিসান। গেজেটেড হলে টেবিলে একটা মাঝারি মাপের কাঁচ পাবার অধিকার জন্মায়, চায়ের চরণ-চিহ্নিত টেবিলে কাঁচ, কাঁচের তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, মা কালী, স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ। স্টোর থেকে একটি তোয়ালে পাওনা হয় সায়েবদের ! কোট ঝোলাবার হুক দম্পতি সমেত একটি আয়না, একটি বৈদ্যুতিক ঘন্টা, টেলিফোনের একটি একসটেনসান লাইন, বিমর্ষ চেহারার একটি দেয়াল ক্যালেণ্ডার, সামনে একটি ডেস্ক ক্যালেণ্ডার, কলঙ্কিত অ্যাসট্রে, গোটাকতক মুশকো চেহারার পেপারওয়েট, কলমদান, প্রভৃতি নিয়ে সাহেব বসেন ক্ষমতার টাটে। দু'পাশে জমতে থাকে পাহাড়ের মত ফাইলের স্তূপ। হরেক রকমের বায়না। জনসাধারণের জীবন যন্ত্রণা অষ্টপ্রহর কেঁদে চলেছে, সায়েব আমাকে দ্যাখো। জল নেই, কল নেই, জমি নেই, জরু নেই, লোহা নেই, সিমেন্ট নেই, পথ নেই, আলো নেই। ফাইল নিচে থেকে ওপরে ওঠে। সায়েবের কাজ 'অ্যাজ প্রোপোজড' বলে সই মারা। নিচে যিনি আছেন, তিনি লেখেন, 'পুট আপ ফর পেরুজ্যাল অ্যাণ্ড নেসাসারি অ্যাকসান'। তারপর 'অ্যাজ প্রোপোজড' হতে হতে 'ওঁ গঙ্গায় নমঃ', গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল মানকুণ্ডুর মানসবাবু, বর্ধমানের বরোদাবাবু, ক্যানিংয়ের কালোবাবু জেলা অফিসে যাচ্ছেন আর আসছেন, রোজই শুনছেন ফাইল ওপরে গেছে। 'অ্যাজ প্রোপোজড'। কেউ উল্টে দেখেনি প্রোপোজালটা কি। পেঁয়াজের খোসার মত, প্রোপোজালের খোসা ছাড়ালে কিছুই আর মেলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের মত। ওদিকে যাঁর আর্জি তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উত্তর পুরুষ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে থাকেন আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং, অর্থাৎ স্তম্ভে স্তম্ভে মাথা ঠুকে তিনি এখন ব্রহ্মে। বিবেকবান দেশসেবক দেশবাসীদের যেমন উপদেশ দেন, দেখবেন মানুষ যেন কাজ পায়, 'ফ্রম পিলার টু পোস্ট, পোস্ট টু পিলার', এই বদনাম ঘোচাতে হবে, সব রেডটেপ খুলে নিজেদের প্যান্টের তলায় ঘুনসি করে নিন। গুনগুনিয়ে আবার সেই গান : কুছ্ তো লোগো কহেঙ্গে। লোগোঁ কা কাম হায় কহনা। সায়েব নস্যি নিতে নিতে জেলার নেতাকে বললেন, সবকিছুর একটা প্রোসিডিওর আছে। কালভার্ট-কালভার্ট করছেন, স্যাংসন কোথায় ? কোন স্কীমে হবে ? এখন যেমন সাঁতরে খাল পেরোচ্ছেন পেরিয়ে যান। ফিনান্সে প্রোপোজাল গেছে। ফিনান্স থেকে সি, এম ; সি, এম থেকে ক্যাবিনেট ; ক্যাবিনেট থেকে সি, এম ; সি, এম থেকে ফিনান্স ; ফিনান্স থেকে পি ডব্লু ডি ; পি ডব্লু ডি থেকে লোকাল সেলফ্ গাভার্নমেন্ট ; সেখান থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েত ; অঞ্চল থেকে পঞ্চায়েত। ইট ইজ সো সিম্পল। নিন এক টিপ নস্যি নিন। তবে হ্যাঁ মিনিস্ট্রি যদি উলটে যায়, কান্ট হেলপ, তখন প্রেসিডেন্টেস রুল, মানে গার্ভানার, গাভার্নার হয়ত বলবেন, একটু অপেক্ষা করুন, নির্বাচন তো হবেই, নতুন ক্যাবিনেট ডিসিসান নেবে। ক্যাবিনেট, কফিন, কেবিন সব যেন সমার্থক শব্দ। কখন কি ভূত বের করে কে জানে।

অফিসে আমার নিজের পয়সায় কেনা একটা কেটলি আছে। সেটার চেহারা তেমন ভাল না হলেও কাজ চলে যায় ! গোটাকতক ভাঙা কাপ আছে। আর আছে আমার

পিওন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অমূল্য। অমূল্যের প্রথম বউ তিনটি সন্তান উপহার দিয়ে ক্ষয়কাশে ভুগে ভুগে সরে পড়েছে। অমূল্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। সাহস আছে। যা মাইনে পায় তাতে নিজেরই চলে না। দ্বিতীয় পক্ষ চটজলদি দুটি প্রাণ নামিয়ে দিয়েছে। অমূল্য এখন পাঁচে পঞ্চবাণ। এ অফিসের নিয়ম হল কেউ কারুর কথা শুনবে না। যার যা কাজ, তিনি যদি সেই কাজ ভুলেও করে ফেলেন, তারচেয়ে অপরাধ আর কিছু নেই। কর্মচারীদের দু'টো ইউনিয়ন। দু'রকম রাজনৈতিক রঙ। মঞ্চে ফোকাস মারছে। অভিনেতারা হাত পা ছুঁড়ছে। গদিতে যখন যে দল তখন সেই সেই ইউনিয়নের প্রবল পরাক্রম। অমূল্যর বয়েস হয়েছে, পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাই একটু মান্য করে চলে। কথাবার্তা শোনে। বারে বারে চা আনে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেয়, পোস্টাপিসে লাইন দিয়ে খাম পোস্টকার্ড এনে দেয়। টিফিন এনে দেয়, ভাগ পায়।

অমূল্য আজ গেঞ্জি পরে এসেছে। নীল জামাটা কাল বড় ছেলে বেচে দিয়ে চায়নাটাউনে শামমীকাপুরের নাচ দেখেছে। বার বার দেখো, হাজার বার দেখো। কাল রবিবার ছিলো। এর আগে, ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল অমূল্যর, সেটা ঝেড়ে জুয়া খেলেছিল। ছাতা, জুতো, বাসনকোসন সবই এই ভাবে গেছে। অমূল্যর ভয়, কোনও দিন ঘুমের সময় পরনের কাপড়টা খুলে নিয়ে বেচে না দেয়।

অমূল্য ফুটপাথের দোকান থেকে চা এনেছে। সহকর্মী বিমলও এসেছে। সাধারণত বারোটায় আসে, আজ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে সকাল সকাল চলে এসেছে। বিমল আবার শিল্পী। গান লেখে, গান গায়। নতুন একটা গান লিখেছে। টেবিলে তাল দিতে দিতে গানে সুর চড়াচ্ছিল, এক তারা, দু তারা, তারা তিন চার। তা ধিন ধিন্ তা, তারা তিন চার, তোমার কথাই কেন, ভাবি বার বার।

গান শুনতে শুনতে সবে সিকি কাপ চা খাওয়া হয়েছে, এমন সময় ব্যানার্জি সায়েব ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকলেন। ইনি হলেন এক নম্বর সায়েব। লম্বা, চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট। কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম আছে। জীবনে কারুর ভাল করেননি। সুযোগ পেলেই সহকর্মীদের বাঁশ দেন। প্রোমোশান আটকে দেন। এমন সব ব্যবস্থা নেন যাতে ঘন ঘন মোশান আসে। এনার তূণে মারাত্মক দুটি অস্ত্র আছে, সাসপেনসান অ্যান্ড ট্রানস্ফার। তৈল মর্দনে ভারি ওস্তাদ। আমরা নাম রেখেছি তেলসায়েব।

সায়েব এলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে হয়। সার্ভিস কনডাকট রুলে কি আছে জানি না, তবে এইটাই নিয়ম। বড় এলেই ছোট উঠে দাঁড়াবে। পুলিসদের সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল পড়ে আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন, বসুন।

বিমলের উঠে দাঁড়াতে একটু দেরি হচ্ছিল। টেবিলে হাঁটু তুলে গাড়ু হয়ে বসেছিল। পেছন দিকে শরীর ঠেলে, হাঁটু নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কে জানত দুম্ করে ব্যানার্জিসায়েব এসে পড়বেন। চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে পা আটকে বিপর্যয় কাণ্ড। ব্যাগ থেকে আনারস বের করার মত অবস্থা। যাক ওঠার আগেই বসার হুকুম পেয়ে বেচারা বেঁচে গেলেন। ব্যানার্জিসায়েব তির্যকে বিমলকে একবার দেখে নিলেন। হয়ে গেল তোমার। ট্রানসফার টু কুচবিহার।

ব্যানার্জিসায়েব কোনও রকমে সামনের চেয়ারে পেছন ঠেকালেন। চাকরির খাতিরে মানুষকে কত যে নীচে নামতে হয়। কুলীন কুলসর্বস্ব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানে বড়পদ, তাঁকে বসতে হল আমার মত এক হরিজনের সামনে। ছোট পদ মানেই হরিজন।

ব্যানার্জিসায়েবের মুখ বেজায় গম্ভীর। হাসেন, তবে আমাদের সামনে নয়। হাসলে পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভোরে টিনের চালে বসে কাক যে সুরে ডাকে সেই সুরে ব্যানার্জিসায়েব বললেন, দুর্গাপূজো সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে।

দুর্গাপূজো ? কিরকম আইডিয়া স্যার ? মানে সার্বজনীন পূজো ! প্রত্যেক বছর চাঁদা দি স্যার ! দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাই।

ওইতেই হবে, ওইতেই হবে। একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। দুর্গাপূজোর সঙ্গে একটু স্মল স্কেল ইন্‌ডাষ্ট্রি পাঞ্চ করে দেবেন। বেশি বড় করার দরকার নেই। পাঁচ দশ মিনিটের মত হলেই হবে, বেশ জমিয়ে লিখবেন। মনে রাখবেন মন্ত্রীর বক্তৃতা। যদি একচান্‌সে মনে ধরাতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে উঠে যাবেন। চড়চড় প্রোমোশান। আর যদি জিনিসটা না জমে, ট্রানসফার্ড টু কুচবিহার।

বলছেন ?

ইয়েস। দেবতা প্রসন্ন হলে মানুষের কি না হয়।

মিত্তির সায়েব আর বাগড়া দিতে পারবেন না।

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই বাগড়া দেয়। মন্ত্রী সো ডিজায়ার্স। কখন দিচ্ছেন লেখাটা ?

কালকে।

আরে না না, কাল উইল বি টু লেট। বেলা তিনটে নাগাদ আসব। অ্যাসেমব্লিতে টুক করে মন্ত্রীকে ধরিয়ে দিয়ে যাব। ব্যানার্জি সায়েব চলে গেলেন। বিমল বললে, দুর্গাপূজোয় ইন্‌ডাষ্ট্রি ঢোকাবি কি করে ?

দ্যাখ না, ঠিক ঢুকিয়ে দোব। মহাভারতে অত মাল ঢুকতে পারে, পূজোয় স্মল স্কেল ঢুকতে পারে না !

বন্ধুগণ।

ওই দেখুন দুর্গা দশভূজা। সিংহবাহিনী, অসুরদলনী।

আমরা, এই আমরা, যারা আজ ক্ষমতার আসনে বসে আছি, তারাও দশভূজা, অসুর দলনকারী।

দেশে আইন শৃঙ্খলাহীন যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল, আমরা সেই আসুরিক শক্তিকে শক্ত হাতে দাবিয়ে রেখে ধীরে ধীরে জনজীবনে শান্তির শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মধুবাতা ঋতায়তে।

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

বিমলকে গৌরচন্দ্রিকাটা পড়ে শোনালুম। চারটে লাইন একেবারে ফর্মূলায় ফেলা। সমস্ত পূজোর আগে যেমন গণেশ পূজো, একদন্তং মহাকায়াং লম্বোদর-গজাননং, সেই রকম যারা ছিল তারা বদ, আমরা যারা এসেছি, তারা গণেশের মতোই, বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং, নিজেরাই নিজেদের প্রণাম করি। জনগণেশের সেবক আমরা। একেবারে কড়া নির্দেশ, মন্ত্রীর ভাষণের শুরুতেই পূর্বতন সরকারকে দু ছত্র চপেটাঘাত অবশ্যই করতে

হবে। মা দুর্গার দশহাতের সঙ্গে মালটা কায়দা করে লাগিয়ে দিয়েছি। এইবার বাকিটা দুর্গা বলে নামিয়ে দিতে পারলেই ল্যাঠা শেষ।

বন্ধুগণ, আমাদের এই তেত্রিশ কোটি দেব দেবী সমাদরে পূজো পান না। খুবই দুঃখের কথা ! আমরা যদি গদিতে পাকাপোক্তভাবে বসতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত ভাবে জনজীবনকে উৎসবে উৎসবে ভরিয়ে তুলব। এক যায় তো আর এক আসে। প্যাণ্ডেল আর খুলতেই হবে না। আলোর ঝালর বারোমাস ঝুলতেই থাকবে। মাইক গানে গানে আকাশ বাতাস অষ্টপ্রহর উদ্বেল করে রাখবে। যেওনা নবমী নিশি লয়ে তারাদলে, কবির এই আক্ষেপ আর থাকবে না। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব নিশিকেই অমাবস্যা নিশি করে তুলেছিলেন, আমরা আজ কৃতসঙ্কল্প, বন্ধুগণ, সুযোগ দিন, আপনাদের জীবনে নবমীর রাতকে আমরা চিরস্থায়ী করে ছেড়ে দোব। আপনারা আমাদের পাকা করুন, আমরাও আপনাদের পাখার বাতাস করব।

পূজো যত বাড়বে দেশের মানুষের অবস্থাও তত ভাল হবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে অকৃপণ ধারায়। বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হবে। খরা থাকবে না, বন্যা আসবে না। শরতের শস্য ক্ষেত্রে বাতাস নেচে যাবে বাতুলের আনন্দে। পুজো মানেই শিল্প। পুজো অর্থনীতিকে ঠেলা মারে চাঙ্গা করে তোলে। কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি তাল তাল এঁটেল মাটি ডাঁই করে। চ্যাচারি, দরমা, খড়, পাট, দড়ি, শোলা, জরি, সলমা, চুমকি, সাটিন কাঁচামাল আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। সপরিবারে শিল্পী আটচালায় বসে পড়েন প্রতিমা গড়ার কাজে। বাবুরা আসতে থাকেন বায়নার টাকা নিয়ে। দুর্গাপুজোই সবচেয়ে বড় পূজো। একঢিলে দু'পাখি। মা দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অসুর। জীবজন্তুর মধ্যে সিংহ, প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর। মা দুর্গাকে সপরিবারে সাপ্লাই দিতে হয়। সবই ম্যাগনাম সাইজের। প্রচুর বাঁখারি, বিচুলি, পাট, মাটি, তুঁষ, কাপড়, রঙ লাগে। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই যাঁরা মায়ের একান্নবর্তী পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। পরোক্ষে তাঁরা বাঙালার দরিদ্র শিল্পী পরিবারকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। একেই বলে কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষ মাস।

বন্ধুগণ, আপনাদের গলায় গামছা দিয়ে যাঁরা চাঁদা নিয়ে যান, তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। ভক্তের ভক্তির পূজো নাই বা হল। সবাই কি আর রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ। পাড়ায় পাড়ায় হুল্লোড়ের পূজোই হোক। এক কমিটি ভেঙে শত কমিটি হোক। শিল্প বাঁচুক, শিল্পী বাঁচুক। আমরা যদি সুপরিকল্পিত ভাবে আরও কিছু দেবীকে জাতে তুলতে পারি, তাহলে, কুমোরপাড়া সারা বছরই রমরমে হয়ে থাকবে,কাপড় জামার দোকানে সারা বছরই পূজো লেগে থাকবে। প্যাণ্ডেলওয়ালাদের প্যাণ্ডেল আর খুলতে হবে না। এক যাবেন, আর এক আসবেন। তাসাপার্টি ন্যাশন্যাল অর্কেস্টার চেহারা নেবে।

বন্ধুগণ, এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে হাসি ফুটবে। মা হাসবেন, ছেলে হাসবে। বছরে একবার চাঁদা দিতে গায়ে লাগে। দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে, ইনকামট্যাকস, সেলসট্যাকসের মত সহজ হয়ে যাবে। মনে তখন আর কোন বাধা থাকবে না। তৈয়ার বলে, গেরস্থ হাসি হাসি মুখে, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চাঁদা তুলে দেবে।

বন্ধুগণ, এ চাঁদা চাঁদা নয়, পরভৃতিকা। চাঁদা নয়, বলুন পারকোলেশান অফ

ওয়েলথ। চাঁদা নয়, বলুন সাম্য। আমাদের সংবিধান, যে সাম্য, মৈত্রী আর একতার কথা বলেছেন, তা রাজনীতি দিতে পারবে না। রাজনীতি কোনও নীতিই নয়, এক ধরনের ছ্যাঁচড়ামি। বারোয়ারীই হল সমস্যা সমাধানের পথ। চাঁদায় প্রতিপালিত হবে শিল্পী, চাঁদায় প্রতিপালিত হবে বেকার। আমরা আর কতজনকে চাকরি দিতে পারব ! বেকারদের ফেলে দিন মায়ের চরণে, বাবার চরণে ! বাছারা বেঁচেবত্তে থাক। তাদের বাঁচা দরকার। তা না হলে নির্বাচনে লড়বে কারা, দেয়ালে দামড়া অক্ষরে জাতিকে জাগরণের বাণী শোনাবে কারা ! জয় হিন্দ।

না, জয়হিন্দ এখানে চলবে না। রেডিও কি টিভির ভাষণে চলে। পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে বেমানান ? কেটে উড়িয়ে দিলুম।

বিমল শুনে বললে, একটু যেন ফাজলামো হয়ে গেল রে। মিনিস্টার না রেগে যান। রেগে গেলে তোর চাকরি যাবে মাইরি।

একটু প্যাঁচ কষে দিলুম। কেন বল তো ?

নিজের ওপর নিজে প্যাঁচ কষলি ! কালিদাসের টেকনিক ? যে ডালে বসে আছিস সেই ডালটা কেটে ফেলার প্যাঁচ ?

আজ্ঞে না স্যার। ব্যানার্জি সাহেবের বাঁশ তৈরি হল। হাতে করে নিয়ে যাবেন, পেছনে করে ফিরে আসবেন। ওই মাল আমাকে গত বছর বাঁশ দিয়েছিল মনে আছে ?

তোর সেই প্রোমোশান ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্টারভিউতে যত জামাই ঠকান প্রশ্ন করে আমাকে আউট করে দিয়ে নিজের শালাকে ঠেলে ওপরে তুলে দিলে। সে মালকে ত চিনিস। একেবারে নীলকণ্ঠ। পাপ করে করে পাক তেড়ে মেরে গেছে।

বিমল ফিস্ করে মুখে শব্দ করল ! ব্যানার্জি সাহেব আসছেন।

কি হয়ে গেছে ?

এমন ভাবে বললেন, যেন আমি মালের বাপের চাকর। মাল শব্দটা আমি বিমলের কাছে শিখেছি।

হ্যাঁ স্যার।

দিন দিন। বড় হয়ে গেল না কি ? ক মিনিট ?

চার-পাঁচ মিনিট হবে।

দেন ইট ইজ অলরাইট। প্রাইভেট সেক্রেটারি এর মধ্যে বারতিনেক ফোন করেছেন। এত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, বক্তৃতা লেখার একটা যন্ত্র বেরলে বেশ হত। কল টিপে জল বের করার মত। দরকার মত একমিটার, দুমিটার বক্তৃতা বের করে নেওয়া যেত।

বিমল বললে, কাজটা কি ভাল হল ? কে লিখেছে বলে, সেই দুর্বাসা যখন চিৎকার করবে, তখন তো মাল তোমাকে নিয়ে টানাটানি হবে।

তুইও যেমন, মালকে চেন না, হেসে হেসে বলবে, এই যে স্যার লিখে নিয়ে এসেছি। ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। পুজোর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি। আপনার মাথাতেও আসে স্যার।

বিমল মন্ত্রীর গলা নকল করে বললে, এইরকম মাথা বলেই আপনাদের মত গাধাদের সামলাতে পারছি।

আমি ব্যানার্জি সায়েবের গলায় বললুম, হেঁ হেঁ তা যা বলেছেন স্যার। আমাদের গাধা বললে, গাধারাও স্যার প্রতিবাদ করবে।

বিমল বললে, থাক, নিজেদের চিনতে পেরেছেন দেশের মানুষের সৌভাগ্য। এক তারা দু'তারা, তারা তিন চার।

বিমল আবার গান ধরল, টেবিলকে তবলা করে। তিন তালে বেশ কিছুক্ষণ কালোয়াতী চলল। অফিস না পাড়ার ক্লাব, এ প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। দু'চারজন পাবলিক খবরাখবর সংগ্রহে এলেন। শিল্পের খবর। কি করলে, কি হয়! দেশে চাকরি নেই। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই ত ঝুঁকতে হবে।

একজনকে বলা হল, ইট তৈরি করুন। গঙ্গায় ভীষণ পলি পড়ছে। কাটুন আর ছাঁচে ফেলে ইট বানান। সভ্যতার ফাউন্ডেশানই হল ইট। নাক সেঁটকাবেন না। ইট শুনতে খারাপ লাগলে বলুন বিলডিং ব্লকস। মানুষের যেমন আদি মানব আছে, শিল্পেরও তেমনি আদিশিল্প আছে। ইট সেইরকম একটি জিনিস। ইটের মার নেই। পচবে না, গলবে না। থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান ব্যবহার। বাড়ি তৈরিতে লাগবে প্লাস মানুষ যত রাজনীতি সচেতন হবে ইটের ব্যবহারও তত বাড়বে। ইটের নাম তখন ব্রিকব্যাটস। ভেঙে টুকরো করে সাপ্লাই দিন। অপোনেন্টকে ঘায়েল করার এর চেয়ে ভাল দিশী গোলা আর কি আছে।

আর একজনকে বলা হল পাঁপর তৈরি করুন। বাংলার ঘরে ঘরে পাঁপর শিল্প চালু হোক। এটা আমাদের সাম্প্রতিক মস্তিষ্ক তরঙ্গ। কর্তৃপক্ষ ভেবেচিন্তে বের করেছেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা বেকার। চুল বাঁধছেন আর চুলোচুলি করছেন। মেয়েদের একবার পাঁপর শিল্পে জুড়ে দিতে পারলে, পাড়া জুড়োবে, বর্গী আসবে। বর্গী নয় নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক কানে আসতে থাকবে। পাঁপরের ওপর প্রায় চল্লিশ পাতার একটা রিপোর্ট, সাইক্লোস্টাইল করে, হলদে মলাট দিয়ে বেঁধে মন্ত্রীর টেবিলে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা।

TOTAL EMPLOYMENT AND PAPAD

সাতটা অধ্যায়। অতীত বাংলা, বর্তমান বাংলা, ইতিহাসে পাঁপর, ডালের উৎপাদন, গুদাম ও পোকা খাওয়া ডাল, জল ও লোহাজল. বাঙালীর আহার বৈচিত্র্য, পাঁপর ও পার্ক, পেট ও পাঁপর, অ্যালকহল ও পাঁপর, অবাঙালী সম্প্রদায় ও পাঁপর, তেলেভাজা পাঁপর ও সেঁকা পাঁপর, বিবাহ ও লোকাচারে পাঁপর, হজম, বদহজম ও পাঁপর, বর্ষা ও পাঁপর। সাতটি অধ্যায়জুড়ে পাঁপরের শ্রাদ্ধ, শান্তি তিলকাঞ্চন।

ভদ্রলোক বললেন, কি যে রসিকতা করেন মাইরি। পাঁপর আবার একটা শিল্প!

আজ্ঞে হ্যাঁ, মশাই, কুটির শিল্প!

বিমল বললে, পেঁয়াজিটাও একটা শিল্প।

ভদ্রলোক চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, তা ত দেখতেই পাচ্ছি। যা আপনারা দিন রাত বছরের পর বছর করছেন।

॥ দুই ॥

সে দিন, বেলা তিনটে টিনটে হবে, পুজোর দীর্ঘ ছুটির পর অফিস সবে খুলেছে, বসে বসে একটু স্টিম নিচ্ছি, কাজে মন বসাতে আরো দিন পনের সময় লাগবে, ততদিনে কালীপুজো এসে যাবে। কালীপুজো, ভাই ফোঁটা মিলিয়ে আবার দু'দিন ছুটি। পুজোর ছুটিতে মধুপুর মেরে এসেছি। কালীপুজোয় দীঘা যাব ক্যালেন্ডার দেখেছি। এক দিন ক্যাজুয়েল নিলে পর পর তিন দিন হয়ে যাবে।

সবে মধুপুর থেকে এসেছি। ছুটির ঘোর এখনও কাটেনি। বেলা পড়ে এলেই মনে হয় মধুপুরে পাথরোল নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশ লাল করে পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। বেশ ভাবে ছিলুম। হঠাৎ মুখার্জি সায়েব এসে ভাব চটকে দিলেন।

দু'আঙুলে নস্যির টিপ। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছ?

ভাল আছি স্যার। আপনি!

চলছে। চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের অসীম কৃপায়।

বেশ নাদুস নুদুস বিশ্বাসী মানুষ। এক সময় অধ্যাপনা করতেন। এই চাকরিতে মাঝামাঝি জায়গায় ঢুকেছিলেন। চড় চড় করে ঠেলে ওপর দিকে উঠে গেছেন। এঁর জীবনে দুটি হবি। এক নম্বর, উঁচু পোস্ট খালি দেখলেই ইন্টারভিউ দেওয়া। সে যেখানেই হোক। দু'নম্বর, একটু লেখা।

প্রথমটা আমাদের কাছে তেমন ভীতিপ্রদ নয়। লেখাপড়া করে উনি ইন্টারভিউ দেবেন, সে ত নিজের পাঁঠা। তার জন্যে দু'-একটা বইপত্তর যোগাড় করে দেবার অনুরোধ, এমন কিছু বড় বায়না নয়। রাখলে রাখা যায়, না পারলে বলে দেওয়া যায়।

দু'নম্বর হবিটাই আমাদের পক্ষে বেশ ভীতিপ্রদ, অন্ততঃ আমার পক্ষে। এই সায়েবটি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। তখন আকাশ অন্ধকার। দরজার পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে ঝাঁ করে দাড়িটা কামিয়ে নেন। তারপর পায়চারি করতে করতে মাথায় ভাব এসে যায়। পাখির মতো একটা দুটো করে লাইন আসতে থাকে ডানা মেলে। বেগ যখন বেশ টনটনে হয়ে ওঠে, ধাঁ করে চলে আসেন লেখার টেবিলে। প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে প্রথমেই লেখেন—ওঁ সরস্বতী। তারপর গড়গড়িয়ে কলম চলল। ভূতাবিষ্টের মত লিখেই চললেন। সকালে বাজারের ভাবনা নেই। ফেরার পথে সন্ধেবেলাতেই সেরে ফেলেন। ভাবের মাত্রা এমন মাপাপাত্রে আসে যেন টাইম বোমা। সাড়ে সাতটা বাজল, শেষ লাইন নেমে গেল। লেখার তলায় খ্যাঁস করে একটা দাঁড়ি, দুটো ফুটকি, ফিনিস।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত, নিষ্ঠাবান কর্মী। অফিস দশটায়। আসেন ঠিক ন'টায়। অফিসে বসেই সাইরেন শোনেন। আর আমরা, যারা অবশ্যই দেরিতে আসি আর তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাদের মাঝে মধ্যেই ডেকে ডেকে বলেন, ঠিক সময়ে অফিসে আসা একটা সৎ অভ্যাস। দেশের মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হলে জাতি নীতিভ্রষ্ট হবে। ফলো মী। রাত দশটা বাজলেই আমি শুয়ে পড়ি, উঠি ভোর চারটেয়। যত ভোরে ওঠা যায় ততই দিন বড় হয়। কাজের সময়ে বেড়ে যায়। আমি নিজে হাতে সব কাজ করি।

বড় কর্তা যখন, তখন ত মাইলড কিম্বা কড়া ডোজে উপদেশ দেবেনই। পিতা অন্ন

দেবেন, শিক্ষক কান মলে দেবেন, কবিরাজ পাঁচন দেবেন, স্ত্রী মুখ ঝামটা দেবেন, প্রতিবেশী বাঁশ দেবেন, পুত্র দুঃখ দেবে, গুরু দীক্ষা দেবেন, গাভীন হলে গরু দুধ দেবে, যার যা ধর্ম। আমরা এ কান দিয়ে শুনি ও কান দিয়ে বের করে দি। ঈশ্বর দুটো কান দিয়েছেন কেন ?

মুখার্জি সায়েব সাজ পোশাকে খুব সাদাসিধে। ঝলঝলে প্যান্ট জামা। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। শীতে একটা আকার আকৃতিহীন কোট বেরোয়, গলায় একটা টাই ওঠে। নস্যি নাকে পুরে, চারপাশে বেশ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। দপ্তরে আমি একা কুম্ভ। বিমল ছুটির ওপর ছুটি চাপিয়ে চলেছে। রবিবারের পর সোমবারেই ওর আর বেরতে ইচ্ছে করে না। দীর্ঘ ছুটির পর নাকি চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। বৃদ্ধ পিতা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করলে তবেই আবার কোঁত পাড়তে পাড়তে অফিসে আসে। সেই ঠ্যাঙাটি মনে হয় এখনও বেরোয় নি।

মুখার্জি সায়েবকে দেখলে ভীষণ আতঙ্ক হয়। মন বলে ওঠে, এইরে মরেছে। নিজের চেম্বারে টেনে নিয়ে যাবেন, পাঁচনের মত এক কাপ চা খাওয়াবেন, মুখটা বোদা মেরে যাবে। তারপর মড়াখেকো একটা ফোলিও ব্যাগ থেকে, মোটা খাতা বের করে একের পর এক কবিতা পড়তে থাকেন। ওনার ধারণা, ওগুলো খুবই উচ্চ স্তরের মাল, জীবনদর্শনের মশলায় ঠাসা, তেমনি তার কারিকুরি। ধৈর্য ধরে শুনলুম, বাঃ বেশ হয়েছে বলে সরে পড়লুম, সেটি হচ্ছে না। সে গুড়ে বালি। প্রতিটি কবিতার ব্যাখ্যা চাই। কি বুঝলে মানিক, বলো দেখি। ফলে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কি লিখেছেন, কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ধরে। নিজেও হয়ত জানেন না। ব্যাখ্যা শুনে বলবেন, হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক, তুমি অবশ্য অন্য রাস্তায় গেলে। তা হোক, ভাল কবিতার ধর্মই হল, যে যেমন বোঝে। ছটা বাজবে, সাতটা বাজবে, অফিস খাঁ খাঁ করবে, অফিস পাড়া নির্জন হয়ে যাবে, তখনও কবিতা চলবে। অর্ডারলি পিওন টুলে বসে বসে ঢুলতে থাকবে। ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার বারেবারে উঁকি মারতে থাকবে। চোখাচোখি হলেই বলবে সেলাম সাহেব। সাহেব অন্যমনস্কে বলবেন, হঁ্যা হঁ্যা সেলাম।

জীবনেরও জানালা আছে
নীলডানা গণেশের গাত্র চর্মে
হৃদয়ের হাসি শুনি
বিধবার নিমীলিত চোখে॥

সেলাম সায়েব। হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম,

মাঝরাতে ফিটনের চাকা ঘোরে
দুর্দান্ত ঝড় ওঠে
কন্দর্পের চুলচেরা বুকে,
সাজানো অজানা
পন্ডিতের তর্ক জোড়ে
টোল ভেঙে পড়ে

সেলাম সায়েব,

হবে হবে সব হবে
মৃত্যু মেতে ওঠে
প্রেয়সীর
অস্পষ্ট জটার বাঁধনে ॥

সুইপার মরীয়া হয়ে চিৎকার করে উঠবে সেলাম সায়েব! আমিও সাহস করে বলব, স্যার প্রায় আটটা বাজল।

তাই নাকি? তা হলে চলো ওঠা যাক।

উঠতেও অনেক সময় লাগবে। সমস্ত টেবিল সজ্জা একে একে ড্রয়ারে ঢুকবে। তিনটে ক্যাবিনেটে চাবি পড়বে, সেই চাবি আবার আর একটা লকারে গচ্ছিত হবে। সেই লকারের চাবিটি ব্যাগে ঢুকবে। নিজের হাতে দুটো জানলা বন্ধ করবেন। একটা মাত্র আলো রেখে, বাকি আলো আর পাখার সুইচ অফ করবেন। তারপর যাবেন বাথরুমে। ফিরে এসে বলবেন, চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি। সে আবার আর এক বাঁশ। আমাকে উজিয়ে ফিরে আসতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে শুরু হবে গৃহযাত্রা। বাড়ি যখন ফিরব তখন চোরেদের সিঁদ কাঠি নিয়ে জীবিকায় বেরোবার সময় হয়েছে।

মুখার্জি সায়েব মুচকি হেসে বললেন, কি, আজ আমাদের সিটিং হবে না কি। নাঃ, আজ থাক।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম, হ্যাঁ স্যার, আজ থাক।

কেন থাক বল তো?

অধ্যাপক ছিলেন, তাই সবসময়েই সবকিছুর ব্যাখ্যা খোঁজেন। বললুম, তা ত জানি না স্যার।

আচ্ছা, এর মধ্যে তুমি কি দুর্গাপুজোর ওপর কোনও কিছু লিখেছিলে?

মরেছে, 'হ্যাঁ' বলব, না 'না' বলব! এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

বিমলের কথাই বোধহয় ফলতে চলেছে। কালিদাস ডাল কেটে কবি হয়েছিলেন, আমি বেকার হব। ভয়ে ভয়ে বললুম, হ্যাঁ স্যার।

ধরেছি ঠিক। আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

কেন স্যার কি হয়েছে?

মার দিয়া কেল্লা।

কার কেল্লা স্যার। আমার কেল্লা?

একরকম তোমারই কেল্লা বলতে পার।

চাকরিটা গেল স্যার?

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় একবার দ্যাখো। মন্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, একেবারে উচ্ছ্বসিত। আমাকে আজ বললেন, মুখার্জি একবার খোঁজ করুন ত, ও জিনিষ। মাথামোটা ব্যানার্জির কলম থেকে বেরবে না। ফাইন্ড আউট দি ম্যান। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, এ তোমার কাজ। ওই কাঁচা খেকো দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, কম কথা?

এইবার দেখা যাক তোমার জন্যে একটি নতুন পোস্ট তৈরি করা যায় কিনা। প্রত্যেকবার ফাইনান্স বাগড়া দেয়।

মনে মনে বললুম, ওই জন্যেই ত স্যার, বসে বসে আপনার ভট্টি কাব্য শুনি, একটাও হাই তুলি না। মাথা খাটিয়ে উদ্ভট লাইনের ব্যাখ্যা খুঁজি।

তা হলে চলো।

কোথায় স্যার?

মন্ত্রী সকাশে।

আমাকে আবার টানাটানি কেন?

তার মানে? মন্ত্রী তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ছুটি হতে এখনও কিন্তু ঘন্টাখানেক বাকি, এই দপ্তর কিন্তু বন্ধ করে যেতে হবে?

হ্যাঁ, বন্ধ করেই যাবে। তুমি ত রাজদর্শনে যাবে। সাত খুন মাপ।

আপনিই বলেছিলেন, জনসংযোগ দপ্তর ঠিক সময়ে খুলবে, ঠিক সময়ে বন্ধ করবে।

আজ আর কোন নিয়ম নেই। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করতে পারেন, মন্ত্রী পারেন না। নাও উঠে পড়।

অগত্যা উঠতেই হল। পাশ কাটান গেল না। বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুখার্জি সায়েব ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, অ্যাসেমব্লি চল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। যতই বলছি ভয়ের কি আছে, খেয়ে ত আর ফেলবেন না, ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছে। একটু বড় বাইরে বাইরে ভাব।

॥ তিন ॥

অ্যাসেমব্লিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর একটি ঘর।

মন্ত্রীরা সব সময়েই মাননীয়। সায়েবরা বলেন অনারেবল। আমি এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে জানি যিনি জেলা পরিদর্শনে গিয়ে ভোরবেলা ডাকবাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে জনৈক তটস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলেছিলেন, হনারেবল মিনিস্টার রোজ দেড় সের পরিমাণ খাঁটি দুধ খান। আপনি অবিলম্বে সেই দুধের ব্যবস্থা করুন।

ইয়েস ম্যাডাম বলে তিনি যেই দৌড়তে যাবেন অধস্তন বললেন, দিক ঠিক করে দৌড়ন স্যার। পুরুলিয়া শহরে গবাদি পশুর বড় অভাব, দু' একটা চাগরু মিলতে পারে, দেড় সের খাঁটি দুধ পাবেন কোথায়?

দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, বলে তিনি ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে ভূতেধরা মানুষের মত গোল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, চাগরুটা কি জিনিস মশাই।

আরে ম্যান চাগরু অনেকটা ছাগলের মত দেখতে হয়। যখনই বাঁটে হাত দেবেন, ছিড়িক করে এক চামচে দুধ ছাড়বে, এক কাপ চা করার মত। আমরা নাম রেখেছি চা গরু।

এ দেশে মন্ত্রীরাই শুধু বুদ্ধিমান নন, বুদ্ধিমান প্রজারও অভাব নেই। গুঁড়ো দুধ ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে বটের আঠা মিশিয়ে দেড় সের খাঁটি গোদুগ্ধ তৈরি হল। বটের

আঁঠা কম বলকারক ! ছটা বাচ্চা পেড়ে ছাগল যখন নেতিয়ে পড়ে তখন বটপাতা খাইয়ে তার স্তনে দুধ আনা হয়। বৃক্ষ বট, মন্ত্রী বট, আহার বটদুগ্ধ।

অ্যাসেমব্লির মন্ত্রীমহোদয় বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মতো লাল। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সবসময়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে মুখটাই ডিসফিগার্ড হয়ে গেছে। অনবরত চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে গলা হয়েছে ফাটা কাঁসরের মত।

চোখ দুটো মোটরগাড়ির ব্যাকলাইটের মত। জ্বলছে, জ্বলবে। দাঁত খিচিয়ে বললেন কি চাই ? মুখার্জি সায়েব থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে এনেছি।

ঠেঙিয়ে ব্যাটার নাম ভুলিয়ে দাও।

মুখার্জি সায়েব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আজ্ঞে স্যার।

আপনাকে নয়, চুপ করে বসুন। আমি সনাতনকে বলছি। অপদার্থ শয়তান। পুলিস কি করছে ? তোমাদের পুলিস ?

ধরচে আর ছাড়চে। এ মুখ দিয়ে ঢুকছে ও মুখ দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মন্ত্রী টেবিলে এক ঘুসি মেরে বললেন, এই আমলারা, রাশকেল আমলারাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে গদি টলিয়ে দিলে। গেট আউট।

সনাতন বললেন আমি আবার কি করলুম।

তোমাক বলিনি পাঁঠা। আমি এই মুখার্জিকে বলেছি।

মুখার্জি সায়েব কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, আমাকে স্যার আমলা বলবেন না। আরও দুধাপ ওপরে উঠলে তবেই আমলা হতে পারব।

তাহলে বসুন। সনাতন তুমি যাও। তোমাদের দ্বারা কিস্যু হবে না। আমার নাম জপে যদ্দিন গদিতে আছি, যা পার কামাই করে নাও। গাড়ির পারমিট বেরিয়েছে ?

কবে ?

নেমে গেছে ?

কাল নামছে।

তবে আর কি ? যাও বোতল খুলে বসে পড়।

লোহার পারমিটটা যে এখনও আটকে আছে।

কেন ?

তাত জানি না। ফাইলটা আটকে রেখেছে !

হোয়াট। মন্ত্রীর অর্ডার চেপে রেখেছে। আমি ওই সান্যালের প্যান্ট খুলে নেবো। অফিসার হয়েছে অফিসার।

হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিলেন।

মুখার্জি সায়েব মিউ মিউ করে বললেন, মিস্টার সান্যাল স্যার পোল্যান্ড গেছেন।

পোল্যান্ড। পোল্যান্ডে কেন ?

আজ্ঞে লোহা চিনতে।

অপদার্থ। কে অ্যালাউ করেছে ?

আপনিই স্যার করেছেন।

আই ওয়াজ মিসলেড।

মিঃ সান্যাল স্যার সি এমের লোক।

এই সি এমরাই দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে, কবে যে আবার ওয়ান পার্টি রুল হবে। সামনের বার আমাকে সি এম হতেই হবে। সনাতন।

বল দাদা।

আরও এম এল এ চাই। ম্যাজোরিটি আমার। তোমাকে আমি লোহা দিয়ে ইস্পাত দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে মুড়ে দোব।

দেশের লোক দাদা বড় সেয়ানা হয়ে গেছে।

বোকা বানাবার কল চালু করে দাও ! এখনও সময় আছে। নাউ অর নেভার। এখন তুমি যাও তাহলে, অ্যাঃ।

সনাতন নামক জীবটি মাখমের মত মাখোমাখো হাসিতে মুখ ভরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাসি যেন মুখ ছেড়ে আধ হাত লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘর খালি হল। মন্ত্রীমহোদয়ের মুখ সাহিত্যসভার প্রধান অতিথির মত ভীষণ গোমড়াও হয়ে আছে। যে জানে না, সে দেখলে ভাববে, বউ বুঝি খুব বকেছে। এ যে পলিটিক্যাল মার বাবা। কোথায় কে এক অপোনেন্ট অ্যায়সা কলকাঠি নেড়েছে, আসনে ভূমিকম্প।

টেবিলে তিনবার টোকা মারলেন। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মুখার্জি সায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আর মানুষ হলেন না।

কেন স্যার ?

সব অসতী, অসতী। ঘর করছেন একজনের সঙ্গে, শুতে যাচ্ছেন আর একজনের সঙ্গে। আপনারা হলেন বাজারের বেশ্যা।

এ স্যার কি বলছেন ? ছি ছি।

চপ, প্রতিবাদ করার সাহস আসছে কোথা থেকে। বাইরের খোলসটা হল সতীসাধ্বীর আর ভেতরের ভাবটা হল বারবনিতার। এক বাবুতে মন ওঠে না। নতুন নতুন চাই, নতুন নতুন।

হৃষ্টপুষ্ট মন্ত্রীমহোদয় চেয়ারে বসে বসেই স্প্রিঙের মত নাচতে লাগলেন, ওপর নীচ, নীচ ওপর।

নতুন নতুন বলার সময় মুখের চেহারা হল কোলা ব্যাঙের মত। ডোবায় বসে ডাকছেন যেন, গ্যাঙোরগ্যাং। আচ্ছা জায়গায় এনে ফেললেন আমার শুভানুধ্যায়ী মুখার্জি সায়েব। একেবারে বাঘের ঘরে চারপাশে ঘোগের বাসা।

নাচ করে মন্ত্রীমহোদয় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, মুখার্জি, আমি প্রতিবাদ পছন্দ করি না। যা বলব, তা মানতে হবে। মন্ত্রীর অবজার্ভেশানে কখনও ভুল হয় না। ভুল হলে দেশ শাসন করা যেত না। বুঝেছেন ?

ইয়েস স্যার।

হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আমরা ইয়েস ম্যানই পছন্দ করি। ওই সান্যালটার আমি বারোটা বাজাবই। পোল্যান্ডে গেছে আর একটু ঠেলে কুমেরুতে পাঠিয়ে দোব। র‍্যাসকেল।

মুখার্জি সায়েব বললেন, আমি প্রতিবাদ করিনি স্যার, শুধু বলতে চেয়েছিলুম, আমি ওই গণিকাদের দলে পড়ি না। আই অ্যাম সো ডিভোটেড টু ইউ।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না মুখার্জি। প্রমাণ চাই, প্রমাণ, ডিভোসনের প্রমাণ।

কি ভাবে স্যার।

ওই সান্যালের চেয়ারে আপনাকে আমি বসাব। ওই চেয়ারে আমি আমার লোক চাই।

কি করে বসব স্যার।

ফুল, দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, আই উইল অ্যারেঞ্জ ইওর প্রোমোশান।

কিন্তু সি এম।

ইডিয়েট। আমি দুর্নীতির অভিযোগ এনে হারামজাদাকে সাসপেন্ড করব, আপনাকে দোব প্রমোশন। বাট ইউ মাস্ট বি ভেরি অনেস্ট। আমার লোককে আপনি রমেটিরিয়েল দেবেন উইদাউট অ্যানি হ্যারেসমেন্ট।

অফকোর্স স্যার।

আ, এই ছেলেটি তাহলে আমার সেই বক্তৃতা লিখেছিল।

হ্যাঁ স্যার।

চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করলুম। ধাই করে টেবিলে হাঁটু ঠুকে গিয়েছিল। মনে মনে বাপ বললুম। মুখে যেন যন্ত্রণার রেখা না পড়ে। তাহলে কেস কেঁচে যাবে। যাঁর সামনে এসে বসেছি তাঁর একটা আঙুল নাড়ায় আমার বরাত ফিরে যেতে পারে। কতদিন ধরে জীবন বৃক্ষে মুকুল আসছে, ফল ধরছে, ঝরে পড়ে যাচ্ছে, পাকছে না। এইবার এমন সার পড়তে পারে হয় গাছ জ্বলে যাবে নয়ত পদোন্নতির ফল পাকবে।

বোসো বোসো, হি লুকস ভেরি ইনোসেন্ট। তোমার লেখায় বেশ ডেপোমি আছে হে। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তোমাকে পেছন পাকা বলা যেতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাজনীতি করো?

আজ্ঞে না স্যার।

এই রকম একটা দুটো র মাল আমার চাই মুখার্জি। বাইরে ইনোসেন্ট ভেতরে শয়তানি। তোমাকে আমার কাজে লাগবে। যাও। এখন যাও। আমার কাজ আছে।

আমরা দু'জনে সমস্বরে ইয়েস স্যার বলে উঠলুম।

মুখার্জি সায়েব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, যাক তোমার কপালটা এতদিনে ফিরল। একই পোস্টে ঘাঁসড়াচ্ছো বছরের পর বছর।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, একবার ত আপনার জন্যই আমার প্রমোশন হল না। আপনার ভাগনেকে লড়িয়ে দিলেন।

এ তুমি কি বলছ? নিজের ভাগনে আগে না তুমি আগে? এর পরের চান্সে তোমারই হত।

আপনার কি মনে হল?

তার মানে?

এই যে মন্ত্রী বললেন, পেছন পাকা, ভেতরে শয়তানি, চাকরিটা যাবে নাত?

আরে না না, ওসব হল সোহাগের কথা। মেজাজ এখন খুব চড়েই থাকবে। টার্ম শেষ হয়ে আসছে, ইলেকশান প্রায় এসেই গেল। চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি।

সেরেছে রে, আবার মানিকতলা।

মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি দাঁড়াল। সায়েব বাজার করবেন। আমাকে বললেন, এত ভাল আর রকম রকম মাছ, তুমি কলকাতার অন্য কোনও বাজারে পাবে না। মাছ কিনবে নাকি?

অপরাধীর মত মুখ করে বললুম আমার মাছ কে রাঁধবে স্যার।

মনে মনে বললুম আপনি তিন হাজারি মনসবদার ছরকম মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারেন। আমাদের একবেলা এক চিলতে জোটাতেই জিভ বেরিয়ে যায়।

তিন রকমের ব্যাগ হাতে গাড়ি থেকে নামতে নামতে মুখার্জি সায়েব বললেন, বুঝলে আমি একটু ভোজনবিলাসী। তিন রকমের মাছ না হলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সবাই ঠাট্টা করে বলে মৎস্যাবতার। মাছের কপালটাও আমার ভাল। এই বাজারে ঢুকলেই দেখতে পাবে।

আমিও যাব স্যার?

বাং মাছ দেখবে না। সব রকম মাছ তুমি চেন।

একটা মাছই আমি চিনি, তা হল কাটা পোনা।

কাটাপোনা, হাঃ হাঃ, কাটা পোনা আবার মাছ নাকি হে। চলো চলো ফলুই দেখবে চল। রূপোর মত চেহারা। জলের গামলা ছেড়ে দশ বারো হাত করে লাফিয়ে উঠছে।

কলকাতায় বেশ কাঁঠালপাকা গরম পড়েছে। প্রাণ একেবারে আইঢাই। সবে সকাল সাড়ে দশটা। শহরে যেন আগুন ছুটছে। জামার বুকের সবকটা বোতাম খুলে দিয়ে বিমল চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে। কাল সারারাত কোথায় গান গেয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ বলছি।

একবার আসতে হচ্ছে।

এখুনি?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। অনারেবল মিনিস্টারের তলব।

আপনি কে বলছেন স্যার?

অনারেবল মিনিস্টারের পি এ।

অনারেবল মিনিস্টারের ঘর খুঁজে পেতেই জীবন বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহলে এত ঘুরপাক। দেউড়ির পুলিসকে বলা ছিল তাই কাছা ধরে টানেন নি।

চারটে টাইপরাইটার একই ছন্দে বেজে চলেছে। চারটে টেলিফোনের একটা থামে ত আর একটা বাজে। টেলিফোনের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি অষ্টভুজ মহাদেবের মত, টেলিফোনের ভোজবাজি দেখাচ্ছে। তুলছেন ফেলছেন, ফেলছেন তুলছেন। যেন জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলছে। এনগেজ্‌ড।

অনেকক্ষণ বসে আছি। একটু উসখুস করলেই প্রজাপতি গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক ধমকের সুরে বলছেন, চুপ করে বসুন। সময় হলেই ডাক আসবে। আচ্ছা ল্যাঠা রে বাবা! আমি ত আসিনি, তিনিই ত ডেকেছিলেন।

অবশেষে ডাক এল। প্রজাপতি গোঁফ ধমকের সুরে বললেন, যান, ডাকছেন।

সব মেজাজ দ্যাখো! যেন ঘেও কুকুর! মন্ত্রী মহোদয়ের হাওয়া লেগেছে আর কি! নীল রঙের দরজা ঠেলে ঘরে পা রাখতেই, পা যেন ডুবে গেল। জলে নয়, নরম কার্পেটে। টেবিলের সামনে পাঁচটা সারিতে অন্তত কুড়িটা চেয়ার। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে বিশাল একটি টেবিল। টেবিলের আবার একতলা, দোতলা হয় এই প্রথম দেখলুম। অনেকটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখো গোছের অভিজ্ঞতা। একতলায় কাঁচ লাগান, তার ওপর মন্ত্রী মহোদয়ের হাত। দোতলায় ব্যালকনিতে যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার, যেন খেলার সামগ্রী। কলমদানি, ভেলভেটের পিনকুশান, হ্যানাত্যানা। সারা ঘরে হিলহিল করছে একটা যান্ত্রিক ঠাণ্ডা।

মন্ত্রী মহোদয়ের কাশি হয়েছে। বিশ্রী কাশি। সাইবেরিয়ায় যেন হায়না কাশছে। ঘরটা এত পেল্লায়, ক্ষমতার ঘূর্ণায়মান আসনটি এত বিরাট, আর আমি এত ক্ষুদ্র, মনে হল, আমি একটা টিকটিকি। টকটক না করলে, নজরেই পড়ব না।

সেই গানটা মনে খেলে গেল, আমি এসেছি, আমি এসেছি-ই, বঁধূ হে। লয়ে এই হাসি রূপ গান॥

দরজা থেকে দুপা এগিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ঘোষণা করলুম, আমি এসেছি স্যার।

দেখেছি। অমন ন্যাকা সুরে কথা বলছ কেন? লিঙ্গ ঠিক আছে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বোসো।

ভয়ে ভয়ে বসলুম। সম্বর্ধনাটা তেমন সুবিধের হল না। লিঙ্গ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মেডিকেল বোর্ডে না পাঠিয়ে দেন! আজ আবার চোখে চশমা উঠেছে।

মৌমাছি কাকে বলে জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যে মাছি মধু দেয়।

তোমার মাথা। এ কি গরু যে পালান ধরে চ্যাঁক চোক করলেই দুধ দেবে! মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে চাকে রাখে। বুদ্ধিমান মানুষ চাক ভেঙে সেই মধু খায়। ভাল্লুকেও খায়। আমাদের এই রাজনীতির মত। আমরা চাক বেঁধে মধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি, বিরোধী ভাল্লুকেরা এসে সব সাবাড় করে দেবে। মধু খেয়েছ?

ছেলেবেলায় স্যার, সেই জন্মাবার পরেই, ঠোঁটে একবার দেওয়া হয়েছিল।

গাধা কোথাকার! আমি রোজ চার চামচে মধু দিয়ে পাতিলেবুর রস খাই।

ভীষণ দাম।

লিখতে পারবে?

কি লিখতে হবে বলুন?

পশ্চিমবাংলায় মৌমাছির চাষ। জমি কুপিয়ে, মৌমাছির বীজ ছড়িয়ে চাষ নয়, মৌচাক বসিয়ে মাছির চাষ। গাধাদের বিশ্বাস নেই। তিন পাতা ধান চাষ লিখে, দাঁত বের করে সামনে এসে দাঁড়াল, এনেছি স্যার।

পারব স্যার। বারুইপুরে মৌমাছির চাষ আমি দেখে এসেছি।

হুঁ। শোনো, মৌমাছির সঙ্গে একটু রাজনীতি ঢুকিও। বেশ কায়দা করে ঝাড়বে। এখন বাজে বেলা বারোটা। তিনটের মধ্যে চাই। তুমি দুটোর মধ্যে দেবে। তারপর টাইপ হবে। চারটের সময় আমাদের পৌঁছতে হবে। টিভি সেন্টার। সংস্কৃত কোটেশান একদম ব্যবহার করবে না। আমার ফল্‌স টিথ, উচ্চারণে ভীষণ অসুবিধে হয়।

মুখে এসে গিয়েছিল, প্রেব্যাক করলে কেমন হয় স্যার! ভাগ্যিস বলে ফেলিনি।

মাত্র দু'ঘন্টা সময়, তিনপাতা লিখতেই হবে, নয়ত চাকরি চলে যাবে। কি এখন লিখি? প্রথমেই লিখি, মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি, নাচি, দাঁড়াবার সময় ত নাই। পরোপকারী মৌমাছি, হুল ফোটালেও গাছে গাছে মানুষের জন্য অমৃতকোষ ঝুলিয়ে রাখে। মৌমাছি আর আদর্শ রাজনৈতিক দল-নেতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই যা করেন, সবই মানব হিতার্থে। হিতার্থে শব্দটা চলবে না। দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে। ফলস টিথে অসুবিধে হতে পারে। মানব কল্যাণে। না চলবে না। য ফলা আছে। মানুষের উপকারে লিখি। সহজ সরল, যুক্তাক্ষর বর্জিত।

মৌমাছি একশো মাইল রেডিয়াসে, ও বাবা রেডিয়াস আবার ইংরেজী শব্দ, একশো মাইলের পরিধিতে পড়াপড়ি করে, ফুলে ফুলে, ফুলিফুলি মধু সংগ্রহ করে এনে, মোমচাকের কন্দরে কন্দরে মধুভাণ্ডে মধু সঞ্চয় করে। স্রো এসে গেছে।

এই মধুই হল সেই অমৃত, যে অমৃত উঠেছিল সমুদ্রমন্থনে, সেই অমৃত, যে অমৃত অসুররা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, দেবতারা কৌশলে কেড়ে নিয়েছিলন। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার অমৃত ভাণ্ডে, আমাদের শ্রমে, নিষ্ঠায়, দেশহিতব্রতে উন্নয়নের যে মধু সঞ্চিত হয়েছে একদল উন্মত্ত, লোমশ ভাল্লুক, মাতোয়ালা হয়ে রাতের অন্ধকারে তা খেয়ে চলে যাবে, এ কি আপনারা সহ্য করবেন? অসুরকুলের এই ঘৃণ্য প্রয়াস আমাদের রুখতেই হবে। রুকবোই, রুকব।

মধুর মত মধুর বস্তু আর কি আছে! উপনিষদ বলছেন, ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মার্ধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসে। ইত্যাদি। মধুর একেবারে ছড়াছড়ি। দ্রব্যগুণে মধুর কোনও তুলনা হয় না, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, ফ্রাকটোজ, ক্যালোরিতে ঠাসা, এক এক ফোঁটা, এক একটি অ্যাটম বোমা। অ্যালকোহল রক্তে মিশতে ছ ঘন্টা সময় নেয়, মধু জিভে পড়ামাত্রই রক্তে মিশে যায়। মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খেলে মানুষ শতায়ু হয়।

বন্ধুগণ, আপনারা ঘরে ঘরে বাক্‌স চাক বসিয়ে মৌমাছি পালন করুন। মধুর উৎপাদন বাড়ান। মধু মানে স্বাস্থ্য, মধু মানে যৌবন, যৌবন মানে জীবন, জীবন মানে জাতি। কর্মে, ধর্মে, মর্মে বাঙালী জেগে ওঠ। আমরা বড় পেছিয়ে পড়েছি। ইন কিলাব জিন্দাবাদ।

আঃ, টেরিফিক লিখে ফেলেছি। বাচ্চা লোক এক দফে তালি বাজাও।

দুটো বেজে দশ মিনিটে বক্তৃতা মন্ত্রীর হাতস্থ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে বললুম, কামাল কর দিয়া গুরু।

মন্ত্রী মহোদয়ের খুব পছন্দ হয়েছে মনে হল। সংস্কৃত শ্লোকটির ব্যাপারে সামান্য একটু আপত্তি তুললেন। ওটাকে বাদ দিলে কেমন হয়।

শ্লোকটার লাইনে লাইনে স্যার মধু। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কবে আবার মধু হবে।

থাক তা হলে। গাড়িতে যেতে যেতে তুমি আমাকে বার কয়েক তালিম দিয়ে দিও। তিনটে পাঁচে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হল। সামনে দু'জন বডি গার্ড। পেছনে আমরা তিনজন। একজন হলেন মন্ত্রী মহোদয়ের পি এ।

যেতে যেতে শ্লোকের তালিম চলেছে। বলুন স্যার, ওম্। উঁহু ওঁ নয় অউম্।

খুব ক্ষেপে গেলেন, লিখেছ ওঁ, বলতে বলছ অউম্।

আজ্ঞে খাস সংস্কৃত ওঁ এর উচ্চারণ অউম্, যেমন বাডজেটের উচ্চারণ হল বাজেট। বলুন স্যার, মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। ক্ষরন্তি নয়, উচ্চারণ হবে, হখসরন্তি।

বেশ জুতসই একটা গালাগাল দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। আমাদের ওভারটেক করে পাশ দিয়ে সাঁ করে আর একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহোদয় চমকে উঠে বললেন কে গেল, মনে হচ্ছে আর এক জন মন্ত্রী গেলেন।

পি এ কিছুই দেখেন নি। ভিক্টোরিয়ার মাঠে জোড়া শালিক দেখছিলেন। বোকার মত বললেন, না স্যার।

তুমি থামো, গবেট কোথাকার, আমি গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়তে দেখেছি।

সামনের বডিগার্ডের মধ্যে একজন বললেন, হ্যাঁ স্যার, মন্ত্রী গেলেন।

আমি দেখেছি। জঙ্গল আমাকে ওভারটেক করে চলে গেল।

জঙ্গল মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী। রাগে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ জবাফুলের মত লাল, হোয়্যার ইজ মাই ফ্ল্যাগ রাশকেল। মাই ফ্ল্যাগ।

আমি তোমার চাকরি চিবিয়ে খাবো গাধা। হোয়ার ইজ মাই ফ্ল্যাগ।

কাকে এইসব মধুর সম্ভাষণ হচ্ছে? গাড়ির সামনের ফ্ল্যাগ পতপতিয়ে দেবার দায়িত্ব কার? মন্ত্রী মহোদয় পেছন থেকে ড্রাইভারদের ব্রহ্মতালুতে ঠাই করে একটা চাঁটা মেরে বললেন, কি কথা কানে যাচ্ছে না।

গাড়ি হুড় হুড় করে রাস্তার বাঁ দিকে গিয়ে থেমে পড়ল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। বুড়ো হাবড়া, রাত কানা নয়, ফাইন ইয়ংম্যান। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেশ ডাঁটে দরজা বন্ধ করে, হন হন করে হেঁটে চল্ল ময়দানের দিকে।

আমরা সকলেই হাঁ হয়ে গেছি। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা খেলে, রাতে বিছানায় ছোট বাইরে করে ফেলার কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। এ তো দেখছি সঙ্গে সঙ্গে কুইক অ্যাকসান।

মন্ত্রী বললেন, যাচ্ছে কোথায়, রাশকেল যাচ্ছে কোথায়?

একজন বডিগার্ড সামনের দিক থেকে নেমে পেছনে পেছনে দৌড়ল। আমরা কথা

শুনতে পাচ্ছি না, দূর থেকে মূকাভিনয় দেখছি। দু'জনেরই হাত পা খুব নড়ছে। বডিগার্ড ভদ্রলোক ঘাড় ধরে ড্রাইভার ছেলেটিকে আমাদের দিকে টেনে আনছেন।

মন্ত্রী মহোদয় রাগে পাঞ্জাবি খাঁমচাচ্ছেন। বুকের কাছটা গিলে হয়ে গেল। লোকে মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রী মহোদয় ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই, মন্ত্রী বললেন, ওর কানটা একবার খালি আমার হাতে ধরিয়ে দাও। তারপর যা করার আমিই করছি।

ছেলেটার কি প্রাণের মায়া নেই ? বেপরোয়ার মত বললে, যান, যান সব করবেন।

আমার হাঁটুতে বিশাল এক চড় মেরে, মন্ত্রী স্প্রিংয়ের মত নাচতে লাগলেন, জুতো, জুতো পেটা করব, জুতো পেটা করব।

ড্রাইভার বললে, বাঙলা বনধ করে দোব।

মন্ত্রী বললেন, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, কনসপিরেসি, কনসপিরেসি। এ ব্যাটাকে বিরোধীরা ফুসলে নিয়েছে। হ্যাঙ হিম, কিল হিম, শুট হিম।

মটোর সাইকেলে একজন সার্জেন্ট যাচ্ছিলেন। এ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই। বাইক ঘুরিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। খুব তড়পাবার তালে ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়কে দেখে সটাস করে একটা স্যালুট ঠুকলেন।

কি [illegible] স্যার।

রাগে মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকে কোনও রকমে বললেন, ওকে মেরে ফেল।

পি এ মাথায় ফাইলের বাতাস শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসার কোথায় উঠেছে কে জানে। চারশো, টারশো হবে হয়-ত।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়ে গেছেন। এমন পথ নাটক তিনি জীবনে দেখেছেন কি না সন্দেহ। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ?

উনি পেছন থেকে আমার মাথায চাঁটা মেরেছেন, বাপ তুলেছেন, জুতো মারার আগে আমি গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়েছি। মন্ত্রী বলে হাতে মাথা কাটবেন না কি।

মন্ত্রী মহোদয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হি ইজ এ লায়া ?

ড্রাইভার বললে, আপনি এঁদের জিজ্ঞেস করুন, মিথ্যে বলছি কি না।

আমি মনে মনে বললুম, আমি অন্তত সাক্ষ্য দোব না, যে দেয় দিক। চাকরিটা যাক আর কি। জলে বাস করে, কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা। আমি বলে প্রোমোশনের ধান্দায় তেলিয়ে চলেছি। মাসখানেকের মধ্যে ফাইল না নড়লে হয়ে গেল। পরের নির্বাচনে কোন্ মহাপ্রভুরা দু'হাত তুলে নেচে নেচে আসবেন কে জানে।

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, কি করেছিলে তুমি ?

কিছুই করিনি !

মন্ত্রী মহোদয় হাওয়া বেরতে থাকা বেলুনের মত ছটফট করতে করতে বললেন, রাশকেল পি এ, তুমি কিছু বলছ না কেন ? বোবা হয়ে গেছ ? বোবা।

পি এ বললেন, ও গাড়িতে ফ্ল্যাগ লাগাতে ভুলে গেছে।

ড্রাইভার বললে, আমি ফ্ল্যাগ পাব কোথা থেকে ? তিনদিন আগে দুর্গাপুর থেকে

আসার পথে, বর্ধমানে, জনতা গাড়ি থামিয়ে ওঁকে জুতোর মালা পরাতে গিয়েছিল। সেই সময় একশো মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমি ওঁকে বাঁচাই। সেই গণ্ডগোলের সময় পাবলিক ফ্ল্যাগটা খুলে নিয়েছিল। আমাকে না দিলে ফ্ল্যাগ আমি পাব কোথা থেকে স্যার ! আপনিই বলুন।

মন্ত্রীমহোদয় জ্বলন্ত অঙ্গারের দৃষ্টিতে পি এ-র দিকে তাকালেন। ওই দৃষ্টিতেই কাজ হল। পি এ আমতা আমতা করে বললেন, স্যার আমি বলেছি, ডিপার্টমেন্ট দিতে দেরি করছে।

তুমি আমাকে বলনি কেন ?

বললে কিছু হত না স্যার। ওটা অন্য দলের হাতে।

কন্‌সপিরেসি, কন্‌সপিরেসি, বলে মন্ত্রী দেহের হাল গাড়ির আসনে ছেড়ে দিলেন।

সার্জেন্ট ড্রাইভারকে নরম গলায় বললেন, যাও গোলমাল কোর না যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও। তোমার চাকরির মায়া নেই !

না স্যার, আমি ত কেরানী নই, ড্রাইভার, আমাদের লাইনে চাকরির অভাব নেই।

এভাবে গাড়ি ফেলে পালালে তোমার জেল হয়ে যাবে যে।

ড্রাইভার গাড়ির আসনে এসে বসতেই মন্ত্রীমহোদয় বললেন, অকৃতজ্ঞ বেইমান।

ড্রাইভারের সাহসও কম নয়, সে বললে ; আপনিও।

হোয়াট।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিও।

জানো, তোমাকে আমি নিজে হাতে তুলে এনে স্টিয়ারিং-এ বসিয়েছি !

সে, আমার হাত ভাল বলে। একশো কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ মাইল স্পিডে কে আপনার গাড়ি চালাবে। ক'জন ড্রাইভার কলকাতায় আছে ! আমি মিনি চালালে, এর চেয়ে বেশি রোজগার করব। দিন নেই রাত নেই আপনার হোল ফ্যামিলির খিদমত খাটছি, মাইনে পাঁচশো উপরি জুতো ঝ্যাঁটা লাঠি।

খুব লম্বা-চওড়া বাত হয়েছে তোমার দাঁড়াও, ফিরে আসি।

ফিরে আর আসতে হচ্ছে না, এবারে পাবলিকেই খতম করে দেবে। মেয়ে মানুষের যৌবন, আর নেতাদের গদি এক জিনিস।

আমি সে ফেরার কথা বলছি না গাধা। আজ ফিরে আসি, তারপর তোমাকে দেখাব কত ধানে কত চাল।

ভয় দেখালে ভিড়িয়ে দোব স্যার। স্টিয়ারিং আমার হাতে।

মন্ত্রী গুম মেরে গেলেন। আমি বললুম বলুন স্যার, মধু হখসরন্তি সিন্ধবঃ, মার্ধ্বিনঃ, সন্তোষধীঃ। মন্ত্রী মহোদয় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, ধ্যাততেরিকা মধু। রাখ তোমার মধু।

ওভারটেক করা মন্ত্রী আগেই এসে পড়েছেন। সাদা অ্যামবাসাডার এক পাশে বিশ্রাম করছে। যে পতাকা নিয়ে এত গোলমাল, সেই পতাকা গাড়ির ঠোঁটে নেতিয়ে পড়ে আছে। আমার মন্ত্রী মহোদয়ের পরাজয় মানে আমাদের পরাজয়।

মাথা নিচু করে হাঁটছি।

কানের কাছে মন্ত্রী ফাটলেন। বোমা ফাটার মতই ব্যাপার।

দাঁত খিঁচিয়ে বললেন এ কোথায় নিয়ে এলে, এটা ত টয়লেট।

মাথা নিচু করে হাঁটার পরিণাম। নেতাকেই সবাই অনুসরণ করে, নেতা যে এতক্ষণ আমাকেই অনুসরণ করছিলেন, জানব কি করে। ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজনের টনক নড়েছে। তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন, এদিকে স্যার, এদিকে।

গোটা তিনেক দরজা ঠেলে, আমরা শীতপ্রধান এলাকায় রাগপ্রধান মানুষটিকে নিয়ে প্রবেশ করলুম। রাস্তায় দেখেছি, ঠ্যালা চেপে প্যাকিং বাকস চলেছে, গায়ে লেবেল সাঁটা। তীর চিহ্ন দিস সাইড আপ সতর্ক বাণী, গ্লাস হ্যান্ডল উইথ কেয়ার। আমরা অনুরূপ একটি গোলমাল মানুষকে যে ঘরে এনে ফেলেছি, সেটি হল মেক আপ রুম।

বিজেতা মন্ত্রী মহোদয় আয়নার সামনে বসে পড়েছেন। জনৈক মেক আপ-ম্যান তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে বড় ব্যস্ত। ঘষা মাজা চলেছে। পোড়া হাঁড়ি মাজার কায়দায়। নানা রকম মলম মালিশ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাউডারের প্রলেপ পড়ছে। গায়ে একটা ছাপকা ছাপকা গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। আমাদের পাড়ায় একজন দাদের মলম ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি করতে বেরোবার সময় এই রকম আলখাল্লা ধরনের জামা পরেন। মানুষের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করার জন্যে দাদের মলম, আর রাজনীতি প্রায় একই বস্তু। দুটোই চুলকুনির ওষুধ। সারুক না সারুক, লাগিয়ে যাও।

বিজিত মন্ত্রী মহোদয় মুখটাকে তোলো হাঁড়ির মত করে আর একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ বোঝাই গেল দু'জনে বিশেষ সদ্ভাব নেই। উনি বোধহয় রাজনীতির সুতো টানাটানিতে ইদানীং শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ডানপাশে এলিয়ে পড়ে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, দেরি করে ফেলেছেন দাদা, গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছিল বুঝি।

আমাদের মন্ত্রীও কোনও জবাব দিলেন না। আয়নার নিজের মুখের দিকে রাগরাগ চোখে তাকিয়ে রইলেন। পারলে চড় কষাতেন।

মেক আপ ম্যান বললেন, এই সাদা পাঞ্জাবি চলবে না।

মন্ত্রী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, বাপ চলবে।

মেক আপ ম্যান বললেন, বাপস।

বাঁপাশের মন্ত্রী বললেন, ঠোঁটে একটু লিপষ্টিক মাখলে দোষ হয় না। চিত্রতারকারা মাখেন।

কলার টিভি হলে মাখিয়ে দিতুম স্যার।

আপনাদের এখানে হেয়ার ড্রেসার নেই?

আজ্ঞে না স্যার। আমাদের এখানে সবকিছু ফেসিয়াল। মুখের ওপরেই যত অত্যাচার।

আমার ঝুলপি দুটো ঠিক সেপে নেই। দাড়ি কামাতে গিয়ে ছোট বড় হয়ে গেছে।

আমাদের মন্ত্রী এদিকে বিদ্রোহ করে বসে আছেন, মুখে কিছু মেরেছ কি তোমাকে আমি মেরে ভস্তা করে দোব।

মুখটা বড় তেল তেল করছে স্যার।

পুরুষ মানুষের মুখ তেলতেলেই হয়। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মেকআপ নেবে মেয়েমানুষ। বুঝেছ ছোকরা। মেয়ে ছেলের মুখে যা যা খুশি মাখাও।

অনুষ্ঠান পরিচালক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, হাত জোড় করে বললেন, স্যার ক্যামেরার খাতিরে মুখটাকে একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। তা না হলে আলো জাম্প করবে।

আমি আমার ভোটারদের খাতিরেই কিছু করিনি, তুমি আমাকে ক্যামেরা দেখাচ্ছ।

সবাই করে স্যার। রাজ্যপাল, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হালকা মেকআপ অ্যালাউ করে। টিভিতে মুখটাই সব। টিভি-র মুখ রক্ষা করুন স্যার।

সরষের তেল ছাড়া আমি মুখে কিছু মাখি না।

একদিন স্যার।

পাশের মন্ত্রী বললেন, আমি কি রকম লক্ষ্মী ছেলে দেখুন, সব মেখেছি। মুখের চেহারাই পালটে গেছে। উঃ মুখে যে কত ময়লাই জমে। আমাদের মুখ নয় ত মুখোশ। আজ রিয়েল চেহারাটা জনসাধারণ দেখবে।

পরিচালক আমাদের মন্ত্রীকে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

মন্ত্রী মহোদয় এবার একটু টসকালেন, ঠিক আছে, সামান্য একটু লাগাও। আমার সিসটেমটা একটু অন্যরকম, নেচারাল ন্যাচারাল বিইং। বিয়ের সময় মুখে একটু স্নো মেখেছিলুম, সারা রাত ঘেমে মরি।

এখানে ঘাম হবে না স্যার : স্টুডিওতে শীতে কেঁপে মরতে হয়।

নাও নাও, লাগাও, লাগাও।

মেক আপ ম্যান মন্ত্রীর মুখমণ্ডল যথেচ্ছার শুরু করে দিলেন। সেই গল্পে পড়েছিলুম, রাজা একজনের কাছে মাথা নীচু করেন, তিনি হলেন ক্ষৌরকার। টিসু পেপার দিয়ে মুখ ঘষা হচ্ছে। তেল কালিতে কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে। ক্রিম আর পাউডার মাখিয়ে যখন তাঁকে ক্যামেরার উপযুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হল, তখন তিনি নিজের মুখ দেখে আনন্দে আটখানা। এত রূপ ছিল কোথায়। কলকাতার পলুউশনে চাপা ছিল।

আয়নার মুখ দেখছেন আর বলছেন, রোজ একটু করে মাখলে বেশ হয়। আহা, এ মুখ বউকে যদি একবার দেখাতে পারতুম।

মেকআপের ভদ্রলোক বললেন, এই তো তৈরি করে দিলুম। সাবধানে নিয়ে যান। কাল সকাল পর্যন্ত ঠিক থাকবে।

অনুষ্ঠান পরিচালক বললেন, পাঞ্জাবিটা স্যার পালটালে বেশ হত। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি দিচ্ছি, দয়া করে পরুন।

আপনার ওই অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না, ভেরি ভেরি সরি। আমি বাউল নই, মন্ত্রী।

সাদায় স্যার ভূতের মত দেখাবে।

শাট আপ।

আচ্ছা, আচ্ছা, অ্যাজ ইউ লাইক।

সদলে দুই মন্ত্রী স্টুডিওতে চলে গেলেন। আমরা ফেউয়ের দল বাইরের অফিস ঘরে বসে রইলুম। সামনে একটা মনিটার। পর্দায় ভেতরের খেলা দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রী রাগ রাগ মুখে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। আমার সেই জ্ঞানগর্ভ লেখাটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজ দেখে কেরামতি চলবে না। জীবন্ত আলোচনা। পশ্চিম বাংলার

উন্নয়নে সোচ্চার চিন্তা। কোথা থেকে এক মডারেটার ধরে আনা হয়েছে। তিনি খুব কেতামেরে একপাশে কেতরে বসে আছেন। কালো কার বাঁধা একটি করে স্পিকার বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার মত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জামার তলায়, বক্ষসংলগ্ন হয়ে আছে।

ফ্লোর ম্যানেজার অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন সঙ্কেত বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কলা দেখালেন, স্টার্ট। চেটো বুদ্ধদেবের ভঙ্গীতে তুললে, স্টপ। আঙুল দিয়ে লাট্টু ঘোরালে, আলোচনা গুটিয়ে আনুন। সময় শেষ হয়ে আসছে।

মডারেটার তেড়েফুঁড়ে ভূমিকা করলেন। পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি আর লজ্জাবতী বধূর মত মুখ ঢেকে নেই। আধুনিকার অসঙ্কোচ পদক্ষেপে, গ্রাম থেকে, জেলা শহরে, শহর থেকে রাজধানীতে, রাজধানী থেকে বিদেশে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে, চারিদিকে হই হই পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় মন্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কেমন করে আপনারা এই অসাধ্য সাধন করেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

আমাদের মন্ত্রী সরোষে বললেন, ইনসালটিং। আগে আমাকে প্রশ্ন না করলে, আমি ওয়াক আউট করব।

অপর মন্ত্রী ব্যাঙ্গের গলায় বললেন, ওয়াক আউট করাটা অপোজিশানদের একচেটে কাজ। নিজের ভূমিকা ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, বসে আছেন ট্রেজারি বেঞ্চে। আপনার অবশ্য দোষ নেই, কোয়ালিশানে না এলে, চিরকালই আপনাকে অপোজিশান বেঞ্চে বসতে হত।

ফ্লোর ম্যানেজার প্রোডিউসার দু'জনেই ধেই ধেই করে নাচছেন, স্টপ স্টপ।

আমাদের মন্ত্রী আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সদর্পে ওয়াক আউটের জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় মন্ত্রী ট্রেজারি বেঞ্চে বসে চিৎকার করছেন—শেম শেম।

অনুষ্ঠান পরিচালক বিব্রত মুখে বললেন, স্যার, এ এসেমব্লি নয়, টিভি স্টুডিও।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, আমার একটা প্রেসটিজ আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, আমারও আছে।

আপনার দপ্তর ছোট, বনবিভাগ আমার দপ্তর, শিল্প।

বন বিভাগ ছোট? হাসালেন দাদা। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ভূমির মাপ জানা আছে মন্ত্রী মহোদয়?

পশ্চিমবাঙলার ছোট বড় শিল্পের সংখ্যা কি আপনার জানা আছে?

আরে মশাই, শিল্প বড় না, অরণ্য বড়। কাঁচা মাল না দিলে আপনার শিল্প ত লাটে উঠবে।

পরিচালক বললেন, ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে স্যার।

আমাদের মন্ত্রী এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ করুন আপনি। আমাদের ব্যাপার, আমাদের ফয়সালা করতে দিন।

তা হলে, আপনাদের এই তরজাটাই রেকর্ড করে নি। জমবে ভাল।

স্টেশান ডিরেক্টার ছুটে এলেন। এ সমস্যার কি সমাধান। এ ত নির্বাচনের আগে,

আসন ভাগাভাগির চেয়েও জটিল ব্যাপার।

ফ্লোর ম্যানেজার বললেন, কোরাসে উত্তর দিলে কেমন হয়। সমবেত সংগীত যখন হয় সমবেত প্রশ্নোত্তর কেন হবে না।

যেমন ধরুন, প্রশ্ন যদি হয়, পশ্চিমবাংলার এই অভূতপূর্ব উন্নতি কিভাবে সম্ভব হল ? ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাদের সুশাসনে।

আমাদের মন্ত্রী কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ইয়ারকি হচ্ছে ? মন্ত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি। জান তোমার চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি।

পারেন স্যার, তবে বদহজম হবে।

অ্যাঁ কি বললে ?

স্টেশান ডিরেকটার বললেন, আচ্ছা, ফাঁপরে পড়া গেল দেখছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রী পা নাচাতে নাচাতে বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, মধু ত আমার অরণ্যসম্পদ।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, তোমার বাপের সম্পদ।

অবজেকসান, অবজেকশান, মাননীয় স্পিকার, ও এটা তো আবার অ্যাসেমব্লি নয়।

আমাদের মন্ত্রী নিজেকে সংযত করে বললেন, মধু দু'রকমের, এক, বনের মধু, সেটা মধুই নয়, তার ওপর আমার কোনও কনট্রোল নেই। দুই, চায়ের মধু, সেটাই হল আসল মধু, গ্রামীণ শিল্পের মধু। ইচ্ছে করলে আমি উৎপাদন বাড়াতে পারি, আমি উৎপাদন কমাতে পারি।

ওঃ রাজা ক্যানিউট রে। দিস ফার অ্যান্ড নো ফারদার।

শুনলেন। আপনারা শুনলেন।

ডিরেকটার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াবার ক্ষমতা নেই।

দুই মন্ত্রী কোরাসে বললেন, কে বাঘ, কে গরু।

কোরাস ছেড়ে উনি বলেন, আমি বাঘ, উনি বলেন, আমি বাঘ।

ইনি বলেন, ওটা গরু, উনি বলেন, ওটা গরু।

ডিরেকটার বললেন, আপনারা, দুজনেই বাঘ, আর একই জঙ্গলে, দুটো বাঘ থাকতে পারে না। প্রোগ্রাম ক্যানসেলড।

॥ চার ॥

ঘাড় চুলকে, মুখ কাঁচুমাচু করে একদিন বলেই ফেললুম, স্যার, আমার একটা প্রমোশান দীর্ঘ দিন দরকচা মেরে রয়েছে, পাকছেনা, ফাটছেনা, বসছেনা। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

মন্ত্রী মহোদয় সবে খানাপিনা সেরে এসেছেন। মেজাজে বসন্তের বাতাস বইছে, কোকিল ডাকছে কুহু সুরে। দাঁত খোঁচাটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে বেশ ভাবুক ভাবুক মুখে বললেন, কোন্ হারামজাদা চেপে রেখেছে !

জানি না স্যার।

অপদার্থ। জেনে, আমাকে জানাও। কমপ্রেস আর তোকমারি একসঙ্গে লাগাতে

হবে। তোমার তিন হাজার টাকা মাইনে হওয়া উচিত।

বুকটা কেমন করে উঠল। তিন হাজার মাইনে হলে, রোজ মাছ খাব। চারা নয়, বেশ পাকা পোনা। সকাল বিকেল। সপ্তাহে তিন দিন মুরগী চালাবো। রোজ সকালে হাফবয়েল, পুরু মাখন দিয়ে দুপিস রুটি। রাতের দিকে বাড়িতেই একটু ঢুকু ঢুকু। গালগলায় তিনথাক মাংস নেবে যাবে। আর ইডেনে আগাছার জঙ্গলে বসে যে ইভটিকে গত তিন বছর ধরে বলে আসছি—একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর, সবুরে কাবুলী মেওয়া ফলে, তাকে টেনে তুলে আনব ঘরে। সেই অভাগীর জন্যে কম রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি। কাকে ব্রহ্মতালুতে বড় বাইরে করে করে, উত্তাপে চাকতি মাপের একটা টাকই তৈরি করে দিলে। সে দিন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বসে দুজনে হাতে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি আর তারা গুনছি, এমন সময় কে একজন প্রেম ঘাতক ঝোপের ওপাশে ছোট বাইরে করতে লাগল। কি তার তেজ? আখের রস, কি বীয়ার খাওয়া মাল। পিঠ ফুঁড়ে যাচ্ছে। ওঠার উপায় নেই। এমনভাবে বসেছিলুম দু'জনে আইনের ভাষায় যাকে বলে, কমপ্রোমাইজিং পজিশান। কলকাতার মানুষের তো কোনও আক্কেল নেই। হত হাইডপার্ক। এ শহরে হাইডিং হাইডিং চলে সব কেবল হাইডপার্কটা নেই। সেই প্রথম শীতের রাতে ভূতঘাটে গিয়ে ছোটবাইরে স্নান-প্রেম-ক্লান্তিতে গঙ্গাবারি ধৌত কমে ক'াপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলুম। বাড়িতে প্রশ্নবান, ভিজে এলি কোথা থেকে? প্রেমে আর রণে অণৃত ভাষণ অ্যালাউড। অম্লান বদনে বলতে হল, রিটারনিং ফ্রম বার্নিং ঘাট। এক সহকর্মী হঠাৎ পটল তুললেন। এই ত মানুষের জীবন মা। এই আছে এই নেই। মা অমনি কোথা থেকে একমুঠো নিমপাতা এনে বললেন, চিবিয়ে খা। রাতে সাড়ে দশটার সময় বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমানন্দে নিমপাতা চর্বণ। অহো, এই বদান্য মন্ত্রী মহোদয়ের জাঁকে সেই প্রেম এবার কার্বাইডপাকা হবে। রাতে বাড়ি ফিরে আর নিমপাতা নয়, স্ত্রীর সেবা। লং লিভ এই গবরমেন্ট।

তা হলে?

বলুন স্যার?

খুশি ত। প্রোমোশান হোক না হোক, তোমার ইভ্যালুয়েশন হয়ে গেল। তিন হাজার। তিন হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় আনন্দ হচ্ছে।

তবে আর কি এই আনন্দেই একটা কাজ করে ফেল।

বলুন স্যার। আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি। আই লাভ ইউ। আর একটু হলেই ডার্লিং শব্দটা বেরিয়ে পড়ছিল। কি দুঃসাহস আমার।

মন্ত্রীমহোদয় অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অবাক করলে ছোকরা। আমাকে তুমি প্রেম নিবেদন করছ। আমাকে সবাই দুর্বাসা বলে। কত কি যে ভস্ম করেছি। আচ্ছা শোনো, একটু গোবরের খবর নাও ত।

গোবর স্যার।

হ্যাঁ স্যার। দুটো জেলা আগে ধর, হুগলী আর চব্বিশ পরগণা। দুটো জেলায় কত গোবর উৎপাদন হয়।

গোবর আবার উৎপাদন হয় নাকি। সে ত গরুতে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নাদে।

গর্দভ ? সেটাও একটা উৎপাদন। তুমি করবে কি, লেটেস্ট সেনসাস থেকে ক্যাটল পপুলেশানটি বের করবে। করে, একটা স্যাম্পল সারভে কি করবে।

সে আবার কি জিনিস ?

তুমি প্রত্যেক জেলায় টেন পারসেন্ট গরুকে মিট করবে। গরুর মালিককে জিজ্ঞেস করবে, আপনার গরু দিনে কতবার মলত্যাগ করে। এক এক গরুর, এক এক হ্যাবিট। দেখবে মানুষের মতই। আমার যেমন।

আপনার গরু আছে স্যার ?

তুমি এক গরু। আমি মানে আমি। আমার সকালে একবার, রাত্রে একবার। তোমার কবার ?

আজ্ঞে, আমার বারবার।

তোমার অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস আছে।

ওই স্যার তিন হাজার টাকা হলে রোজ চিকেন ব্রথ খাব, ঠিক হয়ে যাবে। হবে ত স্যার !

ও, সিওর। তা গরুরও ওই রকম। তুমি একটা অ্যাভারেজ করবে। অ্যাভারেজে এল হয়ত ওই জেলার গরু দিনে চারবার করে। এইবার তুমি কি করবে ?

কি স্যার ?

যে কোনও একটা গরু, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান গরুর পেছু নেবে। অ্যাজ ইফ তুমি একটা ষাঁড়। ফলো করতে করতে, ফলো করতে করতে, যেই সে ঘ্যাস করে করল, অমনি তুমি স্যাম্পলটা কালেক্ট করে নিলে

ঘেন্না করবে স্যার।

অ্যাঃ ঘেন্না করবে। ওরে আমার ঘুঁটেকুড়নীর ব্যাটা।

মন্ত্রী মুখ ভেঙালেন। তৎক্ষণাৎ রইল তোর চাকরি বলে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল। স্রেফ তিন হাজার টাকার গাজরের লোভে জেনুইন গাধার মত হাসি মুখে বসে রইলুম।

পশ্চিম বাংলার সব বাঙালী মেয়েই এক সময় ঘুঁটে দিত। ঘুঁটে না দিলে শাশুড়িরা গালে নিমঠোনা মারত।

নিমঠোনা কি জিনিস। জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে।

আমার মা স্যার ঘুঁটে দিতেন না।

তাঁর মা দিতেন। যত অতীতে পেছবে, দেখবে গরু আর ভড়ভড়ে গোবর। গোবরেই না আমাদের মত পদ্ম ফুটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তোমরা কি জমিদার ছিলে ?

না স্যার, জমিদাররা কি চাকরি করে !

আমরা ছিলুম। আমার ঠাকুর্দা সঙ্গে গোবরের গুলি নিয়ে ঘুরতেন। এ পকেটে গোবরের গুলি, ও পকেটে আফিমের গুলি। একটা করে পাপ কাজ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একগুলি গোবর, একগুলি আফিম মুখে পোস্ট করতেন। এখন তিনি স্বর্গে ডেলিভারি হয়ে গেছেন।

তোমার মাথায় কি আছে ?

আজ্ঞে বুদ্ধি।

তুমি বুঝি তাই মনে কর ? গোবর, আছে গোবর।

না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। (না বললেই তিন হাজারের স্বপ্ন ফুস্)

আচ্ছা, গোবরটা তুমি কালেক্ট করলে। করলে ত ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার ওজন কর। ধরো দু' কেজি হল। তা হলে কি হল, টোটাল গরু ইনটু টু ইজইকোয়ালটু টোটাল অ্যাভেলেবিলিটি অফ কাউডাং ইন দি ডিসট্রিক্ট। ক্লিয়ার ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লিয়ার।

তা হলে, বেরিয়ে পড়।

আজই স্যার ?

না, কাল থেকে তোমাকে সাত দিন সময় দেওয়া হল।

গোবর কি হবে স্যার ? ঘুঁটে ইনডাস্ট্রি !

তোমার মাথা ! গোবর গ্যাস তৈরি হবে। সেই গ্যাসে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, রান্না হবে। মাঠে সার হয়ে ফিরে যাবার আগে, টন টন গোবরের কাছ থেকে আমরা গ্যাসটুকু আদায় করে নোব। একে বলে প্ল্যানিং। পশ্চিম বাংলাকে দেখিয়ে দোব, আমরা কি করতে পারি, আর কি পারি না। এক মাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত ছটা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট আমি বসাবোই। সেন্টার প্রচুর টাকা স্যাংসান করেছে। সে টাকা ফিরে না যায়। দেশের মানুষ কাজ চায়, কাজ। শুধু গলাবাজিতে কিছু হয় না।

মন্ত্রীমহোদয় ফোন তুলে বললেন, কানাইকে দাও।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, হিসেবে কোনও কারচুপি কোর না, তাহলেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। এ ব্যাপারে তোমাকে ডি এমরা সাহায্য করবেন।

ফোন বেজে উঠল।

কে কানাই ? আমার ছকটা দেখলে ! দেখেছো ! কি বললে, মঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ মঙ্গল অমঙ্গল করবে ? রাসকেল। না না, তুমি রাসকেল নও, দ্যাট ব্লা[illegible] মঙ্গল। তা ও ব্যাটাকে একটু ঠান্ডা কর। গাড়ি চাপা বন্ধ করব ? এবার তুমি রাসকেল। ইলেকসান এসে গেল। এখন ত ঘুরতেই হবে। লাল ? হ্যাঁ হ্যাঁ লাল। না, একটা লাল কলম ছাড়া আর কিছু নেই। ইডিয়েট ! লাল ল্যাঙোট পরতে যাব কোন দুঃখে ! আমি কি কুস্তিগির। না, তোমার বউদির ঠোঁটে লাল নেই। ঘরে ? দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়ারের গদি লাল বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করে দিচ্ছি। জানি না কোন রাসকেলের কাজ, সে ব্যাটার চাকরি খাব। কি বললে, খাওয়া দাওয়া কম করব ! ইডিয়েট ! আমি চাকরি খাবার কথা বলছি। চাকরি খেলে গলায় কাঁটা ফুটবে কেন ? একি চারা পোনা ভেবেছ ? না না, ইলেকসান পর্যন্ত বোনলেস ভেটকি আর চিকেনেই চালিয়ে নোব। ফিরে আসছি ত ? আসছি। তোমার মুখে ফুলচন্দন। কি বললে, মারা না গেলে মৃত্যুর কথা আসছে কেন ? আজই থরো চেক আপ, অ্যাকসিডেন্ট ! মরেছে ? গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ও গাড়ি ! গেরুয়া রঙের গাড়ি পাব কোথায় ? পলা ? হ্যাঁ হ্যাঁ পলা তো আমার আঙুলেই

আছে। কত বড় ? একটা বড় সাইজের সুপুরির মত ? ও, রাস্তায় বেরোবার সময় প্রথমে ডান পা ফেলব ? তাই ফেলবো। যদি মনে থাকে।

মন্ত্রীমহোদয় ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তাহলে স্যার সাতদিন আপনার কাজে আমাকে যাতে ছাড়া হয় অফিসকে একটু বলে দেবেন।

কিইই ?

মন্ত্রীর বিস্ফোরণ।

আমার কাজে অফিসের অনুমতি ? আমি বড় না অফিস বড় ?

আজ্ঞে আপনি।

যদি প্রশ্ন কর:তেন, আমি বড় না ঈশ্বর বড় ? আমি বলতুম আপনি। সামান্য তেলে যদি তিন হাজারের মাচায় একবার উঠতে পারি, আমাকে আর পায় কে ? সেই সিগারেটের বিজ্ঞাপন—মিনস্টার মে কার,মিনস্টার মে গো, আমলাজ উইল গো ফর এভার।

মন্ত্রী বললেন, তুমি যাবে, যদি কেউ কিছু বলে, কান ধরে আমার কাছে টেনে আনবে। যাও। আভি নিকালো।

দুর্গা, শ্রীহরি বলে বাঘের সামনে থেকে সরে পড়া গেল। বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়। বেশি তেলে হড়হড়ে। হড়কে বেরিয়ে যাবে। সাপ নিয়ে খেলা। ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে। এই গোবরেই না গেঁজিয়ে যাই। প্রকৃতই যদি ষাঁড় হতে পারতুম, তা হলে গরুর খবর আমার চেয়ে, কে আর ভাল জানত ? আহা মানব সন্তান না হয়ে যদি কোনও গোমাতার গর্ভে একটি এঁড়ে হয়ে জন্মাতুম।

॥ পাঁচ ॥

হুগলী এক বিশাল জেলা। গরু সমীক্ষায় এর কোন অংশে ল্যান্ড করব ভেবেই পেলুম না। মাথায় ধরব, না পায়ে ধরব, না হাতে ধরব। এত বড় একটা কাজ। ধান নয়, গম নয়, গোবরের প্রাপকতা ?

বিমল বলেছিল, গরু না হলে কেউ গোবরের কথা এত ভাবে ! পাড়ার একটা গরু ধর। পেটে গোটাকতক ঘুষি মার। মাল অটোমেটিক পড়বে। তাকিয়ে দেখ। চোখের দেখায় ওজন পেয়ে যাবি।

গোবর সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই রে। হিসেবে সামান্য ভুল হলেই আমার বারোটা বেজে যাবে।

তা হলে মর।

মরতে হলে ডি এম-এর কাছেই মরা ভাল। সকাল এগারোটার সময়ে ডি এম-এর দপ্তরে হাজির। মানুষটি ভাল। ভেবেছিলুম খ্যাঁক করে উঠবেন। না, বেশ হেসে হেসেই বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে, এ কি গেরো বলুন তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। গোবর যে এত মূল্যবান কে জানত ! আপনি, আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ?

কোনও ভাবেই নয়। সামনে নির্বাচন, আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। যা পারেন, নিজে করুন। উইশ ইউ গুডলাক।

কিভাবে কি করা যায়। মন্ত্রী বলেছেন টেন পারসেন্ট গরুর গোবর চেক করে একটা অ্যাভারেজ বের করতে হবে।

আপনি যেমন, আপনার মন্ত্রীও তেমন। হতেছে পাগলের মেলা খ্যাপাতে খেপীতে মিলে। আমরা মরছি আমাদের জ্বালায়। রোজ তিন চারটে করে পলিটিক্যাল লাঠালাঠি হচ্ছে। মাঠে-ঘাটে মানুষের লাশ গড়াচ্ছে, সেই সময় আপনি এলেন গোবর গণেশ হয়ে। সাত-সকালে আর জ্বালাবেন না ত।

কানে আঙুল দিয়ে বসেছিলুম। পতি নিন্দা শোনাও পাপ। আহা, ওই হল আর কি। তুমি হো পিতা, তুমি হো মাতা, সখা তুমি হো, কি যেন একটা গান আছে এই রকম। জেলা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। একেবারে পণ্ডশ্রম হল, তা বলব না। এইটুকু বোঝা গেল গড্ডায় আড্ডা মেলালে জেলা অফিস ক্যাঁক করে চেপে ধরবে না।

দোকানে চা খেতে খেতে মাথায় একটা মগজের ঢেউ খেলে গেল। শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু আছে। জমিদারের ছেলে। সেই সুসিতের কাছে গেলে সমস্যার হয়ত সমাধান হবে। ওদের গোটা কতক গরু আছে। সুসিত কি এই সময়ে বাড়িতে থাকবে? দেখা যাক চেষ্টা করে।

সুসিত বাড়িতেই ছিল। সবে চান সেরেছে। খেতে বসবে আর কি। একটা পাঁচের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসবে। ব্যবসা করে। স্বাধীন মানুষ। আমাদের মত গোলাম নয়।

সুসিত বললে, আমাদের তিনটে গরু আছে তবে তারা ত সব জার্সি।

সে আবার কি? জার্সি ত ফুটবল খেলোয়াড়রা পরে।

আরে, না রে বাবা, জার্সি হল বিলিতি গরু। এক একবারে পনের কেজি দুধ নামায়।

তা নামাক। প্রাতঃকৃত্য করে ত।

তা করে। তবে কোয়ানটিটি দিশি গরুর মত হবে না। সায়েব গরু ত, সায়েবের মত সিসটেম। একটু কম করে।

তুই ভাই আমাকে বাঁচা। একটু করতে বল, ওজনটা দেখতে হবে। তারপর একটু এদিক সেদিক করে নিলেই বিলিতি গোবর দিশি গোবর হয়ে যাবে।

তা হলে অপেক্ষা কর, করলেই আমি খবর পাঠাতে বলছি।

তোর দাঁড়িপাল্লা আছে?

সে ব্যবস্থা হবে 'খন।

সুসিতের কলকাতায় যাবার বারোটা বেজে গেল। দু'জনে ভরপেট খেয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি। কখন গরু দয়া করে একটু করবে। বেলা প্রায় তিনটে বাজল। বিকেলের চা এসে গেল।

কি রে সুসিত, তোর গরুর কি হল?

দাঁড়া দেখে আসি।

সুসিত ফিরে এসে বললে, গরুর বোধহয় কনসটিপেশান হয়েছে মাইরি।

সে কি রে?

খাচ্ছে কিন্তু ছাড়ছে না।

তা হলে দুধেও কনসটিপেশান বল?

না, তা নয়, দুধটা ত গ্ল্যান্ডের ব্যাপার।

তা হলে কি হবে?

তোর ত সাতদিন সময় আছে। আজ বরং সন্ধ্যার দিকে জোলাপ খাইয়ে রাখি। তুই কাল সকালের দিকে আয়।

জোলাপের দাস্তে ত হিসেব মিলবে না রে?

আরে বিলিতি, জোলাপ খেয়ে যা করবে, দিশি তা এমনি করবে।

হঠাৎ ভেতর বাড়িতে উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল, করেছে করেছে। শিশু-কণ্ঠের চিৎকার, মেজকা, গরু পায়খানা করেছে, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

আমরা দু'জনে শেষ চুমুকের চা ফেলে দৌড়লুম। সুসিতের গোয়ালে ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। তিনটে অদ্ভুদ চেহারার জন্তু বাঁধা রয়েছে।

সুসিত, এরা কি সত্যিই গরু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সায়েব গরু। দেখছিস না, গোয়ালে পাখা ফিট করেছি।

তিনটে গরুর মেমসায়েবের মত নাম, শেলি, রুবি, লিলি। শেলি নেদেছে। একপাশে পোয়াটাক মাল পড়ে আছে।

সুসিতের মা বললেন এ গরুর বাবা একটাই দোষ, একেবারে বিলিতি স্বভাব। দুধ বেশি গোবর কম। তেমন ঘুঁটে হয় না।

তা মাসিমা, দিশি গরু এক একবারে কতটা করে দেয়?

কি, দুধ?

আজ্ঞে না, গোবর।

তা ধরো তিন চার কেজি ত হবেই।

দিনে কবার?

সে বাবা এক এক গরুর এক এক স্বভাব। আমার এই মেজো ছেলে সুসিত, দিনে সাত-আটবার—সুসিত বলতে, আঃ, মা, হচ্ছে গরুর কথা, তুমি আমাকে ধরে টানাটানি করছ কেন?

টানাটানি করব কেন? আমি বলছি, মানুষের মতই কোনও গরু সকাল সন্ধ্যে দু'বার ঠিক তোর বাবার মত। কোনও গরু তোর মত বার-বার।

ল অফ অ্যাভারেজ সাধে শিখেছি। যার কল্যাণে টাটা বিড়লার রোজগার আমাদের ঘাড়ে চেপে পারক্যাপিটা ইনকাম হয়ে যায়। ল অফ অ্যাভারেজে সুসিতের বৈঠকখানায় বসে বেরল, গরু দিনে চারবার করে, এক একেবারে তিন কেজি। এইবার সেনসাস রিপোর্ট দেখে গরুর সংখ্যা বের করে মারো গুণ। যদি হাজার দশেক গরু থাকে, হাজার ইনটু বারো, ইনটু দশ। বাপস, হুগলী ত গোবরে নেবড়ে আছে রে বাবা!

সুসিতের ওখান থেকে বেরোবার পর বেশ খুশি খুশি লাগল। একটা ফর্মুলা আয়ত্তে এলে অঙ্ক কষা সহজ হয়ে যায়। পরীক্ষায় ফেল করার ভয় থাকে না। এখন আমি সব জেলার গোবর সেকেন্ডে বের করে দিতে পারি। গরু গুণিতক বারো সমান সেই

জেলার গোবর। আর আমাকে পায় কে! আ-যাও মেরা মন্ত্রী! তিন হাজার আমার হাতের মুঠোয়।

শ্রীরামপুরের বাজারে ফার্স্টক্লাস আম উঠেছে। পেয়ারাফুলির দেশ। পেয়ারাফুলি ছাড়াও, তাজা ল্যাংড়ার ছড়াছড়ি। তিন হাজার ত হবেই। খোদ মন্ত্রী হামারা হাত কা মুঠ্‌ঠিমে। সারা পশ্চিমবাংলার গোবরের হিসেব আমার বুক পকেটে। আয় শালা, লড়ে যাই।

বেশ তাজা ল্যাংড়া নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গৃহপ্রবেশ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাতাসে বসন্ত ছেড়েছে। যদিও এখন বসন্ত নয়, বর্ষা এলো বলে। মেজাজ ভীষণ খুশি খুশি। পুরনো দেয়ালের সব প্ল্যাস্টার ফেলে দোব। নতুন প্ল্যাস্টারে সবুজ ডিসটেম্পার বিজলীর আলোয় মিটি-মিটি হাসবে। নহবতের সুরে রাঙা শাড়ি পরে তিনি আসবেন। তিন হাজার। কিন্তু কোন্ পোস্টে তিন হাজার মাইনে হবে! খোদ বড়-কর্তারও ত তিন হাজার হয় না। হয় কি? কে জানে বাবা! সে মন্ত্রী বুঝবেন। দ্যাটস নট মাই হেডেক।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, রাত প্রায় এগারোটা। গরমের রাত, পাড়া তাই সরগরম। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। খাবার ঘরে এখনও হল্লা চলেছে। মা আছেন, আমার বোনটা আছে। দেখে এসেছি জানালায় চেন দিয়ে বাঁধা আছে আমাদের মাস তিনেক বয়েসের কুকুর, টম। আমার বোন কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। অ্যালসেসিয়ান বলে এনেছিল, নেড়ীও হতে পারে।

ওপাড়ায় খুব একটা মজা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসিতে সব ভেঙে পড়ছে। তিন হাজার এখনও হয়নি। তাইতেই বাড়িতেই বাড়িতে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। হলে কি হবে! সকাল সন্ধ্যে সানাই বাজবে। হঠাৎ আমার বোন ডাকল, দাদা, দেখবি আয়, দেখবি আয়।

দেখার মতই ব্যাপার!

ব্যাটা কুকুর। জন্মে থেকে শুধু ছাঁটই খেয়ে আসছে। সেই মুখে পড়েছে ল্যাংড়া আমের টুকরো। তিন টুকরো খেয়ে সামনে থাবা গেড়ে বসে কান খাড়া করে জিব চোকাচ্ছে। আমার বোন তারিয়ে তারিয়ে আঁটি চুষছে। চেনে বাঁধা তাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। ভুক্ ভুক্ করছে আর নেচে নেচে উঠছে। জার্মান সাহেব আমের জন্যে পাগল।

আমার বোন আঁটিটা ছুঁড়ে দিল।

কুকুর আঁটিটা মুখ দিয়ে ধরে আর আঁটি পিছলে চলে যায় নাগালের বাইরে।

দাদা, ঠেলে দে, ঠেলে দে।

একবার দিলুম। আঁটি আবার পিছলে চলে এল।

আবার দিলুম। আবার চলে এল।

আঁটি তো হাড় নয়। পিচ্ছিল জিনিস। কুকুরটার অবস্থা ঠিক আমার প্রোমোশানের মত। নাগালে আসে, আবার পিছলে চলে যায়। টম আমার মতই ক্ষেপে উঠেছে।

বার তিনেক হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়েছি। কুকুরটা ইতিমধ্যেই বদ মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। যা করছি দূর থেকে। চতুর্থ বারে, কি ভাবে যেন আমার ডান হাতের চেটোর উলটো পিঠটা তার কামড়ের সীমানায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাক।

ধরেই ছেড়ে দিল। দিলে কি হবে, ওইতেই যা হবার তাই হয়ে গেল। খানিকটা মাংস কুন্দলে ওপর দিকে ঠেলে উঠল। হাতের ওপর দিয়ে যেন পাওয়ার টিলার চলে গেল। ওদিকে ল্যাংড়ার চকলা, এদিকে হাতের চকলা।

যে কুকুরকে আম খাওয়ানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হচ্ছিল, তাকে এবার জুতো খাওয়াবার জন্যে সবাই তেড়ে উঠল। সে বেচারা বুঝেছে, কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। যে হাত তিন হাজার আনবে সেই হাতে কামড়। কোণের দিকে ভয়ে বসে আছে।

এদিকে আমার পুরো হাত চড়চড় করে ফুলছে।

মেরে কি হবে। অন্যায় করে ফেলেছে, অবলা জীব। এত রাতে ডাক্তার পাই কোথায়।

একটিমাত্র ডিসপেনসারি খোলা ছিল। তেমন নামডাকঅলা কেউ নয়। ঠেকাদেনেঅলা এল এম এফ। পরে এম বি হয়েছেন। বসে বসে সারাদিনের হিসেব মেলাচ্ছিলেন। কম্পাউন্ডার ঝাঁপ বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত।

আমি ঢুকে বলেছি সবে, ডাক্তারবাবু, আমাকে কুকুরে—

দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ডাক্তার জাম্প করলেন, ওরে বাপরে, আমি কুকুর নই, ও এখানে হবে না, এখানে হবে না, হাসপাতালে যান হাসপাতালে যান।

ক্যাশ বাক্স ছেড়ে ডাক্তারবাবু এক লাফে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। এমন আতঙ্কের কি কারণ বোঝা গেল না। কুকুরের কামড় খাওয়া মানুষ কি খ্যাপা কুকুর। জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে এসেছি। কম্পাউন্ডারবাবুকে মাস্তানের গলায় বললুম, যা বলছি, তাই করুন। বেশ খানিকটা তুলো বের করুন। ডাক্তারবাবুর চেয়ে সাহসী মানুষ বলেই মনে হল।

নিন চেপে ধরুন। বেশ করে চাপ দিয়ে ফোলাটাকে থেবড়ে দিন।

বিজ বিজ করে শব্দ হচ্ছে। ব্যাটা টম হাতটাকে বেশ জখম করে দিয়েছে।

নিন এবার কার্বলিক ঢালুন। আরে মশাই যন্ত্রণা আমার হবে, আপনি অত কাতর হচ্ছেন কেন? নিন, এবার যে কোনও একটা মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিন।

কম্পাউন্ডারবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কাল থেকেই তলপেটে চোদ্দটা ইনজেকসান নেবার ব্যবস্থা করুন। জলাতঙ্ক হলে আর বাঁচবেন না।

কালকের কথা কালকে, এখন একটু ট্রেটভ্যাক ছাড়ুন। আর গোটাকতক পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিন।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট। কেন মরতে তিন হাজার টাকার আনন্দে ল্যাংড়া কিনে মরেছিলুম। সকালেই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কাছে দৌড়লুম। তিনি আবার আর এক কাঠি ওপরে যান। টিপেটুপে বললেন, এঃ গ্যাসগ্যাংগ্রীন হয়ে গেছে হে।

হাতটা না অ্যামপুট করতে হয়।

সে কি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

আমি যে লিখে খাই।

বাঁ হাতে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসে কি না হয়। অনেকে পা দিয়ে লেখে।

তলপেটে ফুঁড়তে হবে?

বাড়ির কুকুর তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে প্রয়োজন হবে না।

এরপর যিনিই দেখেন, তিনিই প্রশ্ন করেন, হাতে আবার কি হল।

কুকুর কামড়েছে!

সর্বনাশ? ইনজেকসান নিয়েছ?

দরকার হবে না। বাড়ির কুকুর।

ওই আনন্দেই মর। কে বলেছে তোমাকে, নিতে হবে না।

আমাদের ডাক্তারবাবু।

কিস্যু জানে না। মানুষ মারা ডাক্তার। পাস্তুরে চলে যাও।

একজন আবার রাস্তার কলের পাশে জমা জল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি আতঙ্ক হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আজ না হোক কাল হবে।

হঠাৎ পা মাড়িয়ে দিলেন, উঃ করে উঠলুম।

হঠাৎ পা মাড়ালেন।

না হে পরীক্ষা করে দেখলুম, কেঁউ কেঁউ কর কি না।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাত বুকের কাছে ঝুলছে। গ্যাংগ্রীন শুনেছি, গ্যাসগ্যাংগ্রীন কাকে বলে জানি না। এদিকে গোবরের রিপোর্ট একটা লিখতে হবে। চব্বিশ পরগণার ডি, এমের সঙ্গেও একবার দেখা করবার দরকার। বুড়িটা অন্ততঃ ছুঁয়ে রাখতে হবে।

বাসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কি হল হে!

কুকুরে কামড়েছে শুনে বেশ যেন আনন্দ পেলেন। 'আমাকেও কামড়ে ছিল হে! ওয়ান্‌স আপন এ টাইম, আই ওয়াজ এ প্রাইভেট টিউটর' বলে শুরু করলেন। যে বাড়িতে পড়াতেন সেই বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। শুয়ে থাকত টেবিলের তলায় একদিন চটি পরতে গিয়ে ন্যাজে পা লাগায়, ন্যাজের অপমানে খাঁক - ব কামড়ে দিল। তারপর ভাই পাস্তুরে গিয়ে ইনজেকসান। এই এত বড় সিরিঞ্জ। লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। সামনের দিক থেকে এক একজন করে যাচ্ছেন, আর চিৎকার করে উঠছেন—বাবারে।

বেয়নট চার্জ শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ যুদ্ধে হয়।

এই ইনজেকসানও দেওয়া হল ওই কায়দায়। দু'হাতে সিরিঞ্জ বাগিয়ে, দূর থেকে ছুটে এসে তলপেটে ফাঁস। আমার সামনে আর মাত্র তিনজন। ভয়ে গা-হাত-পা কাঁপছে। এক-পা এক-পা করে লাইন থেকে সরছি। ইচ্ছে, পাশে সরে গিয়ে দে ছুট। পেছন থেকে একজন বললেন, ব্যাটা পালাচ্ছে। আর যায় কোথায়! সবাই মিলে জাপটে ধরে পেড়ে ফেললে। ওঁরা সকলেই ছিলেন ন্যাজকাটা শেয়াল। আমার ন্যাজটিও কাটিয়ে ছাড়লে? সে যে কি যন্ত্রণা! তা তুমি কবে নিচ্ছ?

আমি নোব না। কামড়েছে বাড়ির কুকুর।

নেবে না মানে ! আমি এজেন্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট ব্র্যাণ্ড বলছি, বাড়িরই হোক আর রাস্তারই হোক ইনজেকসান ইজ এ মাস্ট।

কুকুরে চাটলেও আজকাল পাঁচটা নিতে বলে। কাটলে চোদ্দ, চাটলে পাঁচ। এই হল নববিধান।

তিনটে সিট আগের ভদ্রলোক এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলেন, বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, আজকাল আদর করে চেটে দিলেও নিতে হয়। আরে মশাই দুধ খেতে খেতে বাচ্চা ছেলে অসাবধানে কামড়ে দিলেও নিতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা বাস আলোচনায় উত্তাল হয়ে উঠল। পেট ফোঁড়ার পক্ষে আর বিপক্ষে তুমুল তর্ক বিতর্ক। ড্রাইভার রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে পেছন ফিরে বললেন, আরে মশাই, আমাকে একবার শেয়ালে কামড়েছিল। কিস্যু করিনি। এক গুণীন এসে পিঠে থালা বসিয়ে সব বিষ নামিয়ে দিলে।

ব্যাস আলোচনা ঘুরে গেল, দৈব আর বিজ্ঞানের দিকে।

চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক বুকে ঝোলা হাত নিয়ে আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, ইলেকসানের আগে আমাকে আর জ্বালাবেন না। এ সব পেটি কেস লোক্যাল থানায় ডায়েরী করিয়ে রাখুন। কোন দলের ? রুলিং না অপোজিসান ?

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি এসেছি মন্ত্রীর গোবরের জন্যে।'

মন্ত্রীর আবার গোবর কি ? গোবর তো গরুরই হয়। খাটালে খোঁজ করুন।

আজ্ঞে, মন্ত্রীর গোবর গ্যাস ?

ও, এমনি গ্যাসে হচ্ছে না, এবার পাবলিককে গোবর গ্যাস দেবেন ! কত খেলাই জান প্রভু—সর্প হয়ে দংশ তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো। তা ডান হাতটা অমন করে বুকে ঝুলিয়েছিলেন কেন ?

কুকুরে কামড়েছে।

যাক, রাজনৈতিক দংশন নয়। যে দংশনে আমরা অষ্টপ্রহর জ্বলছি। ইনজেকসান নিয়েছেন ?

আজ্ঞে না, বাড়ির কুকুর ত।

বেশ করেছেন। আমার তিনটে কুকুর। কামড়ে কুমড়ে আমার শরীর ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে। সর্ব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যেন বুয়োর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলুম।

অমন কুকুর পোষার দরকার কি স্যার ?

এ আপনি কি বলছেন ? এই যে ভোট দিয়ে যাদের ক্ষমতায় পাঠালেন তাঁরা যদি কামড়াতে আসেন, কিছু করার থাকে। যদ্দিন মেয়াদ তদ্দিন কামড়। কুকুরের কামড় সহ্য হয়ে গেছে বলে মানুষের কামড় আর তেমন অসহ্য লাগে না।

সকলে ভয় দেখাচ্ছেন, ইনজেকসান না নিলে জলাতঙ্ক হবে।

হ্যাঁ সব হবে। আমি ডি, এম বলছি, নো ইনজেকসান।

তা হলে গোবর স্যার।

আমাকে গোবর বানালেন ? শুনুন, গোবর আছে, গোবর থাকবে, ওইসব

অ্যাকাডেমিক একসারসাইজ ইউসলেস।

আমি চব্বিশ পরগণার একটা ফিগার বের করেছি।

আমাকে দিয়ে যান। লিখে রাখি। মন্ত্রী চাইলে সেইটাই সাপ্লাই করব।

যাক্ কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। ডি, এম-কে বাজিয়ে গেলুম। এখন হাত নিয়ে দিনকতক পড়ে থাকি। সাতদিনের মাথায় হাজিরা দিয়ে গোময় পরিসংখ্যান পেশ করব।

সন্ধ্যে থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। টিপটিপ বৃষ্টি। তুমুল ঝড় জল আসছে। বাড়ির সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়াল। তিন হাজার এখনও হয় নি, হবে শুনেই ভি আই পি'রা আসতে শুরু করেছেন। তাও কেমন দিনে? ঝড়ের রাতে। কার এই অভিসার।

আমাদের অফিসের ড্রাইভার ইসমাইল জীপ থেকে নেমে এল। বগলে একটা ফাইল।

কে পাঠালেন?

বড় সায়েব।

ইসমাইল, আমি তো ভাই এখন কিছু লিখতে পারব না। আমার হাতের অবস্থা দেখো! তিন মাসের আগে এ হাতে কলম ধরা যাবে কিনা সন্দেহ!

সে আর আমাকে বলে কি হবে স্যার! আপনি বড় সায়েবকে বলুন।

তড়াক করে লাফিয়ে জীপে উঠে, ইসমাইল কালবিলম্ব না করে চলে গেল। থাকলেই আমার কাঁদুনি শুনতে হবে। কুকুরে কামড়াবার পর থেকেই আমার আচার আচরণ কিঞ্চিৎ কুকুর কুকুর হয়ে গেছে। করুণ সুরে কথা বলতে গেলে এক ধরনের কুঁই কুঁই শব্দ হচ্ছে। রেগে গেলে গড়ড়্ গড়ড়্। আমার মনে হয় তার আগে থেকেই হয়েছে। যবে থেকে মন্ত্রীমহোদয়ের সান্নিধ্যে এসেছি।

ফাইলটা খুলতেই একটা নোট বেরিয়ে এল। বড় কর্তার হুমকি:

আগামীকাল সকাল সাতটার মধ্যে খাজারামকে চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে একটা বক্তৃতা লিখে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করবেন হাসপাতালের লেম্যানস ওয়ার্ডে। জীপ দুর্ঘটনায় আজ সকালে তিনি আহত হয়েছেন। ঠ্যাং ভেঙে গেছে। জরুরি, জরুরি, জরুরি।

খাজারাম সম্প্রতি দল ভেঙে বেরিয়ে গেছেন। তিনি আর একটি দল করেছেন। আলাদা সিম্বল, আলাদা ম্যানিফেস্টো। নির্বাচনে নামছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন। বড় বড় বোলচাল মারছেন। মন্ত্রীর মত আমারও খুব রাগ। পার্টি কমজোর হয়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। ধুনোর আঠা দিয়ে সাঁটা মেয়েদের সেলাইয়ের বাক্সের মত সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।

গালাগালের তুবড়ি ছোটাতে পারি। বাদ সেধেছে হাত। ফুলে ফেঁপে ঢোল। তিন হাজারের খেলা। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, আমার হাত ফুলে মনুমেন্ট? বড় অসহায় অবস্থা। ওদিকে মন্ত্রী পড়লেন ঠ্যাং ভেঙে, এদিকে তাঁর কলমচির হাত খাবলেছে নেকড়ে বাঘে। খাজারাম গলাবাজি করছে। আমাদের মন্ত্রীমহোদয়কে ফেরাতেই হবে। নইলে, আমাদের আখেরে কাঁচকলা।

মাঝরাতে বৃষ্টি নামল তেড়ে। ঘন্টা চারেকেই কলকাতা কাৎ। একেবারে কল্লোলিনী কেলেঙ্কারি। সব হাবুডুবু। বক্তৃতা লেখা হয়নি, তার একটা জেনুইন কারণ আছে। না

হাজিরা দিলে চাকরি চলে যাবে।

বাসও চলবে না, ট্রাম ত সামান্য বৃষ্টিতেই ঠ্যাং তুলে বসে থাকবে। হাফপ্যান্ট পরে জলে নেমে পড়াই চাকরি বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা ? জল ভেঙে, রিকশা ঠেঙিয়ে যখন হাসপাতালে পৌঁছলুম তখন সর্বাঙ্গে ঝাঁকি আর কচুরিপানার কুঁচি লেগে আছে। বেশ রোহিত মৎস্যের মত খেলে খেলে এসেছি। ওয়ার্ডের বাইরে একটা বেঞ্চিতে মুখার্জি সায়েব বসে আছেন বিরস বদনে। মালকোঁচা মারা ধুতি ভিজে সপসপে ?

স্যার আপনি ?

তুমি যদি ফেল কর, মন্ত্রীকে ঠেকাতে হবে ত। তোমার হাতে কি হল ?

আজ্ঞে কুকুরে কামড়েছে।

আঃ তুমি আবার এই দুর্দিনে কুকুর নিয়ে ছেলেখেলা করতে গেলে। ইলেকসানের পর করলে হত না। যাক, লেখা হয়েছে ?

আজ্ঞে, না।

সে কি ? সারা রাত তাহলে কি করলে তুমি ?

কি করে লিখব স্যার। হাতটা ত অকেজো হয়ে গেছে। ভিজে জামার পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন সাঁ করে। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমি ফাঁসিতে চলেছি।

তোমার মন্ত্রী তুমি সামলাও, আমার কি ?

মন্ত্রী কি স্যার আমার একার ? তিনি সকলের, সারা দেশের ?

ঠিক আছে ? ভেতরে যাও বুঝবে ঠ্যালা ?

কেবিনের বাইরে পুলিস পাহারা। কোথায় যাবেন ?

মন্ত্রী ডেকেছেন। আমার নাম বলুন।

ভেতরে মন্ত্রীমহোদয় চিল চিৎকার করছেন। সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে। ভেতরে যাবার অনুমতি মিলল।

কি সুন্দর দৃশ্য। ট্রামের ট্রলির মত একটা ঠ্যাং ওপর দিকে তুলে মন্ত্রী আমার শয্যাশায়ী। মাথার দিকে গুরু গম্ভীর চেহারার দু'জন ডাক্তার দু'জন নার্স। পাশের চেয়ারে আমার মুখ চেনা এক বড় কর্তা। যিনি আমাকে একবার বেলা দেড়টার সময় গরম রসগোল্লা খাবার বায়না ধরে দুপুর রোদে সারা ব্র্যাবোর্ণ রোড চষিয়ে মেরেছিলেন। এক এক মাড়োয়ারী মিষ্টির দোকানে ঢুকি আর জিজ্ঞেস করি, গরম রসগোল্লা হ্যায় ? তারা হাঁ করে মুখের দিকে তাকায় আর বলে, রসগুল্লা হ্যায়, লেকিন গরম কাঁহাসে মিলেগা। রাত বারো বাজে আইয়ে।

তিনি এখন খুব আমড়াগাছি করছেন, আপনি যদি বাঁদিকে একটা ডাইভ মারতেন স্যার ?

ইডিয়েট ? তাহলে ত মরেই যেতুম। মরলে খুব সুবিধে হয়, তাই না ? জিপ তো বাঁ দিকেই ওলটাল। তাহলে স্যার ডানদিকে মারলেন না কেন ?

তাই তো মেরেছিলুম ? গিয়ারে পা আটকে লাট খেয়ে গেলুম।

অ্যাকসিডেন্টের আগে যদি নেমে পড়তেন।

মন্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এই এটাকে বার করে দাও তো। ওই মূর্খটাকে।
পুলিস ছুটে এল, আপনি স্যার বাইরে যান তো, উনি বিরক্ত হচ্ছেন।
গরম রসগোল্লা বেরিয়ে গেলেন।
মন্ত্রী মহোদয় আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ স্নেহ মাখান গলায় বললেন, কি, লিখে এনেছ ?
আজ্ঞে না স্যার।
হোয়াট ? তুমি লেখনি ?
আমার হাত গেছে স্যার। কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।
ষড়যন্ত্র ? ও খাজারামের লোক। ওকে পরীক্ষা কর তো।
ডাক্তারবাবুরা বললেন, কোন্ দলের লোক, স্টেথিসকোপ কিম্বা এক্সরেতে ত ধরা পড়বে না।
মূর্খ ওর হাতটা পরীক্ষা কর। সত্যিই কুকুরে কামড়েছে কি না ?
একজন নার্স এগিয়ে এসে পড়-পড় করে আমার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন, স্যার সাংঘাতিক কামড়েছে। সেপটিক মত হয়ে গেছে।
বলো কি ? কার কুকুর কামড়েছে তোমাকে ?
একটু মিথ্যে বললুম, আজ্ঞে হুগলীতে যখন গোবর সারভে করছিলুম, সেই সময় এক গোয়ালের বাইরে একটা বাঘের মত কুকুর শুয়েছিল। আমি নধর একটি গরুর পেটে হাত দিয়ে যেই বলেছি, মা ভগবতী একটু কর তো, কুকুরটা অমনি লাফিয়ে এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।
ইন এফিসিয়েনসি অফ দি ডি-এম। গ্রস নেগলিজেনস অফ ডিউটিস। আমাকে দেখতে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বললেন, আহা পা-টা অমন করে নাড়বেন না স্যার। ওয়েট দেওয়া আছে। ট্র্যাকসান ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। সেরে উঠে যা হয় করবেন।
তুমি ইনজেকসান নিয়েছ।
আজ্ঞে না স্যার। ডি-এম টোয়েন্টিফোর পরগনাস বললেন, কুকুরটা যখন পাগল ছিল না তখন না নিলেও চলবে।
হি নোজ নাথিং। এই একে একটা ভ্যাকসিন ঠুকে দাও ত এখুনি।
পেছু হটে দরজার দিকে সরছি। একজন নার্স বললেন, পালাচ্ছে স্যার।
চেপে ধরো, চেপে ধরো।
নারী-বাহিনী চেপে ধরল।
মন্ত্রী বললেন, আমি মন্ত্রী বলছি, তোমাকে নিতে হবে।
তলপেটে প্যাঁক করে ছ সি সি সেরাম ফুঁড়ে দেওয়া হল। যেমন কর্ম তেমন ফল।
মন্ত্রী বললেন, এইবার কাজের কথা।
হ্যাঁ স্যার কাজের কথা ?
লিখতে যখন পারনি, তখন বলতে ত পারবে ?
কি স্যার ?
ওই খাজারামকে নস্যাৎ করে দু'চার কথা ?

কোথায় স্যার ?

তিনদিন পরে একটা আসনের জন্যে পার্লামেন্টারি বাই ইলেকসান। আমার ক্যান্ডিডেট হেরে যাক, ডু ইউ ওয়ানট দ্যাট ?

নো স্যার !

তাহলে আজই আমরা যাব।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, আমরা এই অবস্থায় আপনাকে যেতে দোব না।

তোমাদের বাপ দেবে ?

আমি মিউ মিউ করে বললুম, এখন আর কুকুরের ঘেউ নয় বেড়ালের মিউ। ইলেকসান পড়েছে যে, পলিটিকসে জড়ালে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার ?

না জড়ালেও যাবে। আমি যাইয়ে দোব।

মরেছে, এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

ঘন্টাখানের পরে হাসপাতাল থেকে অভিনব একটি শোভাযাত্রা বেরল। উদাস শহর কলকাতা সেভাবে তাকিয়ে দেখল না। দেখলে নজরে পড়ত, একটি সাদা অ্যামব্যাসাডার, পেছনে রাগী রাগী চেহারার এক মানুষ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান পা সামনের দিকে ট্রলির মত প্রসারিত, প্রান্ত ভাগে একটি বাটখারা ঝুলছে। ট্রাক থেকে বেরিয়ে থাকা লোহার 'বারে' যেমন হুঁসিয়ারী লাল চাকতি ঝোলে। চারপাশে বালিশ। তিনি সেট হয়ে বসে আছেন। পাশেই বিমর্ষ চেহারার একটি ছেলে। বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত স্লিংয়ে ঝুলছে। মুখটা মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে। তলপেটে সিঙি মাছে কাঁটা মারছে ?

পেছনে আর একটি গাড়িতে দু'জন হাড় বিশেষজ্ঞ, একজন সেবিকা, ওষুধপত্র।

মিছিল ক্রমশ রাজনীতির অন্ধকারে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল। আর ফিরে এল না, পতাকা উড়িয়ে স্লোগান দিতে দিতে ! এখন কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক বাজারে মধ্যবয়সী একটি ছোকরা গামছা বিক্রি করে। কেউ জানে না, তার দাম তিন হাজার টাকা ? এখন সে দিন আনে আর দিন খায়, কিছু সুখে আছে। কোনও বৃশ্চিক দংশন নেই। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছে।

—দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত—

সঞ্জীব বৈশিষ্ট্য

একালের বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসধারা যাঁদের জন্য আজও প্রবহমাণ তাঁদের মধ্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অগ্রগণ্য, সর্বাগ্রগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কৌতুকপ্রিয়তা, অমলিন ব্যঙ্গ, সরস উক্তি প্রভৃতি সমস্ত গুণই সঞ্জীবের লেখনীতে অবলীলায় প্রকাশ পায়। তাঁর রসিকতা বা ব্যঙ্গ কখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আঘাত করে না। মানুষের ব্যক্তি-জীবনে বা সমাজজীবনে যে নিত্য অসংগতি, সেইগুলিই ফুটিয়ে তুলে তিনি পাঠকের মনে এক অবর্ণনীয় আনন্দ ও কৌতুকের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। তবে সব গল্পই যে অবিমিশ্র হাস্যরসের তাই নয়, কোনও কোনও গল্পে হাস্যরস সৃষ্টির পরেও একটি দুটি চরিত্রে এমন সূক্ষ্ম বেদনা বা আর্তি প্রকাশ পায়, পাঠকের চিত্তে কৌতুক-উদ্রেক সত্ত্বেও চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। এই দ্বৈত-রস-সৃষ্টির সমন্বয়ে সঞ্জীব বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বর্তমান গ্রন্থে লেখকের এইরকম ঊনত্রিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। যা সকল পাঠকের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করবে।